

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক *Ebong Prantik*

বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩০, সেপ্টেম্বর ২০২৫



এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor: 8.311
Vol. 12th Issue 30th, September, 2025
DOI : 10.5281/zenodo.17690458

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন



এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পো:- কেঁষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

Ebong Prantik

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor: 8.311

[ISSN: 2582-3841(O), 2348-487X(P)]

DOI : 10.5281/zenodo.17690458

*Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and*

Printed by Anuprintha printing House, Kolkata - 150,

Vol. 12th Issue 30th, 22th Sept., 2025, Rs. 900/-

E-mail: ebongprantik@gmail.com

Website: www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১২ তম বর্ষ ও ৩০ তম সংখ্যা

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ISSN: 2582-3841 (Online)

2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিষ্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেপ্তপুর, কলকাতা ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মণ

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনুপ্রিষ্ঠ প্রিন্টিং হাউস, ৪১ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০ ০১২

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মূল্য : ৯০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

- ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রতী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শান্তজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

- ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনিবার্ণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

- ড. রূপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি. এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।
শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০-২৫০০ এর মধ্যে।
২. বাংলা হরফে লিখলে অত্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।
৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল ebongprantik@gmail.com
৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।
৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেইটপুর, কলকাতা- ৭০০১০২

ফোন: ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur,

Kolkata - 700102

Ph. No.: 8250595647

E-mail: ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

গোবরডাঙ্গা, বাদে খাঁটুরা, বর্মন পাড়া, পিন - ৭৪৩২৭২

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট / পাতিরাম বুকস্টল, কলকাতা / ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট /

এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website: www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

উত্তর-পূর্বে উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিক পর্ব ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব : একটি তুলনামূলক পাঠ	
পরমাশ্রী দাশগুপ্ত	১৩
বিহারিলাল চক্রবর্তী ও তাঁর 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্য : বাংলা কাব্যসাহিত্যে একক কণ্ঠের আত্মপ্রকাশ	
সাম্পান চক্রবর্তী	২১
মহাভারত ও বর্তমান যুগে তৃতীয় লিঙ্গ : সমীক্ষাত্মক আলোচনা	
সুদীপ্তা ভকত	৩২
বাংলা লোকছড়া : পারিবারিক নানা সম্পর্কের দর্পণ	
শান্তনু ভট্টাচার্য	৩৭
আদিবাসী লোক উৎসব করম পূজা	
মনশ্রী মাহাত	৪৩
প্রত্যুষের শুকতারা এবং দুই বন্ধুর গল্পো	
ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়	৪৮
শৈলজানন্দের ছোটগল্পে দাম্পত্য-জীবন	
ইন্দ্রাণী হাজরা	৫৭
ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং লিঙ্গ ন্যায়বিচার : একটি পর্যালোচনা	
মৃণাল দাস	৬৪
ফ্যাসিবাদ বিরোধীতায় অরুণ মিত্রের কবিতা	
মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ	৭১
নারীমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ-অতৃপ্তির শিল্পরূপ : ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'আমতেল'	
মেঘা ভট্টাচার্য	৮০
অতীতের ধূসর জগত সৌন্দর্য্য অভিসার : প্রসঙ্গ বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ	
চিরঞ্জীব মুখার্জী	৮৯
মধু-মানসের সন্ধানে	
সায়ক মুখার্জী	৯৫
তারাক্ষরের কবি : জীবন চেতনার শৈল্পিক রূপায়ণ	
জবা মণ্ডল	১০৫
সমরেশ বসুর ছোটগল্পে রাজনৈতিক চেতনা	
সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়	১১০

ভুসুকুপাদ ও জীবনানন্দের শিকারের চিত্রকল্প : বিশ্বস্ততা ও প্রতারণার আখ্যান চন্দন বারিক	১১৮
জাতীয় চেতনা কী আসলে কল্পিত সম্প্রদায় অভিষেক মণ্ডল	১২৬
বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জন' নাটকে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান তপন কুমার বাল্লা	১৩৩
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন : উনিশ শতকের এক অনালোচিত বাঙালি সমাজসংস্কারক ও তাঁর উত্তরাধিকার জগদ্বন্ধু সরদার	১৪৩
তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনী' : মিথ্যা অপবাদে জীবন বিনষ্টির গল্প ফিরোজ আলি মণ্ডল	১৫১
ষষ্ঠী অমরেশ বিশ্বাস	১৫৪
প্রতিস্পর্ধী জাতীয়তাবাদের খোঁজ : উনিশ শতকে বাঙালির ক্রীড়াচর্চা রাহুল পণ্ডা	১৫৯
একবিংশ শতকে নারীদের জন্য বিবেকানন্দের বার্তা : ক্ষমতায়ন ও কর্মমুখী প্রয়োগ নির্মল হালদার	১৬৬
'ছেঁড়া তার' (১৯৫০) : কৃষকের যন্ত্রণাময় জীবন দীননাথ সরদার	১৭৪
বৈদিকযুগে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ : একটি সমীক্ষা কৌশিক সরকার	১৮২
নানা অভিযুগে : কাজী নজরুল ইসলাম দেবাশিস ঘোষ	১৮৭
ঔপনিবেশিক বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুত্থান ও প্রভু জগদবন্ধু সোমাশ্রী শীল	১৯১
গান্ধীজির অহিংস নীতি : একটি পর্যালোচনা অঞ্জু রাহা	১৯৮
অনালোকিত নারীসত্তার ব্যতিক্রমী উদ্ভাসন প্রসঙ্গ 'কবির বউঠান' উপন্যাস রেজাউল ইসলাম	২০৪
ওয়াহাবি প্রতিরোধ আন্দোলন : প্রসঙ্গ মালদা জেলা আব্দুল বাসির	২১৪
শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ সাহাবুদ্দিন আহমেদ	২২০

‘কে কবি—কবে কে মোরে?’ জিজ্ঞাসু মধুসূদন ও প্রশ্নোত্তরের সমাপন আকাশ বিশ্বাস	২২৬
‘রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবির ছবি’- একটি বিশ্লেষণমূলক পাঠ সাধন বিশ্বাস	২৩২
মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষাশৈলীতে তার প্রতিফলন বর্ষা পণ্ডা	২৪১
পরম্পরা ও নন্দনতত্ত্ব : সহরই লোকশিল্পের পুনর্মূল্যায়ন অমিত ভট্টাচার্য	২৫০
একমেরুতাবাদ থেকে বহুমেরুতাবাদে উত্তরণ : বর্তমান বিশ্বরাজনীতির চালচিত্রে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ চাঁদ অধিকারী	২৫৯
উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ভাবনা : গৌঁওখালির খ্রিস্টসঙ্গীতের প্রেক্ষিতে একটি আলোচনা পুষ্পেন্দু রাউৎ	২৬৫
বাংলা কথাসাহিত্যে দেশভাগ : বৈষম্যের খতিয়ান বিজন সরকার	২৭২
উনিশ শতকে ভারতের কারিগরি বিদ্যাচর্চা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা প্রনয় দে	২৮২
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ : নরনারীর জীবনদর্শন অগ্নিজ্বালা থেকে আলোকপ্রভা লোকেশ্বর রায়	২৮৮
কোভিড-১৯ মহামারিকালে অনলাইন শিক্ষা : সমস্যা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা সুত্রত মজুমদার	২৯৬
নারী মুক্তির কথাকার কৈলাসবাসিনী দেবী : বিস্মৃতির অন্তর্জালে প্রত্নাষা দাস	৩০৬
প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব - কপিলের সাংখ্য ও মহাভারতীয় সাংখ্য অবলম্বনে সুজয় সরকার	৩১৪
নারীচর্চার এক আলোকিত অধ্যায় : শিক্ষাভাবনায় বাঙালি মহিষসী নারী প্রত্নাষকুমার রীত	৩২১
মুক্তি প্রসঙ্গে মন : সাধারণ মানুষ, বিশেষত কায়বুহকারী যোগীর মুক্তিলাভ প্রক্রিয়া পিউ চক্রবর্তী	৩৩৩

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেহ-মনের সম্পর্ক : দেকাত, স্পিনোজা, লাইবনিজ তপন রুইদাস	৩৩৯
ব্যক্তিত্ব গঠনে স্মৃতির ভূমিকা জগদীশ দাস	৩৪৯
চৈতন্যের উত্থান পরবর্তীতে বাংলার আর্থসামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন ও বর্তমান নবদ্বীপস্থিত বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের গুরুত্ব অচিন্ত্য দেবনাথ	৩৫৪
Mothering the Marginalized : Disability and Emotional Resistance in Sarat Chandra's <i>Bindur Chhele</i> Ratan Sarkar	৩৬৩
Riyaz in the 21st Century : Innovations in Vocal Practice with Virtual Companions Md. Bulbul Ahamed	৩৭১
A Study on Implication of Socio-Cultural Learning Theory in Political Science Education : Insight from Vygotsky Susmita Paul	৩৮১
<i>Birajlakshmi Ghosh</i>	৩৮৮
Corruption and Mental Health : A Sociological Overview Irani Sahu	৩৯৩
Anonymity, Silence, and the Politics of Intimacy in Sachin Kundalkar's <i>Cobalt Blue</i> Hasanuzzaman Ansari	৪০১
<i>Monika Gupta</i>	৪০৯
Implications of Kant's Deontology on Business Ethics : A Philosophical Analysis Priyanka Mukherjee	৪১৬
Relevance and Significance of Indian Knowledge System in Relation to NEP 2020 Rudra Prasad Saha	৪২৫
Tradition in the Perspective of History : East Midnapore Utkalika Sahoo	
Contemporary Marginal Women Drapadi Murmu at the Top of Respect : Some Words and Some in the Story Mina Khatun	

The Upaniṣads and the Brāhmo Samāja : The Philosophical Foundation of Monotheism (<i>ekēśvaravāda</i>)	
<i>Uday Karmakar</i>	8৩২
Nationalism, Science, and Enterprise : The Role of Acharya Prafulla Chandra Ray in the Development of Indigenous Industry	
<i>Sreshtha Nandy</i>	8৩৮
Adverse Effects of Urbanisation on Environment and A Solution	
<i>Paulomi Saha</i>	88৭
Comparative Analysis of Manik Bandopadhyay's Padma Nadir Majhi and Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea	
<i>Samriddhi Sekhar Mondal</i>	8৫৬
Nazrul's Krishnanagar : Contemporary Socio-Religious Condition and it's Relation with Poverty	
<i>Kushal Biswas</i>	8৬২
Strategic Convergence in Asia : India-Japan Relations amidst China's Rise	
<i>Surajit Majumdar</i>	8৬৯
Bengal Famine of 1943 : Starvation, Food Problem, and the Provincial Politics	
<i>Partha Pramanik</i>	8৮২
A Study on Tribal Development Policies and Their Impact on Indigenous Communities in India	
<i>Debdas Mondal</i>	৮৭৮

সম্পাদকীয়



পড়তে পড়তে আশ মেটে না- এই অনন্ত তৃষ্ণাই আসলে জ্ঞানের প্রতি মানুষের চিরকালীন প্রেমের প্রকাশ। প্রতিটি পাঠ যেন নতুন করে কোনো অজানা জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়, দেখা যায় আরেকটি পৃথিবী, আরেকটি অনুভবের ছায়া। বইয়ের ভেতর দিয়ে আমরা যাত্রা করি অন্যের চিন্তার ভিতরে, অনুভব করি তাঁর আনন্দ, দুঃখ, স্বপ্ন ও সংগ্রাম। পাঠের এই মগ্নতাই সাহিত্যকে শুধু জ্ঞানের উৎস নয়, নন্দনের উৎসও করে তোলে। সাহিত্যপাঠ মানে কেবল তথ্য আহরণ নয় বরং রুচি ও সংবেদনের পরিশীলন। পাঠকের চোখে যখন কোনো শব্দ নেচে ওঠে, কোনো বাক্য হৃদয়ের তার ছুঁয়ে যায়, তখনই পাঠ পরিণত হয় এক নান্দনিক সাধনায়। সেই সাধনায় আমরা ক্রমে শিখে যাই- জীবনের রূপ, প্রকৃতির রস, মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। পড়তে পড়তে আমরা কেবল জ্ঞান অর্জন করি না, নিজের আত্মাকে নতুন করে চিনে নিতে শুরু করি। এই আত্ম-অনুসন্ধানের যাত্রাই পাঠের প্রকৃত আনন্দ। পাঠ যেন শ্রোতের মতো, যার প্রতিটি ঢেউ নিয়ে আসে চিন্তার উচ্ছ্বাস, ভাবনার নতুন আলো। জ্ঞানসমুদ্রে সেই নিরন্তর পাড়ি আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে, মনকে করে মুক্ত, আর পৃথিবীকে করে তোলে আরো বেশি সুন্দর ও বোধপূর্ণ। ‘এবং প্রান্তিক’- এর এই সংখ্যা আপনাদের সেই পূর্ণতারই স্বাদ দেবে।

উত্তর-পূর্বে উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিক পর্ব ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব :

একটি তুলনামূলক পাঠ

পরমাশ্রী দাশগুপ্ত

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতে লিখিত ও চর্চিত সাহিত্য বঙ্গদেশের সীমানার বাইরে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর-পূর্বের নানা অঞ্চলে বাংলা ভাষা ছিল ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা’ অর্থাৎ যোগাযোগ রক্ষার ভাষা। বাংলা ভাষা সেখানে প্রশাসনিক নানা কাজে, আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও এই অঞ্চলে চর্চিত হত অনেক আগে থেকেই। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায় উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার মডেলকে অনুসরণ করে। এই প্রভাবজনিত গ্রহণ এই অঞ্চলের উপন্যাস রচনার এক শক্ত ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিল। উত্তর-পূর্বের বাংলা, অসমীয়া, মণিপুরী ও বিভিন্ন জনজাতি ভাষায় উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব নিরূপণ করাই এই প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য। মূলত তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধটি লিখিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্যে বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব ও প্রসার চিহ্নিত করাই এই প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: প্রভাব, গ্রহণ, তুলনামূলক, বঙ্কিমচন্দ্র, উত্তর-পূর্ব।

মূল আলোচনা: ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যের এক নিজস্ব ধরণ তৈরি করেছিল। পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করা মডেল অনুসরণ করে বাংলা কথাসাহিত্যের পথ চলা শুরু। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই সে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তা সফল রূপ ধারণ করে। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ এই ধারার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের এই বাঁকবদল পার্শ্ববর্তী আঞ্চলিক সাহিত্য জগতেও নতুন স্রোত নিয়ে আসে। তবে তা উনিশ শতকেই নয়। বাংলার বাইরে, বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা গদ্যচর্চার নিদর্শন ষোড়শ শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বাংলা গদ্যের অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, দানপত্র ইত্যাদিতে। কিন্তু সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল মূলত পদ্য আঙ্গিক। দেশীয় রাজাদের যোগাযোগের মাধ্যমও ছিল বাংলা। নানা প্রশাসনিক কাজে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের জন্যও তাঁরা বাংলা ব্যবহার করত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাংলা ছিল ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা’। সুতরাং বঙ্গদেশে লিখিত ও চর্চিত বাংলা সাহিত্য এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের চিন্তায় ও মননে বাংলা সাহিত্যের গভীর প্রভাব কাজ করেছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় কথাসাহিত্য বিশেষত উপন্যাস রচনার কাজটি শুরু হয়েছিল বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় মোটামুটি উপন্যাসের কাঠামো নিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকে। সাহিত্যিকদের সামনে তখন বঙ্কিম উপন্যাস ছিল অন্যতম

মডেল। সামাজিক বিষয় এবং ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েই তারা প্রাথমিকভাবে উপন্যাস লেখার কাজটি শুরু করেছিলেন। ত্রিপুরায় রচিত বাংলা উপন্যাসে, আসামের অসমিয়া উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে এসে পড়েছিল বঙ্কিম উপন্যাসের প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় উত্তর-পূর্বের নানা ভাষায় উন্মেষ পর্বের উপন্যাস রচনার কাজটি শুরু হয়। পরবর্তীকালে মণিপুরী উপন্যাস রচনার প্রথম ধাপেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনিবার্যভাবে চলে এসেছিল। এই প্রভাবজনিত গ্রহণ এই অঞ্চলের উপন্যাস রচনার এক শক্ত ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিল। যে ভিত্তিভূমি থেকে পরবর্তীকালে উত্তর-পূর্বের বাংলা, অসমিয়া, মণিপুরী ও বিভিন্ন জনজাতি ভাষা তাদের সাহিত্যের নিজস্ব দৃঢ়ভূমি তৈরি করে নিতে পেরেছিল। গদ্যের মোড়ক ভেঙে আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের রচনারীতি ও ভাষাশৈলী সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করে। প্রাবন্ধিকেরা বঙ্কিমী রীতি আত্মসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজস্ব রীতির নির্মাণ করেন।

এক

ত্রিপুরায় গদ্য সাহিত্যচর্চার সূচনা হয় মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য (১৮৪৯-১৮৬২) এবং মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৬২-১৮৯৬) শাসনকালে। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী’ সভার উদ্যোগে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় ‘ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী’ পত্রিকা। এখানে কিছু গদ্যের চর্চা হয়েছিল। তবে এটি ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে।

বিশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে ত্রিপুরায় প্রবন্ধ রচনা যথাযথভাবে শুরু হয়। মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা (১৮৫৩-১৯৩১)। তিনি কুমিল্লা অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাস করেন এবং সেখান থেকেই পড়াশোনা করেন। মামলা মোকদ্দমার কাজে তিনি নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করতেন। ফলে বাংলায় রচিত ও চর্চিত সাহিত্যের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন- ‘আবর্জনার ঝুড়ি’ এবং ‘বাংলা ভাষার চারিযুগ’। ‘আবর্জনার ঝুড়ি’ রচনাটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ত্রিবেণী পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুমান করা হয়, এটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের রচনা এবং সম্ভবত অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটি ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণাকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের বইমেলায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। বাংলা গদ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কমলাকান্তের দণ্ডুর’, ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ গ্রন্থে যে গদ্য নির্মিত হয়েছিল, সেই রীতির ব্যবহার এখানে দেখা যায়। বিশেষত ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ দ্বারা এই আত্মজীবনী সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে। ‘আবর্জনার ঝুড়ি’ রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা-

তখন বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী সবে বাহির হইয়াছিল, একদিন কোন সভাসঙ্গের মুখে বইখানার লঘু ভাষার নিন্দা শুনিয়া খুল্লতাত (মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য) বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে লয়, এই শক্তিমান লেখক বাঙলা ভাষাকে আর সংস্কৃতের খাতক রাখিবে না। পণ্ডিত বাংলা, যাহাকে সাধু ভাষা বলে তাহা বোধহয় আর টিকিল না। আর এই কথায় বরং গৌরবের আনন্দই রহিয়াছে।^১



মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সাহিত্যবোধের এটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সখ্যতা ছিল। তিনি রাজাদের দ্বারা বারবার ত্রিপুরায় আমন্ত্রিত ও অভিনন্দিত হয়েছেন। ত্রিপুরার রাজারা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের পাশাপাশি তারা যে বঙ্কিম সাহিত্যেরও নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন, তা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা বিষয়ে বীরচন্দ্র মাণিক্যের এই মূল্যায়ন ছিল যথাযথ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ছিল সংস্কৃত মোড়ক মুক্ত নতুন ধরনের, যা ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের ভাষারীতির ধরনকে নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

‘আবজ্ঞনার বুড়ি’-র পাশাপাশি নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘বাংলা ভাষার চারিযুগ’। এ রচনাটি ‘রবি’ পত্রিকায় (সূচনা ১৯২৪ খ্রি.) প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে এ রচনাটি আগরতলা শহরের পৌণমী প্রকাশন থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।^২ মাত্র ৩৬ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার ‘প্রথম যুগ’ বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগকে। ‘দ্বিতীয় যুগ’ বলেছিলেন মুঘলদের হাত থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে শাসনভার চলে যাওয়ার পরবর্তী সময়কালকে। ‘তৃতীয় যুগ’-এর প্রবর্তক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা এবং তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যে যে বাঁকবদল এনেছিল তাকেই সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মী। পাশাপাশি এই প্রবন্ধ দুটি ত্রিপুরা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে উনিশ শতকের শেষ পর্বে বঙ্কিম সাহিত্যের জনপ্রিয়তার পরিচয়বাহী।

দুই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধনসূচক ভাষণে বলেছিলেন-

... বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলা সাহিত্য। ...সেই কারণেই আজ বাঙালি যত দূরে যেখানেই যাক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।^৩

বাংলা সাহিত্য নিশ্চিতভাবেই এক ‘অখণ্ড আত্মবোধ’ তৈরি করে। বঙ্গদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিকভাবে অনেকটা দূরে হলেও বাংলা সাহিত্য ত্রিপুরার বাঙালি ও উপজাতি মানুষদের সেই অখণ্ডতার অনুভব দিয়েছে। ত্রিপুরায় রচিত বাংলা সাহিত্য সেই অখণ্ডতার বোধকেই ধারণ করে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা ভাষাকে আধুনিক রূপ দিচ্ছিলেন, গদ্যে, প্রবন্ধে ও কথাসাহিত্যে নানা বিষয় ভুলে আনছিলেন তখন ত্রিপুরার মননশীল সাহিত্যপ্রেমী সমাজ তা আত্মদান করত ও তা নিয়ে চর্চা ও চলত। পরবর্তীকালে যখন ত্রিপুরায় উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখা শুরু হয়, তখন বঙ্কিম সাহিত্যই ছিল লেখকদের অন্যতম পথপ্রদর্শক। বঙ্কিম সাহিত্যের অনুপ্রেরণা, গ্রহণ ও সংশ্লেষ এই অঞ্চলের সাহিত্যকে নতুন নির্মাণ দিয়েছিল।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠান কিশোর সাহিত্য সমাজের মুখপত্র হিসাবে ‘রবি’ নামক সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। ১৯২৪ সালেই প্রকাশিত পরিমল কুমার ঘোষের ‘খাঁচার পাখী’ ত্রিপুরায় লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস। উপন্যাসটি ত্রৈমাসিক রবি পত্রিকায় প্রথম বছরের প্রথম

সংখ্যা থেকে চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটিতে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। বঙ্কিম সাহিত্যে এই ধরনের যুক্তিবাদী চিন্তার প্রক্ষেপ আমরা আগেই দেখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিমাগের পথে হাঁটতেই পছন্দ করতেন। তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাসের গঠনরীতিতে এর প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর লেখায় তিনি একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইতেন। উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ ও তার মূল্যবোধ উঠে এসেছে ‘খাঁচার পাখী’ উপন্যাসে। যুক্তিবাদের পাশাপাশি এই উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নারীমুক্তি ভাবনা। উপন্যাসের মুখ্য নারী চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল অনুপমা চরিত্রটি মনে করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সূর্যমুখী ও ভ্রমরকে। স্বামীর উদাসীনতার কারণে ‘খাঁচার পাখী’ উপন্যাসের অনুপমার মনে হয়েছিল যে স্বামীর ঘর খাঁচার পাখির মত। তাই সে স্বামীগৃহ ছেড়ে চলে যায়। অনুপমার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ও স্পষ্ট উচ্চারণ মনে করায় ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর ভ্রমরকে, যখন সে বলে-

যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিনই তোমার প্রতি আমার ভক্তি।^৪

দাম্পত্য সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার জন্য স্ত্রীর মত স্বামীর ও যে দায়িত্ব থাকে, সে কথা মনে করায় ভ্রমর। স্বামী যদি শ্রদ্ধার যোগ্য না হয় তবে সেই সম্পর্ক মূল্যহীন হয়ে যায়। ভ্রমর তার কথায় সেটিই বোঝাতে চেয়েছিল। অনুপমাও সেই স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে চায়নি, যে স্বামী দাম্পত্য সম্পর্কে মানসিকভাবে সংযুক্ত নয়। উদাসীন দাম্পত্য সম্পর্কের নানা ফাঁক ও ফাঁকি, নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। নতুন যুগের মেয়েরা যে আর এই প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার করে না, তাও তিনি বুঝেছিলেন। এই ধারণাই সম্প্রসারিত হয়েছে ‘খাঁচার পাখী’ উপন্যাসে।

তিন

ককবরক হল তিব্বত-বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর বোড়া শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষা। ত্রিপুরার আটটি জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা এই ভাষায় কথা বলেন। এরা হলেন দেববর্মী বা ত্রিপুরী, রিয়াং, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই, মুড়াসিং, রূপিনী এবং উচই। ত্রিপুরা, আসাম এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে ককবরক ভাষাভাষীর সংখ্যা ১২ লক্ষ। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির নিবিড় সান্নিধ্য দীর্ঘদিন ধরে পেয়েছেন ককবরক ভাষী জনজাতির মানুষেরা। ফলে এক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে ত্রিপুরায়। ককবরক ভাষায় যে সমস্ত সাহিত্য অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার ‘তাম্রমসা বদল’, ‘প্রতিবেশী’ গল্প অবলম্বনে শ্যামলাল দেববর্মার রচিত ‘নকারিনি কথমা’, ‘বিসর্জন’ নাটক অবলম্বনে সুধঙ্গা দেববর্মার ‘অসা খিচন’, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কমলাকান্তের দণ্ডর’ অবলম্বনে নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মী রচিত ‘কমলাকান্তনি দণ্ডর’, নন্দকুমার দেববর্মী অনূদিত গীতার অনুবাদ ‘ককবরক গীতা’, ড. প্রভাস চন্দ্র ধর অনূদিত রামায়ণের অনুবাদ ‘ককবরক রামায়ণ’ ইত্যাদি।

অর্থাৎ গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি ধ্রুপদী সাহিত্যগ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের অনুবাদও হয়েছে ককবরক ভাষায়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের কাজ এখনও চলছে। ত্রিপুরায় বাঙালি ও জনজাতির মিশ্র সাংস্কৃতিক চেতনা ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ককবরক ভাষার প্রথম উপন্যাস সুধঙ্গা দেববর্মার ‘চেথুয়াঙ’-এই উপন্যাসে অলৌকিকতা-রূপকথা, ইতিহাস-রাজনীতি ও সমাজ



ভাবনার সঙ্গে মিশে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রোমাঞ্চধর্মী রচনার ক্ষেত্রে যেভাবে অলৌকিকতা বাস্তবের সঙ্গে একসাথে পথ চলত, এই উপন্যাস তেমন ভাবেই নির্মিত হয়েছে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ককবরক ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। পাশাপাশি শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের ককবরক ভাষায় অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান কবিতা নাটক অনূদিত হতে থাকে ককবরক ভাষায়। ককবরক ভাষায় প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য অনূদিত হয় ককবরক ভাষায়। জনজাতি জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনা।

শ্যামলাল দেববর্মার ‘খণ্ড’ উপন্যাসের নায়ক বীরচন্দ্র শহর থেকে বি.এ. পাস করে তার হাচুক কপরা গ্রামে ফিরে আসে। কয়েকদিন গ্রামে থেকে সে ফিরে যাবে কলকাতায় এম.এ. পড়তে। এরই ফাঁকে একদিন সে জুমে গিয়ে একাকিনী নির্জন প্রান্তরে সাক্ষাৎ পায় নাইথকতীকে। প্রকৃতিলগ্না এই নারী পাঠকে মনে করিয়ে দেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কথা। নাইথকতীর দেখানো পথে হাঁটতে হাঁটতে বীরচন্দ্র ওরফে বিচাং-এর নিজেকে নবকুমার বলে মনে হয় -

আগে আগে তরুণী পথ দেখিয়ে হাঁটে। পিছন পিছন আমাদের বিচাং! তার হঠাৎ কেন যেন মনে হলো সে নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমার আর তার সামনের তরুণী কপালকুণ্ডলা। নবকুমার-কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তফাৎ থাকলেও কোথাও যেন একটি মিল রয়েছে।^৫

উপন্যাসের নায়ক বিচাং নাইথকতীর সাক্ষাৎ পেয়ে নিজেকে নবকুমার বলে মনে করে। বঙ্কিম উপন্যাসের প্রভাব এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে এসেছে ককবরক উপন্যাস ‘খণ্ড’-এ। বিচাং বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতি আমাদের বুঝিয়ে দেয় সেই সময় শিক্ষিত ককবরকভাষীদের কাছে বঙ্কিম সাহিত্যের জনপ্রিয়তা।

চর

অসমীয়া উপন্যাসের উন্মেষ পর্বে অনেক লেখককেই অনুপ্রাণিত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দিকে যখন অসমীয়া উপন্যাস রচনার সূচনা হচ্ছে, সেই প্রাথমিক পর্যায়ের উপন্যাসে কাহিনি গঠন এবং আঙ্গিক বঙ্কিম উপন্যাসের আদলকে অনুসরণ করেছে। এই সময় পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ, লক্ষীনাথ বেজবরুয়া, হরিনারায়ণ দত্ত, শরৎচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রধর বরুয়া প্রমুখ লেখকের রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসেছে বঙ্কিমের প্রভাব। রজনীকান্ত বরদলৈ নিজেই তার সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ওয়াল্টার স্কটের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। রজনীকান্ত বরদলৈ এর ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘মনোমতী’ ১৯০০ সালে লেখা। এই উপন্যাসটি অহোম রাজাদের শেষ যুগে বর্মী আক্রমণের পটভূমিকায় লেখা। মনোমতী ও লক্ষীকান্তের প্রেম এখানে মুখ্য উপজীব্য। বঙ্কিমচন্দ্রও তার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণকে নির্বাচন করেছিলেন। দুটি রাষ্ট্রীয় শক্তির সংঘাতের পটভূমিতে তিনি বেশ কিছু উপন্যাস লেখেন আবার তার মধ্যেই থাকে প্রেম উপাখ্যান ও রোমাঞ্চ রস। যেমন ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসটিতে মোগল ও রাজপুতদের সংঘর্ষের পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছে রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী, জেবউন্নিসা-মবারকের প্রেম উপাখ্যান। ঘটনাবল্ল প্লট

নির্মাণ, নাটকীয়তা ও এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের পটে প্রেম উপাখ্যান তৈরির এই ভাবনাটি সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে বহু লেখককে প্রভাবিত করেছিল।

মণিপুরীদের সঙ্গে বাংলা ভাষার এক দীর্ঘ সখ্যতার ইতিহাস আছে। মণিপুর রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল ‘বিজয় পঞ্চগলী’ বা ‘মৈতে পুরাণ’ (মণিপুরের ইতিহাস)। আঠেরো থেকে বিশ শতকের মধ্যে মোট পাঁচ খণ্ডে এই ঐতিহাসিক কাব্যটি লেখা হয়েছে। ‘বিজয় পঞ্চগলী’-র প্রথম খণ্ডের শিরোনাম ‘গরীব নওয়াজ চরিং।’ পামাইবা থেকে গোপাল সিংহ বা গরীব নওয়াজ হয়ে ওঠার কাহিনি, মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ও শান্তিদাস অধিকারীর রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ, বার্মা ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের প্রসঙ্গ এখানে পয়ার ও ত্রিপদীতে বর্ণিত হয়েছে। গরীব নওয়াজের সময়েই বৈষ্ণব সমাজের প্রভাবে মণিপুরে বাংলা লিপি গৃহীত হয়েছিল। এর আগে মণিপুরী ভাষার স্বতন্ত্র লিপি ছিল যা রক্ষিত হয়নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-

The older literary tradition suffered from a set-back, owing to the ill-conceived and mischievous action of the Ramanandi missionary Santadas Babaji, whose vandalism is getting together and burning a number of old Manipuri Mess appears to have received the support of Gharib-nawaz himself, and this continued during 18th Century.^৬

‘বিজয় পঞ্চগলী’ কাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড উনিশ শতকের রচনা। রাজা ভাগ্যচন্দ্র থেকে গম্ভীর সিংহের সময় অবধি নানা ঘটনার বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। এই সময় মণিপুরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার লক্ষণীয়। রাজা ভাগ্যচন্দ্র রাসলীলা বিষয়ক বাংলা পদ ও রচনা করেন। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে মণিপুরীদের এক দীর্ঘদিনের সংযোগসূত্র ছিল। লমাবম কমল সিং এর উপন্যাস ‘মাধবী’ লেখা হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। এটি মণিপুরী ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মণিপুর রাজ্যে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাতের সময়কালে লিখিত হয়েছিল এই উপন্যাস। উপন্যাসটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে আছে শিরোনাম সহ কয়েকটি পরিচ্ছেদ। বঙ্কিম উপন্যাসের গঠনরীতি এক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। মণিপুরের মৈতী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান গুরুত্ব পেয়েছে। রাজকুমার বীরেন্দ্রজিৎ ও তার বন্ধু শশীর সঙ্গে পাহাড় সংলগ্ন এক বাগানে প্রকৃতিলগ্ন দুটি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঠককে ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে নবকুমার আর কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎকে মনে করায়। উপন্যাসে প্রকৃতির মাঝখানে দুই কন্যাকে দেখে রাজকুমারীর অপ্রাকৃত দেবী বলে মনে হয়েছিল।

বীরেন দেখল, দুটি মেয়ে বসে মালা গাঁথছে। দুজনকেই অপ্রাকৃত দেবীর মতো দেখাচ্ছে।^৭

বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে নিজের উপন্যাসে এসে সরাসরি পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলেন, লমাবম কমল সিং সেভাবেই তাঁর উপন্যাসে সরাসরি মন্তব্য করেছেন। সর্বজ্ঞ লেখকের উপস্থিতি ‘মাধবী’ উপন্যাসের অন্যতম বিশেষত্ব। ‘দাবানল’ পরিচ্ছেদে সরাসরি তিনি উপন্যাসে প্রবেশ করে উরীরে নামক যুবতীর পরিচয় দেন। লেখক বলেন-

পাঠক! মেয়েটি আর কেউ নয়, সে হল, নিরুপায় উরীরে।^৮



কখনো দুঃখজনক পরিস্থিতিতে লেখকের দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়। লেখক উপন্যাসে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হয়ে থাকতে পারেননি। যখন ডাকাতদল উরীরে এর মা থম্বালের উপর অত্যাচার চালায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে চলে যায় তখন লেখক নিজে তার হতাশা আর কষ্টের কথা উপন্যাসে জানান দিয়ে যান-

হে ঈশ্বর! তোমার পৃথিবীতে এত নির্দয় লোকের বাস! এমন দুঃখের ছবি আর কতবার দেখতে হবে?^৯

‘মাধবী’ উপন্যাসটি রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত। এখানে অলৌকিকতা বাস্তবতার পাশাপাশি চলেছে। যখন দুর্বৃত্তরা উরীরকে বেঁধে ফেলে তখন অলৌকিক উপায় তার উদ্ধার হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর রোমান্সধর্মী লেখাগুলিকে নানা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছেন। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েও তা বাস্তব অতিরিক্ত কিছু। ‘মাধবী’ উপন্যাসেও বাস্তব অতিরিক্ত নানা ঘটনা সাবলীলভাবে মিশে গেছে।

উপন্যাস ছাড়াও ছোটগল্প ও প্রবন্ধের আঙ্গিকেও এসেছিল বঙ্কিমের প্রভাব। ঊনিশ শতকের শেষদিক থেকে উত্তর-পূর্বের বিশেষত আসাম ও ত্রিপুরাতে রাজপরিবার, সম্ভ্রান্ত পরিবার ও জমিদার বাড়ির অন্তঃপুরে মেয়েদের লেখাপড়ার চল ছিল। এরা অনেকেই কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লিখেছেন। আসামের শতদলবাসিনী ও প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তুলে ধরেছেন আহোম কন্যা জয়মতী ও জয়ন্তীর ইতিকথা। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর ‘জয়ন্তী’-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ গুরু হচ্ছে এইভাবে-

আজ প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল। আসামদেশ ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য দ্বারা তিনবার আক্রান্ত হয়। তৃতীয়বারের আক্রমণ অতি ভীষণ। এইবার আসামদেশ ব্রহ্মরাজ সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হইয়া স্বাধীনতার পুষ্পমালা কণ্ঠদেশ হইতে অপসারিত করিয়া পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল গলায় ধারণ করে। ব্রহ্মসৈন্যের পদভারে স্বাধীন আসামের উচ্চ মস্তক অবনত হয়।....শত শত গ্রাম, দেবালয় প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র সতীসাবধীকে দুরাত্মাদের পক্ষিলময় কবলে, সতীত্ব রত্ন বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।....ঠিক এই সময়কার একদিনের একটি ঘটনা আজ আমার এই গল্পের বিষয়।^{১০}

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই লেখাটির গঠনশৈলী ও শব্দচয়ন বঙ্কিমী ঘরানার। এই সময়ে, এই অঞ্চলের গল্প, প্রবন্ধ থেকে এমন অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যাবে।

উত্তর-পূর্বের বাংলা অসমীয়া ও মণিপুরী সাহিত্যের উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিক পর্যায়টি বঙ্কিমী সাহিত্যের অনুসরণ ও অনুপ্রেরণায় নির্মিত। এই অঞ্চলের জনজাতি ভাষার কিছু সাহিত্যেও এই প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চেতনার ধারণা এবং বহন এই উপন্যাসগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে ও উপন্যাসচর্চায় এই অনুপ্রেরণা সেই সমস্ত ভাষার উপন্যাসের ধারার ভিত শক্ত করেছে। ভৌগোলিক দূরত্ব ভেঙে এক অখণ্ড চেতনায় সংযুক্ত হয়েছে উপন্যাসগুলি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তার ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন।^{১১}

বঙ্কিম যে ভিন্নধর্মী রূপ ও রস এনেছিলেন সাহিত্যে, সেই ধারা উত্তর-পূর্বের সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে, লালন করেছে নতুন পথ দেখিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. দেববর্মা, নবদ্বীপচন্দ্র, বইমেলা ২০০৪, 'আবর্জনার ঝুড়ি', ত্রিপুরা, ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার, পৃ. ১৩
২. দেববর্মা, নবদ্বীপচন্দ্র, ২০০৯, 'বাংলা ভাষার চারিযুগ', আগরতলা, পৌণমী প্রকাশন, পৃ. ৫
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আশ্বিন ১৩৪৩, 'সাহিত্যের পথে', কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৪৯
৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৫৯, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', কলকাতা, আদিত্য প্রকাশালয়, পৃ. ৭১
৫. দেববর্মা, শ্যামলাল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৬, 'খঙ', আগরতলা, অক্ষর প্রকাশনী, পৃ. ২৭
৬. Chatterji, Suniti Kumar, 2007, 'Kirata-Jana-Kriti', Kolkata, The Asiatic Society, p 160
৭. সিং, লমাবম কমল, ২০০৯, 'মাধবী', সাহিত্য একাডেমি, পৃ. ৪
৮. ঐ, পৃ. ৯
৯. ঐ, পৃ. ২৮
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আশ্বিন ১৩৪৩, 'সাহিত্যের পথে', কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৪৭
১১. বর্মণ, প্রসূন ও পাল, মৌমিতা (সংকলন ও সম্পাদনা), ২০২১, 'উত্তর-পূর্ব ভারতে নারী-রচনা (১৮৭৪-১৯৪৭)', গুয়াহাটি, নাইনথ কলাম, পৃ. ৬১।

বিহারিলাল চক্রবর্তী ও তাঁর ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্য : বাংলা কাব্যসাহিত্যে একক কণ্ঠের আত্মপ্রকাশ

সাম্পান চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারানসী

সারসংক্ষেপ: সংসারের সীমাবদ্ধতা ও দৈনন্দিন গ্লানি আছন্ন করে রোমান্টিক কবিদের, তাঁদের জীবনাচরণে পরাধীনতার কোন জায়গা নেই। এই অভূতপূর্ণ থেকেই তিনি পৌঁছতে চান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, সারদাময়ী সরস্বতীর কল্পনার আসন সেখানে পাতা থাকে। নিসর্গচেতনাই রোমান্টিক গীতিকবিতার সেই মোহময়ী কল্পনাশক্তির মূল, ফলস্বরূপ বিহারিলাল চক্রবর্তী রচিত নির্বাচিত এই ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যের মধ্যে সেই ধারাটি রয়েছে। যথার্থ অর্থেই বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখি যিনি, সেই বিহারিলাল চক্রবর্তীর তুলনায় অনালোচিত, অনতিপরিচিত বাংলা লিরিক কাব্যের প্রবেশক কাব্যপাঠ হিসেবে ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্য এবং সেই পরিসরে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিহারিলালকে অনুষঙ্গ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চেয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সূচক শব্দ: বাংলা গীতিকবিতা, Individuality, প্রকৃতিনিষ্ঠা, স্বাতন্ত্র্য ও সমাজচিন্তা, উনিশশতক, বিহারিলাল চক্রবর্তী।

মূল আলোচনা: উনিশ শতক বাংলা কাব্যকবিতার ধারা গড়ে ওঠবার শতক। সে ধারায় কেবলি বৈপরীত্যের সংঘর্ষ ও সমাপন। কেমন হবে বাংলা ভাষার গদ্যরীতি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির কাছে তার আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু, কোন পথে যাবে বাংলার কবিতা, কেমন হবে তার প্রকাশভঙ্গি- এ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট রীতি বা আদর্শ তৈরি হয়নি তখনো। চলছিল পরীক্ষানিরীক্ষা। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত ‘সম্বাদ প্রভাকর’ (১৮৩১-৩৩)-এর পাতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আধুনিক কাব্যকবিতার একটা ধাঁচ কিন্তু সেখানেও ভাষারীতি নির্মাণের চেষ্টাটি ঢাকা পড়ে গেছিল বিষয়ের বেড়াজালে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন। সে ধারা মূলত ভারতবর্ষীয় পুরাণ সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ। তাঁদের অস্থি ছিল কাব্যকবিতার মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করানো, আত্মচেতনার বোধ সজ্জাত করা এবং দেশচেতনাকে ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। তবে সে ধারাও সম্পূর্ণটাই নবজাগরণ প্রভাবিত— পাশ্চাত্যের সাহিত্যধারার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা।

ঈশ্বরগুপ্ত ‘সম্বাদ প্রভাকর’-এর মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতির বাঙালিত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগের কৃতী কবিদের জীবনী সংকলন, বাঙালি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়বলী নিয়ে কবিতা রচনা বা পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি ‘বাবু’ ও ‘বিবি’-দের প্রতি কটাক্ষ-সর্বক্ষেত্রে তাঁর এই উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট। আসলে, নিধুবাবুর টপ্পা বা আখড়াই গানে বাংলা কবিতার যে ধারাটি কিছুটা স্তিমিতগতি হয়ে পড়েছিল, ঈশ্বরগুপ্ত তাকে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত ও পরিশীলিতভাবে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেন। সে ধারা শিষ্ট না বটতলামাফিক, সে প্রসঙ্গ আলাদা। কিন্তু সে ধারা বাঙালি প্রাণের নিজস্ব। তখন সমাজে দ্বন্দ্ব ছিল, বিরোধও

ছিল। ‘সম্বাদ প্রভাকর’ প্রতিষ্ঠাকালে ‘ইয়ং বেঙ্গল’রা বাংলা সমাজে উদারনৈতিক আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইছিলেন। তখন দ্বন্দ্ব ছিল ঈশ্বরগুপ্তের খাঁটি বাঙালিহের নির্মাণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কারের বিরোধিতা এবং ‘ইয়ং বেঙ্গল’-দের উগ্র সংস্কারবাদের মধ্যে।

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করে বিহারীলাল চক্রবর্তী-র আগে এবং সমসময়ের কালটিকে কেউ কেউ ‘বীরযুগ’ এবং কেউ ‘ছন্দ মহাকাব্যের যুগ’ আখ্যা দিয়েছেন।^১ সেই সময়ে যারা লিখেছেন তাঁরা হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) এবং নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। বিহারীলাল ছিলেন হেম-নবীনের অগ্রজ (১৮৩৫-৯৪)। পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শের অনুকরণে এনারা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শে বড় হয়ে ওঠা নব্যবাঙালি বাবুসমাজ ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাটি সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু, রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেম-নবীনচন্দ্রের সেই সাধু উদ্দেশ্যটিও পাশ্চাত্য প্রভাবিতই হল। তাঁরা যা করলেন সেটা হল ভারতীয় পুরাণকে পাশ্চাত্যের খাঁচে পুণর্বর্নন অথবা বিদেশি কাব্যের অনুবাদ। রঙ্গলাল, কাব্যরচনার বিশুদ্ধ প্রণালী বোঝাতে গিয়ে বলেছেন “ইওরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্বচ্ছটার প্রতিবিম্ব, এতদেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদের মুখ্য অভিপ্রেত।” অর্থাৎ স্কট বার্ক ড্রাইডেন মিলটন পড়া শিক্ষিত বাঙালি মহাকাব্যের ধ্রুপদী অনুকরণে তার কাব্য চিন্তা তৈরি করে নিতে চাইছে। তবুও তার মধ্যেই রচিত হল মধুসূদন দত্তের ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’, নবীনচন্দ্র সেন-এর ‘অবকাশরঞ্জিনী’ এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিন্তাতরঙ্গিনী’। সংকলনের কবিতাগুলিতে কবির নিত্যন্ত ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে। তবুও ‘পিষ্টপেষিত কবিতার ঝঞ্ঝনান্বিত’^২ মধ্যে সেই সুরটি বড়ই ক্ষীণ হয়ে লুকিয়েছিল।

এই অনুকরণপ্রিয় মহাকাব্যিক ধারা থেকে নবীনচন্দ্র সেনও আলাদা হতে পারেননি। তবু অন্যদের মত নাগরিক পরিবেশ তাঁকে বড় হয়ে উঠতে হয়নি। কলকাতার কলেজ শিক্ষার আগে অবধি তিনি গ্রামেই মানুষ এবং রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু পরে তিনি লেখালেখি শুরু করছেন।^৩ নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও স্বভাবকবিত্বের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তিনি ভোগ করেছেন চিরকাল। তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেল পাশ্চাত্য নয়, বরং তাঁরই পূর্বসূরী বাঙালি কবিদের অনুসরণ কখনো বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। তিনি লিখেছেন বাংলা কবিতার কায়্যা ত্যাগ করে ছায়া হবার কথা।

বাংলা সাহিত্যে, অতএব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ইওরোপীয় পশ্চাদপটের জয়ধ্বনি। বাঙালি কবি সাহিত্যিকরা সেই দ্বিমুখী ধারার দ্বিধাগ্রস্ততাকে আত্মস্থ করে কাব্যরচনা করবার চেষ্টা করেছেন। মধু-হেম-নবীন যেখানে ‘বৃহৎসংহার’-এর মহাকাব্যিক আদল এবং চতুর্দশপদী কবিতার আত্মভাবে মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত- বাংলা সাহিত্যের সেই অনুশীলন পর্বে আবির্ভাব তাঁর। তিনি ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যের পরিচিত কবি, বিহারীলাল চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলাল প্রসঙ্গে ‘আধুনিক সাহিত্য’ প্রবন্ধে বলেছেন- ‘বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখলেন না, পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না- তিনি নিভূতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না— কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।”^৪ বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যাদর্শ তৈরির ক্ষেত্রে বারবার বিহারীলালের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে একথা প্রথম



বিহারীলাল বলছেন না। বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্যে সুদূর জয়দেবের কাব্য থেকে বৈষ্ণব পদাবলী, এমনকি নিধুবাবুর উপাগানেও ব্যক্তিপ্রধান ধারণার চর্চা চলেছে। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে মধু-নবীন-হেমচন্দ্র প্রবর্তিত ধ্রুপদী আঙ্গিকের সাহিত্যকে অস্বীকার করে তার প্রতিক্রিয়ায় বিহারীলালের গীতিকবিতার জন্ম, এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে সমাজে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনাতেও সেই বক্তব্যেরই আভাস পাওয়া যায়। তারাপদ মুখার্জী তাঁর ‘আধুনিক বাংলা কাব্য’-এ এক জায়গায় বিহারীলালের লেখা কিছু অংশ উদ্ধৃত করছেন— **“এখন ভারতে ভাই কবিতার জন্ম নাই/ গোরে বোসে অট্টহাসে ফেরে কার ছায়া?/ হা ধিক! ফেরজ বেষে এই বাল্মিকীর দেশে/ কে তোরা বেড়াস সব উষ্ণিমুখী আয়া?”**^৮ তারাপদ মুখোপাধ্যায় একে ক্লাসিকাল রীতির বিরুদ্ধে বিহারীলালের ধূমায়িত অসন্তোষ হিসাবে পড়তে চেয়েছেন। এক অর্থে তা ঠিক, কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে কেবল পাশ্চাত্য বিদ্রোহই প্রধান হয়েছে এমনটা কখনোই নয়।

বিহারীলাল আদতে জন্ম কবি। তিনি নিজে যা দেখতেন, যেমন দেখতেন, অনুভব করতেন, তেমনই লিখতেন। তিনি পেশাদারি লেখক ছিলেন না, ছিলেন নিজের ইচ্ছার অধীন। কাব্যের বাজার জনপ্রিয়তা বা বিক্রির হিসাবকে তিনি একেবারে গুরুত্ব দিতেন না। বিহারীলালের বাল্যবন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর কখনো বিহারীলালের অনতিজনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।^৯ এছাড়াও, বিহারীলাল সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যের প্রতি সর্গের সূচনায় শেলি, বায়রন, কালিদাস, ভট্টহরি বা বাল্মিকীর কাব্যের উদ্ধৃতি রয়েছে। আসলে উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের ভাবসংঘাতে যে বহির্মুখীতা এসেছিল, বিহারীর উপরিউদ্ধৃত ছত্রগুলিতে সেই ভাবনার প্রতি একটা বীতস্পৃহাই স্পষ্ট হয়েছে। বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্যের কাব্যধারাকে অনেকাংশেই অনুসরণ করতে চাইছিল তখন, সেই অনুকরণপ্রিয়তাকে বিহারীলাল মেনে নিতে চাননি। এর একমাত্র কারণ ছিল বিহারীলালের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বা ‘individuality’-র তীব্রতা। বাঁধা নিয়মের বশবর্তী হয়ে থাকা যে বিহারীলালেরও স্বভাববিরুদ্ধ সে কথা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,^{১০} ঠিক যেমনটি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বাল্যশৈশবে। অর্থাৎ স্বভাবের বশেই বিহারী কবি, বিশেষ যুগের প্রতিবাদ করার বা প্রতিক্রিয়া দেখানোর সচেতন উদ্দেশ্য তাঁর মধ্যে নেই। অসচেতন এই আত্মভোলা কবি তাই জনপ্রিয় নন, বিখ্যাত নন বরং কালের ইতিহাসে স্বতন্ত্র যুগচিহ্নের মত ব্যতিক্রমী।

বিদেশি কাব্যসাহিত্যের ধারায় ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক ধারার সাহিত্যের যে জল-অচল বিভাজন তা বাংলা সাহিত্যে কখনোই প্রযুক্ত হয়নি। ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল গদ্য ও যুক্তির যুগ।^{১১} তা শুরু হয়েছিল ড্রাইডেন-পোপ-ফিল্ডিংদের সময়ে, পরিণতি পায় এলিয়টে। প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে সেগুলি অনুকরণ করার ঝোঁক ক্লাসিকাল রীতিতে গ্রহণীয় হল। ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী সাহিত্যের ভাষায় থাকবে বলিষ্ঠতা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দ অবলম্বন। আবেগ বা অনুভূতির উপরে থাকবে বিশ্লেষণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, বরং পুরনো বিষয়কেই নতুন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থাকবে সেখানে। স্বভাবতই, ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ছিল আলাদা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বা রামমোহনের উদ্যোগে বাংলায় গদ্যরীতি তৈরি করার যে প্রয়াস তা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই মূলত বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটল পাশ্চাত্যের শিক্ষা সাহিত্য ও চিন্তার।

নবজাগরণ পূর্বে তাই বাংলাদেশে পাশ্চাত্যের অব্যবহিত পূর্বে শেষ হওয়া ধ্রুপদী রীতিটিই উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার সাহিত্যরীতি ধ্রুপদী প্রভাবিত হয়ে ওঠে।

এর ঠিক বিপরীতে ক্লাসিকাল সাহিত্যের সংযম ও নিয়মানুবর্তীতাকে সম্পূর্ণ বিপরীতে রেখে ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের সাহায্যে কল্পনার অবাধ স্বাধীনতায় যে সাহিত্য ভাবনা গড়ে ওঠে তাই রোমান্টিক আন্দোলন। যার সংজ্ঞা তৈরি হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের হাত ধরে ‘লিরিক্যাল ব্যালাডস’ (১৭৯৮)-এর মধ্যে। জন কিটস-এর ‘নাইটিঙ্গেল’, শেলি-র ‘স্কাইলার্ক’ বা কোলরিজের ‘কুবলাখান’ সবেতেই আছে বস্তুতন্ত্র বা রক্ষনশীলতার বিপরীতে মননশীলতা ও কল্পনাকে বাধাহীনভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা। প্রকৃতিপ্রেম ও শহরবিযুক্তি, বিস্ময়বোধ ও অতীতচারিতা, বিষমতা, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম দিয়েছিল লিরিকপ্রধান কবিতাকে। যেখানে ব্যক্তির বিষাদ, রাগ ক্ষোভ অভিমান মুখ্য, বৃহত্তর জাতীয় চেতনা নয়। ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে এক বিশেষ আর্থসামাজিক পটভূমিতে জন্ম হয়েছিল রোমান্টিক সাহিত্য আন্দোলনের। যান্ত্রিক জীবনাদর্শ, কৃত্রিম পরিবেশ, শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান পূর্বে জীবনের সহজতাকে হারিয়ে ফেলেছিল মানুষ। কবি তাই শহর থেকে মুখ ফিরিয়ে গ্রামের মধ্যেই খুঁজতে চেয়েছিলেন আশ্রয়।^১ বাংলাদেশে তেমন কোনো রাজনৈতিক পটভূমি ছিল না, গীতিকবিতার ধারাটিও বাংলাদেশে অপরিচিত নয়। তবু, মহাকাব্যজাতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যধারার বহুলচর্চার অভ্যেসে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি পাঠক নিজের মনের কথাকে প্রকাশ করার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কবির সেই ‘আমি’-কে, পাঠকের কাছে প্রথম এনেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। সেইকারণেই উনিশ শতকে পুনরালোচিত গীতিকাব্যের ধারায় তিনি ‘ভোরের পাখি’।

বাংলা গীতিকবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে গীতিকাব্যের ‘প্রেম’ আসলে ‘বিরহজনিত বিচ্ছিন্নতাবোধ’। রোমান্টিক সাহিত্য আন্দোলনে ইংলন্ডে ‘বিরহ’ শব্দটিকে যে মাত্রায় পড়া হয়, বাংলায় তা নয়। বাংলা গীতিকবিতার ‘বিরহ’ আসলে ‘সংসারবিচ্ছিন্নতা’। বিহারীলালের চলন কিছুটা বিপ্রতীপ। তিনি ইংলন্ডের রোমান্টিক আন্দোলনের ‘বিচ্ছিন্নতাবোধ’ থেকে বাংলা গীতিকাব্য ধারার প্রেমজনিত ‘বিরহ’-এ নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন। ব্যক্তির মন্য আবেগ ক্রমশই সর্বজনকে ছুঁতে চেয়েছে।

১২৭১ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিহারীলাল একটি পত্রে লিখেছেন—“কবির যে শক্তির অনুরোধে সর্বব্যাপী হইতে পারেন, সহসা দীপ্তিমতী শক্তির অন্তর্ধান দেখিলে যে কি এক ভয়ানক নিরাশা প্রাপ্ত হন, তাহা কেবল কবিত্রাতারাই যথার্থ অনুভব করতে পারেন।”^{২০} এই শক্তি কবির কল্পনাশক্তি এবং কবি কথিত বিরহের মূল চালিকাশক্তি। কল্পনাশক্তির বিচ্ছিন্নতায় আসে কবির বিরহ। বিহারীলাল কথিত এই ‘শক্তি’- গীতিকবির আরাধ্য। এর সমর্থনে একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পেশ করা যায়। বিহারীলাল প্রথম জীবনে ‘স্বপ্নদর্শন’ বলে একটি গদ্যরচনা করেন। সেটি ১৮৫৮ সালে রচিত এবং সেই বছরেই প্রকাশিত। পরবর্তীসময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি চিঠিতে সেই গদ্যটিকে তাঁর ‘কাঁচা গদ্য’ বলে মনে হয়েছে একথা তিনি জানান। চিঠিটিতে বিহারীর কিছু পদ্যলেখ অর্থাৎ প্রথমজীবনে লেখা পদ্যের অংশ উদ্ধৃত করা আছে। “অসীম অম্বর অগাধ সাগর/ আঁধার পাतालতল/ প্রমোদকানন নাটনিকেতন/ ভয়ানক রণস্থল/..... কিন্তু এ শক্তি সতী স্ত্রী যেমতি/ তেজিবার কভু নয়/ বদ্ধ থেকে থেকে লঞ্চে ও গিরিকে/ শত গুণ বেগে বয়।”^{২১} পংক্তিগুলিতে কবির কল্পনাশক্তির বিস্তার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য এটাই যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত রূপক কাব্য ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। সে কাব্যের বিষয় ছিল কবির কল্পনাবিচ্ছিন্নতা,



পাতালগমন, প্রিয়সখা প্রমোদের রাজ্যে বিলাসরসের প্রকোপে পড়া, বীর ও ভয়ঙ্করে যুদ্ধ এবং 'কল্পনা' নায়িকার সঙ্গে পুনর্মিলন। অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে যা কাব্য উপাদান হয়ে উঠছে, তার ইঙ্গিত রয়ে যাচ্ছে কবিবন্ধু বিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী কোনো কাব্যে। দ্বিজেন্দ্রনাথ হোন বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, বাংলা লিরিক কাব্যের উৎসমুখকে উৎসারিত হতে সাহায্য করছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী।

বিহারীলাল কাব্যচর্চায় কিছুটা অবহেলিত ও অনালোচিত কাব্য 'নিসর্গসন্দর্শন'। কিন্তু এই কাব্যটিকে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রবেশক হিসাবে পড়া যেতে পারে। গীতিকবির আরাধ্য হল প্রেম প্রকৃতি মানুষ এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক। 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যে বিহারীলাল প্রকৃতির, শক্তিগুলিকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করছেন। সাত সর্গে বাঁধা এই কাব্যটি প্রকাশ পায় ১৮৭০ সালে।^{১১}

এই স্বকীয়তা, এই নিজের সঙ্গে কথোপকথন বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের সমসময়ে বড়ই দুর্লভ ছিল। তাঁর কবিতাকে সমসময়ের প্রেক্ষাপটে পড়ে তাই, আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি ক্লাসিকাল রীতিতে লেখা মহাকাব্যের পাহাড়চূড়া। ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ জুড়ে বাংলাদেশে বয়ে যাওয়া আশ্বিনের ঝড়ের বর্ণনা। 'ঝটিকার রজনী', 'ঝটিকাসম্মোগ' এবং 'পরদিনের প্রভাত'- কাব্যের অধিকাংশই 'অবোধবন্ধু' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে মুদ্রিত হয়েছিল। তারপর 'অবোধবন্ধু' পত্রিকার তৃতীয় ভাগে সমগ্র কাব্যটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম-দ্বিতীয় সর্গ ১২৭৬ সালের মাঘ সংখ্যায় এবং তৃতীয়-পঞ্চম সর্গ ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। চতুর্থ সর্গটি বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি অসম্পূর্ণ 'সুরবালা' কাব্যের প্রথমংশ।^{১২}

সংসারের সীমাবদ্ধতা সংকীর্ণতা ও দৈনন্দিন গ্লানি কবিকে আচ্ছন্ন করেছে, তাতে বেড়েছে অতৃপ্তি। রোমান্টিক কবি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তার শক্তি সীমিত। ফলে কল্পনার সাহায্যে তিনি পৌঁছতে চান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। সে লক্ষ্য হল কল্যাণ এবং মঙ্গলের আদর্শময় জগত। সেখানে সাংসারিক যাবতীয় অস্থিরতা ও অশান্তির বিনাশ হয়। সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সেই অনন্ত খোঁজ চলেছে। 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যের প্রথম সর্গে 'কবির চিন্তা' অংশে সেই ভাবনাই প্রতিফলিত। এ সর্গের শুরুতেই পাশ্চাত্যের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি শেলি-র উদ্ধৃতি এবং সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ভর্তুহরি রচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।^{১৩} রোমান্টিক বিষাদ-এর কথা মনে পড়ায় শ্লোকটি। একদিকে আত্মবিশ্লেষণ অন্যদিকে তদনীন্তন সমাজচিত্র- দুইয়ের মাঝে উৎসারিত হয়েছে বিহারীলালের স্বরূপ। তিনি সংসারের প্রতি বিরূপ কেননা 'সে সরল ভাব নাই দেখি আর, / গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে।' কবি সৃজনশীল, তাঁর কাছে সংসার পরাধীনতার সমান, বাধাস্বরূপ। একদিকে প্রকাশোন্মুখ শক্তির আকুলতা, অন্যদিকে বাধা। এই অবস্থাকে বিহারীলাল তুলনা করেছেন পরাধীন ভারতের সঙ্গে। অর্থাৎ, বাক-স্বাধীনতা এবং দেশের পরাধীনতার প্রতীতুলনা করা হয়েছে এই সর্গে। এই দ্বিধাই বিচ্ছিন্ন করেছে কবিকে। তাঁর মনে হয়েছে তিনি 'স্বপনের মায়াময় পুরী' ছেড়ে এসে পড়েছেন 'লোকালয়' পৃথিবীতে। সে অবধি তাঁর 'সদা যেন মনে জাগে পালাই পালাই'। সেই বিষাদ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে বিহারী আশ্রয় চেয়েছেন দেবী সরস্বতীর পায়ে। 'বাজাও তোমার সেই বিমোহিনী বীণা/ শুনিয়ে জুড়াক মোর তাপিত হৃদয়/ জুড়োবার কে আমার আছে তোমা বিনা?/ তোমা বিনা ত্রিভুবন মরু বোধ হয়!/' অর্থাৎ 'সারদামঙ্গল' রচনা করবার অনেক আগেই কবিকথিত সেই কল্পনাশক্তি তার মানসমূর্তিটি তৈরি করে নিয়েছে। 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যের প্রথম সর্গেই কবির

সরস্বতী চিন্তায় সেই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সংসারচিন্তায় আচ্ছন্ন কবি কল্পনাশক্তি থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ছেন, তাকে আশ্রয় নিতে হচ্ছে সরস্বতীর পদতলে। ‘সারদামঙ্গল’-এ ত্রিবিধ বিরহের প্রস্তাব রয়েছে, তার ভিত্তিভূমি অতএব বিহারীলালের ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যের মধ্যেই রয়ে গেছে।

উনিশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যে প্রকৃতি ও মানবের সম্পর্কের আভাস দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রই হোক আর প্রবল ঝড়ের প্রেক্ষাপটই হোক, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে রহস্য ও বিস্ময় আবিষ্কারের যে প্রয়াস আবিষ্কার করা যায় তাই-ই রোমান্টিসিজমের মূল কথা। কাব্যটির দ্বিতীয় সর্গ থেকেই সেই বিস্ময় ও রহস্যের বোধ কাজ করেছে বিহারীলালের মধ্যে। দ্বিতীয় সর্গ ‘সমুদ্রদর্শন’ বিশাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রকে সামনে রেখে বিস্ময় ও ভাবকে প্রকাশ করছেন বিহারীলাল। তাঁর বাল্যবন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য- এ প্রসঙ্গে লিখছেন, ছোটোবেলায় বিহারীলাল বাবার সঙ্গে পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই সর্গে সমুদ্রের রূপ বর্ণনায় হয়তো তার প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে নিঃসন্ধিগ্ন হওয়া যায় না। কবিতাটিকে সামান্য অনুধাবন করলেই বোঝা যায় এ কবিতায় অভিনব বস্তুপুঞ্জের সমাহার। কখনো কবি সমুদ্রের উদ্দাম রূপকে প্রণাম করছেন, কখনো বা হয়েছেন শঙ্কিত। ক্রক্ষেপহীন সমুদ্র পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে বিহ্বল হয়ে পড়ে, মিলতে চায় চাঁদের সঙ্গে। বিশাল পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের জলরাশি এবং তার মাঝে অবস্থিত সমস্ত দ্বীপগুলির যে মানসবর্ণনা দিয়েছেন বিহারীলাল তা বৈচিত্র্যময় এবং পুঞ্জানুপুঞ্জ। সেখানে ইংলন্ড দ্বীপের বর্ণনা করতে গিয়ে ইংলন্ডকে তিনি ‘রাবণের মোহিনী কনক লক্ষপুরী’-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভারতবর্ষ যেন রামহীন, যোদ্ধাহীন। বিদেশি শাসক এসে তাই হরণ করে নিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা রূপ ‘সীতা’-কে। তাঁকে, অর্থাৎ এই অভাগা দেশকে উদ্ধার করবার মত আর কেউ নেই। সমুদ্রের এই বিশালতার কাছে বস্তুগত বা মানুষের সৃষ্টি নিতান্তই তুচ্ছ। সমস্ত যান্ত্রিকতাকে সে এক মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পারে। সেই অপার বিস্ময়ের পথেই কবিকল্পনায় এসেছে অগন্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণ প্রসঙ্গ। ‘অসীমতর গভীর অতল’ হঠাৎ করেই উন্মোচিত হয় কবির সামনে। কবিতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় অংশ হয়তো এটাই। তবু শেষ অবধি কবি আশ্রয় খুঁজেছেন শান্তিতেই। সৃষ্টিছাড়া কিছু হোক, তা কবি চান না। কিন্তু, বৃহদাকারের এই কবিতায় আবেগ এবং ভাবোচ্চাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি বিহারীলাল, এমনকি বেশ কিছু অংশ প্রভাবদোষে দুষ্ট। সর্গের বেশ কিছুটা অংশ বায়রনের ‘Child Harold (IV)’ কাব্য থেকে নেওয়া। ‘গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে/ কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়;’। বায়রন লিখছেন ‘Roll on, thou deep and dark blue ocean-rolls!’ সুতরাং পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং রোমান্টিসিজম সম্পর্কে বিহারীলাল যে অবহিত ছিলেন, এই অংশ থেকেই তা প্রমাণিত।

তৃতীয় সর্গের নাম ‘বীরঙ্গনা’। সর্গটিতে অযোধ্যানিবাসী এক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর বীরঙ্গনা স্ত্রী-এর কথা আখ্যানের মত করে বর্ণনা করা হয়েছে। অযোধ্যানিবাসী ব্রাহ্মণটি কাজের প্রয়োজনে এসেছেন কাশীতে। স্ত্রী তাঁর স্বদেশে নিজগৃহে থাকেন। একদিন স্ত্রীবিরহে উতলা হয়ে নিজ ভৃত্যকে তিনি পাঠালেন স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্য। পথে ঝড় বাদলের মধ্যে পড়লেন তারা। আশ্রয় নেবার জন্য তারা এসে পড়লেন থানা ঘরে। থানার ‘নচ্ছার’ রক্ষাকর্তারা ব্রাহ্মণীর উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হল। রমণী তাঁর সতীত্ব রক্ষার্থে সংগ্রাম করলেন, ভৃত্য মারা গেল। ব্রাহ্মণী পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন। এ কবিতার মূল



রস বীর। ভূতের কর্তব্যনিষ্ঠা ও পত্নীর আত্মরক্ষার জন্য বীরত্ব প্রদর্শন এই কবিতার মূল বিষয়। বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে সর্গটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, গোটা কবিতায় ঝড়ের প্রতিকূল রাত্রে ব্রাহ্মণ পত্নী এবং ভূতটি যে দূর্যোগের মধ্যে পড়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বেশ কিছু ইমেজারির ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে চার ছত্রেই ফুটিয়ে তুলেছেন তার বীভৎসতা। ‘ধকধক দশদিকে বিদ্যুতের ঝালা/ কক্কড় অশনির ভীষণ গর্জন/ মন্মাদ ভেঙে পড়ে লক্ষ বৃক্ষ রলা/ ছটাছট বৃষ্টি শিলা বাঁটুল বর্ষণ/’ দ্বিতীয় প্রকাশটি কাব্যিক। ঝড়ের রাতে দুটি মানুষের অসহায়তার ছবি— ‘নিষাদের শরাহত কুরঙ্গের প্রায়/ একবার ঘুরে পড়ে, আর বার ধায়/ সহসা আলোক এক পাইল দেখিতে।’ অর্থাৎ কবির ভাষা ও শব্দ ব্যবহার সর্বদাই কাব্যগুণসুলভ নয়, প্রথমটিতে তা স্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আবার ব্যাখ্যাটি প্রায় রবীন্দ্রসুলভ। ভাষা যাই হোক, পাঠক গোটা দৃশ্যকে সহজেই মানসদৃষ্টিতে ভেবে নিতে পারেন। সব থেকে বড় প্রমাণ, যখন থানায় বসে থাকা পুলিশ চরিত্রটির পরিচয় দিচ্ছেন কবি। কবিতা অনুযায়ী চরিত্রটি খলনায়ক। বর্ণনাটি যথাযথ—

“কেলেমুক্ষি, বেঁটে, ভুঁড়ে চোক কুৎকুৎ/ ঘাড়ে গর্দানেতে এক, হাঁসফাঁস করে, / ভালুকের মত রোঁয়া যেন মামদো ভূত/ নবাবের ঢঙে বসে ধমকের ভরে।/ বেকান জামদানি তাজ শিরের উপর/ গাল ভরা পান, পিক দাড়ি বেয়ে পড়ে / লতেছেন উৎকোচের হিসাব বাস্তর, / মুখেতে ধরে না হাসি, ঘাড় দাড়ি নড়ে।”

সবশেষে, ভূতাকে দুর্বৃত্তদের হাতে মরতে দেখার পর ব্রাহ্মণপত্নী ভয় না পেয়ে অস্ত্র দিয়ে থানার দারোয়ানের মস্তক ছেদন করছেন। সে বর্ণনা নারীসুলভ নয়, তীব্র প্রতিহিংসামূলক। এখন, যদি একটু বড় করে ভাবা যায়, বঙ্গনারীর এহেন বাহ্যিক বীরত্ব উপস্থাপনা, সেযুগের তুলনায় একজন রোমান্টিক গীতিকবির তুলনায় কিছুটা অভিনব ঠেকে। মধুসূদন দত্ত যে ‘বীরঙ্গনা’-দের তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন, তাঁরা সাহসী, অকপট, আত্মবিশ্বাসী। তাঁরা হৃদয়ের যুদ্ধে জিততে চায় ধ্রুপদী সাহিত্যের আভিজাত্য সহ। কিন্তু বিহারীলালের বীরঙ্গনা গৃহবধূ। অত্যাচারিত হলে প্রতিবাদের সাহস রাখে। সর্গটি আরো অন্যকিছু অর্থও আমাদের কাছে উদ্ধার করে আনে। কোনো ধর্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে নিজের ভূতের উপর বিশ্বাস রেখে ‘হস্তার পথ পার করা’র অনুমতি দিচ্ছেন। বিপদগ্রস্ত স্ত্রীকে পরদিন সকালে অটুট বিশ্বাসেই নিজগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নারীস্বাধীনতার ভাবনার এই অভিনবত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। বিহারীলাল গবেষক যথার্থই লিখছেন, ‘উনিশ শতাব্দে নবজাগরণ ও নারীর স্বাভাবিক বিষয়ে আস্থাশীল। দীর্ঘ কুসংস্কার ও অত্যাচারের আড়ালে থাকা নারীজাতিকে কাব্যনায়িকা ও মানসনায়িকা হিসাবে এক শ্রদ্ধার মাত্রায় পড়া শুরু হয়েছিল এই শতকে।^{১৪} কাব্য ও সাহিত্যে নারীজাতির প্রতি অবহেলা ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মানবিকতার দাবি বিহারীলালের মধ্যেও পাওয়া গেল। বিহারীলালের মত অন্তর্মুখী কবিও ‘বীরঙ্গনা’ সর্গটিতে সম্পূর্ণ এক অন্য কবিভাবনা ও সমাজসত্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করছেন।

‘নিসর্গসন্দর্শন’- এর চতুর্থ সর্গ ‘নভোমন্ডল’। কবির কল্পনায় রাতের আকাশের বর্ণনা। কিন্তু কবিতার ভাববস্তুতে মিশে আছে মিষ্টিসিজমের বীজ। ইওরোপীয় বিচারে মিষ্টিসিজম আসলে হৃদয়নির্ভর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মনিবেদন। ইওরোপে মিষ্টিসিজমের তিনটি রূপ রয়েছে। প্রকৃতি, আত্মা এবং ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত। এই কবিতায় প্রকৃতিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বিহারীলালের বিশ্বাসের বোধ। মিষ্টিসিজম আসলে কোন মতবাদ নয়, বিশেষ প্রবণতা। যে সত্য বুদ্ধি বা জ্ঞানের অতীত, যে উপলব্ধি, প্রকাশের কোনো

ভাষা নেই, কেবল আভাসে ইঙ্গিতে যাকে ব্যক্ত করা চলে, তাই মিষ্টিক সত্য বা উপলব্ধি। রাতের আকাশ দেখে একাধারে কবি বিহারীলালের আত্ম ও বিশ্বদর্শন হয়েছে, তার মূল রয়েছে কবিতার ভিতর। কবি রাতের আকাশের অজস্র তারামণ্ডলী এবং তাদের ঘিরে থাকা বায়ু, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান অপার বিশ্বয়ে কল্পনা করেছেন। সেখানে তাঁর ‘অপূর্ব আনন্দ রসে উথলে হৃদয়’। অপূর্বরসের সঙ্গে রোমান্টিক সাহিত্য আন্দোলনের ‘Spirit of wonder’-এর যোগ আছে। এ কবিতায় বেশ কিছু ইমেজারির ব্যবহার আছে। সেগুলি সুপ্রযুক্ত এবং সুকল্পিত। রাতের আকাশে চাঁদের অভাব পূরণ করছে কৃষ্ণরাতের তারারা। তারগুলি যেন অন্ধকারের মধ্যে জ্বলা জোনাকির মতন। কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি চাঁদের শোভার সঙ্গে যুক্ত। বলাই বাহুল্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত চাঁদ। এছাড়াও, এ সর্গের শেষ অংশে একটি অনবদ্য চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। পংক্তিগুলি এইরকম— “ধরণী দুখিনী আজি তার অদর্শনে,/ স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী/ ঢেকেছেন সর্ব অঙ্গ তিমির বসনে/ প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন সতী?” সমামোজ্জি অলংকারের আশ্চর্য প্রয়োগে নিশীথরাত্রি এক বিরহাতুর নারীর চিত্ররূপ লাভ করেছে। বস্তুর ওপর প্রাণ আরোপ করে তাকে এক অদ্ভুত ব্যঞ্জন দেওয়ার প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে। মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতাটির শেষ অংশ। অপেক্ষারত বসুন্ধরা জননীর এমনই একটি চিত্রকল্প সেখানেও পাই।^{২৫} রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীর কবিভাবনার গভীর যোগাযোগ হয়তো বা এভাবেই সম্ভব হয়েছিল। বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে দেখছেন। প্রকৃতিকে রমণী হিসাবে কল্পনা করে তাঁকে নিজের মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। নিসর্গ বর্ণনায় বিহারী গোটা কবিতাতেই আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছেন, যা তাঁর কাছে থেকে অপ্রত্যাশিত। বিশালতা ও গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে, মহাকাশের বিশালতাকে বোঝাতে গিয়ে কোথাও কাব্যটি সামান্য শব্দভারগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু কাব্যের শেষে কবির নিসর্গ চেতনা ঈশ্বরচেতনায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি বলছেন— ‘ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার/ বিশ্বব্যাপী বিশ্বাধার বিশ্বের কারণ/ ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য্য তোমার/ অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।’ অর্থাৎ কবি খুঁজছেন সৃষ্টির রহস্যের চাবিকাঠি, সেই ব্যাকুল পরিক্রমার উত্তর এই অংশে পাচ্ছি। কবিতাটি ধর্মতত্ত্ব নয়, কবির ধ্যানমগ্নতার রসোপলব্ধি। এখান থেকে বিহারীলালকে নতুনভাবে পড়ে নিতে পারি আমরা। গীতিকবিতার অন্যতম শর্ত হল সঙ্গীত। সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য আত্মতন্ময়তা। তবেই তা সার্থক। শ্রোতা যেন কান পেতে তা শোনে। বিহারীলালের এই কবিতায় আমরা সেই আভাস পাই। বিহারীলালের কবিতা পড়ে অন্তত, নিজের কথা/ নিজের সুর শুনতে পাচ্ছি আমরা, সরিয়ে ফেলতে পারছি ক্লাসিকাল রীতির পাহাড়চূড়া। রাতের আকাশকে অবলম্বন করে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে বিহারীলাল সেই অনন্ত স্বর্গলোকে পৌঁছতে চাইছেন যেখানে তাঁর কাঙ্ক্ষিতকে সন্ধান করতে পারেন। তাঁর পরবর্তী কাব্য ‘সারদামঙ্গল’-এ যে মিষ্টিসিজম, তার আভাস এই কবিতায় সামান্য হলেও আছে। মিষ্টিক কবির কাছে, ধর্মনিষ্ঠ কবির কাছে ঈশ্বর সেই পরমসত্ত্বা। তার সঙ্গে কবির নিঃসঙ্গ লীলা। বিভোর প্রকৃতি প্রেমিক কবির কাছে প্রকৃতি সেই সত্ত্বা। মিষ্টিক কবি বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে এক অসীমতার ব্যঞ্জনায় পৌঁছে যান। ‘নভোমন্ডল’ কবিতায় কবি খুঁজছেন সৃষ্টিরহস্যের চাবিকাঠি, সেই ব্যাকুল পরিক্রমার উত্তর কবিতার শেষাংশে পাওয়া যায়। সেখানে কবি বলছেন, নভোমন্ডল ঈশ্বরের মতই বিশ্বব্যাপী, ঈশ্বর্য্যময়, অথচ অন্তিমে তা ঈশ্বরের সমতুল নয়।



এ কাব্যের শেষ তিনটি সর্গ অর্থাৎ পঞ্চম-ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ ঝড়ের রাত্রের বর্ণনা। বাংলাদেশে ১২৭১ সালের আশ্বিন এবং ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে যে ঝড় হয়েছিল, তার বর্ণনাই কবিতাগুলিতে মুখ্য। তৃতীয়টি ১২৭৬ সালের ষোলোই কার্তিক ঝড়ের পরদিনের সকালের বর্ণনা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিন্তু গোটা কবিতাগুলিকে পড়লে মনে হয় এ যেন একটিই বিশেষ রাত এবং তার পরদিন সকালের বর্ণনা। কবিতাগুলির বিষয়বস্তুর দিক থেকে লক্ষ করলে দেখব এর তিনটি অভিমুখ। ঝড়ের প্রাকৃতিক রূপবর্ণনা, সাধারণ মানুষের বিপর্যয় এবং তাদের অবস্থান কবির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা, কবির নিজস্ব সাংসারিক জীবন সংক্রান্ত প্রক্ষেপ। প্রথম পর্যায়ে ঝড়ের সূচনায় প্রকৃতির রুদ্ধ এবং শান্ত দুই রূপেরই বন্দনা করেছেন কবি। তুলনা এসেছে আদিম সময়ে সভ্যতার আদি পর্বে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ঝড়ের রূপ পূজন এবং আধুনিক সময়ে মানুষের প্রকৃতি বিষয়কে তাক্ষিল্যের ভাবের মধ্যে। কবিতাটি শেষ হয়েছে কবির স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি চিন্তায়। দ্বিতীয় পর্যায় ‘ঝটিকা সন্তোগ’- পর্বটিতে সাংসারিক জীবনের প্রত্যক্ষ ছাপ। ‘সন্তোগ’ শব্দেই সংসার জীবন ভোগ করবার একটা ইঙ্গিত থাকছে। কবিতাতেও বারবার এসেছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পূর্ণ সাংসারিক কথোপকথন প্রসঙ্গ। অথচ, এ কবিতার সূচনায় লর্ড বায়ারনের একটি মুখবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, এ ব্যবহার কী কেবল কবিতার বহিরাঙ্গিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই ব্যবহৃত? কেননা, কবির মনে সাধারণ মানুষ সম্পর্ক যে সমবেদনার ভাব জেগেছে তা নিজের স্ত্রী-র সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রেই। নৌকাঘাটে ঝড়ের রূপ প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন কবি। কবিপত্নী সে বর্ণনা শুনে যারপরনাই বিচলিত। বিহারীলালের লেখনী এসময় ঝড়ের রূপবর্ণনা ছেড়ে স্ত্রী-কে শান্ত করার দিকেই ঝুঁকছে। অর্থাৎ ‘কবির চিন্তা’ সর্গে যিনি লিখেছিলেন ‘সংসার ফাঁপরে পড়ে সদা ঝালাপালা’, তিনিই শেষ সর্গে এসে সম্পূর্ণ গার্হস্থ্যজীবনের উদাহরণ দিয়েছেন। আবেগের ভারসাম্যহীনতাই হয়তো বিহারীলালের একমাত্র সীমাবদ্ধতা। অথচ, পত্নীকে তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন যখন তখন লিখছেন- “অয়ি! অয়ি! অয়ি আত্মগুণাবমানিনী/ তব সুললিত সেই বীণার ঝংকার/ যেন প্রবাহিত হয়ে সুধা প্রবাহিনী/ পূর্ণ করি রাখিয়াছে হৃদয় আমার।” অর্থাৎ সংসারসমুদ্রে থেকেও মানসিক বিচ্ছিন্নতার বোধ অক্ষুণ্ণ থাকছে। প্রীতিবিরহের ভাবনাটির বীজ কোথাও যেন লুকিয়ে থাকে কবির এই আক্ষেপানুরাগের মধ্যে। সপ্তম এবং শেষ সর্গে দেখা যায়, সাধারণ মানুষের দূরবস্থার কথা ভেবে দরদী কবি দুঃখিত, চিন্তিত ও সমব্যথা। প্রবল ঝড় শেষে পৃথিবী ও সমস্ত মানবসংসারের শান্তি কামনা করেছেন তিনি। সৌন্দর্য ও কল্যাণের আদর্শে এসেই বিহারীলাল তাঁর ‘নিসর্গসন্দর্শন’ পর্বটি শেষ করছেন।

কবির ‘সারদা’ বা সৌন্দর্যসরস্বতীর ভাবনাটি সবসময়েই নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। নিসর্গচেতনাই তার উদ্দীপনবিভাব। সেই নিসর্গকে বিহারীলাল কেমনভাবে দেখেছেন, তাঁর কাব্যপ্রকাশটাই ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যের মধ্যে রয়েছে। ‘সঙ্গীতশতক’ কাব্যে এক জায়গায় বিহারীলাল লিখেছিলেন “প্রণয় করেছে আমি/ প্রকৃতি রমণী সনে,/ যাহার লাভণ্য-ছটা/ মোহিত করেছে মনে।”^{১৬} ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যে প্রকৃতির মূল উপাদানগুলি যেমন জল, বায়ু, মহাকাশ প্রভৃতিকে আশ্রয় করে আসলে বিহারী সেই ‘সারদা’ কল্পনার ভিত্তিকেই দৃঢ় করেছেন। দেবী সরস্বতী মেধা প্রজ্ঞা প্রভা প্রভৃতি নবশক্তির উৎস। বিহারীলালের ‘সারদা’ পরিকল্পনায় এই সমস্ত শক্তির সমন্বয় ঘটেছে। ‘নিসর্গসন্দর্শন’ তারই প্রবেশক কাব্য। যদিও বিহারীলালের কাব্যে সংখ্যমের বাঁধ ভেঙেছে যখন তিনি অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তবু ক্রটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই কাব্যে বিহারীলালের স্বকীয় প্রকাশভঙ্গিটি অক্ষুণ্ণ ভাবে হলেও ধরা পড়েছে।

মোহিতলাল মজুমদার যেমন বলছেন, “বাহিরের সকল প্রকার রীতি বা ফ্যাশন একেবারে বজ্ঞন করিয়া, বাহিরের প্রতিষ্ঠা, নিন্দা-প্রশংসা অগ্রাহ্য করিয়া বিহারীলাল আপনার প্রাণকেই প্রামাণ্য করিয়া নিজের সঙ্গে নিজেই নিভূতে আলাপ করিতে বসিলেন।”^{১৭} এই স্বকীয়তা, এই নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন সময়ে বড়ই দুর্লভ ছিল। কিছু বছর পরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক কিশোর কেবল বিহারীলালের এই সহজ কাব্যভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। ‘বিহারীবাবুর মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ঐ পর্যন্ত দৌড়িত’^{১৮} তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্য যার কাছে চিরঋণী।

তথ্যসূত্র:

১. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, আষাঢ় ১৩৭২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বাংলা সাহিত্যে নবযুগ, কলিকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কোং, পৃষ্ঠা-২২৬
২. সেন, সুকুমার, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৪, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-২৪৭
৩. সেন, নবীনচন্দ্র, দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বৈশাখ ১৩৬৬, নবীনচন্দ্র রচনাবলী (আমার জীবন) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা-১-৮ (জন্ম ও শৈশব পর্ব)
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৌষ ১৩৯৪, রবীন্দ্ররচনাবলী- পঞ্চম খন্ড, ‘বিহারীলাল’, ‘আধুনিক সাহিত্য’, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫৩৯
৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭৭, আধুনিক বাংলা কাব্য (প্রথম পর্ব), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা-১৩৮
—তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ পড়ে মনে হয় তিনি মানতে চাইছেন না যে বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর কোনোভাবে রয়েছে। তাঁর মতে বিহারীলাল নীরব কবি। তিনি ভাবকে যথাযথ রূপ দিতে পারেননি।
৬. গুপ্ত, বিপিনবিহারী প্রণীত, দ্বিতীয় বিদ্যাভারতী সংস্করণ চৈত্র ১৩৭৩, পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় একত্রে), বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, বিদ্যাভারতী, পৃষ্ঠা-১০।
—বিহারীলাল তাঁর ‘সঙ্গীতশতক’ কাব্যটি নিজ ব্যায়ে ছাপিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলছেন সে বইয়ের পঞ্চাশটিও বিক্রি হয়নি। “এইত বাঙ্গালা পাঠক সমাজের সহৃদয়তা!”
৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৭
৮. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, অক্টোবর ২০০৪, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, রত্নাবলী, পৃষ্ঠা-৩৪৮
—শিল্প সাহিত্যের বিবিধ পরিভাষা প্রসঙ্গে ক্ল্যাসিসিজম নামপ্রবন্ধটি ক্লাসিক সাহিত্যরীতি-র রূপকে যথাযথ বিশ্লেষণ করেছে।
৯. ভট্টাচার্য, অরুণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-২০০
—ইংলন্ডে রোমান্টিক সাহিত্য আন্দোলনের ধারাটির সংহত পরিচয় অরুণ ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন এই অংশে।



১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, ষষ্ঠ মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (খন্ড ২), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা-২৪-২৫
১১. ঐ, পৃষ্ঠা-২৭-২৮
১২. ঐ, পৃষ্ঠা-১৮
—এছাড়াও শ্রী বিষ্ণুপদ পান্ডা রচিত ‘বিহারীলাল ও বাংলা গীতিকবিতার ধারা’-গ্রন্থে ‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যের রচনাকাল ও প্রকাশকাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বইটি শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ সালে প্রকাশিত।
১৩. চক্রবর্তী, বিহারীলাল, ফাল্গুন ১৩৬৮, বিহারীলাল রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩
১৪. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, ১৩৭৫, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, কলিকাতা, সংস্কৃতি প্রকাশন পৃষ্ঠা-১৬৩-১৬৪
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), ‘সোনার তরী’. বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৪৪
—রবীন্দ্রনাথ লিখছেন- “মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়ন যুগল দূরে নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।”
১৬. চক্রবর্তী, বিহারীলাল, ফাল্গুন ১৩৬৮, ‘বিহারীলাল রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা-১৯৩
১৭. মজুমদার, মোহিতলাল, তৃতীয় সংস্করণ কার্তিক ১৩৫৩, আধুনিক বাংলা সাহিত্য. কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা-৫০
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শ্রাবণ ১৩৯৬, রবীন্দ্ররচনাবলী (নবম খন্ড). ‘জীবনস্মৃতি’. বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৪৬০।

মহাভারত ও বর্তমান যুগে তৃতীয় লিঙ্গ : সমীক্ষাত্মক আলোচনা

সুদীপ্তা ভকত

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে বহু পথ অতিক্রম করে আমরা বর্তমান যুগে পদার্পণ করেছি। বর্তমান যুগে আমাদের জীবনযাত্রা শিক্ষা-সংস্কৃতি সব কিছুই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে পরিত্যাগ করে এবং বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে আমরা হয়ে উঠেছি বিজ্ঞানমনস্ক, হয়েছি আধুনিক। তবে এই আধুনিকতাতেও প্রাচীনত্বের প্রতিফলন যেমন দেখতে পাই, তেমনি প্রাচীনত্বের প্রতি আমরা টানও অনুভব করি। সংস্কৃত সাহিত্যের গর্ভেই ভারতীয় সাহিত্যের জন্ম অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিচায়ক হল বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলি। সংস্কৃত সাহিত্যে নপুংসকজাতীয়দের বিকার না ভেবে এই তৃতীয়া প্রকৃতিদের ‘প্রকৃতি’ বলে উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে তাঁদের যথেষ্ট স্থান এবং সম্মান নিহিত ছিল বলে মনে হয়। পুরুষ বা নারীর মৌল উপাদান থেকে অন্যরকমভাবে পৃথক এবং পূর্ণসত্তা বলেই এঁরা তৃতীয় প্রকৃতির মানুষ। সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ মহাভারত মহাকাব্যে ‘তৃতীয়া-প্রকৃতি’, রূপান্তরকামী এই বিষয়গুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে বর্ণিত আছে এবং এই বিষয়ের সাথে বর্তমানে সমাজের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরব এই আলোচ্য প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ: মহাভারত, তৃতীয়-লিঙ্গ, রূপান্তরকামী, বৈষম্য, প্রকৃতি।

মূল আলোচনা: মহাভারত সর্বকালের দীর্ঘতম এবং প্রাচীনতম মহাকাব্য। এই মহাকাব্য কে যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, এই প্রাচীন গ্রন্থটিতে তৃতীয় লিঙ্গ এবং যৌন পরিচয় একটি বিস্তৃতি বিষয়। মহাভারতে লিঙ্গ এবং যৌনতার একটি পরিশীলিত এবং সূক্ষ্ম ধারণা আছে, যার মধ্য দিয়ে তৃতীয় লিঙ্গ এবং LGBTQIA+ পরিচয়ের ব্যাপক স্বীকৃতি এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রতিফলিত হয়। “যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে” আমরা সেই ছোটবেলা থেকে আজ অবধি এই কথাটি শুনে আসছি এবং এই বাকটির সত্যতা এতটাই যে আজও এই বাকটিতে এতটুকু ভাটা পড়েনি। কেন? না এই যে লিঙ্গ পরিবর্তন এই বিষয়টি বর্তমান সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা বহুযুগ আগে মহাভারতের পাতায় এই বিষয়টির শুধু যে উল্লেখ আছে তা নয়, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রূপেও স্থান পেয়েছে। নারী থেকে পুরুষ হওয়া, নপুংসক চরিত্র সবই এই মহাকাব্যে বর্ণিত। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র অর্জুন যাঁকে বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ‘তৃতীয়া-প্রকৃতি’ রূপে সাময়িকভাবে হলেও গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে একটা অন্যমাত্রা দিয়েছেন এই মহাকাব্যে। এই মহাকাব্যের বিরাট-পর্বে আমরা দেখতে পাই, অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশ বছরে পঞ্চ-পাণ্ডবেরা রাজা-বিরাটের রাজ্যে ছদ্মবেশে আশ্রয় নেয়। মহাভারতে অর্জুন অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজনে বিরাট রাজার কাছে এক অসামান্য দার্শনিক ভাষায় বলেছিলেন, “তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ নাম্মা চৈব বৃহন্নলা”।^১ অর্থাৎ আমি বৃহন্নলা নামে নিজেকে তৃতীয়া প্রকৃতির মধ্যে অন্তরিত রাখব। ‘স্ত্রী-প্রকৃতি’র নপুংসক হয়ে অর্জুন



আরও বললেন- “গায়ামি নৃত্যম্যথ বাদয়ামি ভদ্রোহস্মি নৃত্যে কুশলোহস্মি গীতে/তুমুত্তরায়ৈ পরিদৎস্ব মাং স্বয়ং ভবামি দেব্যা নরদেবা নর্তকঃ”।^১ অর্থাৎ নরনাথ! আমি নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া থাকি। কেন না আমি - নৃত্য, গীত ও বাদ্যে নিপুন; অতএব আপনি স্বয়ং আপনার কন্যা উত্তরার নিকট আমাকে অর্পণ করুন; আমি সেই উত্তরাদেবীর নর্তক হইব। এই বলে অর্জুন বিরাট রাজার কন্যা উত্তরা ও অন্তঃপুর চারিণী মেয়েদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখানোর জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন- “কন্যানাং নর্তকো যুবা”।^২ অর্জুনের এই ‘তৃতীয়া-প্রকৃতি’ এক বৎসরের জন্য অভিশাপ প্রাপ্ত। একবার অর্জুন ইন্দ্রের আমন্ত্রণে তাঁর রাজসভায় যান। সেখানে উর্বশী অর্জুনকে দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু অর্জুন উর্বশীর প্রতি কোন রূপ আকৃষ্ট হলেন না বরং তাঁকে কুরুমাতা বলে সম্বোধন করেন। এই সম্বোধন শুনে উর্বশী ক্রুদ্ধ অর্জুনকে অভিশাপ দেয় যে, তুমি সারা জীবন ‘কিন্নর’ হয়ে নারীদের সঙ্গে কেবল নাচ-গান করবে। পরে এই অভিশাপের কথা ইন্দ্রকে অর্জুন জানায় এবং ইন্দ্রের অনুরোধে উর্বশী এই শাপ কমিয়ে এক বছরের জন্য অর্জুনকে অভিশাপ করেন। এই অভিশাপ জীবন মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন বিরাট রাজার রাজ্যে ‘বৃহন্নলা’ এই নপুংসক রূপে ইন্দ্রের রাজসভার গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছ থেকে শিখে আসা গান-নৃত্য-বাদ্যে দ্বারা তিনি বিরাট রাজাকে মোহিত করেন। বিরাট রাজাও মোহিত হয়ে নিজ কন্যা উত্তরার নৃত্যগীতির প্রশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন, তাঁর অন্দরমহলে থাকতে দেন। এইভাবে এক বৎসর অভিশাপ জীবন অতিবাহিত হলে তিনি পুনরায় আবার নিজ রূপে ফিরে আসেন। তবে মহাভারতের অর্জুনের এই এক বৎসর অভিশাপ জীবন সফল হলেও যেন মনে হয় তাঁরই অভিশাপ জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তার উত্তরসূরীরা অর্থাৎ আজকের ‘তৃতীয়া-প্রকৃতি’ হিজড়া সম্প্রদায়।

এবার এই মহাকাব্যের চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম এক চরিত্র যেখানে দেখতে পাব নারী থেকে পুরুষ হওয়া ‘শিখণ্ডী’র কাহিনী। মহাভারতের ‘অম্বা’ এক অভিশাপ চরিত্র। ভাই বিচিত্র বীরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা থেকে অম্বাকে নিয়ে আসে হস্তিনাপুরে। কিন্তু শাল্বরাজার প্রতি অম্বার অনুরাগের কথা জানতে পেরে মুক্তি দেয় অম্বাকে। অন্যদিকে শাল্বরাজ অম্বাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে অম্বা এই ঘটনার জন্য ভীষ্মকে দায়ী তাই করে এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য মহাদেবের উদ্দেশ্যে কঠিন তপস্যায় ব্রতী হয়। তাঁর এই কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শূলপানি উমাপতি মহাদেব তপস্বিনী অম্বাকে দর্শন দিয়ে বললেন তুমি বর গ্রহণ কর। অম্বা ভীষ্মের পরাজয় প্রার্থনা করলেন এবং মহাদেব সেই বর ও দিলেন। কিন্তু বর পেয়ে অম্বা উমাপতিকে বললেন দেব! আমি স্ত্রীলোক, যুদ্ধে কি করে আমার জয় হবে? প্রত্যুত্তরে মহাদেব বললেন- “দ্রুপদস্য কুলে জাতা ভবিতাসি মহারথঃ।/ শীঘ্রাস্ত্রচক্রযোধী চ ভবিষ্যসি সুসম্মতঃ।।/.....পুমান্ পশ্চাৎ কস্মাচ্চিৎ কালপর্য্যৎ”।^৩ অর্থাৎ “শূলপাণি মহাদেব অম্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, আমি যেন ভীষ্মকে বধ করতে পারি। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব পেয়ে ভীষ্মকে বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দ্রুপদের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছু কাল পরে পুরুষ হবে”।^৪ পরের জন্মে তিনি দ্রুপদ রাজার কন্যা হয়ে জন্ম গ্রহণ করলে ও তিনি পুরুষই হবেন। ফলে পরজন্মে নপুংসক শিখণ্ডী হয়ে জন্ম নিয়ে ভীষ্ম বিনাশের কারণ হয় অম্বা। এরপর অম্বা আগুনের কাছে নিজেকে সাঁপে মৃত্যুবরণ করেন নবজন্ম কামনায়। সেই সময় দ্রুপদ রাজা ও মহাদেবের তপস্যায় রত হয় সন্তান লাভের জন্য। মহাদেব তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন - “তোমার একটি ‘স্ত্রীপুরুষ’ সন্তান হবে। যথাকালে দ্রুপদমহিষী

একটি পরমরূপবতী কন্যা প্রসব করলেন, কিন্তু তিনি প্রচার করলেন যে তাঁর পুত্র হয়েছে”।^{১০} এই কন্যাকে দ্রুপদ পুত্রের মত পালন করতে লাগলে এবং নাম দিলেন শিখণ্ডী। যেহেতু পুরুষ পরিচয়েই সকলে জানতো তাই শিখণ্ডীর সঙ্গে দর্শণারাজ হিরণ্যবর্মার মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর সত্যি সামনে আসে যে, দ্রুপদ কন্যা শিখণ্ডিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। একথা শুনে রাজা হিরণ্যবর্মী ক্ষোভে ফেটে পড়েন ফলে দ্রুপদ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পিতার এই অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে শিখণ্ডিনী বনবাসী হলেন। এই বনেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় স্থলাকর্ণ নামে এক যক্ষের সাথে, যিনি ছিলেন কুবেরের অনুচর। শিখণ্ডিনী তাঁর পূর্বজন্ম ও বর্তমান অবস্থার কথা তাকে জানালেন এবং প্রার্থনা করলেন- ‘যক্ষ আমাকে পুরুষ করে দিন’।^{১১} এরপরই লিঙ্গ বিনিময় করেন দুজনে। শিখণ্ডিনী হয়ে ওঠেন ‘শিখণ্ডী’ আর স্থলাকর্ণ হয়ে যান ‘নারী’ আর মজা ব্যাপার হল এই অভিশাপের মধ্য দিয়েই ঘটে গেল নারী-থেকে পুরুষ ট্রান্সসেক্সুয়ালিটি অর্থাৎ বর্তমান যুগের ভাষায় রূপান্তরকামী। যদিও এই দুজনের লিঙ্গ রূপান্তরের উদ্দেশ্য ছিল শিখণ্ডিনীর পিতাকে অর্থাৎ দ্রুপদ রাজাকে হিরণ্যবর্মার কাছে অসম্মানিত হবার হাত থেকে রক্ষা করা। তাই শিখণ্ডী তার পুরুষত্ব প্রমাণ করে যখন স্থলাকর্ণ কাছে ফিরে যান তখন কুবের তাঁর অনুচরের এই লিঙ্গ পরিবর্তনে ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেন যে স্থলাকর্ণ তাঁর পূর্ব লিঙ্গে আর রূপান্তর হতে পারবেন না অর্থাৎ তিনি নারী হয়ে তার জীবন অতিবাহিত করবেন যতদিন না শিখণ্ডীর মৃত্যু হয় তবে শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর তুমি পূর্বরূপ ফিরে পাবে। অতএব স্থলাকর্ণ স্ত্রী হয়েই থাক, আর দ্রুপদকন্যা ‘শিখণ্ডিনী’ পুরুষ হয়ে থাকুক। মহাদেবের বর ও কুবেরের অভিশাপ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যে রূপান্তরকামী শিখণ্ডী যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি যেন সমাজে এই রূপান্তরকামী’দের কর্মক্ষেত্রে সম-অধিকারের বীজ বপন করেছে বলে মনে হয়। এছাড়াও মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভগ্নাস্বন নামক ধার্মিক রাজা ইন্দ্র দ্বারা বিমোহিত হয়ে সরোবরে অবগাহন করে স্ত্রীরূপে পরিণত হওয়া, ইত্যাদি চরিত্রগুলির অবতারণার বেদব্যাস যেন এই রূপান্তরকামী বিষয়টি নিছকই সাধারণ বলে প্রতিভাত করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহাভারত যুগে নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলোর মতোই রূপান্তরকাম ও রূপান্তরকামী চরিত্রগুলিও যেমন মহাকাব্যের একটা অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে তাইই নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মে ভবিষ্যৎ বলে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সমীক্ষাত্মক আলোচনা:

নারী থেকে পুরুষ হওয়া রূপান্তরকামী এই শিখণ্ডী’র চরিত্রটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রথিশ্রেষ্ঠ হয়ে অংশ গ্রহণ করা, যেন পরবর্তী যুগের পাথেয় বলে মনে হয়, কারণ বর্তমান যুগেও এই রূপান্তরকামীরা বড় বড় প্রতিষ্ঠানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তবে একথাও বলতে হয় যে, সেই যুগ বা এই যুগ, যুগ যাই হোক না কেন কিছু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা নতুন কিছু প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বকালে, সর্বযুগেই প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। মহাভারতেও যেন তার অনাথা হয়নি, শিখণ্ডীর পুরুষত্ব প্রাপ্তিতে দ্রুপদ রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে শিখণ্ডী কে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য পাঠালেন। শিখণ্ডী চতুষ্পাদ ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে শিখণ্ডী যখন ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন, ভীষ্ম তাঁর পূর্বের স্ত্রীত্ব স্মরণ করে ও প্রতিজ্ঞার দোহাই দিয়ে শিখণ্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন। শিখণ্ডী পুরুষত্ব লাভ করার সত্ত্বেও ভীষ্মের শিখণ্ডীকে যুদ্ধে অগ্রাহ্য করা, এতে মনে হয় ভীষ্ম এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেন বেদব্যাসের রূপান্তরকামী শিখণ্ডী অর্থাৎ এই শ্রেণীর



প্রতি একটা 'কিস্ত' ভাব যেন ব্যক্ত করেছেন। আবার এ ও মনে হয়, বেদব্যাস লিঙ্গ-রূপান্তরের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনা স্বাভাবিক বলে এই মহাকাব্যে উপস্থাপন করলেও ভীষ্মের, শিখণ্ডীকে যুদ্ধে অগ্রাহ্যের ফলে এই শ্রেণীর প্রতি যেন অবজ্ঞায় প্রদর্শিত হয়েছে। বর্তমান যুগে আমাদের দেশ ঐতিহ্যগত ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তৃতীয় লিঙ্গকে সমাজে স্বীকৃত দিলেও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের এখনও অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, যখন প্রসঙ্গ আসে উত্তরাধিকারের অধিকার নিয়ে। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে হিজড়াদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নাগরিকত্বের সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট করার বাধা দূর হয়। কিন্তু নাগরিক হিসেবে সংবিধান স্বীকৃত কিছু আইনি অধিকার পেলেও এখনো যেমন সম্পত্তিতে হিজড়াদের উত্তরাধিকারের বিধান নেই তেমনি যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনায় আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগও নেই হিজড়াদের। সুতরাং বর্তমানে যুগেও লিঙ্গ পরিবর্তন বা রূপান্তর আইন-সিদ্ধ ও স্বাভাবিক প্রয়োগ হলেও আমাদের আধুনিক-সমাজ সেই ভাবে এখনও সড়গড় হয়নি, একটা 'কিস্ত' ভাব আছে তা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না।^৪ বর্তমানে এই রূপান্তরকামী অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের (অধিকারের সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ সালে স্ব-অনুভূত লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। ট্রান্সজেন্ডার নাগরিকদের তৃতীয় লিঙ্গের অধীনে নিজেদের নিবন্ধন করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। যারা পুরুষ বা মহিলা নয়, এই ধরনের ব্যক্তির হিজড়া বা বিকল্পভাবে নপুংসক নামে পরিচিত। মহাভারতে যেমন তৃতীয় প্রকৃতি হলেও বিরাট রাজা অর্জুনকে তার কন্যাসহ অন্তঃপুর কন্যাদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, পুরুষ না নারী এসব দ্বন্দ্বের উর্দে, বিনা দ্বিধায়, ঠিক সে ভাবেই যেন আমাদের দেশের বিচার-ব্যবস্থাও প্রাচীন ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ১৯৯৪ সালে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে ভোটাধিকার প্রদান করেছে। ১৫ই এপ্রিল ২০১৪-এ, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হিজড়াদেরকে (তৃতীয় লিঙ্গ) একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যাতে পিছিয়ে না পরে তারজন্য এই শ্রেণীদেরকে উন্নতি করার জন্য শিক্ষা এবং চাকরিতে সংরক্ষণের অধিকারী বলে ঘোষণা করে এবং তাদের জন্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য ও সমস্ত ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেয়। ১৯৪৯ সালের ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ আইনের সামনে সমতা ঘোষণা করে। এটা বলে ১৯৪৯ সালের ভারতের "রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির কাছে আইনের সামনে সমতা বা ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে আইনের সমান সুরক্ষা ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যের নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করবে না"।^৫ ১৯৪৯ সালের ভারতের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ আইনে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যের কোন নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে না। আদালত আরও রায় দিয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধান সরকারী নথিতে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ১৫ অনুচ্ছেদ লিঙ্গ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। এই রায়ের উপর ভিত্তি করে, বর্তমানে ভোটার আইডি কার্ড, পাসপোর্ট এবং ব্যাঙ্ক ফর্মের মতো সরকারি নথিগুলিতে পুরুষ (M) এবং মহিলা (F) এর পাশাপাশি একটি তৃতীয় লিঙ্গ (TG) বা "ট্রান্সজেন্ডার" (T) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একুশ শতকে এসেও বিশ্বের দেশে দেশে নানাবিধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানুষকে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানাবিধ সমতা প্রতিষ্ঠা আজকের দুনিয়ায় এমন লড়াইয়ের অন্যতম। লিঙ্গ পরিচয়ের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বাইরে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে 'হার্মাফ্রোডাইট' বা 'উভলিঙ্গ' কিংবা 'ট্রান্সজেন্ডার' বা 'রূপান্তরিত লিঙ্গ'-

এর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা সাম্প্রতিক কালের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তার জন্য সাধুবাদ জানাই ভারতীয় সংবিধানকে।

উপসংহার:

মহাভারতে উপরিউক্ত আলোচ্য চরিত্র দুটির এই ঐতিহাসিক মহাকাব্যটিতে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আমরা বলতে পারি যে, তৃতীয়া-প্রকৃতি, রূপান্তরকামী, সমকামী সম্পর্কগুলি ভারতীয় সমাজে অনেক আগেই গৃহীত এবং অন্তর্গত ছিল। তাই তো, লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রাচীন স্বীকৃতির প্রতিনিধিত্বকারী শিখণ্ডী এই চরিত্রটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষই বোধ হয় প্রথম দেশ, যেখানে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বহু বছর আগেই এই তৃতীয়া-প্রকৃতি, রূপান্তরকামী, সমকামী সম্পর্কগুলির আধুনিক সংজ্ঞা তৈরী হয়েছিল, সুতরাং বলা যায় ট্রান্সজেন্ডার মহিলাদের অস্তিত্ব নতুন নয়। মহাভারতের ‘অম্বা’ এই চরিত্রটি ট্রান্সজেন্ডার নারীর নিদর্শন, যা বর্তমান ভারতীয় সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত। আবার ‘বৃহল্লা’ নপুংসক এই চরিত্রটিও মহাকাব্যে যথেষ্ট সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। বিরাট রাজা অর্জুনকে ‘তৃতীয়া-প্রকৃতি’ জেনেও তাঁর কন্যার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন শুধু তাই নয়, রাজসুত্রে তাকে স্থান দিলেন। বর্তমান সমাজ-সভ্যতার জীবন ধারায় এই সকল যৌন-প্রতিবন্ধীরা সবসময় হয়ে আসছে উপেক্ষিত সেখানে আজ থেকে বহু বছর আগে এই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এই লিঙ্গকে আলাদা নয়, বরং নারী-প্রকৃতি, ও পুরুষ-প্রকৃতির মতই বেদব্যাস এই ‘তৃতীয়া-প্রকৃতি’ কে সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা বর্তমান-সমাজের কাছে এটা শিক্ষণীয় বলা যায়। তাই বোধ হয়, বর্তমান যুগে এই ‘Third Gender’ মানুষের কল্যাণে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত তৃতীয়া-প্রকৃতি নিয়ে যে ন্যায়াদেশ দিয়েছে সেটা যেমন অভীষ্টতম এক ইচ্ছাপূরণ, তেমনি এই আদেশের মধ্য দিয়ে যেন ভারতের চিরন্তনী-সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। মহাভারতম- বিরাটপর্ব ১২, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।
- ২। মহাভারতম- উদ্যোগপর্ব ১৬, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।
- ৩। মহাভারত-সারানুবাদ, রাজশেখর বসু, এম সি সরকার আয়াণ্ড সঙ্গ প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫৬।
- ৪। [https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_Persons_\(Protection_of_Rights\)_Act,_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_Persons_(Protection_of_Rights)_Act,_2019)
- ৫। ল’ ম্যানের বাংলায় মেজর ক্রিমিনাল, প্রকাশক-ভট্টাচার্য এন্টারপ্রাইজ, ২, কে সি রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০৪৯।

বাংলা লোকছড়া : পারিবারিক নানা সম্পর্কের দর্পণ

শান্তনু ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাণী বিড়লা গার্লস কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা লোকছড়া। ‘ছড়া’ শব্দটি দেশজ। ছড়াকে আদিম কবিতার বীজ বলা যায়। শিশু জন্মের পর লোকসাহিত্যের এই ধারাটির সঙ্গেই প্রথম পরিচিত হয়। ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুরে ও তালে শিশু নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে ঘুমায়। শিশুর অবচেতন মনলোকে ছড়া একটা স্থায়ী দাগ কেটে যায়। যা বয়স বাড়লেও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকে। লোকছড়ায় ভাবের পারস্পর্য থাকে না। ঘটনার ধারাবাহিকতা অথবা আনুপূর্বিক কাহিনিও থাকে না। লোকছড়ার বিষয়বস্তু বহু বিস্তৃত। নর-নারী, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, খেলাধুলা, প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত— এমনি নানা বিষয় লোকছড়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লোকসমাজ পরিবার কেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। লোকছড়াগুলিতে লোকসমাজের পারিবারিক নানা সম্পর্কের নানা রূপ ফুটে উঠেছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন এই সবই নারীর দৃষ্টিতে। কারণ লোকছড়াগুলি মূলত নারী সমাজের মুখে মুখে রচিত ও মুখে মুখে প্রচলিত। তাই নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পারিবারিক নানা সম্পর্ক কেমন তারই প্রতিফলন লোকছড়ায় দেখা যায়। এমনি কিছু নির্বাচিত লোকছড়ার অনুপুঞ্জ বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পারিবারিক নানা সম্পর্কের রূপ তুলে ধরা আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: লোক, লোকছড়া, লোকসাহিত্য, লোকসমাজ, পরিবার, নারী।

মূল আলোচনা: লোকছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী এল বান এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমস্তের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝতে পারিব না ছড়ার মাদুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতি প্রচার, মানবেয় এত প্রাণপন প্রযত্ন, এত গলধর্ম ব্যায়াম— প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এইসকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন শকে কোন তারিখে কোনটা রচিত হয়েছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহার আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।’^১ এখানে লোকছড়ার বেশকিছু বৈশিষ্ট্যের কথা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। লোকছড়ার চিরন্তন আবেদন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লোকছড়ার আবেদন পূর্বেও ছিল, আছে ও থাকবে।

ছড়া শব্দটি দেশজ। ‘ছড়া’ শব্দটি সংস্কৃত ‘ছটা’ শব্দ থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকের মতে ছড়া শব্দটির উৎপত্তি ‘ছন্দ’ শব্দ থেকে। ছন্দের অপভ্রংশ রূপ হল ছড়া। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ ছড়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন— ‘ছড়া হল সমষ্টিগত

লোকমনের সৃষ্টি; সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন স্মৃতি অভিজ্ঞতার কথা পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে ক্ষুদ্র অবয়বে যে বাঙ্ঘ্য রূপ লাভ করে তাই ছড়া।^{১২}

ছড়া মূলত দু'ধরনের। এক. লোকছড়া বা লৌকিক ছড়া, দুই. সাহিত্যিক ছড়া বা অলৌকিক ছড়া। লোকছড়াগুলি লোকসমাজ থেকে উঠে আসে। এর নির্দিষ্ট কোনো রচয়িতা নেই। লোকমুখে সৃষ্ট হয়ে লোকমুখেই প্রচলিত। অন্যদিকে সাহিত্যিক ছড়ায় রচয়িতা নির্দিষ্ট। সাহিত্যিক ছড়ার পাঠান্তর বা রূপান্তর সম্ভব নয়। আমাদের আলোচ্য লোকছড়া। লোকছড়া মূলত নারী সমাজের মুখে মুখে সৃষ্ট ও প্রচলিত। যুক্তিসংগত বা বিশিষ্টভাব কিংবা ভাবের পারম্পর্য লোকছড়ায় নেই। ঘটনার ধারাবাহিকতা বা অনুপূর্বিক কাহিনি এতে থাকে না। বাহুল্য বর্জিত, দৃঢ়বদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত এর রূপ। লোকছড়া প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— 'ইহার অন্তর্গত পরিচয় সম্পর্কে একটি কথা সহজেই বলিতে পারা যায় যে, ইহা সমগ্রভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নহে, বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। ইহার বহিরঙ্গণত পরিচয় সম্পর্কেও এইকথা বলিতে পারা যায় যে, ইহার শিল্পরূপও ব্যক্তি কিংবা সমাজের কোন সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি বলিয়া কদাচ ভুল হইতে পারে না। লোকসাহিত্যের দলগত রচনা (communal authorship) সম্পর্কে যে দাবী উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহা ছড়ার মত আর কোন বিষয়ের উপর এত নিঃসন্দেহভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভাবের দিক দিয়া যেমন ইহাতে পরিণতি নাই, কেবলমাত্র অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিত মাত্র আছে, রূপের ভিতর দিয়াও ইহার তেমনি অপরিশোধিত রহিয়াছে, অথচ ইহার এমনই ধর্ম যে, ভাবের দিক দিয়া ইহার অস্ফুটতা, কিংবা রূপের দিক দিয়া ইহার অপরিশোধিত ইহার রসগ্রাহীকে আঘাত করে না।'^{১৩}

লোকছড়ার বিষয় বিস্তৃত। নর-নারী, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, খেলাধুলা, প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত—এমনি নানা প্রসঙ্গ লোকছড়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লোকসমাজ পরিবার কেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত। লোকছড়াগুলিতে পারিবারিক নানা সম্পর্কের নানা রূপ ফুটে উঠেছে। তবে এসকলই নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে। কারণ লোকছড়াগুলি মূলত নারীদের সৃষ্ট ও নারীদের দ্বারাই প্রচলিত। তাই নারীর দৃষ্টিতে পারিবারিক সম্পর্কগুলি কেমন তার প্রতিফলন লোকছড়ায়। নারীর সঙ্গে পরিবারের নানা ব্যক্তি যেমন বিবাহপূর্ব পিতা, মাতা, ভাই, বোন, মাসি, পিসি মামা, মামি প্রমুখ এবং বিবাহোত্তর স্বামী, শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, ভাসুর প্রমুখ কেমন আচার-আচরণ করেন তার প্রতিফলন বহু লোকছড়ায় পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি নির্দিষ্ট লোকছড়াকে কেন্দ্র করে লোকসমাজের পারিবারিক নানা সম্পর্কের নারীকৃত রূপ পরবর্তী পর্যায়ে তুলে ধরা হল। নারী তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত পারিবারিক নানা সম্পর্কের প্রতি তার অনুভূতি কেমনভাবে ব্যক্ত করেছে লোকছড়াগুলিতে তা এবার আলোচনা করা যাক।

পারিবারিক সম্পর্কের আলোচনায় প্রথমেই আসে মা-এর কথা। দীর্ঘদিন নানা শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে মা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান। মা শিশুর সবচেয়ে আপন। মাকে কেন্দ্র করেই শিশু বড়ো হয়ে ওঠে। মাতৃঋণ কখনোই পরিশোধ করা যায় না। লোকছড়ায় মা প্রসঙ্গে জয়গান করা হয়েছে। মাকে পরিবারের সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে।

দুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী

সংসার দুর্লভ মিঠে মা বড়ো জননী।

অথবা,



কীসের মাসি কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন

আজ হতে জানলাম মা বড়ো ধন।

মা-এর পরেই আসে পিতার প্রসঙ্গ। পিতা সর্বস্ব দিয়ে সন্তানকে লালন পালন করেন। আদর-যত্নে বড়ো করে তোলেন। কন্যার বিবাহ দেওয়ার সময় অনেক সম্পদ দিয়ে পাত্রপক্ষকে তুষ্ট করতে চান। যাতে বিবাহ পরবর্তীকালে কন্যা সুখে থাকে। এমন প্রসঙ্গ লোকছড়ায় উঠে এসেছে—

আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে।...
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই যে বাপ টাকা দেছেন সিঁদুক ভরিয়ে।

‘সিঁদুক ভরিয়ে’ পিতা তো টাকা দিলেন কিন্তু কন্যাসন্তানটি কী সুখী হলেন এমন লোভি শ্বশুরকুলে গিয়ে এটা প্রশ্ন থেকেই যায়। লোকছড়ায় আবার ঠিক বিপরীত চিত্রও আমরা দেখতে পাই। যেখানে টাকার বিনিময়ে পিতা বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে তার কন্যা সন্তানের বিবাহ দিয়েছেন। কন্যা আক্ষেপ করেছে—

এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনাতলায় বসে
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে
আমরা যাব পরের ঘরে পর অধীন হয়ে
পরের বেটা মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে
দুই চক্ষুর জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

ভাই-এর সঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে কন্যা। নানা চাওয়া-পাওয়া, খেলাধুলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, খুনসুটি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভাই-বোনের। তাই বাড়ির মেয়েটির যখন বিবাহ হয়ে যায় বিচ্ছেদ বেদনায় ভাইয়ের মন ব্যাকুল হয়।

ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন চোখে হাত দিয়ে
সেই যে ভাই কাপড় দেবেন আলনা সাজিয়ে।

বিবাহ পরবর্তীকালে বোনের সংসার সুখের না হলে ভাইয়ের মন যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। বোনকে আশ্বাস দেয় ভাই—

এ মাসটা থাক্ দিদি কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।

আবার, ভাই প্রসঙ্গে অন্য একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

বাপ দিল সরু শাঁখা মা দিল শাড়ি
ভাই দিল ছড়কো ঠেলা চল শ্বশুর বাড়ি।

পরিবার থেকে বোন চলে গেলে জমি, বাড়ি ও সকল সুযোগ-সুবিধার মালিক হবে ভাই। তাই দ্রুত বোনকে বিবাহ দিতে সে খুব উদ্যোগী। এই ছড়ায় ‘ছড়কো ঠেলা’ দিয়ে বোনকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে চেয়েছে ভাই।

ভাই-এর মতোই বোনের সঙ্গেও কন্যার সখ্যভাব থাকে। মাঝে মধ্যে, ঝগড়া হলেও অন্তরের মিলতো থাকেই। তাই বোন প্রসঙ্গে লোকছড়ায় আছে—

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন কালামুখী বলে।

ছোটো ছেলেমেয়েদের মামার বাড়ি খুব আদরের জায়গা। যে সকল আবদার বাবার বাড়িতে পূর্ণ হয় না, সে সবও মামার বাড়িতে পূর্ণ হয়ে থাকে। মামার বাড়িতে শাসন নেই, আছে অত্যধিক প্রশংসা। লোকছড়ার মামারবাড়ি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই
মামা বাড়ি ভারী মজা, কিল চড় নাই
মামী দিল দুধভাত, দুয়ারে বসে খাই।
অথবা
মামার কাছে যাই/মামা দিলে দুধভাত
দাদার কাছে যাই/দাদা দিলে কাতুকুতু।

মাসি-পিসি প্রসঙ্গও বেশকিছু ছড়ায় পাওয়া যায়। মায়ের পরে মাসি পিসিরাই শিশুকে ঘুম পাড়াতে সাহায্য করে থাকে। লোকছড়ায় ঘুমকে সজীব সন্তা হিসাবে ধরা হয়েছে এবং ঘুমপাড়ানিকে মাসি পিসি বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো।
খাট নাই, পালঙ নাই, খোকার চোখে বোসো।

একটি লোকছড়ায় দেখা যায় বোনের সন্তান বাড়িতে আসায় মাসি উনুনে খুদ চাপায়। হয়তো মাসির আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তবু সে বোনের সন্তানের আহ্বারের ব্যবস্থা করে।

মাসি বড় টসটসাল
বোনপোকে দেখে মাসি খুদ চড়াল।
আবার অন্য লোকছড়ায় দেখা যায় মাসি-পিসি কিছুই দেয় না তার বোনের অথবা ভাইয়ের সন্তানকে।

মাসি পিসি বন কাপাসি বনের মধ্যে ঘর
কখনও বললনি মাসি কড়ার নাড়ু ধর।
আবার কোথাও মাসি-পিসির প্রসঙ্গ এনে মাসির তুলনায় পিসিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পিতা ও পিতা সম্পর্কিত আত্মীয় পরিজনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। হয়তো এই লোকছড়াটি তেমনি কোনো ভাবনার প্রতিফলন।

মার বোন মাসি/কাদার তলে ঠাসি।

বাবার বোন পিসি/ ভাত কাপড় দি পুষি।

শ্বশুর বাড়িতে মেয়েদের একটা নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। লোকসমাজে সাধারণত শাশুড়ি নববধূর প্রতি নানা মানসিক অত্যাচার করে থাকে। লোকছড়ায় শাশুড়ি প্রসঙ্গে বধূর অত্যন্ত খারাপ মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। শাশুড়ি সকাল বেলা মারা গেলে খেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে তবে বধূটি কাঁদবে বিকালে।

শাশুড়ি ম'ল সকালে
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো
কাঁদবো বিকালে।

আবার অন্য লোকছড়ায় পারিবারিক নানা সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য শাশুড়িকে তোয়াজ করে চলার কথাও বলা হয়েছে।

মণ্ডা মনহরা/জেলাপি রস করা
খাবি দাবি গাল ফুলাবি



শাশুড়ির গলায় তেল লাগাবি।

বধূর সঙ্গে ননদের সম্পর্কও সাধারণত ভালো হয় না। ননদ বাড়ির মেয়ে হিসাবে দীর্ঘদিন যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এসেছে কিংবা বর্তমানে পায়, তার বিন্দুমাত্রও বধূর কপালে জোটে না। বধূর অবচেতনে ননদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ বা হিংসা কাজ করে। তাই ননদের বিয়ে হয়ে গেলে বধূ ভারি আনন্দ পায়।

ভালো কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে

ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

শ্বশুর বাড়ির অন্যান্য সদস্য, যেমন— শ্বশুর, ভাসুর প্রসঙ্গে সদর্থক মানসিকতার পরিচয় লোকছড়া পাওয়া যায়। শাশুড়ি ননদ যে বধূকে গাত্রবর্ণ নিয়ে খোঁটা দিয়ে হীনমন্যতায় ভোগায়, সেই বধূকেই শ্বশুর, ভাসুর প্রশংসা করে। এই লোকছড়াটি নারীর পরিবার জীবনে অপর নারীই যে তার বড়ো শত্রু তার প্রমাণ।

শাশুড়ী ননদ বলবে দেখে

বৌ হয়েছে কালো

শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে

ঘর করেছে আলো।

বহুবিবাহ রীতির ফলস্বরূপ পারিবারিক সম্পর্কের সর্বাপেক্ষা তিক্ত রূপ দেখা যায় সতীন সম্পর্কে। লোকসমাজে সতীন সমস্যা মেয়েদের কাছে সর্বাধিক বড়ো একটা সমস্যা। সতীনকে হত্যা করার কথা বা সতীনের মৃত্যুকামনা প্রসঙ্গ বহু লোকছড়ায় দেখতে পাওয়া যায়।

সাত-সতীনের সাত কৌটা।

তার মাঝে আমার এক অরভরের কৌটা।

অরভরের কৌটা নাড়ি চড়ি

সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।

অথবা,

বঁটি বঁটি বঁটি/সতীন পেলে কুটি

হাতা হাতা হাতা/খা সতীনের মাথা।

অথবা,

অশথ কেটে বসত করি

সতীন কেটে আলতা পরি।

সতীনবিহীন সংসার চেয়ে মেয়েরা কামনা করে—

ময়না ময়না ময়না/সতীন যেন হয় না।

যার হাত ধরে নারীর শ্বশুরবাড়ি প্রবেশ সেই স্বামীকেই ভাগ করে নেওয়া কোনো নারীর পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাই নারী মনের একান্ত কামনা সতীনের মৃত্যু তথা সতীনের গঙ্গাযাত্রা।

পাখি পাখি পাখি

সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যায়।

আমি খাটে বসে দেখি।

লোকছড়ায় জামাইকে খুব সমাদর করা হয়েছে। জামাইয়ের জন্য ভালো ভালো খাবারের আয়োজনের প্রসঙ্গ আছে। জামাইকে আদরযত্ন করলে বা ভালো রাখলে বাড়ির মেয়েটিও ভালো থাকবে এই আশা পরিবারের।

জামাই আসবে বলে

কুটেছি চাল পাঁচ কাঠা।
অথবা এসো জামাই বসো খাটে
পা ধোও খড়ের মাঠে

লোকছড়ায় জামাইয়ের অভিমানের প্রসঙ্গও আছে। অনেক আদর আপ্যায়ন করা
সত্ত্বেও জামাইয়ের মন পাওয়া দুষ্কর।

কাপড় দিলাম জোড়ে জোড়ে কন্যা দিলাম দানে
তবু জামাই ভাত খেল না কিসের অভিমানে।

এমনিভাবে লোকছড়াগুলিতে পারিবারিক নানা সম্পর্কের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে।
গোষ্ঠীবদ্ধ লোকজীবনে পরিবার একটা বড়ো ভূমিকা নেয়। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে
যে আত্মিক যোগ তাই পরিবারকে বেঁধে রাখে। এই বন্ধন তখনই সুদৃঢ় হয় যখন পরিবারের
সদস্যরা একে অপরকে সম্মান করে। লোকসমাজে নারী সেই সম্মানটা হয়তো বেশিরভাগ
ক্ষেত্রে পায় না। তাই তার অবচেতনে জমে থাকা ক্ষোভগুলি এমনই সব লোকছড়ায় ফুটে
ওঠে, যা হয়তো বাস্তব সমাজে নারী প্রকাশ করতে অক্ষম।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭
বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪৯।
- ২। আহমেদ, ওয়াকিল, বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ২।
- ৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা,
১৯৬২ খ্রি., পৃ. ১৩১।

আদিবাসী লোক উৎসব করম পূজা

মনশী মাহাত

সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ

মানভূম মহাবিদ্যালয়, মানবাজার, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: আদিবাসী লোক উৎসবের মধ্যে করম এক বড় উৎসব। সেই উৎসবকে কেন্দ্র করেই এই প্রকৃতি জগতের আরাধনা। করম আসলে কি আদিবাসীরা কেন করম উৎসব পালন করে আর এই করম উৎসবের তত্ত্ব কথাই বা কি? কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই উৎসব পালন করে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে রয়েছে এই গবেষণা পত্রের চর্চা। প্রকৃতির করম বৃক্ষ কে আদিবাসীরা কেন দেবতার রূপে বিশ্বাস করে, আদিবাসীদের মধ্যে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে যে উৎসব সেই উৎসবের পেছনে অনেক রকম বিষয় রয়েছে। যেমন কৃষি উৎপাদনের বিষয়, প্রকৃতি সৃষ্টি তত্ত্বের বিষয়, নারী জাতির বৈশিষ্ট্যের কথা এবং প্রকৃতির প্রতি প্রেম, ধর্মীয় বিশ্বাস এই সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে সামাজিক ধর্মীয় দিক কতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে সমস্ত দিকটি তুলে ধরার জন্য এই গবেষণা পত্রের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: প্রকৃতি প্রেম, ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষি, সমাজ, ধর্মীয় পুরাণ ইত্যাদি।

মূল আলোচনা: সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে আদিবাসীদের জীবন চর্চা কৃষি কেন্দ্রিক। কৃষিকে কেন্দ্র করেই এদের সুখ-দুঃখ হাসি কান্না সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি বংশপরম্পরায় গড়ে উঠেছে। আদিবাসীরাই একদিন পাহাড়, জঙ্গল, পাথর, মাটি, কেটে অসমান জমি সমান করে তাকে চাষযোগ্য আবাদী জমিতে পরিণত করেছিল। তারপর কৃষি সভ্যতার সেই মহা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিল তাদের নিজস্ব সামাজিক অনুশাসন ধর্ম সংস্কৃতি। প্রতিষ্ঠিত করেছিল নিজস্ব কৃষি ভাবনা, কৃষি পদ্ধতিকে। তৈরি করেছিল কৃষি কেন্দ্রিক ধর্ম, কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি। আদিবাসীদের করম পূজা এক বড় উৎসব। যা ভারতবর্ষের মধ্যে ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবাংলা বিহার, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পালিত হয়। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, এছাড়াও বাংলাদেশে ও নেপালেও করম উৎসব পালন হচ্ছে। এই উৎসবে করম দেবতার উপাসনা করা হয় যিনি যুবশক্তি ও যৌবনের দেবতা। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মূলত সাঁওতাল, মুন্ডা,হো, খাড়িয়া, ভূমিজ, কুড়ুম,করমালি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই করম উৎসব পালন করে। “করম” শব্দের অর্থ হল কর্ম অর্থাৎ কর্মের মধ্য দিয়ে করম বৃক্ষকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালন করা হয় সে জন্য এর নামকরণ করম উৎসব। (কর্ম- করম) করম আসলে একটি বৃক্ষ সেই বৃক্ষকে আদিবাসীরা দেবতা রূপে গ্রহণ করেছে।

আদিবাসী জনজাতিদের বারোমাসে তেরো পার্বণ হয়েই থাকে অর্থাৎ মাঘ মাস থেকে শুরু করে পৌষ মাস পর্যন্ত তারা উৎসবে মেতে থাকে সেই হিসেবে করম একটি উৎসব যা ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের পার্শ্ব একাদশীতে পালন করা হয়। করম দেবতা হল আদিবাসীদের কৃষি উৎপাদনের সৃষ্টি কর্তা অর্থাৎ মাটিতে বীজ রোপন করে অঙ্কুরিত হলেই করম দেবতার পূজা করা হয়। আদিবাসীরা করম গাছকে পূজা করে দেবতা রূপে। আসলে

আদিবাসীরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়, ওরা হচ্ছে প্রকৃতি পূজারী। সেজন্য তাদের কাছে গাছ, মাটি, পাথর, নদী, পাহাড়, আলো, বাতাস, জল এই সমস্তই তাদের কাছে দেবতা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে - করম আসলে কি? করম পূজা আসলে কিসের উৎসব? কেন করম পূজা করে আদিবাসীরা? করম পূজার ইতিহাস কি?

করম হচ্ছে আদিবাসীদের এক ধর্মীয় উৎসব। এটি মূলত কৃষিভিত্তিক উৎসব। সমগ্র কৃষি জগতকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালিত হয়। কৃষিকাজে যাতে কোন বাধা-বিপত্তি না আসে এবং শস্য উৎপাদন যাতে ভালো হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই পূজা করা হয়ে থাকে। স্থানভেদে এই উৎসব ভিন্ন হলেও মূল হচ্ছে করম বৃক্ষকে নিয়েই। করম গাছ উর্বরতা শক্তি এবং শুভ শক্তির প্রতীক। করম পূজা শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি প্রকৃতির সাথে মানুষের গভীর সম্পর্কের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক বৃক্ষকে কেন্দ্র করেই এই আচার অনুষ্ঠান করা হয়। এটা সাধারণত আদিবাসীরা অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন রকম ভাবে উদযাপন করছে।

আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল কুর্মি মুন্ডা ভূমিজ এরা সাধারণত বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রকৃতি রূপী করম বৃক্ষকে পূজা করে আসছে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী করম পাতাকে মৃত্যুর সংস্কার কাজেও ব্যবহার করছে। করম পাতাকে তারা সামাজিক শুদ্ধতারূপে মান্যতা দিয়েছে। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে করম শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে করমকে কেউ কর্ম বলছে আবার “যাহা কর্ম তাহাই ধর্ম বলে মনে করছেন অর্থাৎ (Karam is Dharam)”^১ আদিবাসী জনজাতিগণ সারা বছর এই উৎসবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। করম পূজা মূলত ভাই বোনের সম্পর্ককে মজবুত বা দৃঢ় করার এক পার্বণ। ঠিক যেমন বাঙালিরা রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে রাখি বন্ধন এর মাধ্যমে ভাইয়ের জীবন দীর্ঘায়ু করার জন্য বোনেরা করে, ঠিক তেমনি আদিবাসী সমাজেও বিশেষ করে কুড়ুমি সমাজের বোনেরা করম গাছকে আঁকড়ে ধরে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা এবং সুখ সমৃদ্ধির আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। “আমার করম ভাইএক ধরম” এই প্রবাদ বাক্য বলে। অর্থাৎ আমার কর্মের উপাসনার মাধ্যমে যেন ভাইয়ের ধর্ম হয়। করম আসলে সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধির পরব বিভিন্ন জনজাতি বিভিন্নভাবে করম দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায় যাতে ঘরের সপরিবারের কল্যাণ হয়।

দেখা যায় আজও সারা ভারতবর্ষে যে সকল নিবিড় কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী রয়েছে তার সংখ্যাগরিষ্ঠই হলো কুড়ুমি সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তারা কুটুম বিন, কুরুমান, কুড়ুবা কুনবি বিভিন্ন নামে পরিচিত। “শস্যবীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের রহস্য উদ্ভাবনের কৃতিত্ব মেয়েদের এবং কৃষির সূচনাও মেয়েরা করেছিল এই মতটি নৃবিজ্ঞানী গণ মেনে নিয়েছেন।”^২ লক্ষ্য করার বিষয় কুড়ুমালি সংস্কৃতিতেই সেই যুগান্তকারী ঘটনার স্মৃতি এখনো জাওয়া বা করম উৎসবের মধ্যেই তা আজও পালিত হয়ে আসছে।

বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের মতোই আদিবাসীদের এই করম বিনতি বা করম পুরান কথা। করম পুরান কথা আদিবাসী সমাজে এক বড় মহান সম্পদ বলে মনে করা হয়। কর্মের মধ্য দিয়ে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাই ধর্ম। ধীরেন্দ্রনাথ বাল্মীকি বলেছেন - “করম-ধরম দুঃখ-পীড়া এবং অভাব থেকে মুক্তি দেয়, সেজন্য করম গোসাইকে মান্যতা দেওয়া হয়।”^৩ যারা এই করম দেবতাকে অমান্য করে তাদের ক্ষেত্রে সংসারের দুঃখ, জ্বালা, রোগ, অসুখ, অভাব লেগে থাকে বলে আদিবাসী সমাজের মানুষের কাছে বিশ্বাস।

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে মাহালী, মন্ডা, ভূমিজ, কুড়ুমি, সাঁওতাল ওরাও এই সমস্ত সমাজে করম উৎসব ভাদ্র মাসের পার্শ্বএকাদশীতে পালন করে। মূলত বছরে একটা নির্দিষ্ট



দিনে করম উৎসব করে। কিন্তু এদের মধ্যে সাঁওতাল জনজাতিরা একটু আলাদাভাবে উৎসব করছেন। সাঁওতালদের করমের আবার বিভিন্ন ধরন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন - গুরু কারাম, মাঝি কারাম, উপাস কারাম, মরা কারাম, মা: মড়ে কারাম, ডাণ্ডা কারাম ইত্যাদি। এরা অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তে না হয় কার্তিক মাসের পূর্ণিমা আবার ভাদ্র মাসের একাদশীতেও করম পূজা করছে। এটা নাকি তাদের পারিবারিক কিছু সমস্যা বা অঘটন দেখা দিলে তারা করম দেবতা কে পূজা করে সম্ভুষ্ট করে এটা সম্পূর্ণ তাদের পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে তবে সমস্ত এলাকাতে নয়। বিবাহিত বা কুমারী মেয়েরা ব্রত পালনের মাধ্যমে কমপক্ষে পাঁচ দিন আগে বিভিন্ন রকমের শস্য দানা রোপন করে নদী থেকে বালি তুলে এনে একটি ডালিতে রাখে আর সেই বালিতে মুগ, মসুর, ছোলা, ভুট্টা বিভিন্ন ধরনের শস্য দানা রোপন করে। ওই দিন থেকে মেয়েরা ব্রত করতে শুরু করে পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন রকম নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে। ওই নিয়ম চলবে করম পূজার দিন পর্যন্ত। ঐদিন নিরলা উপবাস দিয়ে মেয়েরা অঙ্কুরিত চারা গাছকে কেন্দ্র করে নাচ গানের মাধ্যমে উৎসব পালন করে। অঙ্কুরিত ওই চারা গাছকে বলে জাওয়া।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের পার্শ্ব একাদশীর দিন কুমারী মেয়েরা ব্রত করে সন্ধ্যার সময় ছেলেরা বাজ বাজনা নিয়ে করম গাছের ডাল নিয়ে আসে গ্রামের কোন এক আখড়াতে বা পূজা স্থানে। মাটিতে ডালটিকে স্থাপন করে এরপরে সবাই নতুন পোশাক পরে পূজায় যোগ দেন তারপর পূজা পাঠ করা হয় কর্ম এবং ধর্ম কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে। ওই কাহিনী দুই যুবক করমু এবং ধরমুকে কেন্দ্র করে। করমু অর্থে করম, ধরমু অর্থে ধরম।

আদিবাসীদের প্রত্যেকটা পূজার পেছনে গানের রহস্য রয়েছে। যেটা আমরা এই করম পূজার ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি। করম বৃক্ষ বা করম দেবতাকে নিয়ে যে গান রয়েছে তার মধ্য দিয়ে করম ঠাকুরকে জাগিয়ে তোলা হয়, অর্থাৎ করম উৎসব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন করম বৃক্ষকে যখন জাগানো হয় করম ডালকে যখন কেটে নিয়ে আসে আবার করম পাতাতে সিঁদুর দেওয়ার সময় এরকম যতক্ষণ না করম ডালকে বিসর্জন করা হয় ততক্ষণ মেয়েরা গান বলতে থাকে। গানের তালে তালে নাচ করে আর ছেলেরা ধমসা মাদল বাজিয়ে এক আনন্দময় উৎসব গড়ে তুলে।

সাঁওতাল সম্প্রদায় যখন করম ডাল মাটিতে রোপন করে সেই আখড়াতে করমের জন্মস্থান নিয়ে তারা যে গান গায় যেমন- “তোকা রেদম জানাম লেনা কারামে গোঁসাই হো? তোকা রেদম বুসাড় লেনা নেও হারী ডার? সিএং বীর রেদম জানাম লেনা কারামে গোঁসাই হো/ মান বীর রেদম বুসাড় লেনা নেও হারী ডার।”^৪ অর্থাৎ করম গোঁসাই কোথায় জন্ম নিয়েছে, কোথায় এই ডাল উৎপন্ন হয়েছে, তার উত্তরে বলা হয়েছে যে উত্তর দিকে সিং জঙ্গলে করম গোঁসাইয়ের জন্ম আর মান জঙ্গলে নেওহারী ডালের উৎপন্ন হয়েছে। এইরকম দেখা যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের গানের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন এবং উত্তর খুঁজে নেই যেটা আদিকাল থেকেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে চলে এসেছে। যেমন কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেরাও করম ডালকে গ্রামের মাঝে আখড়াতে নিয়ে আসার সময় যে গান করে সেটা হল- “আবুরে করম গুঁসাএং ঘারে দুয়ারে/কাইল তরে করম গুঁসাএং কাঁস লদীক পারে।”^৫ অর্থাৎ আজকে করম ঠাকুর আমাদের ঘরের দুয়ারে এসেছে কিন্তু কালকে করম ঠাকুরকে আবার সেই কাঁস নদীর পারে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। এইরকম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে গান ও নাচ করে করম উৎসব পালন করে।

করম পূজা উপলক্ষে প্রাপ্তবয়স্করা যে নাচ করে তা হল করম নাচ বা পাতা নাচ। পাতা বা করম নাচ ধমসার ধ্বনিতে করা হয়। এই করম পূজাতে কিছু কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় লোকেরা যেমন কুড়মি, মুন্ডা, ভূমিজ, সাঁওতাল এদের বাড়ির ছোট নাবালিকা মেয়েরা জাওয়া ডালিকে মাঝখানে রেখে নাচ ও গান করে একে বলা হয় জাওয়া নাচ। এই জাওয়া প্রসঙ্গে ডক্টর বিনয় কুমার মাহাতো বলেছেন - “পাতা নাচ আদিম মানুষের বৃষ্টি প্রার্থনা এর শস্য উৎপাদন ক্রিয়ার ইন্দ্রজালিক অনুকৃতির অনুষ্ঠান।”^৬

আদিবাসী সমাজের লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাবে করম দেবতাকে প্রসাদ দিয়ে সম্ভষ্ট জানায়। সেটা তাদের করম পুরাণের কথা অনুযায়ী করে থাকে। যেমন কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেরা করম পূজার পরের দিন সকালে করম দেবতাকে বাসি ভাত বা পান্তা ভাত কচু পাতায় খেতে দেয় তার সঙ্গে বিভিন্ন রকম গোটা শস্য আর ঝিঙ্গে, টেঁড়স, (লবণ ছাড়া) করে তরকারি দেওয়া হয়। সবজি অর্থে পিচ্ছিল জাতীয় যে সকল সবজি রয়েছে সেগুলো দিয়ে রান্না করা হয় এবং বাড়ির সবাই সেই পান্তা ভাত দিয়ে পান্না করে। কুড়মি সম্প্রদায়ের করম কাহিনী অবলম্বনে আদিকালে করম ঠাকুরের গায়ে নাকি গরম ফোঁস্কা হয়েছিল। এবং সারা শরীর যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে আর ওই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঠান্ডা বাসি ভাত আর কচুপাতা দিয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিল সেই থেকেই আজ পর্যন্ত কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেরা করম ঠাকুরকে বাসি ভাত দিয়ে পুজো করে আসছে।

তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আদিবাসীদের করম পুরাণের মূল তত্ত্ব কথা কী? কেনই বা এই করম পূজার প্রচলন হয়েছিল আদিবাসীদের মধ্যে? আদিবাসীদের করম পুরাণ সম্পর্কে জানা যায়, আদিকালে কোন এক ধনীর বাড়িতে করমু আর ধরমু নামে দুই ছেলে কাজ করতো। ধনীর বাড়ি থেকে গরু ছাগল মাঠে নিয়ে যেত আর মাঠের ধারে তারা করম বৃক্ষের ডাল ভেঙে সেই ডাল মাটিতে রোপন করে নাচ গান খেলা করত। এদিকে গরু ছাগল রাও করমু ধরমুর দিকে তাকিয়ে থাকতো তারা মাঠে ঘাস না খেয়ে এইভাবে দীর্ঘদিন পরে দেখা গেল যে গরু ছাগলের অবস্থা খুব সংকীর্ণ জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা দেখে বাড়ি মালিক একদিন মাঠে তাদেরকে দেখার জন্য গিয়েছিল এবং সেখানে দেখতে পেল যে করমু আর ধরমু সেই করম বৃক্ষকে নিয়ে নাচ গান করছে। রেগে গিয়ে সেই ধনী ব্যক্তি তাদের করম ডালটি মাটি থেকে উপড়ে ফেলে দিল এবং তাদেরকে বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিল। এরপর করমু ধরমুর অবস্থা খুব খারাপের দিকে এগিয়ে গেল। তারা এ বাড়ি সে বাড়ি গিয়ে খাবারের সন্ধান করে কিন্তু কিছুতেই তাদের কপালে খাবার জোটে না।

এইভাবে রেগে গিয়ে তারা একদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে জমিতে যে সকল ধান রোপন করা হয়েছে সেগুলো উপড়ে ফেলবো। এই কথা যখন তারা স্থির করল সেই সময় করম ঠাকুর এক বৃদ্ধ মানব রূপ ধারণ করে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে বললেন যে তোমরা করম ঠাকুরকে খুঁজে নিয়ে এসো তাহলে তোমাদের দুঃখ যন্ত্রণা সব ঘুচে যাবে। এই কথা শুনে তারা বাড়িতে গিয়ে তাদের মাকে বুঝিয়ে বলে তারা করম দেবতার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যেতে যেতে অনেক রকম দৃশ্য দেখতে পেল। যেমন জল খাবে বলে যখন জল খেতে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে সে জলে মধ্যে পোকা, যেতে যেতে ফলের গাছ দেখতে পায়, ফল খাবে বলে দেখা যাচ্ছে ফলের মধ্যেও পোকা। এইভাবে প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্যেই তারা সমস্যা দেখতে পেল এবং সমস্ত প্রকৃতি জগতের অবস্থাও কিন্তু করমু



ধরমুর মতো হয়ে উঠেছিল। তাই সমস্ত প্রকৃতি জগৎ করমু ধরমুকে বলেছিল করম ঠাকুর কে যেন আমাদের দুঃখের কোথাও বলে এবং জানায়।

তাই সমস্ত প্রকৃতি জগতের দুঃখ যন্ত্রণার কথা মাথায় রেখে করমু ধরমু সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে করম ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিল। আর সেখানে গিয়ে করম দেবতাকে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা এবং সমস্ত প্রকৃতি জগতের দুঃখের কথা জানালো। আর কিভাবে এই কষ্টের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে সেটা গানের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা জানালো। তারপর করম ঠাকুর তাদের দর্শন দিয়ে বললেন যে তোমরা ফিরে যাও আর ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীতে করম বৃক্ষকে পূজা করবে উপোস করে। তাহলেই তোমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট জ্বালা, যন্ত্রণা সরে যাবে। সেই থেকে আজও আদিবাসী সমাজের লোকেরা করম বৃক্ষকে দেবতা রূপে পূজো করে আসছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। N.N Hembram - Austric Civilization of India, Haripada Sahoo Books and News, Calcutta, 1982, p- 61,
- ২। ডক্টর মনোরঞ্জন মাহাতো- কুড়মি কুড়মালি, ফুরুএ প্রকাশনী, মুড়ারী, মুনিয়াদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪৬
- ৩। ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে- কারাম বিনতি, শান্তিনগর রিজেন্ট পার্ক কলকাতা ২০১০, পৃষ্ঠা-২
- ৪। ডক্টর রতন হেমরম- সানতালি লোকগীতি মে সাহিত্য ওর সংস্কৃতি, মাধা প্রকাশন, জাহের টোলা বারিডি জামশেদপুর-১৭, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৯১,
- ৫। ডঃ মনোরঞ্জন মাহাতো- কুড়মি কুড়মালি, ফুরুএ প্রকাশনী, মুড়ারী, মুনিয়াদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯
- ৬। শ্রী সুভাষ মাহাতো- করম পরম ও মেলা, ২০১২, বেলপাহাড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২।

প্রত্যুষের শুকতারা এবং দুই বন্ধুর গল্পো

ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বারাসাত গভর্ণমেন্ট কলেজ

সারসংক্ষেপ: ‘অবোধ-বন্ধু’ উনিশ শতকের শহর কলকাতার একটি মাসিক পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এই পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই লেখক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। পরে এই পত্রিকার সম্পাদক হন। তাঁর ‘বঙ্গসুন্দরী’, ‘সুরবালা’, ‘প্রেম-প্রবাহিনী কাব্য’ প্রভৃতি রচনা ‘অবোধ-বন্ধু’র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা রচনার প্রথম লগ্নে বিহারীলাল ‘প্রিয় সখা’ শিরোনামে একটি কুড়ি শবকের কবিতা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই কুড়িটা শবক তিনি ‘বঙ্গ সুন্দরী’ কাব্যের ‘উপহার’ সর্গে জুড়ে দেন। এই ‘উপহার’ সর্গটি বিহারীলাল উপহার দিয়েছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে। ‘বঙ্গসুন্দরী’ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে বিহারীলাল তাঁর সম্পাদিত ‘সুরবালা কাব্য’-এর প্রথম ভাগের তিনটি সর্গকে অন্তর্ভুক্ত করলেন ‘বঙ্গসুন্দরী’ কাব্যের স্বতন্ত্র একটি সর্গ হিসেবে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন কবি বিহারীলালের ‘সর্বস্বধন লেখক’। তিনি খুব ভালো ফরাসি ভাষা জানতেন। ছিলেন ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁতের শিষ্য। নামজাদা পজিটিভিস্ট। দার্শনিক অগাস্ট কোঁত পৃথিবীর ভালো ভালো বই বেছে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘পজিটিভ লাইব্রেরি’। এই লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছিল Jacques Henri Bernardin de Saint Pierre (১৭৩৭-১৮২৪) রচিত Paul et Virginie উপন্যাস (১৭৮৮)। কৃষ্ণকমল সেই উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ ‘অবোধ-বন্ধু’র পৃষ্ঠায় ‘পৌল ভজ্জিনী’ নামে প্রকাশিত হয়। বছর সাতেকের বালক রবীন্দ্রনাথ ‘অবোধ-বন্ধু’র আ-বাঁধা খণ্ডগুলি থেকে সেই ‘পৌল ভজ্জিনী’ পড়েছিলেন। পড়েছিলেন বিহারীলালের কবিতাও। ‘অবোধ-বন্ধু’ সেই থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছিল অমলিন হয়ে। পেয়েছিল সারস্বত প্রতিষ্ঠা।

সূচক শব্দ: অবোধ-বন্ধু, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয় সখা, বঙ্গসুন্দরী, সুরবালা, কল্পনা, নায়িকা, আত্মহত্যা, ঠাকুর আইন অধ্যাপক, নামজাদা পজিটিভিস্ট, পৌল ভজ্জিনী।

মূল আলোচনা: ‘অবোধ-বন্ধু’ সেকালের কলকাতার একটি মাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন:

বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।^১

সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ এমন করে ‘অবোধ-বন্ধু’র কথা না লিখলে আমরা ঐ পত্রিকাটি সম্পর্কে কৌতূহলী হতাম না। ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায়:



১৮৬৩ সনের মে (১২৭০, বৈশাখ) মাসে ‘অবোধবন্ধু’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন- হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।^২

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ থেকে প্রকাশিত আরও একটি বইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অবোধ-বন্ধু’র প্রকাশকালকে নির্দিষ্ট করে লিখেছেন:

অবোধ-বন্ধু। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬৩।^৩

এর পাশাপাশি ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার প্রকাশের আরও একটি তারিখ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কেদারনাথ মজুমদার তাঁর ‘বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য’ বইতে লিখছেন:

১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে ‘অবোধবন্ধু’ বাহির হয়। ১২৭৪ সালের মাঘ

মাসে তাহার প্রথম বর্ষ শেষ হয়। ইহার পর ফাল্গুন চৈত্র এই দুই মাসে

আর পত্রিকা বাহির না করিয়া বৈশাখ মাস হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ করা হয়।^৪

এই তারিখ অনুযায়ী ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার প্রকাশ কাল দাঁড়ায়: ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭। প্রাবন্ধিক কেদারনাথের বক্তব্য অনুযায়ী জানুয়ারি, ১৮৬৮ সংখ্যাটি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ‘অবোধ-বন্ধু’ নামক মাসিক পত্রিকাটি তার প্রকাশের এক বছর পূর্ণ করে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যা এবং মার্চ, ১৮৬৮ তারিখে ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি। এরপর এপ্রিল, ১৮৬৮ সংখ্যার ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকা পত্রিকাটি তার প্রকাশের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যারও সম্পাদকের নাম- যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার ফাল্গুন, ১২৭৩ (ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭) সংখ্যার একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে উল্লেখ রয়েছে: ‘১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা’। তাহলে ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লিখিত ‘এপ্রিল, ১৮৬৩’ বা ‘মে, ১৮৬৩’ তারিখটি কি সঠিক নয়? উক্ত সংখ্যার ‘অবোধ-বন্ধু’ মাসিক পত্রিকার ‘আরম্ভ’ অংশটি পড়লে এই আপাত বিরোধের অবসান ঘটে। সেই ‘আরম্ভ’ অংশে সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখলেন:

সূর্য যেমন অন্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধবন্ধু এ তাবৎকাল পর্যন্ত পাঠক বর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। এক্ষণে তাহা পূর্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধ মনকে উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা।^৫

বোঝাই যাচ্ছে, এপ্রিল, ১৮৬৩ তারিখে যে ‘অবোধ-বন্ধু’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সেই ‘অবোধ-বন্ধু’ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭ তারিখের আগে পর্যন্ত ‘কয়েক সংখ্যা’ প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বলছেন:

‘অবোধবন্ধু’ কিছুদিন চলিয়া আত্মগোপন করে। ১২৭৩ সালের ফাল্গুন (১৮৬৭, ফেব্রুয়ারি) মাসে ইহা নবোদ্যমে পুনঃপ্রচারিত হয়।^৬

‘অবোধ-বন্ধু’র ঠিক কতগুলি সংখ্যা ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭-এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, তা ‘অন্তমিত সূর্যের’ মতন দেখতে বা জানতে পারা যায় না। স্বয়ং সম্পাদক যখন ফাল্গুন, ১২৭৩ বা ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭ সংখ্যার ‘অবোধ-বন্ধু’কে ‘১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা’ বলে সিলমোহর দিয়ে দেন, তখন তার আগের সংখ্যাগুলির হিসেব আর কে রাখে?

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন:

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ‘অবোধবন্ধু’র সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগের নবম সংখ্যা (পৌষ, ১২৭৫) হইতে তিনি [অবোধ-বন্ধু] পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন।^৭

এখন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘অবোধ-বন্ধু’ কতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিল? প্রাবন্ধিক এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন:

‘অবোধ-বন্ধু’ তৃতীয় ভাগ (বৈশাখ-চৈত্র, ১২৭৬) পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।^৮

রবীন্দ্রনাথও আক্ষেপ করে লিখেছেন:

বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবার বহু পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিকপত্র বাহির হইত। তখন বর্তমান লেখক [রবীন্দ্রনাথ] বালক বয়স প্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে যখন বোধোদয় হইল তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।^৯

‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮ নাগাদ। রবীন্দ্রনাথ সে সময় বছর সাতেকের বালক। ‘জীবনস্মৃতি’ রচনার পত্রিকাপাঠে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

বাল্যকালে আর একটি ছোট কাগজের সঙ্গে পরিচয়লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।^{১০}

‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার শ্রাবণ, ১২৭৪ সংখ্যায় বিহারীলাল চক্রবর্তী ‘প্রিয় সখা’ শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছেন। পত্রিকাপাঠে দেখা যাচ্ছে, মোট কুড়িটি স্তবক আছে সেই কবিতাটিতে। কবিতার শুরুতেই কবি বলছেন:

প্রিয়তম সখা সহৃদয়

প্রভাতের অরুণ উদয়,

হেরিলে তোমার পানে

তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে

দুঃখের তিমির দূর হয়।^{১১}

এখানে সকালবেলার সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্তের সঙ্গে কবির ‘প্রিয়তম সখা’ উপমিত। সূর্যের আলোয় যেমন রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনই ‘প্রিয়তম সখা সহৃদয়’-এর দিকে তাকালে কবির মনের দুঃখের অন্ধকার কেটে যায়। এখানেই শেষ নয়, ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার আশ্বিন, ১২৭৬ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে বিহারীলালের ‘বঙ্গসুন্দরী’ কাব্য। এই কাব্যের প্রথম সর্গের নাম ‘উপহার’। পত্রিকাপাঠে দেখা গেল, সেই উপহার সর্গের অন্তর্গত ২৯ নং স্তবক থেকে ৪৯ নং স্তবক – এই কুড়িটা স্তবক হয়ে গেল ‘প্রিয় সখা’ কবিতার, যেটি শ্রাবণ, ১২৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেই কুড়িটা স্তবকের কপি-পেস্ট। সম্পূর্ণ ‘প্রিয়



সখা' কবিতাটাই সেই 'উপহার' সর্গে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন বিহারীলাল। একেবারে সচেতন ভাবেই।- 'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকার সেই আশ্বিন, ১২৭৬ সংখ্যায়, 'বঙ্গসুন্দরী কাব্যের উপহার' নামক প্রথম সর্গ'-এর ৫২ নং স্তবকের শেষে 'ফুটনোট' হিসেবে পত্রিকা সম্পাদক বিহারীলাল লিখলেন:

এই কাব্যের কোন কোন অংশ ১২৭৪ সালের অবোধ-বন্ধুতে প্রথম
প্রকাশিত হয়।^{১২}

আর এই 'উপহার' সর্গের ৫০ নং স্তবকে কবি বিহারীলাল লিখলেন:

করে আজি অর্পিণু তোমার,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার
এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে
সাতজন নারী রাজে
ম্নেহ প্রেম করুণা আধার।^{১৩}

'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকার বৈশাখ, ১২৭৬ সংখ্যায় বিহারীলাল শুরু করেছিলেন 'সুরবালা' কাব্য। প্রথম ভাগ। প্রথম সর্গ। এই সর্গের নাম বিহারীলাল দিচ্ছেন: নায়িকা। দেখা গেল, এই সর্গের নায়িকা সুরবালা শিশুকালেই তার মা-বাবাকে হারিয়েছে। ঠাকুমার কাছে মানুষ। ঠাকুমার সে নয়নের মণি। বক্ষের হার। তাকে এতটুকু চোখের আড়াল হতে দেন না তিনি। কবিতার ৪৪ নং স্তবকে সুরবালা 'ষোড়শী রূপসী নারী'তে পা দিল। সুরবালা স্বভাবে তার বাবার মতন। অভিনন্দন জানিয়ে কবি লিখলেন:

পিতৃপুণ্য বলে তুমি গো এখন
হয়েছ ষোড়শী রূপসী নারী;
পিতার মতন পাইয়াছ মন
শিখেছ উদার ব্যভার তাঁরি।^{১৪}

এরপর ৫৬ নং স্তবকে কবি বিহারীলাল সুরবালাকে বলছেন:

সুরবালা! মম সখা সহৃদয়
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়
চকোর পাগল হবে না কেন?^{১৫}

এ সখা কোন সখা? বোঝাই যাচ্ছে, ইনিই সেই কবির 'প্রিয়তম সখা সহৃদয়'। সুরবালাকে দেখে তার প্রেমে পাগল হয়ে গেছে কবির এই বন্ধু। জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৬ সংখ্যার 'অবোধ-বন্ধু'তে সুরবালা কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ, 'কল্পনা'তে কবি তাঁর 'প্রিয়তম সখা'র স্বভাবের পরিচয় দিয়ে বলছেন, বাল্যকালে এই শিশুটিকে বাড়ির লোকজন বকাবকি করলে সে প্যান প্যান করে কাঁদত না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আবার কখনো বা রাগ খুব বেশি হলে একা একাই ছোট ছোট পায়ে দুই ক্রোশ পথ হেঁটে পৌঁছে যেত পিসির বাড়ি। কবির ভাষায়:

সকাল বেলায় আসিল খবর
বাড়ীর উপরে করিয়ে আড়ি;
দুই ক্রোশ পথ চলি বরাবর
হয়েছে দাখিল পিসির বাড়ী।^{১৬}

এই শিশুটিকেই বড় বয়সে দেখা গেল, প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠরত অবস্থায় হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে। বিহারীলাল লিখছেন:

পাঠ সমাপন হ'তে না হ'তে
বিদেশ ভ্রমণে উঠিল মন;
যথা যে বিভূতি আছে এ-ভারতে
করিতে সকল অবলোকন।^{১৭}

এ সবই ১৮৫৮ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে ঘটে যাওয়া ঘটনা। ঘটনার দিন তিনেক পরে, ২০ এপ্রিল, ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' কাগজে কবির সেই 'প্রিয়তম সখা'র দাদা বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই বিজ্ঞাপনটি সবিশেষ পাঠ করলেই আমরা সেই 'প্রিয়তম সখা'কে চিনতে পারব। বিজ্ঞাপনটি এইরকম:

বিজ্ঞাপন।- আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬/১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাহার নিকট যথোচিত বাধিত উপকৃত হইব। শ্রী রামকমল ভট্টাচার্য্য। নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।^{১৮}

হ্যাঁ, বিহারীলালের এই 'প্রিয়তম সখা' হলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। সুরবালা কাব্য রচনার সমকালে তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার সিনিয়র প্রফেসর। এরপরে কখনো তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক', আবার কখনো বা কলকাতা হাইকোর্ট বা হাওড়া কোর্টের সফল ব্যবহারজীবী। পাশাপাশি তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে টানা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেকালের রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) কলা ও আইন- দুই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। অন্যদিকে ছিলেন সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক এবং তখনকার কালের নামজাদা পজিটিভিস্ট। পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, অধ্যাপক, দার্শনিক প্রভৃতি নানান সত্তায় তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন।

এই কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ করেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় একবছর কাল তিনি নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণকমলের এই নিরুদ্দেশ সেকালের কলকাতায় বেশ আলোড়ন তুলেছিল। কৃষ্ণকমলের বাসস্থান ছিল পুরনো কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চল। পরবর্তী কালে সে অঞ্চলের নাম হয় বিডন স্ট্রীট। 'সংশপ্তক' পত্রিকার সম্পাদক এ প্রসঙ্গে বলছেন:

তুলনামূলক সেই জনবিরল কালে (১৮৫০ এর দশক), এই বর্তমানের জনাকীর্ণ বিডন স্ট্রীটের চারপাশে ছিল বনবাদাড়, কাঁচা রাস্তা আর কিছুটা করে জঙ্গল। মাঝে মাঝে ছিল কয়েকটা গলি। এই গলিতেই সন্ধ্যা নামলে বারবণি তাদের আড্ডা জমতো। এখানেই ছিলেন পেশোয়াজ পরা এক কিশোরী। এই কিশোরী সেই সময়ের ১৬-১৭ বছর বয়সের কৃষ্ণকমলকে যে আকর্ষণ করেছিলেন এবং কৃষ্ণকমলও যে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সুরবালা' কবিতায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।...এই নারীকে নিয়ে কৃষ্ণকমল নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন এবং এক বছর পরে ফিরে এসেছিলেন।^{১৯}



কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কোথায় এই একবছরকাল সময় কাটালেন? এ বিষয়ে সেকালের রিপন কলেজ ল ম্যাগাজিন-এ লেখা হয়েছে:

কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি [কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য] হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন এবং কয়েকমাস পদব্রজে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন।^{২০}

এ প্রসঙ্গে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন:

এই পলাতক-জীবনে তিনি [কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য] বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।^{২১}

নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে বন্ধু কৃষ্ণকমলের ফিরে আসার পর বিহারীলাল ‘অবোধ-বন্ধু’ পৃষ্ঠায়, সুরবালা কাব্যের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সর্গে লিখছেন:

ফিরে এসে চিত্ত হ’ল স্থিরতর,
গেল সে ছেলোমো খেয়াল দূরে;
শাস্ত্র সুধাপানে প্রফুল্ল অন্তর,
ভাব রসে মন উঠিল পুরে।^{২২}

ঠিক তার পরের স্তবকেই বিহারীলাল লিখলেন:

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়,
শ্যামল বরণা নবীনা বাল্য;
পেশোয়াজ পরা পারিজাতময়,
গলে দোলে পারিজাতের মালা।^{২৩}

বিহারীলালের লেখা থেকে বোঝা যায়, নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ঐ ‘শ্যামল বরণা নবীনা বাল্য’র প্রেমে পড়েছিলেন। নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে সম্ভবত নয়। কিন্তু সেই প্রেম বিবাহে পরিণত হয়নি। বাড়ি থেকে মনোনীত পাত্রীর সঙ্গে কৃষ্ণকমলের বিবাহ হয়। এ বিয়েতে কৃষ্ণকমলের মত ছিল না। হয়ত তিনি তাঁর প্রেমিকার কথা বাড়িতে বলতে পারেননি। কিংবা বলেওছিলেন হয়ত। বাড়ির লোকজনের মত ছিল না। বিবাহের দিনে:

ক’নে দেখে ফাটে বরের পরাণ,
পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয়?
যে ছবি হৃদয়ে সদা শোভমান,
এ ক’নে তাহার কিছুই নয়।^{২৪}

এ বিবাহে কৃষ্ণকমল সুখী হতে পারেননি। বিহারীলালের কবিতায় দেখা গেল, বিবাহিত কৃষ্ণকমল তার পূর্বপ্রণয়নীর সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ। এমন একটা সময়ে:

দাদা তাঁর কুল প্রধান পুরুষ,
কত কি নির্ভর যাঁহারে করে;
সেই মহীয়ান মনের মানুষ
তাজিলেন প্রাণ আপন করে।^{২৫}

সুরবালা কাব্যের পরবর্তী সর্গের নাম ‘আত্মহত্যা’। কৃষ্ণকমলের দাদা রামকমল ভট্টাচার্য, যিনি ছিলেন সেকালের নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ‘সংবাদ প্রভাকর’ কাগজে একসময় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ করেই আত্মহত্যা করে বসলেন ১১ জুলাই, ১৮৬০ তারিখে। বিহারীলাল লিখছেন:

যে দাদা বড়ই বাসিতেন ভাল,
সব আব্দার যাঁহার ঠাঁই;
যে দাদা বংশের সমুজ্জ্বল আলো,
সে দাদা এখন বাঁচিয়ে নাই।^{২৬}

সেই ‘আত্মহত্যা’ সর্গের একেবারে শেষ স্তবকে কবি বিহারীলাল সুরবালাকে বললেন:
বস তবে, আজি আসি অভাগিনী,
পোড়া বিধি যদি না লাগে বাদে;
সখার প্রেমের করুণ কাহিনী
শুনাব তোমারে মনের সাধে।^{২৭}

এইখানেই শেষ হয়েছে ‘সুরবালা কাব্যে[র] আত্মহত্যা নামক তৃতীয় সর্গ’ এবং ‘প্রথম ভাগ’।
সুরবালা কাব্যের ‘দ্বিতীয় ভাগ’ আর ‘অবোধ-বন্ধু’র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার ‘৩য় ভাগ[বর্ষ]’, ১ম সংখ্যা’ অর্থাৎ বৈশাখ, ১২৭৬ সংখ্যার প্রথম থেকে সপ্তম পৃষ্ঠা জুড়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখছেন, ধারাবাহিক ‘নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত।’ আর ঐ একই সপ্তম পৃষ্ঠাতেই বন্ধু বিহারীলাল শুরু করছেন, ‘সুরবালা কাব্য। প্রথম ভাগ। প্রথম সর্গ।’- একই পৃষ্ঠায় দুই অভিন্নহৃদয় লেখকের সহাবস্থান। এইকারণেই মাসিক বসুমতী পত্রিকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-এর ‘অবিচ্যুয়ারি’ বা ‘শোক-সংবাদ’-এ লেখা হয়েছে:

‘অবোধবন্ধু’ মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী। আর তাঁহার [বিহারীলালের] সর্বস্বধন লেখক ছিলেন- কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহারই [কৃষ্ণকমলেরই] প্রতিভার বিভিন্নমুখী বিকাশে অবোধবন্ধু নূতনত্বে মণ্ডিত হইত।^{২৮}

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুরবালা কাব্য কোনদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গসুন্দরী’ কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। এর ঠিক বছর দশেক পরে ১৮৮০তে ঐ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। সেই বইয়ে বিহারীলাল ‘অবোধ-বন্ধু’তে প্রকাশিত ‘সুরবালা কাব্য’, প্রথম ভাগ’ সবটাকেই জুড়ে দিলেন ‘সুরবালা সর্গ’ হিসেবে। সুরবালা ছিল কাব্য। হয়ে গেল ‘বঙ্গসুন্দরী’ কাব্যের একটি সর্গ। সেই দ্বিতীয় সংস্করণ ‘বঙ্গসুন্দরী’র যে বইটা কৃষ্ণকমলের সংগ্রহে ছিল, সেই বইয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখে রেখেছিলেন:

এই সখা তাঁহার [বিহারীলাল চক্রবর্তীর] বাল্যকালের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। এই ক-একটি পদ্যপঙ্ক্তি কৃষ্ণকমল নিজের certificate -এর মতন জ্ঞান করেন এবং value করেন। বেহারীর পদ্য যদি স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের নামটাও টেকে যাবে, এই লোভে কৃষ্ণকমল এই টিপ্সনীটি সংযোজন করিয়া রাখিলেন।^{২৯}

নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে ফিরে কৃষ্ণকমল

ডভটন কলেজের ছাত্ররূপে জর্জ স্মিথের নিকট ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময় ফরাসী ভাষাও তিনি অনুশীলন করেন এবং উহাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কৃতি হন।^{৩০}

কৃষ্ণকমল ছিলেন ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁতের শিষ্য। নামজাদা পজিটিভিস্ট। দার্শনিক অগাস্ট কোঁত পৃথিবীর ভালো ভালো বই বেছে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘পজিটিভ লাইব্রেরি’। এই লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছিল Jacques Henri Bernardin de Saint Pierre



(১৭৩৭-১৮২৪) রচিত Paul et Virginie উপন্যাস (১৭৮৮)। ফরাসি শেখার ফলশ্রুতি হিসেবে, বিহারীলাল সম্পাদিত ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকায় পৌষ-চৈত্র, ১২৭৫ এবং পৌষ-চৈত্র, ১২৭৬ সংখ্যা গুলিতে টানা আটমাস ধরে প্রকাশিত হয়েছিল কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনুদিত ‘পৌল ভজ্জীনী’। এই অনুবাদ প্রায় এক নিঃশ্বাসে পড়েছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ। ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকার গদ্য হিসেবে ‘পৌল ভজ্জীনী’কেই মনে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘জীবনস্মৃতি’র পত্রিকাপাঠে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

এই অবোধ-বন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলভজ্জীনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা ভজ্জীনের সঙ্গে সেই দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল!^{৩১}

এইভাবে ‘প্রতুষের শুকতারা’ অর্থাৎ ‘অবোধ-বন্ধু’ পত্রিকা এবং সেকালের দুইজন অভিন্নহৃদয় বন্ধু মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছেন। এইকারণেই ‘বিহারীলাল’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তী আর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য- এই দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে এক সূত্রে গাঁথে দিয়ে আরও বললেন:

পাঠকদিগকে এইরূপে বিশুদ্ধভাবে আপনার নিকটে টানিয়া আনিবার ভাব প্রথম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পৌলভজ্জীনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।^{৩২}

উল্লেখপঞ্জি:

- ১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ: বিহারীলাল: সাধনা পত্রিকা: আষাঢ়, ১৩০১: পৃষ্ঠা: ১২৭
- ২। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ: বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮): বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা: প্রথম সংস্করণ: মাঘ, ১৩৪২, নতুন সংস্করণ: মাঘ, ১৩৫৪: পৃষ্ঠা: ১৮৪
- ৩। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ: বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮-১৮৬৭: বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ২ বন্ধিমা চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা: প্রথম প্রকাশ: চৈত্র, ১৩৫১: পৃষ্ঠা: ৭২
- ৪। মজুমদার কদারনাথ শ্রী: বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য: প্রথম খণ্ড: প্রকাশক: মজুমদার নীরেন্দ্রনাথ শ্রী, Research Home, Mymonsingh: প্রকাশকাল: আষাঢ়, ১৩২৪: পৃষ্ঠা: ৪১২
- ৫। অবোধ-বন্ধু পত্রিকা: ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা: ফাল্গুন, ১২৭৩ সাল: পৃষ্ঠা: ১
- ৬। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ: বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮): পৃষ্ঠা: ১৮৪
- ৭। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ: বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮): পৃষ্ঠা: ১৮৪
- ৮। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ: বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮-১৮৬৭: পৃষ্ঠা: ৭২
- ৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ: বিহারীলাল: সাধনা পত্রিকা: আষাঢ়, ১৩০১ সংখ্যা: পৃষ্ঠা: ১২৬
- ১০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ: জীবনস্মৃতি: প্রবাসী পত্রিকা, মাঘ, ১৩১৮ সংখ্যা: পৃষ্ঠা: ৩১৪-৩১৫

- ১১। চক্রবর্তী বিহারীলাল: প্রিয় সখা: অবোধ-বন্ধু পত্রিকা: শ্রাবণ, ১২৭৪ সংখ্যা: পৃষ্ঠা: ২৩৫
- ১২। অবোধ-বন্ধু পত্রিকা: আশ্বিন, ১২৭৬ সংখ্যা: পৃষ্ঠা: ১৩৯
- ১৩। ঐ, পৃষ্ঠা: ১৩৯
- ১৪। চক্রবর্তী বিহারীলাল: সুরবালা কাব্য: প্রথম ভাগ, প্রথম সর্গ, নায়িকা: অবোধ-বন্ধু পত্রিকা: বৈশাখ, ১২৭৬ সংখ্যা: পৃষ্ঠা: ১০
- ১৫। ঐ, পৃষ্ঠা: ১১
- ১৬। চক্রবর্তী বিহারীলাল: সুরবালা কাব্য: প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সর্গ, কল্পনা: অবোধ-বন্ধু পত্রিকা: জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৬: পৃষ্ঠা: ৩৮
- ১৭। ঐ, পৃষ্ঠা: ৩৮
- ১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ শ্রী: কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা: প্রকাশকাল: ফাল্গুন, ১৩৪৬: পৃষ্ঠা: ৭
- ১৯। ঘোষ স্বপন: স্বপন ঘোষের অপ্রকাশিত কৃষ্ণকমল: সম্পাদনা: সত্যদাস মংগল: গিরিধারী প্রকাশন, ২৯ রাজেন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, কলি-৩৫: প্রকাশকাল: ২৯ মে, ১৯৮৩: পৃষ্ঠা: ১০
- ২০। লেখক অজ্ঞাত: আচার্য কৃষ্ণকমল: রিপন কলেজ ল ম্যাগাজিন: বরেণ্য চরিত: ভট্টাচার্য বটুকনাথ শ্রী অধ্যাপক: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬: প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬: পৃষ্ঠা: ১৫৩
- ২১। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ শ্রী: কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য: পৃষ্ঠা: ৭
- ২২। চক্রবর্তী বিহারীলাল: সুরবালা কাব্য: প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সর্গ, কল্পনা: অবোধ-বন্ধু পত্রিকা: জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৬: পৃষ্ঠা: ৩৮
- ২৩। ঐ, পৃষ্ঠা: ৩৮
- ২৪। ঐ, পৃষ্ঠা: ৪১
- ২৫। ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৩
- ২৬। চক্রবর্তী বিহারীলাল: সুরবালা কাব্য: প্রথম ভাগ, তৃতীয় সর্গ, আত্মহত্যা: অবোধ-বন্ধু পত্রিকা আষাঢ়, ১২৭৬: পৃষ্ঠা: ৫৯
- ২৭। ঐ, পৃষ্ঠা: ৫৯
- ২৮। মাসিক বসুমতী: ১১শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৯: পৃষ্ঠা: ৮৯৫-৮৯৬
- ২৯। পিতৃতর্পণ: গুপ্ত বিপিনবিহারী: ভারতবর্ষ: পৌষ, ১৩২০ সংখ্যা: পৃষ্ঠা: ৭২
- ৩০। লেখক অজ্ঞাত: আচার্য কৃষ্ণকমল: রিপন কলেজ ল ম্যাগাজিন: বরেণ্য চরিত: ভট্টাচার্য বটুকনাথ শ্রী অধ্যাপক: পৃষ্ঠা: ১৫৩
- ৩১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ: জীবনস্মৃতি: প্রবাসী পত্রিকা: মাঘ, ১৩১৮ সংখ্যা: পৃষ্ঠা: ৩১৫
- ৩২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ: বিহারীলাল: সাধনা পত্রিকা: আষাঢ়, ১৩০১, পৃষ্ঠা: ১২৭।

শৈলজানন্দের ছোটোগল্পে দাম্পত্য-জীবন

ইন্দ্রাণী হাজারা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ

মেজিয়া, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৭৬) ছোটোগল্পে দাম্পত্য জীবনের যে বহুমাত্রিক রূপ বর্ণিত হয়েছে, তাই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য। প্রায় চারশোর বেশি ছোটোগল্পের স্রষ্টা শৈলজানন্দের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে করুণা প্রকাশনী যে ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সংকলন প্রকাশ করে, তার ষোলোটি গল্পের মধ্যে তেরোটি গল্প অবলম্বন করে বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হবে। গল্পগুলিতে একদিকে যেমন সহজ সুন্দর দাম্পত্য জীবন অঙ্কিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সন্তানহীনতা, সৌন্দর্যহীনতা ও মানসিক বৈপরীত্যের কারণে দাম্পত্যে কীভাবে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়, সে ছবিও চিত্রিত হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কে অবহেলায় স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান, আত্মহত্যার মতো ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে কোনো গল্পে। কোথাও আর্থিক বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের ভয়াবহতা বিবাহিত জীবনের প্রেক্ষিত রচনা করেছে। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বাস্তবতাবোধ এবং সহজ অনাড়ম্বর ভাষার সংমিশ্রণে গল্পগুলিতে নর-নারীর দাম্পত্য-জীবন কীভাবে অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আলোচ্য গল্পগুলি অবলম্বন করে তা বিশ্লেষণ করা হবে।

সূচক শব্দ: ‘শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়’, ‘ছোটগল্প’, ‘দাম্পত্য-জীবন’, ‘প্রেম-অপ্রেম’, ‘সন্তানহীনতা’।

মূল আলোচনা: ‘কালিকলম’ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লেখক হলেও সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের থেকে ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রমী। মূলত কয়লাখনি অঞ্চলের ভাষ্যকার হিসেবে তিনি খ্যাত। ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব অনুভূতির সংমিশ্রণে আসানসোল, রানিগঞ্জের কয়লাখনিতে কর্মরত প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করে বাংলা সাহিত্যে তিনি এক ভিন্ন ধারার প্রবর্তন করেন। কৈশোরজীবনের অনেকখানি সময় রানিগঞ্জে মাতুলালয়ে কাটানোর সুবাদে কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার নামহীন, অন্ত্যজ কুলিমজুরদের জীবনের সংগ্রামের কাহিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত হয়েছে। কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় ‘কয়লাকুঠি’ গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে তাঁর সুনাম প্রচারিত হয়। তারপর ‘কল্লোল’, ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘সংহতি’, ‘বিজলী’ প্রভৃতি সমকালীন বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসাধন্য এই শিল্পী মানুষটি ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত। প্রায় চারশোর বেশি ছোটোগল্প ও প্রায় পৌনে তিনশো উপন্যাসের রচয়িতা শৈলজানন্দ কৃতিত্বের সঙ্গে দীর্ঘ সময় চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ‘নিঃস্ব, রিক্ত বসিষ্ঠ জনতার প্রথম প্রতিনিধি’ বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের জীবনীকার

বাঁধন সেনগুপ্তের মতে লেখকের গল্প সংকলনের সংখ্যা একত্রিশ। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর রচিত গল্পই মূলত আমাদের বিবেচ্য।

তাঁর ছোটগল্পগুলির অভিমুখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কয়লাখনি অঞ্চলের কাহিনি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সমাজ, সাধারণ মানুষ, তাদের দৈনন্দিন সমস্যা তাঁর লেখায় সমানভাবে স্থান করে নিয়েছে। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের চরিত্র, তাদের মানসিক জটিলতা, নর-নারীর সম্পর্কের রসায়ন, আর্থ-সামাজিক বিপন্নতা, জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় দার্শনিক অনুভব - তাঁর গল্পগুলিকে পাঠকের দরবারে আদৃত করেছে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যতর প্রাণীরাও তাঁর গল্পে সুগভীর মমতায় চিত্রিত হয়েছে। বিস্মৃতপ্রায় লেখকের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে প্রকাশিত ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সংকলনের (করুণা প্রকাশনী) ভূমিকায় লেখকের জীবন ও সাহিত্যের গবেষক বুদ্ধদেব দাস বলেন, “সুগভীর বাস্তবতাবোধ, নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি মমতা, নারীজীবনের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি অপার সহানুভূতি এবং বর্ণনা ও ভাষার সুম্যমগুণিত গতি”^১ হল শৈলজানন্দের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত গল্প-সংকলনটিতে বিভিন্ন রসাস্বাদের ষোলোটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগুলি ১৩৩১ থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যে ‘ভারতবর্ষ’, ‘কালিকলম’, ‘প্রবাসী’ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলিতে নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি বিশেষ দিক লক্ষ করা যায়, তা হল নর-নারীর দাম্পত্য-জীবন। সহজ ভাষায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এই কথাকার তাঁর অধিকাংশ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণির নর-নারীর দাম্পত্য-জীবনের বিচিত্র দিককে রূপদান করেছেন।

সমাজের যে-কোনো শ্রেণির মানুষের প্রাত্যহিক যাপন, তার অন্তরঙ্গ সুখ-অসুখ, মানসিক দ্বন্দ্ব-জটিলতা সমানভাবে লেখকের সাবলীল লেখনীতে সুপরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। আর্থিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অনুষঙ্গে তিনি সহজ দক্ষতায় কাহিনি বুনেছেন। শ্রেণিগত তারতম্যের মতোই লিঙ্গ-বৈষম্যের ভয়াবহ দিকটিও তাঁর লেখায় বর্ণিত হয়েছে। কোথাও দাম্পত্য জীবনের উপরেই প্রধানত আলোকপাত করা হয়েছে, কোথাও প্রসঙ্গক্রমে গল্পের অংশ হিসেবে তা বর্ণিত হয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে উচ্চবিত্ত সচ্ছল পরিবারের দাম্পত্য চিত্রের পাশাপাশি রয়েছে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত দাম্পত্যের ছবি। কখনও সন্তানহীনতা, কখনও সৌন্দর্যহীনতা, কখনও মানসিক বৈপরীত্য, কখনও নারীবিরোধ - দাম্পত্যজীবনে কীভাবে দোলাচল সৃষ্টি করে, তা বিভিন্ন কাহিনির বয়ানে চিত্রিত হয়েছে। তবে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবনের শোচনীয় পরিণতির সঙ্গে সরস প্রেমময় দাম্পত্য রসায়নের গল্পও অনেক কাহিনির প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। কীভাবে শৈলজানন্দের ছোটগল্পে নর-নারীর দাম্পত্য-জীবন রচনাগুণে অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আলোচ্য গল্পগুলি অবলম্বন করে আমরা তা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব।

জনৈক সমালোচক শৈলজানন্দের ছোটগল্পে দাম্পত্য-জীবনকে সরস ও ট্রাজিক - এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি প্রেম-বিশ্বাস-নির্ভরতা যে সরস সুখী দাম্পত্য নির্মাণ করে, সেই সহজ সমীকরণ প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের আলোচ্য বেশ কয়েকটি গল্পে। আলোচনার প্রথম পর্যায়ে আমরা সেই দিকটির উপর আলোকপাত করব। গল্পগুলি হল - ‘কৃষ্ণা’, ‘জনম-ঋণী’, ‘হতভাগা’, ‘মারণ-মন্ত্র’ ও ‘পোড়ারমুখী’। পাঁচটি গল্পে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর আধারে পাঁচজন দম্পতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। ঘটনাচক্রে তারা সকলেই নিঃসন্তান। কিন্তু সন্তানহীনতা তাদের মধ্যে কোনো নিঃসঙ্গতা বা মনোমালিন্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে বাৎসর্য ও মমতার সংমিশ্রণ



ঘটেছে। ‘পোড়ারমুখী’ গল্পে পোড়ারমুখী নামী বিড়ালটির বাৎসল্য কাহিনির মুখ্য বিষয় হলেও বিড়ালটির প্রতি কথকের সন্তানহীনা স্ত্রীর বাৎসল্য সমানভাবে ফুটে উঠেছে। আর পোড়ারমুখীর বিহনে স্ত্রীর মনোবেদনা দূর করতে বেড়াল বাচ্চাটির সন্ধানে আদালতের কাজ বাদ দিয়ে কথক যেভাবে সচেতন হয়েছেন, তাতে নিঃসন্তান স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রশয় ও বাৎসল্যের দিকটিও স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।

‘হতভাগা’ গল্পে নিঃসন্তান বাসন্তীর অনাথ বোনপোটিকে নিজের সংসারে পাকাপাকিভাবে নিয়ে আসা নিয়ে বা পরে তাকে কেন্দ্র করে বাসন্তীর স্বামীর কোনো আপত্তি চোখে পড়ে না। বরং স্বামীর বিধবা বোনের সন্তানকে তাদের সংসারে নিয়ে আসার ব্যাপারে পূর্বে আপত্তি দেখানোয় বাসন্তী নিজেই কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। স্ত্রীর সকল সিদ্ধান্তে নীরব সম্মতিতে স্ত্রীর প্রতি বাসন্তীর স্বামী রমেনের অনুচ্চারিত ভালোবাসা ও উদারতা অনুভূত হয়। ‘জনম-ঋণী’ গল্পে নিবারণের অলস অকর্মণ্য বাবা অর্থ ও গহনার লোভে খেঁদুরানির চেহারা অসুন্দর হওয়া সত্ত্বেও বিবাহে সম্মতি দান করে প্রথমদিকে নিবারণের বিরাগভাজন হয়। কিন্তু গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় স্বামীর প্রতি মাতৃহীনা সরলমনা কিশোরী খেঁদুরানির আনুগত্য ও নিঃশর্ত সমর্পণে অসুন্দর স্ত্রীর প্রতি নিবারণের স্নেহের উদ্রেক হয়। নিবারণের অবচেতনে হয়তো তার মা-বাবার খেঁদুর গহনাগুলি ঠকিয়ে আত্মসাৎ করার গ্লানি কিছুটা অপরাধবোধ তৈরি করে।

‘কৃষ্ণা’ ও ‘মারণ-মন্ত্র’ গল্পে দুটি সহৃদয়, মানবিক, পরোপকারী ও সমমনস্ক দম্পতির পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের সম্পর্কের স্বাভাবিকতা পাঠককে নর-নারীর শাশ্বত ভালোবাসায় বিশ্বাসী করে। ‘মারণ-মন্ত্র’ গল্পের শেষে কানুনগো সাহেব তাঁর দরিদ্র কর্মচারী ভীমের আত্মহত্যা ও একটি নির্যাতিতা নারীকে রক্ষা করার ঘটনা তাঁর পত্নীকে চিঠিতে লেখেন। গল্পটিতে নারীজাতি তথা আর্ত অসহায় মানুষের প্রতি কানুনগো সাহেবের অতীব সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আন্তরিক ক্রিয়াকলাপ ও ওঁদারের উৎস কিছুটা যে তাঁর প্রেমময় দাম্পত্যে নিহিত ছিল, তা তাঁর পত্রের ভাষ্যে অনুভব করা যায়। পীড়িতের যত্নণায় সমব্যথী মানুষটি পত্রের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ের ভার লাঘব করেছেন স্ত্রীর কাছে, “প্রতি ডাকে তোমায় চিঠি না লিখিলে ব্যথা পাও তাই চিঠিখানি লিখিতেছি।”^২ ‘কৃষ্ণা’ গল্পেও কৃষ্ণাদের বাড়িতে ভাড়া নেওয়া কথক ও তাঁর স্ত্রীর মানবিক আচরণের পিছনে একই কারণ অনুভূত হয়।

দাম্পত্য সম্পর্কে যথাযথ মনোযোগের অভাবে কীভাবে নিঃসঙ্গতা ও ব্যবধান রচিত হয়, কীভাবে তা করুণ পরিণামের দিকে ধাবিত হয়, তার প্রকৃষ্ট রূপ হল ‘বদলি মঞ্জুর’ গল্পটি। ছোটো একটি স্টেশনের সর্বময় কর্তা হরিপদর নিঃসন্তান স্ত্রী বীণাপানি একাকিত্বের বেদনায় স্বামীর বদলি মঞ্জুর হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। দিন দুয়েকের জন্য বেড়াতে আসা দূর সম্পর্কের দেওর সুকুমারের উজ্জ্বল উপস্থিতি তার একাকিত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে জংশন স্টেশনে হরিপদর বদলি মঞ্জুর হলেও দীর্ঘদিনের অবসাদে তৈরি হওয়া বীণার অসুস্থতা আর সারে না। বীণার মৃত্যুর পর তার বাক্স খুলে সুকুমারের উপহার দেওয়া আলতা আর সুকুমারকে লেখা বীণার চিঠি দেখে হরিপদর দীর্ঘশ্বাসে তাদের দাম্পত্যে অন্তর্ভুক্তি দূরত্বের আভাস মেলে। “গল্পটি কর্মব্যস্ত সংসার ও স্ত্রীর ভাবনাহীন স্বামীর প্রেমবোধ ও স্ত্রীর নিঃসঙ্গতার অসহায়তাবোধ – দুয়ের মধ্যকার প্রেমভাষ্যের সত্য চিত্র।”^৩

শৈলজানন্দের সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বারবার। নারীর অসহায়তা, নিপীড়ন, পারিবারিক তথা সমাজ স্বীকৃত দাম্পত্য-জীবনে শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হওয়া – বিভিন্ন গল্পে এই দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন লেখক। এই পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ গল্প ‘নারীমেধ’। কয়লাখনি অঞ্চলের এই কাহিনীতে কয়লার ব্যবসায়ী পরাশর-নয়নতারার সংসারে নয়নতারার চরিত্রহীন ভাই পঞ্চুর আধিপত্য চলে দিদির প্রশ্নে। নিঃসন্তান স্ত্রী মায়ার চোখের সামনেই একপ্রকার বাড়ির পরিচারিকা অকালবিধবা যুবতী ছবিকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে গর্ভবতী করে পঞ্চু, তারপর পাপ লুকিয়ে ফেলতে তাকে অকালে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। সন্তানহীনতার অজহাতে লম্পট স্বামী ও তার দিদির সংসারে চূড়ান্ত অবহেলা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয় মায়ী। তবু অসহায় সামাজিক অবস্থানের কারণে মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে না পেরে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছবির মৃতদেহ খাদে ফেলে এসে নিলজ্জভাবে ভগ্নিপতির উপর কৃতকর্মের দায় চাপিয়ে দিয়ে স্বামীত্বের অধিকারে স্ত্রীকে কাছে টানে পঞ্চু, “এখানে অসহায় নারীর উপরে অত্যাচারের (পাশবিক) পাশাপাশি নারীত্বের অবমাননার যে চিত্র দেখানো হয়েছে তাতে গল্পটি সর্বকালীন আবেদন লাভ করেছে বলা যায়।”^৪

লেখকের নাগরিক জীবনভিত্তিক সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন হল ‘ধ্বংসপথের যাত্রী এরা’। এই গল্পে গ্রাম ছেড়ে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় আসা অজিত মেসবাড়ির পাশে বস্তিবাসী বালিকা অতসী ও তার মাকে জানতে পারে। অতসীর মা-বাবার দাম্পত্যের সরাসরি বর্ণনা না থাকলেও অতসীর মন্তব্যে ও মা-মেয়ের নিদারুণ অভাব-বিধ্বস্ত জীবনের মধ্যে এক অস্বাভাবিক দাম্পত্যের ইঙ্গিত মেলে। অতসীর বাবা তাদের ছেড়ে অন্যত্র থাকে ও মেয়ে অনাহারের জ্বালায় বাবার কাছে গেলে তাকে প্রহার করে তাড়িয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে অতসীর মাকে বোবা সেজে ভিক্ষায় বের হতে হয়। ‘দুঃস্বপ্ন’ গল্পে ডাক্তারের বাড়ির প্রৌঢ় রাঁধুনি সদানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুন্দরী যুবতী আরতি। সদানন্দের জবানিতে জানা যায়, বিবাহের পূর্বে পুরুষের পাশবিক লালসার শিকার হওয়া মেয়েটিকে টাকার বিনিময়ে বিবাহে রাজি হয়ে উদ্ধার করেছে সে। সদানন্দের সুযোগসন্ধানী ব্যবহারে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, স্ত্রীর সৌন্দর্যকে সে ডাক্তারের কাছে আর্থিক নিরাপত্তার টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। আরতি শেষ পর্যন্ত খুন হয়।

প্রেমহীন গতানুগতিকতায় আচ্ছাদিত দাম্পত্যে পাঁচ সন্তানের জননী ক্ষয়জীর্ণ দেহ-মন নিয়ে কীভাবে রুগ্ন সংসারের ঘানি টেনে চলে, তার করুণ ছবি অঙ্কিত হয়েছে ‘এই জীবনের পাওয়া’ গল্পে। আর এক প্রেমহীন দাম্পত্যের ছবি রয়েছে ‘মারণ-মন্ত্র’ গল্পে। সেখানে কানুনগো সাহেবের কাছে জামাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে মহামায়ার বিধবা মা। তরুণী মেয়েটির মূর্ছার অসুখে বিরক্ত বৃদ্ধ স্বামী তাকে মিথ্যে চারিত্রিক বদনাম দেয় ও নিয়মিত প্রহার করে। অন্যদিকে বিধবা শাশুড়ির জমিখানি নিজে দখল করতে চায়। সাহেবের বিচারে মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে মহামায়া জানায় তাকে আবার কখনও ফেরৎ পাঠালে সে আত্মহত্যা করবে। নারীর অবস্থানজনিত অসহায়তার জন্য খুন হয় আরতি, আত্মহত্যা করার হুমকি দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করতে চায় মহামায়া, আর কেউ আবার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় সুতীব্র আঘাতে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার পথই বেছে নেয়। ‘অতি ঘরস্তী না পায় ঘর’ গল্পে নিঃসন্তান সুখমা স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ সেবা ও অখণ্ড মনোযোগ সত্ত্বেও গ্রামের বান্ধবীর লেখা চিঠিতে জানতে পারে গোপনে তার স্বামী হরিশ দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। নারীত্বের পরাভবে সুগভীর অভিমানে সন্তানসম্ভবা সুখমা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।



‘নারীমেধ’সহ এই ছয়টি গল্পে অসুখী দাম্পত্য জীবনে নারীর করুণ অসহায় অবস্থানটি বর্ণনা করেছেন লেখক। তবে তাঁর প্রকাশভঙ্গি বিস্ময়করভাবে নিরাসক্ত। “নারী জীবনের অসহায়তা ও বিড়ম্বনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁর নিজের চোখ কোথাও অশ্রুসজল হয়নি, কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে সমবেদনা প্রকাশ করেননি। কেবল নারী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর রূপটি যেন অধরৌষ্ঠ রুদ্ধ করে কঠিন সংযমের সঙ্গে, স্বল্পতম বর্ণনা ও মন্তব্যের সাহায্যে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।”^৫

নিঃস্ব-রিক্ত-বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক বলে পরিচিত শৈলজানন্দ প্রথমাবধি অনামী প্রান্তিক মানুষের অবমাননায় সমবেদনা অনুভব করতেন। তাই নারীর দুঃখ-দুদর্শার পাশেই দারিদ্র্য জর্জরিত সংসারে বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় জীবনবিমুখ পুরুষের ছবিও তাঁর রচনায় এসেছে। ‘মারণ মন্ত্র’ গল্পে কানুনগো সাহেবের কর্মচারী শীর্ণ দুর্বল দারিদ্র্যপীড়িত ভীম মুচি তার নির্মল সুন্দর হাসিটির জন্য মনিবের স্নেহভাজন ছিল। তার হাসিটি অটুট রাখতে তিনি ভীমের সংসারের দেনা মেটানোর টাকা দেন। কিন্তু ভীমের কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কুচক্রী দাদা সুধন ও তার স্ত্রী সে টাকা চুরি করে নেয় ও ভীমকে সমূহ বিপদে ফেলে। তাদের মিথ্যে উস্কানিতে উত্বেকিত হয়ে এবং অভাবের তাড়নায় ভীমের মতো নিরীহ সংযমী পুরুষটিও আদরের স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে। প্রবল অভিমানে তার স্ত্রী অন্য সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে ত্যাগ করে যায়। স্ত্রী চলে যাওয়ার বেদনায়, দাদা-বৌদির কৃতঘ্নতায় নিরুপায় ভীম মুচি আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়ায়। ভীম মুচির দাম্পত্য জীবনের এই করুণ পরিণতির পিছনে সামাজিক অনুশাসন, অপরিসীম দারিদ্র্য ও কাছের মানুষের প্রতারণা কীভাবে কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা লেখক এখানে দেখিয়েছেন।

‘বধু-বরণ’ গল্পে মাতৃহীন ননীমাধবের বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় মামারবাড়িতে মামিমার স্নেহহীন আশ্রয়ে ও গ্রামের বিবাহিত তরুণীদের সাহচর্যে কৈশোর কাটে ননীমাধবের। মামিমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি পালিয়ে এলে চপল স্বভাবা কমবয়সী বিমাতার কামনামন্দির আচরণ তাকে আবার গৃহহীন করে। নারীর স্বাভাবিক বাৎসল্য থেকে আজীবন বঞ্চিত ননীরা অন্তরে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় যে নারীবিদ্বেষ তৈরি হয়, তা তার স্বাভাবিক দাম্পত্যে অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি করে। পরিচয় গোপন করে, বিয়ে করে, গ্রামের সরল সহজ কিশোরী গৌরীকে প্রতারণা করে সে সমস্ত নারীজাতির প্রতি আজীবনের ক্ষোভের প্রতিশোধ নিতে চায়। বিশ্বাসের যে বুনিনাদে সুখী বিবাহিত জীবন গড়ে ওঠে, স্ত্রী গৌরীর প্রতি নিজের মানসিক জটিলতার কারণে সেই বিশ্বাস কখনও গড়েই ওঠে না ননীরা। ভীত, অনুগত, তার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল স্ত্রীকে ছলনা করে, তার সমস্ত অলংকার খুলে নিয়ে, মাঝরাত্রে একাকী স্টেশনে তাকে পরিত্যাগ করে এসে পৈশাচিক আনন্দ পায় সে। কিন্তু তার পরের অংশেই তার মানসিক পরিবর্তনের আভাস দেন লেখক। নিষ্পাপ গৌরীর ভালোবাসার পিছুটানে সে উল্টোদিকের ট্রেন ধরে আবার ফিরে আসতে চায়, “এতদিন পরে সত্যি তাহার মনে হইতে লাগিল, নিখিল-ব্যাপী এই বিরাট মিথ্যাচারের বাহিরে সত্য বস্তু হয়তো বা কোথাও কিছু থাকিতেও পারে।”^৬ এইভাবে মানুষের শুভবোধে আস্থা ও এক স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের পূর্বাভাস দিয়ে গল্প সমাপ্ত হয়েছে।

এছাড়া গল্পগুলির মধ্যে বিবাহিত দম্পতিদের আর একটি দিক লক্ষণীয়, সেটি হল স্বামী-স্ত্রীর অসততায় গাঁটছড়া বাঁধা। ‘মারণ-মন্ত্র’ ও ‘জনম-ঋণী’ গল্পদুটিতে এইরকম দুই-জোড়া দম্পতির ছবি পাওয়া যায়, যারা চূড়ান্ত স্বার্থপরতায় নিজেদের হিতার্থে নিকট আত্মীয়ের

অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। তাদের মিথ্যাচারের পিছনে দারিদ্র্য ও রোগগ্রস্ততা থাকলেও, তাদের মানসিকতার কুটিল দিকটি চাপা থাকে না। ‘মারণ-মন্ত্র’ গল্পে ভীম মুচির দাদা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত সুধন ও তার স্ত্রী অন্যায়ভাবে ভীমের স্ত্রীর নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ভাইয়ের দাম্পত্য বিনষ্ট করে। উপরন্তু তাদের প্রতি ভীমের আন্তরিকতা ভুলে গিয়ে কানুনগো সাহেবের দেওয়া টাকা চুরি করে নিয়ে ভীমকে সর্বস্বান্ত করে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়। ভীমের প্রতি চরম অন্যায় করলেও তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে মজবুত বাঁধন লক্ষিত হয়। একইভাবে ‘জনম-ঋণী’ গল্পে নিবারণের বাবা চিন্তাহরণ ও সৎ-মা সুরধুনী নিবারণের স্ত্রী খেঁদুরানির সঙ্গে ছলনা করে তার বাবার দেওয়া সমস্ত গহনা আত্মসাৎ করে। মাতৃহীন খেঁদুকে ভালোবাসার অভিনয় করে ভুলিয়ে যেভাবে তারা প্রতারণা করে, তা লেখকের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দুটি গল্পেই এই অসাধু দম্পতির আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রিয়জনের বিশ্বাসভঙ্গ করে তার সর্বনাশ ঘটাতে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে।

দাম্পত্য কলহ নিয়ে একটি বহুল পরিচিত প্রবাদ হল, “অজায়ুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘাডম্বরে / দাম্পত্যকলহে চৈব, বহ্নারস্ত্রে লঘুক্রিয়া।” অর্থাৎ দাম্পত্য কলহ আপাতভাবে বিরাট মনে হলেও বাস্তবিক অর্থে তা হয় না। এই প্রচলিত দার্শনিক সত্যটির অন্যতম সার্থক চিত্রায়ণ হল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘অসমাপ্ত’ গল্প। কথক-লেখক বন্ধুকে দরিদ্র পোস্ট-মাস্টার রাখাল তার জীবন নিয়ে গল্প লিখতে বলে। গল্পছলে গৃহিণীর কলহপ্রবণতা নিয়ে বন্ধুকে বারংবার অজস্র অভিযোগ জানায় রাখাল মাস্টার। আপাতভাবে তাদের দাম্পত্য-কলহ ও অশান্তির আবহ গল্পে ঘুরেফিরে আসে। কিন্তু তাদের দাম্পত্যের মাধুর্যের দিকটি কথকের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, যখন সাঁওতাল যুবক মুংরিরা আনা খরগোসের মাংস গৃহিণীর প্রিয় হলেও কিনতে অসমর্থ হওয়ায় তার কণ্ঠে হতাশা প্রকাশিত হয়। অসচ্ছল আর্থিক পরিস্থিতিতেও তার স্ত্রীর সততা ও নীতিবোধ রাখাল মাস্টারকে ঘিরে রাখে। সর্বোপরি গল্পের শেষদিকে লেখক বন্ধুর প্রতি তার বিশেষ অনুরোধে তাদের দাম্পত্য-কলহের অন্তরালে থাকা প্রগাঢ় প্রেম পরিস্ফুট হয়, “দ্যাখ, আমার গল্পের ভিতর সেই যে এক জায়গায় লিখেছি - ও আমাকে ভালোবাসে না, ওটা কেটে দিস।”^৭

এইভাবে “সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সহজলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বন্দ্ব জটিলতাহীন জীবনের চালচিত্র এঁকে দেন শৈলজানন্দ তাঁর ছোটগল্পে।”^৮ নর-নারীর বিবাহিত জীবনের সুখ-অসুখ, প্রেম-অপ্রেম, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব শিল্পীর সহজ ভাষার বুনোটে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। চারপাশের জানা-অজানা মানুষগুলির অন্তরঙ্গ পরিসরে আলো ফেলে তাদের পাঠকের কাছে একান্ত পরিচিত করে নির্মাণ করেন লেখক। মানুষের সংসারে মিলনের মাধুর্য ও অমিলের বৈপরীত্য যে পাশাপাশি অবস্থান করে, তা লেখকের বিভিন্ন গল্পে রূপায়িত দাম্পত্য-জীবনচিত্রে অনায়াসে প্রতীয়মান হয়।

তথ্যসূত্র:

- ১। মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, ২০২২, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ভূমিকা।
- ২। তদেব, পৃ. ৮২।
- ৩। দত্ত, বীরেন্দ্র, “শৈলজানন্দের ছোটগল্পে প্রেম-অপ্রেম”, পশ্চিমবঙ্গ: শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ঘোষ তারাপদ ও অজিত মণ্ডল (সম্পাদ.), ১৪০৭, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৩১-৩৫, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, পৃ. ৬৮।



- ৪। চক্রবর্তী, সন্তোষ, “জীবনের দর্পণে: শৈলজানন্দের ছোটগল্প”, প্রান্তিক, পৃ. ২৮।
- ৫। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, ২০১৮, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২২৯।
- ৬। মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, ২০২২, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ৭৩।
- ৭। তদেব, পৃ. ১৬৮।
- ৮। চক্রবর্তী, সন্তোষ, “জীবনের দর্পণে: শৈলজানন্দের ছোটগল্প”, পশ্চিমবঙ্গ: শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ঘোষ তারাপদ ও অজিত মণ্ডল (সম্পা.), ১৪০৭, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৩১-৩৫, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, পৃ. ২৩।

ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং লিঙ্গ ন্যায়বিচার : একটি

পর্যালোচনা

মৃণাল দাস

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় সংবিধানে একটি সার্বিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতীয় সংবিধানে মূল লক্ষ্যই ছিল ভারতকে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং আইন কর্তৃক সমানভাবে রক্ষিত হবে। সেই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি নির্দেশমূলক নীতিসমূহতেও বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এত উদ্যোগ ও আয়োজন সত্ত্বেও, নারীরা আজও বৈষম্য ও অন্যায়ে স্বীকার। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও নারীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আইন দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্য ও অবিচারের স্বীকার হয়ে চলেছে। নারীদের প্রতি এই দীর্ঘ বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মাধ্যমে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, দত্তক ও সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন বাতিল করে সবার জন্য এক ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন না করলে এই বৈষম্যের অবসান ঘটবে না এবং ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধে ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের সঙ্গে লিঙ্গ ন্যায়বিচারের সম্পর্ক, এর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: সংবিধান, সাম্য, লিঙ্গ ন্যায়বিচার, পারিবারিক আইন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।

মূল আলোচনা: সাম্য ও ন্যায়বিচারের দর্শনই ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা ভারতকে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং আইন কর্তৃক সমানভাবে রক্ষিত হবে। সেই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সংবিধানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থান প্রভৃতির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ না করে। মৌলিক অধিকারের উপস্থিতির পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিসমূহের উল্লেখ সেরকমই ব্যবস্থার উদাহরন, যেখানে মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি অংশের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘রাষ্ট্র সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।’ এই আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইন কর্তৃক সৃষ্ট নারীদের প্রতি দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, বৈষম্যের যেমন অবসান ঘটানো সম্ভব হবে, অনুরূপভাবে সমাজে সাম্য ও লিঙ্গ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যাবে।



সংবিধানে সাম্য ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠনের সংকল্প ঘোষিত হলেও, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও সাম্য ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজগঠন এখনও অলীক কল্পনা মনে হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত World Economic Forum এর Global Gender Gap Report (2024) অনুযায়ী লিঙ্গ সমতা সূচকে বর্তমান বিশ্বের ১৪৬ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান গত বছরের থেকে ২ ধাপ পিছিয়ে ১২৯তম (২০২৩ সালে ১২৭তম ছিল)।^১ যদিও প্রতিবেদনটি নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষার অগ্রগতি, এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়িত, তবুও এই সূচকগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে যখন নারীরা তাদের জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে সমান পৌর অধিকারগুলি ভোগ করবে। কিন্তু ভারতে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, দণ্ডক ও সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আজও নিয়ন্ত্রিত হয় পারিবারিক আইনের দ্বারা, যেগুলি প্রকৃতিগতভাবেই পিতৃতান্ত্রিক, নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক। তাই নারী ও লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক বিভিন্ন ধর্মের ও গোষ্ঠীর প্রচলিত পারিবারিক/ব্যক্তিগত আইনগুলিকে বাতিল করে সবার জন্য এক ও অভিন্ন দেওয়ানিবিধি প্রণয়ন না করলে এই বৈষম্যের অবসান ঘটবে না এবং ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠিত হবে না।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি: সাধারণভাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অর্থ হল দেশের সকল সম্প্রদায়ের জন্য এক ও অভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা। বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশ এই ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় আইনি অনুশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সেই ধর্মীয় আইনি অনুশাসন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেশের সকল নাগরিকদের জন্য জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে অভিন্ন আইনগত ব্যবস্থার প্রচলনই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মূল উদ্দেশ্য। এই বিধি শুধুমাত্র পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রেই লিঙ্গ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে না, একইসঙ্গে লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদেরও ন্যায়বিচার দেবে। এই আইন লিঙ্গ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই আইনের প্রবর্তনের অর্থ এই নয়, একমাত্র এর দ্বারাই সমাজে লিঙ্গ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় এই আইন অপরিহার্য।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও আইন সাধারণভাবে দু প্রকার – ফৌজদারি এবং দেওয়ানি আইন। দেশের ফৌজদারি আইন বর্তমানে সম্প্রতি কার্যকরী Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) এবং Bharatiya Sakshya Adhinyam (BSA) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিক এই আইনগুলির অধীন। অপরাধমূলক কাজ করলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী নির্বিশেষে একই ফৌজদারি আইন প্রযোজ্য হয় এবং সেই আইনের আওতায় সবার বিচার এবং সাজা হয়।

দেওয়ানি আইনের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় চুক্তি আইন, দেওয়ানি কার্যবিধি, পণ্য বিক্রয় আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, অংশীদারি আইন ইত্যাদির মতো আইনের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ নাগরিক বিষয়েই একটি অভিন্ন বিধি রয়েছে। ভিন্নতা রয়েছে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দণ্ডক, রক্ষণাবেক্ষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতির দেওয়ানি বিষয়ের ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্র গুলি মূলত নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন দ্বারা। এই আইনগুলি মূলত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত। হিন্দুদের যেমন পৃথক পারিবারিক/ব্যক্তিগত আইন আছে, অনুরূপভাবে মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি এবং অন্যান্যদেরও

নিজেদের ব্যক্তিগত আইন আছে। আবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদেরও (Schedule Tribe) নিজস্ব পারিবারিক আইন আছে।

ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং সেই সম্পর্কিত বিতর্ক বহু পুরনো। মুঘল আমলের পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতেও বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, জাতির নিজস্ব নিজস্ব পারিবারিক আইন ছিল। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর গণপরিষদেও অভিন্ন দেওয়ানিবিধি কি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে? মৌলিক অধিকার নাকি নির্দেশমূলকনীতি হিসেবে? এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। বহু বিতর্কের পর মৌলিক অধিকার বিষয়ক উপ-কমিটি (Advisory Committee on Fundamental Rights) তাদের খসড়া সংবিধানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দিয়ে নির্দেশমূলক নীতি অংশে অন্তর্ভুক্ত করে (যা আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়)। যা পরবর্তীতে মূল সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয় এবং এই ধারায় বলা হয়েছে ‘রাষ্ট্র সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানিবিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করবে’।

অভিন্ন দেওয়ানিবিধি এবং লিঙ্গ ন্যায়বিচার: সাধারণভাবে লিঙ্গ ন্যায়বিচারের অর্থ হল লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকারের নিশ্চিতকরণ। এর লক্ষ্য হল সমাজে উপস্থিত লিঙ্গভিত্তিক সমস্তরকম বৈষম্যের ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে সকলের উন্নতির পথ প্রশস্ত করা।^২

স্বাধীন ভারতের প্রারম্ভিক বছরগুলিতেই লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত আইনগুলির সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যে ১৯৫০ এর দশকে হিন্দু ব্যক্তিগত আইন, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হিন্দু ব্যক্তিগত আইনগুলিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়েছিল। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান এবং সমন্বয়পযোগী করার লক্ষ্যে হিন্দু ব্যক্তিগত আইনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল - হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬, হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন ১৯৫৬, এবং হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন ১৯৫৬।^৩

পরবর্তী দশকগুলিতেও সরকারের অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উপাদানগুলির বাস্তবায়নে বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে দেশের সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৫ সালে দেশের সুপ্রিমকোর্ট শাহবানু মামলায় এক যুগান্তকারী রায়ে ধর্ম নিরপেক্ষ আইনের অধীনে এক তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলার ভরণপোষণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালীন রাজীব গান্ধী সরকার মুসলিম ধর্মীয় নেতৃত্বের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে এই রায়কে বাস্তবায়ন করেনি। উপরন্তু মুসলিম মহিলা (তালাকপ্রাপ্ত অধিকার) আইন ১৯৮৬ প্রণয়ন করে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সাথে সঙ্গে ধর্মীয় নীতিগুলির সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছিল।

১৯৯০ এর দশকে লিঙ্গ ন্যায়বিচার এবং সংখ্যালঘু অধিকারের প্রশ্নে অভিন্ন দেওয়ানিবিধি বিতর্কটি আবারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ১৯৯২ সালে জাতীয় মহিলা কমিশনও লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেই ২০০৩ সালে ভারতের আইন কমিশন ‘পারিবারিক আইনের সংস্কার’ শীর্ষক প্রতিবেদনে লিঙ্গ সমতা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে ব্যক্তিগত আইনগুলিরও সংস্কারের পরামর্শ দেয়।



অভিন্ন দেওয়ানিবিধি প্রণয়ন বর্তমান শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল চর্চিত বিষয় এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠী এর সমর্থনে এবং বিরোধিতায় शामिल হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিতর্কের দুটি দিক রয়েছে। এক দল মনে করে ‘সংবিধানের ৪৪নং ধারার বাস্তবায়ন না করতে পারা হল ‘ভারতীয় গনতন্ত্রের ব্যর্থতা’। অপরদিকে এক দল এই আইনকে ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাভাবিকতার বিরোধী এবং দেশের সংহতির পক্ষে বিপদজনক বলে মনে করে।

যদিও অনেকে যুক্তি দেন যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বা কাম্যও নয়। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, লিঙ্গ ন্যায়বিচার তাদের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনগুলির মধ্যে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই পিতৃতান্ত্রিক এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক। এই অবস্থার পরিবর্তন করে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আইনের অভিন্নতা। সেই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ –

প্রথমত: পূর্বতন আইপিসির (IPC) ৪৯৪ ধারা অনুযায়ী ‘জীবিত স্বামী/স্ত্রী থাকাকালীন যদি কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহলে তা আইনত অপরাধ।^৪ তবে এই আইনের একমাত্র ব্যতিক্রম হল যদি একজন পুরুষ মুসলিম হন, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ চারটি বিবাহ করতে পারেন। আমাদের দণ্ডবিধির ক্ষেত্রেও এটি ব্যতিক্রম হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমান প্রগতিশীল বিশ্ব যখন বিবাহের ক্ষেত্রে একগামী, তখন এক নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বহুগামিতা সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

দ্বিতীয়ত: বর্তমানে হিন্দু মহিলারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সমান অংশ পান, সেখানে মুসলিম মহিলারা তাদের পুরুষ আত্মীয়দের তুলনায় অর্ধেকেরও কম অংশ পেয়ে থাকেন।^৫

তৃতীয়ত: হিন্দু নারীদের মতো মুসলিম নারীরা দীর্ঘ সময় ধরে ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন না।^৬

চতুর্থত: ভারতীয় আইনে সকল ধর্মের নাগরিকদের বিয়ের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে, যা মহিলাদের জন্য ১৮ বছর এবং পুরুষদের জন্য ২১ বছর। এই বয়সের নীচে বিয়ে করা বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি আইনত নিষিদ্ধ। তবে, মুসলিম আইনে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। ইসলামে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে যাওয়া নাবালিকার বিয়ে বৈধ বলে বিবেচিত হয়।^৭

পঞ্চমত: ১৯৫৪ সালের ধর্মনিরপেক্ষ বিশেষ বিবাহ আইনেও লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। এই আইন মোতাবেক একজন মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি বা ইহুদি নাগরিক বিবাহ বা চুক্তিতে প্রবেশের পর তাদের আর উত্তরাধিকার আইন মানার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, একজন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিককে বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪ এর অধীনে নাগরিক বিবাহের পরেও উত্তরাধিকার আইন মেনে চলতে হয়।^৮

এছাড়াও, হিন্দু আইনও লিঙ্গভেদে সমান নয়। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের উইলবিহীন উত্তরাধিকার সংশোধন করা হয়েছে, তবুও নারীর উইলবিহীন উত্তরাধিকারে পুরুষতন্ত্রের ছাপ স্পষ্ট। তাই লিঙ্গ নিরপেক্ষ অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতের মতো দেশে যেখানে নারীর অধিকার নিয়ে প্রতিদিন বিতর্ক চলে, সেখানে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধির গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় সমাজ নিঃসন্দেহে পুরুষতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতার এত দিন পরেও দেশের আইন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধর্মীয়

নিয়মগুলিকে বৈধতা দিয়ে নারীদের উন্নতির পথকে রুদ্ধ করেছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এই প্রাচীন নারী-বিদ্বেষী প্রথা ও ঐতিহ্যগুলিকে পরিবর্তন করে আধুনিক সাম্য ও ন্যায্যভিত্তিক সমাজের সূচনা করবে।

অভিন্ন দেওয়ানিবিধি এবং বিচারবিভাগ: অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের পক্ষে সংবিধানের সংকল্পের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন আদালত বিভিন্ন সময় তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিচারবিভাগ প্রথমবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে মত প্রদান করে ১৯৮৫ সালে মোহাম্মদ আহমেদ খান বনাম শাহবানু বেগম মামলার রায়ে। এই মামলায় শাহবানু বেগম নামে এক মুসলিম মহিলা, যাকে তার স্বামী তাৎক্ষণিক তিন তালাক দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ করেছিল, তিনি ফৌজদারি কার্যবিধির (CrPC)-র ১২৩ ধারায় তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের দাবি করেছিলেন। মামলার রায় দিতে সুপ্রিমকোর্ট মন্তব্য করে যে 'CrPC-র ১২৫ ধারার অধীনে মুসলিম মহিলার তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে'। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ কোর্ট মন্তব্য করে 'দেশের সংসদের একটি অভিন্ন দেওয়ানিবিধি প্রবর্তন করা উচিত, যা বিভিন্ন পারিবারিক/ ব্যক্তিগত আইনের লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আইনগুলিকে বাতিল করে জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত করবে।'^৯

অনুরূপভাবে ১৯৯৫ সালে সরলা মুদগাল বনাম ভারত সরকার মামলাতে রায় দিতে গিয়ে আদালত মন্তব্য করে যে 'যখন দেশের ৮০ শতাংশের বেশী নাগরিককে ইতিমধ্যেই বিধিবদ্ধ ব্যক্তিগত আইনের আওতায় আনা হয়েছে, তখন ভারতের ভূখণ্ডের সমস্ত নাগরিকের জন্য "ইউনিফর্ম সিভিল কোড" প্রবর্তন স্থগিত রাখার কোনও যৌক্তিকতা নেই।' এমনকি কোর্ট সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদকে 'একটি দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ - যা একটি অভিন্ন ব্যক্তিগত আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করে - জাতীয় একত্রীকরণের জন্য একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।^{১০}

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রশ্নে ২০০০ সালে লিলি টমাস মামলা, ২০০৩ সালের জন ভেল্লোমেট্রম মামলা, ২০১৫ সালের ABC Vs NCT of Delhi মামলা এবং ২০২১ সালের সংপ্রকাশ মিনা বনাম আলকা মিনা মামলাটিও গুরুত্বপূর্ণ। সংপ্রকাশ মিনা বনাম আলকা মিনা মামলায় হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ আইনের ধারা ২ (২) এর অধীনে বাদ পড়া মীনা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই হিন্দু বিবাহ আইনের প্রযোজ্যতার প্রশ্নই ছিল মূল বিষয়। এই মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি প্রতিভা সিং বলেন 'সুপ্রিমকোর্ট আশা প্রকাশ করেছে যে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের অভিন্ন নিয়মবিধি প্রণয়নের সময় এসেছে এবং সম্পূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা উচিত।' তবে দেশের বিচারবিভাগ অভিন্ন নিয়মবিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি এই আইনের বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত জটিলতাগুলিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনার কথা বলেছেন।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের বিরুদ্ধে অনেকেই অভিযোগ করেন যে এর ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হিন্দু আইন আরোপের চেষ্টা করা হচ্ছে, বাস্তবে এটি সত্য নয়। স্পষ্টভাবে বললে হিন্দু কোড বিল তৈরির সময় হিন্দু আইনের অনেক অংশই পরিবর্তিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু বিবাহকে প্রথমে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে দেখা হত, কিন্তু পরবর্তীতে হিন্দু কোড বিলের অধীনে এটি একটি চুক্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়। সুতরাং, প্রশ্নটি মোটেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বনাম মুসলিম সংখ্যালঘু সম্পর্কিত নয়। সংবিধান প্রদত্ত হাতিয়ার ব্যবহার করে লিঙ্গ সমতার সাংবিধানিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করাই এর মূল লক্ষ্য।



এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একটি অভিন্ন আইনের অর্থ অবশ্যই একটি সাধারণ আইন নয়, বরং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমতার অভিন্ন নীতির ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ব্যক্তিগত আইন, যা দেশের বৈচিত্র্যকেও টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।^{১১}

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি হল লিঙ্গ ন্যায়বিচার – যা প্রস্তাবনার পাশাপাশি মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর নিঃসন্দেহে তাদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যগুলির ভোগ ও সংরক্ষণের অধিকার আছে, কিন্তু যে রীতিনীতিগুলি সমাজে অসাম্য, লিঙ্গগত বৈষম্যের জন্ম দেবে সেগুলির সময়ের দাবি মেনে সংস্কারের প্রয়োজনও রয়েছে। যদিও আইনবিভাগের বিভিন্ন আইন এবং বিচারবিভাগের বিভিন্ন যুগান্তকারী রায় লিঙ্গবৈষম্য ও দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যে সমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে, তবুও লিঙ্গ ন্যায়বিচার ও সমতার আদর্শের সঙ্গে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জগুলি এখনও বিদ্যমান। অভিন্ন দেওয়ানিবিধি প্রণয়নের আইনি ও ব্যবহারিক বাধাগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সমাজের গভীরে প্রথিত রীতিনীতি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা, যে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী বাধ্যবাধকতা।

সর্বোপরি, ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রণয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নির্ভর করছে সমাজের সর্বস্তরের এক অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনার মাধ্যমে লিঙ্গ ন্যায়বিচারভিত্তিক আইনি সংস্কারের জন্য ঐক্যমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টার ওপর। নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকার ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সম্মান করে এবং রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিকাঠামো শক্তিশালী করেই ভারত তার ন্যায়সঙ্গত ও সমতাবাদী সমাজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবে।

তথ্যসূত্র:

1. World Economic Forum, (2024). *Global Gender Gap Report 2024*, Switzerland, p. 205.
2. Mishra, Akanksha. *Gender Equality and the Uniform Civil Code*, International Journal of Legal Science and Innovation, Vol. 6, Issue 2, 2024, p. 279.
3. Buxbaum, D.C., *Family Law and Customary Law in Asia: A Contemporary Legal Perspective*, Springer, 1968, p.209.
8. The Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860), section 494.
৫. Inheritance rights of Hindu, Muslim, Christian women are not the same, available at <https://economictimes.indiatimes.com/wealth/legal/will/inheritance-rights-of-hindu-muslim-christian-women-are-not-the-same/articleshow/90067981.cms?from=mdr> accessed on 30 August, 2025.
৬. The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) 1986 (Act No. 25 of 1986), Section 3 & 4.

৭. Raising Legal Age for Marriage, available at <https://www.drishtiias.com/daily-news-editorials/raising-legal-age-for-marriage>, accessed on 30 August, 2025.
৮. The Special Marriage, 1954 (Act 43 of 1954), Section 19, 20 & 21.
৯. Jain, Rahul. *Uniform Civil Code towards Gender Justice*, International Journal of Legal Development and Allied Issues, Vol. 9, Issue 5, Sept-Oct, 2023, p.11-12.
১০. *Ibid.*
১১. Sathe, S.P., *Social Justice and Legal Transformation*, Oxford University Press, 2015, p.91-92।

ফ্যাসিবাদ বিরোধীতায় অরুণ মিত্রের কবিতা

মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা কবিতা আন্তর্জাতিক বিষয়, ঘটনা ও তত্ত্বাবধান দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল; তারই এক স্বতন্ত্র পরিচয় বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অনাক্রমণ চুক্তিভঙ্গ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দেশ জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে ২২ জুন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। অপরদিকে, লেলিনের লালফৌজ বীরত্বের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ এনেছিল। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্বের প্রগতিশীল মানবতাবাদী মানুষ নানাভাবে সমবেত প্রতিবাদ জানায়। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিজমের আগ্রাসন এবং চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সময় হল বিশ শতকের চারের দশক। ফ্যাসিস্ট সংঘাত ও সংকটের মুখে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনে এবং এই আন্দোলনের কারণেই ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এ ‘প্রগতি লেখক সংঘ’, ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ নামে পরিচিতি পায়। ৪২-এ সংঘের প্রথম সম্মেলনের কার্যকারী সমিতির সদস্য হন অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০)। কবি অরুণ মিত্রের ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিখ্যাত দুটি কবিতা এই সময়পটের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে, কবিতা দুটির শিরোনাম—‘কসাকের ডাক : ১৯৪২’ ও ‘লাল ইস্তেহার’। আমরা বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে এই কবিতা দুটির সূত্র ধরেই সমকালীন বাংলা কবিতার প্রতিবাদী স্বরটির অনুসন্ধান করব এবং অরুণ মিত্রের ভূমিকা পর্যালোচনা করব। নিবন্ধটি বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বাংলার মার্কসবাদী চেতনায় ফ্যাসী-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণমূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচিত হবে।

সূচক শব্দ: ফ্যাসীবাদ, নাৎসি, আগ্রাসন, সমাজতন্ত্র, প্রতিবাদ, সাম্যবাদ, রাশিয়া, প্রগতিশীল।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা: দেশ-কাল, সময়-সমাজের প্রতিফলন সাহিত্যে পড়ে, আর তার-ই এক ভয়ঙ্কর পরিচয় হল যুদ্ধ—বিশ্বযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষমতার লোলুপ আকর্ষণে বারবার অন্য দেশের দিকে নজর দেয়, নানান ফন্দিতে, বলপ্রয়োগ করে দখল নিতে চায়, অন্যায় ভাবে দখল কয়েম রাখতে চায়। এভাবেই ক্ষমতা বৃদ্ধির উদগ্র লালসা পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব পরিণত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তারই পরিচয় বহন করে। আর সংবেদনশীল, মানবতাবাদী লেখক শিল্পী সাহিত্যিক এই সময় চুপ থাকেন না, তাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। ফ্যাসীবাদ বিরোধিতার অনুষঙ্গে অরুণ মিত্রের ‘কসাকের ডাক : ১৯৪২’ কবিতাটিকে সামনে রেখে বাংলা কবিতায় সমকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী লোলুপতার বিরুদ্ধে যে অবস্থান তা এখানে আলোচনা করা হবে।

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার প্রতি মার্কসবাদী চেতনার মানুষের আকর্ষণ ও আস্থা ছিল জোরালো। আর সেই রাশিয়ার উপর নৃশংস অমানবিক আক্রমণ শুভবুদ্ধিচালিত মানুষের কাছে একটা ভয়াবহ ও আতঙ্কের ঘটনা ছিল। সমকালে বিশ্বের

মানবতাবাদী মানুষ ও দেশ-বিদেশের বহু কবি-সাহিত্যিকের মতোই বাঙালি কবি অরুণ মিত্রের চিত্তও ব্যাথিত হয়েছিল। তারই পরিচয় এই গবেষণা নিবন্ধে আমরা অনুসন্ধান করব।

পটভূমি

ইতিহাসগত তথ্যের দিকে তাকালে আমরা দেখব, অনাক্রমণ চুক্তি^১ ভঙ্গ করে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে ২২ জুন ১৯৪১-এ। স্টালিনগ্রাদ দখলের জন্য জার্মানির নাৎসি বাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণের কোড নাম ছিল ‘অপারেশন বারবারোসা’। তীব্র শীত এবং হিটলার-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। নাৎসি বাহিনী দ্রুত কিয়েভ ও রোস্টভ অন ডনের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরাঞ্চলএর দখল নেয়। তৎক্ষণাৎ লেলিনের রেডফৌজ বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ এনেছিল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ নানাভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ জানায়। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিজমের আশ্রয়ন এবং চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সময় হল বিশ শতকের চারের দশক। ফ্যাসিস্ট সংঘাত ও সংকটের মুখে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনে এবং এই আন্দোলনের কারণেই আমাদের ভারতে, বিশেষত বাংলায় ১৯৪২-এর মার্চ মাসে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’, ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ নামে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ৪২-এ সংঘের প্রথম সম্মেলনের কার্যকারী সমিতির সদস্য হন অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০)। গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্রের সম্পাদনায় ‘সোভিয়েত দেশ’ (১৯৪২) পত্রিকায় অরুণ মিত্রের গদ্য ‘সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি’ প্রকাশিত হয়, যেখানে তাঁর প্রতিবাদ কার্যত উগ্র এবং মানবতার পক্ষে ছিল। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার উপর জার্মানির এই অমানবিক, নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল অরুণ মিত্রের ‘কসাকের ডাক: ১৯৪২’ কবিতায়।

অনাক্রমণ চুক্তিভঙ্গ, ফ্যাসিস্ট আশ্রয়ন ও সমসাময়িক বাংলা কবিতা

আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি নানা অনুষঙ্গে বারবার আমাদের সমাজ, জীবন, শিল্প ও সাহিত্যে প্রভাব ফেলে, আলোড়ন তোলে। তেমনই, ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে তাকালে আমরা দেখব, ‘অনাক্রমণ চুক্তি’ অগ্রাহ্য করে জার্মানি ১৯৪২-এর ২২ শে জুন বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর বরাবর সোভিয়েত সীমান্তে রাশিয়া আক্রমণ করে। এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বিশ্বের নান প্রান্ত থেকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। এই আক্রমণের কথা কবি এইভাবে বলেছেন—

“আজভের পিঠের উপরে

চাবুকের শিস শোনো”

‘আজভ’ হল রাশিয়ায় অবস্থিত আজভ সাগর। এখানে আরও উল্লেখ্য, আজভ (Azov) হল ইউক্রেনের জাতীয় রক্ষা বাহিনী যা পূর্ব আজভ সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের মারিউপোলে অবস্থিত ছিল। এটি একটি ডানপন্থি সংগঠন। কবি আরও বলেছেন দুহাজার মাইল দূরে সুমেরু শিখরে, ভালদাই পাহাড়ে নাৎসি বাহিনীর নির্মম আক্রমণের কারণে রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। তাই সোভিয়েতের শাসক-জনতা, সর্বোপরি রাজধানী মস্কো প্রতিরোধ নামিয়ে এনেছে।

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নাৎসীদের^২ পক্ষ নিয়েছিল ইতালি, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ড। পরে যুক্ত হয় ফ্রান্স ও স্পেন। প্রতিবিপ্লবী ইউরোপের আক্রমণে লেনিনের রেডফৌজ বাহিনী অনেক রক্তক্ষয়ের পর হলেও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে রক্ষা করেছিল পৃথিবীর



প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে। কবির ভাষায়—‘কৃষ্ণসাগরের কাল ফনায় অপূর্ব আক্রোশ—দুশমন!’ শিল্প-সাহিত্য-সংগীত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠস্থান জার্মানির নাৎসি বর্বরতা গোটা বিশ্ববাসীকে বিষন্ন ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলার জনপ্রিয় সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়—

“সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া যন্ত্র ও মানুষের তান্ডব চলিতেছে; ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব। এই সংকটকালে আমরা মনে করি নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য।”^৩

ফ্যাসি-বিরোধী স্বর ও সুর দ্রুত রাশিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্বে। স্পেনে লোরকা, আলবের্তি, মাচাদোর কবিতায়, ফ্রান্সে আঁরাগ এলুয়ারের সৃষ্টিতে, জার্মানির ব্রেখটের কবিতায়, তুর্কি কবি নাজিম হিকমত, মার্কিন কৃষ্ণঙ্গ কবি ল্যাংস্টোন হিউজেসের কবিতায় এই ফ্যাসীবাদের তীব্র সমালোচনা দেখা গেল এবং মানবতাকামী মানুষের কাছে বিপুল সাড়া ফেলেছিল সেই সব রচনা।

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ দেখেছেন, পৃথিবীতে নেমে আসা অভূত আঁধারের আবির্ভাব এবং তাঁর কবিতা বিষন্নময় নৈরাশ্যে লগ্ন হয়েছে। ‘সংবর্ত’ কাব্যের নামকবিতায় সুবীন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন— ‘প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বসর্বা যত; নিরর্থক’। আর ‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্ভব’ থেকে প্রকাশিত হয় কবি বিষ্ণু দে-র ষোলো পৃষ্ঠার একটি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কবিতা সংকলন— ‘২২শে জুন, ১৯৪২’।^৪ যুদ্ধের ঠিক এই প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গই এই কবিতা-গ্রন্থটির ছিল মূল সুর। বহু বিখ্যাত কবির বিখ্যাত ফ্যাসি-বিরোধী কবিতার সঙ্গে এখানে আছে বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রক্তঝরা প্রতিবাদী লেখনীও। যেমন বিষ্ণু দে নাৎসি বাহিনীর বর্বরোচিত আগ্রাসী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে লেখেন—

“জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেও ভিৎ টলে, প্রাণের নির্দেশে
কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূর দেশে দেশে।” (‘২২ শে জুন, ১৯৪২’, বিষ্ণু দে)
আবার, এর কিছু সময় পর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

“মৃত্যুর ঝড় ঠেলে
অন্ধকারের গলা টিপে ধ’রে
রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়
অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ।”^৫

(‘অগ্নিকোন’, সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

বাংলা কবিতার এই প্রতিবাদের ধারাতেই আমরা পেয়ে যায় অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সরোজ দত্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস প্রমুখ কবির কবিতা।^৬

কেবল মানবতাবাদী মানুষই নয়, ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের প্রতিবাদে দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, পরিচয়, অগ্রণী, প্রগতি, অরুণি, লাজল, গণবাণী, নবশক্তি, বিজলী, নবযুগ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সমকালে সোচ্চার হয়েছিল। ‘অরুণি’ পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী ‘আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা’।^৭

“এভাবে বাংলা কবিতার সর্বস্তরে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের প্রতিবাদের চড়া সুর শোনা যায়। শুধু কবিতা কেন, উপন্যাস-গল্প-নাটক-শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি মাধ্যমেই বিশ্বনাগরিক সাম্যবাদী মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে।”^৮ ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাৎসি হামলা ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের জয়গানে বাঙালির মুক্ততার সময়কাল—আর এই সময়েই ‘অরুণ মিত্রের ‘লাল ইস্তাহার’ ও ‘কসাকের ডাক’ প্রায়ই আবৃত্তি করা হত।”^৯

অরুণ মিত্রের প্রতিবাদ

এই সময়কালে বাংলা ভাষায় একের পর এক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ফ্যাসি-বিরোধী ‘অরুণ’ পত্রিকায়।^{১০} অরুণ মিত্র এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যখন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন ‘সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি’-র সক্রিয় সদস্য ছিলেন অরুণ মিত্র। সেই সময় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় সাম্যবাদের এশীয় রূপ এবং সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ে নিয়মিত একটি লেখমালা প্রকাশিত হয়। সেই পরিকল্পনা ও রচনা—দুইই ছিল অরুণ মিত্রের।^{১১} অনুভূতিশীল কবি ফ্যাসিস্ট বর্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন—

“ফ্যাসিজম, যা হ’ল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতি দম্বের চরম নগ্ন প্রকাশ, তা যদি জয়ী হয় তা হলে সমস্ত মানবিক মূল্য, সংস্কৃতির সমস্ত কীর্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব সেই বিপদ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করতে হবে— এই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। অনেকে তাতে যোগ দিলেন, আমিও।”^{১২}

তঁার এই সরল স্বীকারোক্তি তাকে সমসময়ের ক্ষত কতটা নাড়া দিয়েছিল, তা আমরা বুঝতে পারি। একই সঙ্গে তঁার এই প্রতিবাদের সুর কবিতায় ধ্বনিত হয়, জনযুদ্ধের সপক্ষে, রাশিয়ার সপক্ষে যখন লেখেন—

“জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া
সোভিয়েট রুশিয়া
জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া
রাখবই ভাই হো”^{১৩}

তখন গোটা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য রুখে দাঁড়াতে সংকল্পবদ্ধ। এখানে অরুণ মিত্রের বিশ্বনাগরিক সত্ত্বাকে আমরা অনুধাবন করি। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বর এই সাম্রাজ্যবাদী নাৎসি আগ্রাসন থেকে সোভিয়েত রাশিয়া তথা আগামি বিশ্বকে রক্ষা করবার দৃঢ় প্রত্যয় অরুণ মিত্রের রক্তক্ষরা লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় জার শাসনের অবসানের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঘটেছিল। সেই সোভিয়েত রাশিয়ায় নাৎসি বাহিনীর আধিপত্যকে কবি ‘জারজের আগ্রাসন’ের সঙ্গে তুলনা করে ধিক্কার জানিয়েছেন। যদিও কমিউনিস্টদের প্রতিরোধের প্রতি তিনি বিশ্বাসী, তবে কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নয়, ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সংবেদনশীলতার পরিচয় রেখেছেন তঁার কর্ম ও রচনা—সর্বোত্রই। এবং এ প্রসঙ্গে অরুণ মিত্র কবিতায় বলেছেন—

“১৯১৭-র নভেম্বরের সকাল
বিদ্যুৎগতি অন্ধকারে
জারজের উত্তরাধিকারে আচ্ছন্ন আবার।



এবার কসাকের কড়া পাঞ্জায় চূড়ান্ত মীমাংসা!”^{১৪}

আমাদের আলোচ্য কবিতা ‘কসাকের ডাক: ১৯৪২’ ও ‘লাল ইস্তাহার’ কবিতাদুটি তাঁর ‘প্রান্তরেখা’ (১৯৪৩), অর্থাৎ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। এই কাব্যগ্রন্থেরই কবিতায় কবির প্রতিবাদী স্বর বেশ তীব্রভাবে প্রকাশ হয়েছে, সেই তীব্রতার স্বরূপ এই রূপ -

“উপসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার ;
দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো;
মানুষের ছশিয়ার !

লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো
নতুন ইস্তাহার”^{১৫}

ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লেখা মানবতাবাদী, মার্কসবাদে বিশ্বাসী সাম্যবাদী কবি অরুণ মিত্রের এই প্রতিবাদী কণ্ঠ যুগে যুগে মানবতার সপক্ষে ধ্বনিত হওয়ার উপযুক্ত—

“তোমাদের দুনিয়াকে রাখব
রুখবই দুশমন রুখব
দোসরের মুখ চাই ভাই হ...
হাতিয়ার।”^{১৬}

‘দোসর’ আর ‘দুশমন’ শব্দের সচেতন প্রয়োগে কবি অনায়াসেই বুঝিয়ে দেন কবিতা-শরীরের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের পরিসরটি। আবার ‘হাতিয়ার’ শব্দটি কবিতার শেষ চরণে সংযোজনের ফলে বৈপ্লবিক মার্কসবাদী-সাম্যবাদী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল আস্থা জানিয়েছেন। সুদূর ভারতবর্ষের থেকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাধারণ মানুষের সমর্থন এবং কবির আত্মপ্রত্যয় সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। দেশ-কাল-সমাজসচেতন কবি সোভিয়েত রাশিয়ার অধিবাসীর অস্তিত্বের লড়াই-এ সামিল হয়েছেন। তাই, এ কবিতায় বলেন—

“সাঁজোয়া থাবা বাড়িয়ে সেই বুড়ো জানোয়ার
ছিড়তে চেয়েছে হৃৎপিণ্ড,
বিশ্বাসঘাতী বাঘনখ প্রতিহত-
মস্কো...”^{১৭}

এ কবিতায় আছে অন্যায়, বর্বরতা এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থাৎ পুঁজিপতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার। ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদের সঙ্গে আছে ‘সাম্যবাদী উচ্চকণ্ঠ, উন্মাদনাময়, জনসংগ্রাম-সমর্থনের ঘোষণাধ্বনি’।^{১৮} শান্তির ললিত বাণীর বার্থ পরিহাসে, জার্মানি কর্তৃক আনাক্রমণ চুক্তিভঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা বিশ্বনাগরিকের জীবনে নেমে আসে কালো সাম্রাজ্যবাদী ছায়া। আর তখন অরুণ মিত্র ফ্যাসিবাদের বিরোধীতার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের জয়গান গান—

“এবার কসাকের কড়া পাঞ্জায় চূড়ান্ত মীমাংসা
মজ্জায় মজ্জায় এ কৃষাণকে চেনো :
ইউক্রেনের গমের চারায় কুলাকের হাড়ের সার
আর ধমনীতে ডনের স্রোত,
জনসাধারণ অসাধারণ।”^{১৯}

এই কবিতার বক্তব্য কখনও কখনও শ্লোগানধর্মী মনে হলেও সমকালের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরোধীতার প্রেক্ষাপটে এই কবিতার শিল্পমূল্য নির্ধারণ করতে হয়। এ কবিতায় কেবলমাত্র নয়, অরুণ মিত্রের কবিতার একটা বিশেষ প্রবণতা মিলহীন ও সহজ অলঙ্কারের কাব্যশরীর নির্মাণ। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন—

“কবিতার কথা বলি তা নাকি তক্ষুনি হয়ে যায়
অলঙ্কার। তবে এই অলঙ্কারই পরো।”^{২০}

অর্থাৎ আমরা দেখছি, কবি অরুণ মিত্রের গদ্যের স্বচ্ছতার মতোই কবিতাও সহজ অথচ তীক্ষ্ণ বাক বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচ্য কবিতায় এ প্রসঙ্গটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

মানুষের প্রতি মমত্ব, সহানুভূতিশীল মনন, সংবেদনশীল আবেগ এবং শ্রেণি-সচেতনতা তাঁর কবিতার একতম ভাবনাকেন্দ্র। অরুণ মিত্রের কবিতায় প্রকৃতি বা নিসর্গ নেই, নেই কোনো মাতামাতি; আধ্যাত্মিকতারও কোনো জায়গা নেই। নির্মম সময়ের ধারাপথে মানুষের সংগ্রামী চেতনাই প্রধান, প্রকৃতি বা ঈশ্বর এসেছে কেবলমাত্র প্রতিবেশ রচনার সূত্রে বা প্রতীকের ব্যবহারে। আমাদের আলোচ্য কবিতায় লক্ষ্য করি সোভিয়েত রাশিয়ার আজভ সাগর, কৃষ্ণসাগর, সুমেরু, ভল্গা নদী, উরাল পর্বতমালা, পামির পর্বতমালা, ককেশাস পর্বতমালা, ডন নদী, ইউক্রেনের সমভূমি স্টেপ্, রাজধানী মস্কো, উজবেকিস্তানের খিবা, বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি শহরের উল্লেখ নিসর্গ-চেতনা বা প্রকৃতিপ্রেমের কারণে আসেনি। বরং এই সব উল্লেখ প্রতিবেশ ও পরিবেশ রচনা করে নাৎসি হামলার ভয়াবহতা ও ব্যাপ্তি এবং অপরদিকে কমিউনিস্ট জনজাতি-জনতা এবং রেডফোর্সের প্রতিরোধ ও সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আবহকে পরিস্ফুট করা ও পাঠকের চেতনায় তা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে কবির যৌবনের কর্মময় জীবন থেকে অর্জিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা এবং ফ্যাসিজম-বিরোধীতা তাঁর জীবনে ও কবিতায় এক বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের প্রতিফলন ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী অরুণ মিত্রের সম্পর্কে বলেছেন—

“১৯৪২ পর্যন্ত ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ কাজ করেছিলেন তিনি (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পড়াকালীন)। ঐ সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হল তাঁর কবিজীবনের প্রথম উত্তরণের পর্যায়। তিরিশের দশকে ফ্যাসিজম-বিরোধী যে চেতনা গড়ে উঠেছিল বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও—‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র তৎকালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারও ছিলেন তারই একজন প্রবক্তা। মার্কসীয় চিন্তাপদ্ধতিকে যারা গ্রহণ করেছিউলেন, স্বাগত জানিয়েছিলেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে—তিনি তাঁদেরই একজন। অরুণ মিত্রকে তিনি গ্রহণ করলেন আত্মীয়ের মতোই। সেই সংস্পর্শ অরুণ মিত্রকেও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দিকে নিয়ে গেল। সেই সময়টাতে ভারতে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা যারা করতেন তাঁরা ছিলেন একই সঙ্গে ফ্যাসিজম-বিরোধী ও ব্রিটিশ-বিরোধী।...এভাবেই প্রস্তুত হয়ে উঠছিল অরুণ মিত্রের কবিমানস।”^{২১}

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম, ‘কসাকের ডাক: ১৯৪২’ এবং ‘লাল ইস্তেহার’ কবিতায় কবির রাজনৈতিক চেতনা ও সচেতনতা প্রবল। কবিতায় তাঁর বক্তব্য কখনো তীব্র শ্লোগানধর্মী হয়েছে ঠিকই এবং তা সমকালের রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কবিতার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর ফ্যাসিবাদের বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকাকে তিনি শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের আগামীদিনের মুক্তির



ইসারা হিসেবে দেখেছেন।^{২২} আবার, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরোধের ভূমিকাকে বিশ্বমানবাত্ম্যার মুক্তির আশাব্যঞ্জক চিহ্ন হিসেবে ব্যক্ত করেছেন কবি।

এই কবিতায় কবির আন্তর্জাতিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, যা মূলত সাম্যবাদী চেতনার—মার্কসবাদী বিশ্বাসের। ফ্যাসীবাদের পরাজয়ের উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণের পতনের আকাঙ্ক্ষা, কবিতাটির সার্থকতা এখানেই। কবিতাটি রাজনৈতিক, প্রতিবাদী তবে শ্লোগানধর্মী নয়; বরং মানবাত্ম্যার ক্রন্দনে সমব্যথী কবি বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয়ে জনজীবনের অভিমুখী। ‘নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা’ যেমন সমকালীন সমাজচেতন মানুষের প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হয়েছিল, কবি অরুণ মিত্র সেই কাজটিই অতি নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পসার্থক কবিতার শরীরী নির্মাণে করেছিলেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম একটি প্রবণতা—ই হল রাজনীতি; রাজনীতি-সচেতনতা সমাজ জীবনের মতো শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। একদিকে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার, মুক্তির প্রত্যাশায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের সংগ্রামী আন্দোলন চলছে দেশজুড়ে। অপরদিকে দেশ-বিদেশের মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম-লড়াইয়ের মাধ্যমে শাসকের অমানবিকতার এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি প্রত্যাঘাত, সাধারণ দেশবাসীর জীবনে আশার-স্বপ্নের দ্যোতনা বয়ে আনত। তেমনই অরুণ মিত্রের প্রতিবাদী কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী নাৎসি শক্তির প্রতি লালসেনাদের প্রত্যাঘাত উদযাপন করা হয়েছে। বিশেষ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ থাকলেও আমাদের কাছে মানবতার যে সুর শোনা গেছে তাঁর কবিতায়, এবং অবশ্যই ফ্যাসীবিরোধী কবিতায়, তা কাব্যগুণের বিচারে শিল্পসার্থক এবং মানবিক আবেদনের সূক্ষ্ম অনুভূতির চিরন্তন প্রকাশক।

ইতিহাসের এক নির্মম সন্ধিক্ষণে ফ্যাসী-বিরোধী মিছিল পরিচালন করার সময়, ঢাকার তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দ্র নিহত হয় ফ্যাসীবাদী সমর্থকদের হাতে।^{২৩} ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ-এ ঘটনা এই বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতিবাদে দল-মত নির্বিশেষে শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হয়ে ২৮শে মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গড়ে তুলেছিলেন ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’। বাংলা নাটক, কবিতা, গান সহ সব ধরনের শিল্প ও সাহিত্যের শাখায় নাৎসি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের প্রতিবাদ ও প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছিল। আর এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে কবি অরুণ মিত্রের ভূমিকা আমরা বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা ও পর্যালোচনা করলাম। তাঁর কবিতার স্বর ও সুর তীব্র ক্ষুরধার হয়েছে, ধিক্কারে, ব্যঙ্গ এবং প্রতিবাদে হয়েছে শ্লোগানধর্মী, আসলে তা নেহাতই মানবতাবাদী এবং বিশ্বজনীন।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার:

১। এলবার্ট, মাইকেল সোয়ার্স, ১৯৮৪, ‘সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত’, অনুবাদক-বিনয় ঘোষ ও সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-২৬।

এ প্রসঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা উল্লেখ করতেই হয় —

“বেলজিয়াম বা হল্যান্ড আক্রান্ত হলে ফ্রান্স এবং বৃটেনকে রাশিয়া যে পরিমাণ সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি আক্রান্ত হলে রাশিয়াকে অনুরূপ সাহায্য

দানের প্রতিশ্রুতি দিতে বৃটেন গররাজি হল। সোভিয়েতের তখন স্থির ধারণা হল, অবশ্য সে ধারণা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত যে, বৃটেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে বাস্তবিক কাজে লাগার মতো কোন বোঝাপড়াই সম্ভব হবে না। হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে তারা বাধ্য হল।...১৯৩৯ সালের ২৪ শে অগস্ট সোভিয়েত রুশিয়া জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করল।”

- ২। গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১১, ‘নাৎসিবাদ’, ‘রাজনীতির অভিধান’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-১৫৩।

“জার্মান ভাষায় ন্যাশানাল সোসালিজমের সংক্ষিপ্ত শব্দ। ১৯২০ খ্রি. অক্টোবরে জার্মানির মিউনিখ শহরে জার্মান ওয়ার্কাস পার্টির সম্মেলনে দলের মতাদর্শরূপে শব্দটি গৃহীত হয়। এই দলের এই আদর্শ ইতালির দক্ষিণপন্থি ও স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিস্ট দলের মতো। ...রাজনীতির ক্ষেত্রে নাৎসি দল ছাড়া অন্য সব দল নিষিদ্ধ ছিল। দলের নীতি নির্ধারণে সদস্যদের কোনও অধিকার থাকত না। হিটলারই ছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতায় আসীন একমাত্র নেতা; তাঁর নির্দেশে পালন করাই ছিল সদস্যদের কর্তব্য।”

- ৩। ‘সম্পাদকীয়’, ২০ জুলাই ১৯৪২, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, কলকাতা, পৃ-৪।
 ৪। চক্রবর্তী, সুমিতা, ২০১০, ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য’, ‘বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি’, সম্পাদনা-হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু, কলকাতা, পুস্তক বিপনি, পৃ-১৩৩।
 ৫। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ২০০৪, ‘অগ্নিকোণ’, ‘সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ-৩৮।
 ৬। সিকদার, অশ্রুকুমার, জুন ১৯৯৯, ‘আধুনিক কবিতা থেকে কবিতার দিকে’, ‘আকাদেমি পত্রিকা-১১’, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৫৯।
 ৭। দাস, সুস্মাত, এপ্রিল ১৯৯৬, ‘ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের বাংলা সাহিত্যের রূপ-রূপান্তর : একটি সমীক্ষা’, ‘আকাদেমি পত্রিকা-৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-১৫৯।

এখানে লেখক সেই সময়ের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী পুস্তিকাগুলির তালিকা দিয়েছেন—

- ক) জাপানী শাসনের আসল রূপ—বিজন রায়
- খ) সভ্যতা ও ফ্যাসিজম—বুদ্ধদেব বসু
- গ) ফ্যাসিজম ও নারী—প্রতিভা বসু
- ঘ) দেশরক্ষায় চীনা নারী—রাণী চক্রবর্তী
- ঙ) সোভিয়াত মধ্যপ্রাচ্যের নারী—রাণী চক্রবর্তী
- চ) ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ—বিনয় ঘোষ
- ছ) গেরিলা বাহিনী হইতে জনবাহিনী—রণেশ দাশগুপ্ত
- জ) দেশরক্ষার ডাক—কনক মুখার্জি
- ঝ) ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী শাসন—রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

- ৮। মুখোপাধ্যায়, কনক, এপ্রিল ১৯৯৬, ‘অবিস্মরণীয় দিনগুলি’, ‘আকাদেমি পত্রিকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৩৩১।

এ প্রসঙ্গে কনক মুখোপাধ্যায় ‘অবিস্মরণীয় দিনগুলি’তে বলেছেন—



“হঠাৎ যেন পৃথিবীটা একেবারে আমাদের ঘরের কাছে সরে এল। মস্কো, লেলিনগ্রাদ, স্তালিনগ্রাদের লড়াই কিংবদন্তি হয়ে ঘরে ঘরে আওয়াজ তুলল। সোভিয়েত রাশিয়ার লাল-ফৌজের বীরত্বের কাহিনীগুলি তরুণ প্রজন্মকে মুগ্ধ করল। প্রতিদিন রণক্ষেত্রের উত্তেজনাময় সংবাদগুলির সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল নান্দনিক সৃষ্টির তরঙ্গ। লালফৌজের প্রবল প্রতিরোধ-সংগ্রামের কাহিনীগুলির সঙ্গে মিলেমিশে গেল ‘জয়া শুরার কাহিনী’, ‘প্যারির পতন’, ‘ঝড়’, ‘রামধনু’-র মতন অনবদ্য কাহিনী ও গল্প-উপন্যাসগুলি।”

- ৯। চক্রবর্তী, সুমিতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ ২০০৫, ‘অরুণ মিত্রের কবিতা: জনজীবনের স্থির কেন্দ্রে’, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়’, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-২৯।
- ১০। ‘অরণি’-র মতো সচেতন প্রগতিশীল পত্রিকার সঙ্গে অরুণ মিত্র প্রথমাধি যুক্ত ছিলেন (১৯৪১-৪৮)।
- ১১। সেন, অরুণ, শারদীয়া ২০০০, ‘অরুণ মিত্র: রচনা ও জীবন’, কলকাতা, ‘অনুষ্টিপ’, পৃ-২১।
- ১২। কর, ধীরেন্দ্রনাথ, ২০০১, ‘কবির পাঠানো বক্তব্য’, অরুণ মিত্র সংখ্যা, কলকাতা, শিলীক্ল, পৃ-৪৮।
- ১৩। মিত্র, অরুণ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, ‘কসাকের ডাক : ১৯৪২’, ‘প্রান্তরেখা’, অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ-৭।
- ১৪। তদেব, পৃ-৬।
- ১৫। মিত্র, অরুণ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, ‘লাল ইন্তাহার’, ‘প্রান্তরেখা’, অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ-৫
- ১৬। মিত্র, অরুণ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, ‘কসাকের ডাক: ১৯৪২’, ‘প্রান্তরেখা’, অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ-৮।
- ১৭। তদেব, পৃ-৬।
- ১৮। চক্রবর্তী, সুমিতা, ২০০৫, ‘অরুণ মিত্রের কবিতা : জনজীবনের স্থির কেন্দ্রে’, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়’, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-৩০-৩১।
- ১৯। মিত্র, অরুণ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, ‘কসাকের ডাক : ১৯৪২’, ‘প্রান্তরেখা’, অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ-৬।
- ২০। মিত্র, অরুণ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, ‘অলঙ্কার’, ‘খুঁজতে খুঁজতে এতদূর’, অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ-৯৮।
- ২১। চক্রবর্তী, সুমিতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ ২০০৫, ‘অরুণ মিত্রের কবিতা: জনজীবনের স্থির কেন্দ্রে’, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়’, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-২৭।
- ২২। চৌধুরী, শীতল, ২০১৫, ‘জীবনপ্রেমিক ও মগ্ন-ধ্যানী কবি: অরুণ মিত্র’, ‘আধুনিক বাংলা কবিতা নিবিড় পাঠ’, কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-১১২।
- ২৩। ঘোষ, বিনয়, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৬০, ‘মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক’, কলকাতা, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, পৃ-৩২।

নারীমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ-অতৃপ্তির শিল্পরূপ : ঝড়েপ্তর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘আমতেল’

মেঘা ভট্টাচার্য

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ময়নাগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি

সারসংক্ষেপ: বর্তমান প্রবন্ধে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী ঝড়েপ্তর চট্টোপাধ্যায়- এর ছোটগল্প ‘আমতেল’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তত্ত্বের একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গল্পে মূল চরিত্রে রয়েছে ‘লতিকা’ নামের এক বিধবা নারী। তার হৃদয়ের অতৃপ্তিই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে তার হৃদয়ের এই অতৃপ্তির সম্ভাব্য কারণ এবং গল্পে তার চরিত্রের পরিণতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। শিল্পরূপ অর্থাৎ শিল্পের প্রকাশ। বর্তমান প্রবন্ধে গল্পকার যেভাবে বিষয়বস্তু, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, দৃশ্য, সংলাপকে ব্যবহার করে লতিকার পরিণতি তথা গল্পেরও সমাপ্তি নির্দেশ করেছেন- তা যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে কিনা তা বিচার করা হয়েছে। লতিকা ও রমেন পরস্পর একটি মোহের বন্ধনে জড়িয়েছিল। কামবাসনার উর্ধ্ব প্রকৃত ভালোবাসা তাদের মধ্যে ছিল না বলেই তাদের ‘আকর্ষণ’ সম্পর্ক অবধি পরিণতি পায়নি। রমেনের কাছে নিজের বার্ষিকের কারণে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে সে নিজের সঙ্গসুখের কামনায় মতিকে বেছে নিলেও মতিও তাকে গ্রহণ না করলে চরম একাকীত্ব ও জীবনে অতৃপ্তির হাহাকার লতিকাকে গ্রাস করে। বর্তমান প্রবন্ধে এই অতৃপ্তির কারণ এবং তা শিল্পগুণসম্মিত রূপলাভ করেছে কিনা- তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: অতৃপ্তি, ব্যক্তিত্ব, মনোসমীক্ষণ, Narcissistic Personality, হীনতাবোধ, দৃশ্য।

মূল আলোচনা:

এক

“অনেক দিয়েছ নাথ/আমায় অনেক দিয়েছ নাথ/আমার বাসনা তবু পুরিল না-...গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না”^১

আমাদের জন্মই হয় মূলত অতৃপ্তির বেদনাবাস্প কণ্ঠে ধারণ করার জন্য। আসলে আমাদের আকাঙ্ক্ষার যেমন সমাপ্তি নেই তেমনই বাঞ্ছিত ফললাভ না হলেই মনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা জন্ম নেয়। জগতে বোধহয় সুখী মানুষ বিরল- প্রবন্ধের শুরুতে তাই বিশ্বকবির সঙ্গীতেই মনের অপূর্ণ কথা পূর্ণতালাভের পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। ‘তৃপ্তি’- শব্দের অর্থ সন্তুষ্টি সুতরাং ‘অতৃপ্তি’ এমন একটি নেতিবাচক মানসিক অবস্থা যা মানুষের জীবনে হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরী করে। বর্তমান প্রবন্ধে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী ঝড়েপ্তর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘আমতেল’-এর নারী চরিত্রের মনস্তত্ত্বের একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঝড়েপ্তর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘স্বজনভূমি’ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তারাসঙ্কর স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এছাড়াও তাঁর কিছু উপন্যাস ‘সহিস’ (২০০৭ বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত), ‘সমুদ্রদুয়ার’ (২০১৯ শুধু সুন্দরবন চর্চা পুরস্কার প্রাপ্ত) ও গল্প সংকলন ‘টাওয়ারে ফাইবার ব্রেন্ড’, ‘কাঠকুটো’, ‘যাত্রীনিবাস’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়



মূলত ‘আমতেল’ গল্পের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র ‘লতিকা’র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তার অতৃপ্তির কারণ অনুসন্ধান। শিল্পরূপ অর্থাৎ শিল্পের প্রকাশ বা রূপ। এই প্রবন্ধে মূলত গল্পের পরিণতিতে বা বলা যায় লতিকার হৃদয়ের অতৃপ্তির বালুচরে পৌঁছানোর জন্য গল্পকার যেভাবে যেসকল উপাদান যেমন- বিষয়, চরিত্র, দৃশ্য, সংলাপকে ব্যবহার করেছেন তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

‘আমতেল’ গল্পের মূল চরিত্রে ‘লতিকা’-কে পাই। তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বছর, সে বিধবা, ডান পা-টি নেই। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় সে তার মৃত স্বামীর অস্তিত্ব সমুদ্রে বিসর্জন দিতে এসেছিল সেখানেই সমবয়সী রমেনের সাথে তার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম আলাপের সূত্রেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আগ্রহের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্রমে রমেন এসে তার সাথে আলাপ করে। তার ক্রাচ লক্ষ্য করে ‘Open-ended style’-এ প্রথম কথা বলে- “আপনি এত কষ্ট করে সাগর মানে গিয়েছিলেন...”^২ নিজের আগ্রহকে প্রশ্নের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা না করে সহানুভূতি মেশানো কর্তে বলাতে লতিকা জানিয়েছে যে সে কথা রাখতে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কথপোকথনের বাঁধাও দূর হয়। স্ত্রী এবং দুই-তিন বছর বয়সী সন্তান থাকা সত্ত্বেও রমেন লতিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। লতিকাও তাকে পথের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে খুশি ছিল। অবশেষে উভয়ের বাড়ি নিকটবর্তী হওয়াতে তারা এক ভ্যানগাড়ি করেই বাড়ি ফেরে এবং পুনরায় দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করে রমেন বিদায় নেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লতিকা ও রমেনের হঠাৎ দেখা হওয়ার প্রসঙ্গ আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় রমেন আবারও লতিকার সাথে দেখা করতে তার বাড়িতে এসেছে। এবার তাদের মাঝে কাজের মেয়ে মালতি চরিত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বর্ষার বৃষ্টি অতিক্রম করে রমেন যায় শুধুই লতিকার সাথে দেখা করার আগ্রহে। চা, আমতেল মুড়ি মাখা খেতে খেতে তাদের মধ্যে ছোট ছোট কথাবার্তা চলতে থাকে। এত ঘোর বৃষ্টি অতিক্রম করে কোনো কাজে এসেছে কিনা রমেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় এমনিই এসেছে। বিধবা লতিকার হয়তো উচিত হয় না এক বিবাহিত পুরুষের আগ্রহকে প্রশ্ন দেওয়া, কিন্তু দেখা যায়- “পুরুষ পরশের আকাঙ্ক্ষায় পুড়ছে তো বিধবা লতিকা আর সাহচর্য কামনায় রমেন”^৩ কিন্তু ভালোবাসা নাকি মোহ এর সমাপ্তি কোথায়? ক্রমশ, চতুর্থ তথা শেষ পরিচ্ছেদ শুরু হয়। মাঝে কেটে গেছে প্রায় চৌদ্দ-পনের বছর। এখন লতিকারানির ফরসা মুখে ‘বড় গোল চশমার কাঁচ’ অথবা ‘মাথায় পাকা চুলের ভাঁজ’। এইবার তার সমস্ত আতিথেয়তা, অন্তরঙ্গতা, উষ্ণ অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে রমেনকে নিরুত্তর দেখা যায়। কারণ পঞ্চাশোত্তীর্ণ লতিকারানিকে এখন রমেনের আবেদনময়ী মনে হয় না। ফেরার সময় দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে লতিকা ফোকলা মাড়ি চেপে তাকে আবার আসতে বললে রমেন বলে যে সে আর আসবে না। বলাইবাহুল্য বিগতযৌবনা লতিকাকে ঘিরে আর কোনো ফ্যান্টাসি রমেনের মনে কাজ করে না। সে চলে যাওয়ার পর মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত লতিকা প্রায় বছরখানেক পূর্বে নিযুক্ত বাড়ির চাকর মতি দাসেরই সাহচর্য প্রার্থনা করে। এক শয্যায় রাত্রিযাপনের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মতি জানিয়ে অগ্রসর হলেও লতিকাকে বিছানায় একা রেখে মতি শেষ রাতে নিজের জায়গায় ফিরে আসে। অক্ষম দেহ-মন নিয়ে সম্পূর্ণ একাকী হয়ে শুধু রাত্রি নয় বাকি জীবনটাও এভাবেই যে তাকে কাটাতে হবে তার দীর্ঘশ্বাস এ ইঙ্গিতও বহন করে।

দুই

লতিকার জীবনে এই অতৃপ্তির মূল কারণ তার ব্যক্তিত্ব। আমরা তার ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য মনস্তত্ত্বের সাহায্য নেব। সিগমুন্ড ফ্রয়েড ছিলেন একজন অস্ট্রিয় মানসিক রোগ চিকিৎসক

এবং মনস্তাত্ত্বিক। তিনি ‘মনোসমীক্ষণ’ (Psychoanalysis) নামক মনোচিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবক। তাঁর মতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব শিশুকালেই মুকুলিত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এই মৌলিক প্রবনতাগুলির রূপান্তর ঘটে। কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ যে জৈবিক প্রবৃত্তি অর্জন করে তা হল কামবৃত্তি/Libido। ফ্রয়েডের ‘Psychoanalysis theory’ অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব মনের তিনটি অংশের সমন্বয়, যথা- ‘id’, ‘ego’, ‘super ego’^৪। এই ‘id’/অভিসত্তার শক্তি হল Libido। অভিসত্তা জড়িত ‘Pleasure Principle’- এর সাথে। সদ্যজাত শিশুদের মধ্যে এই ‘id’ প্রবৃত্তি দেখা যায়। অর্থাৎ, তারা কোনো জিনিস চাইলে সেটা না পেলে কাঁদতে থাকে। সেই জিনিস তাদের তখনই চাই। ‘id’ কখনই বাস্তবতা বোঝে না। ইচ্ছেপূরণের জন্য বস্তুর প্রতি চাহিদা নৈতিক বাধা অগ্রাহ্য করাই id’ এর প্রবনতা। ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় অংশ আছে ‘ego’ বা ‘অহং’। ‘ego’ বাস্তবতাকে মেনে চলে। এর কাজ হল ‘id’ এর চাহিদাকে বাস্তবসম্মত উপায়ে পরিতৃপ্ত করা। কিন্তু, অবাস্তব বা বাস্তবতার বিরোধী কাজে ego-এর সমর্থন থাকেনা বলে ‘ego’-এর সাথে ‘id’-এর সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাড়ে। ‘অহং’ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে ঠিক বা ভুল গুরুত্ব রাখেনা। বরং বাস্তবিকভাবে ‘id’-এর উদ্দেশ্যকে সফল করাই ego-এর স্বার্থকতা। ‘super ego’/ ‘পরাসত্তা’ হল বিবেক বা নৈতিকতাবোধ। অহং যদি অভিসত্তার ইচ্ছেপূরণ করার জন্য নীতিগতভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়ার দিকে ঝোঁকে পরাসত্তা তখন অপরাধবোধ হিসেবে অহংকে জাগিয়ে তোলে। মনের ‘preconscious’ বা পূর্বচেতন স্তরে এর অবস্থান। অর্থাৎ আমাদের ঠিক ভুল বিচার করার ক্ষমতাকে পরাসত্তা নিয়ন্ত্রণ করে। এ যদিও মনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাহ্যিকভাবে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন হবে তা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন- নির্দিষ্ট ব্যক্তির পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, তার নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা ইত্যাদি। ‘আমতেল’ ছোটগল্প হওয়ার কারণে লতিকার জীবনের শুরুর কাহিনী আমরা জানতে পারিনা এক্ষেত্রে যেটুকু ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে তাতে বোঝা গেল তার মনের এই তিনটে অংশের সঠিক ভারসাম্য ছিল না। ‘id’ এর আধিপত্যের কারণে তার ‘ego’ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লতিকার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রূপে গড়ে উঠেছে আত্মরতিমূলক ব্যক্তিত্ব বা ‘Narcissistic Personality’। ‘Narcissism’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রোমান কবি Ovid তাঁর গ্রন্থ ‘Metamorphoses: Book III’- তে। গ্রিক পুরাণের ‘Narcissus’ ছিলেন এক সুদর্শন যুবক। তিনি নিজের প্রতিচ্ছবিতে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারেননি। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ‘Narcissism’ শব্দটি একটি মানসিক অবস্থার সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে মনোবিজ্ঞানী হ্যাডলক এলিস ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই শব্দটিকে এক রোগীর আচরণের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করেন।^৫ এই ধরনের ব্যক্তিত্ব হলো- “ In Freudian psychology and psychoanalysis the term narcissism denotes an excessive degree of self-esteem or self-involvement a condition that is usually a form of emotional immaturity.”^৬ এককথায় Narcissistic Personality যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে “exaggerated feelings of self-importance, an excessive need for admiration and a diminished ability to empathize with other people’s feelings”^৭ থাকবে। এককথায় ‘Narcissism’ বা ‘আত্মকাম’-এর অর্থ মানুষের libido বা কাম অন্য কোনো বিষয়/বস্তুতে আসক্ত না থেকো তা



যদি বাহ্যিক বস্তুকে বর্জন করে ‘অহং’-কেই সেই স্থানে বসায় তাহলে তাকে Narcissism’ বলা হবে।

‘আমতেল’- গল্পটি সর্বজ্ঞকথনরীতিতে বর্ণিত হয়েছে। এই Third person omniscient narrator-এর বর্ণনাতেই আমরা জানতে পারি- প্রথমত লতিকার ডান পা নেই সে ক্রাচে ভর দিয়ে চলে, দ্বিতীয়ত সে বিধবা, তৃতীয়ত আর্থিক দিক দিয়ে সে যে স্বচ্ছল পরিবারের বধু ছিল তা তার বেশভূষা এবং স্বীয় সংলাপে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই উপাদানগুলি তার ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে। Narcissistic Personality-এর প্রথম বৈশিষ্ট্যই একজনের মধ্যে তীব্র পরিমাণে আত্মরতি থাকবে। তার আচরণে বা চিন্তায় অপরের প্রশংসা পাওয়ার তীব্র চাহিদা থাকবে- “A need for admiration, a lack of empathy, and a heightened sense of self-importance”^৮ থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে তার একটি পা না থাকা সত্ত্বেও কি তার মধ্যে হীনমন্যতা ক্রিয়া না করে আত্মরতি ক্রিয়া করতে?- উত্তরটা সম্ভবত তাই। Alfred Adler- এর ‘হীনতাবোধ’ বা ‘Inferiority Complex’ অনুযায়ী অনেকসময় সমাজের চোখে মানুষ নিজের হীনতা দূর করতে গিয়ে অতিরিক্ত ভেবে বসে যে সে মোটেও হীন নয় বরং সমাজের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হীনতাবোধকে দূরে রেখে শ্রেষ্ঠত্বের প্রচেষ্টাকে তিনি ‘অতিক্ষতিপূরণ’ বা ‘Overcompensation’ বলেছেন। তাঁর মতে মানুষ তার জন্মগত হীনতাবোধকে দূর করে সর্বদাই ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। যে কারণে লতিকার মধ্যে পঙ্গুত্বের কারণে সামান্য হীনতাবোধ থাকলেও সে নিজের রূপকে হাতিয়ার করে শক্তি সংগ্রহ করতে চেয়েছে। অন্তত তার নিজের মুখে না হলেও সর্বজ্ঞকথক এবং রমেনের চোখে তার যে রূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতে তাকে প্রতিবারই যথেষ্ট রূপবতী বলেই মনে হয়- “ত্রিশ বত্রিশের ফরসা গোল ছাঁদের সুশ্রী মুখ। তার দুই বগলে পালিশ কাঠের ক্রাচ।... সাদা সিল্ক থান ব্লাউসের পিঠ বেয়ে কালো চুলের গোছায় যে কত দীন সে বৈধব্যা!”^৯ নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন নন এমন নারী বিরল। যে কারণে প্রথম আলাপ হওয়ার সময় থেকেই সে রমেনের আগ্রহভরা দৃষ্টি উপভোগ করছিল। নিজের রূপ সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন ছিল বলেই মনে হয়। যে কারণে একই ভ্যানে বাড়ি ফেরার জন্য উঠতেই লতিকার মনে একই সাথে ত্রাস এবং তাড়না কাজ করে- “আবছা আঁধারে সংশয় হানে। সে চোখে বৈধব্যা নয়, এক পুরুষ খোয়ানো যুবতীর গুপ্ত তছনছের কামনা। রমেনের বুকের পলিতে সে দৃষ্টি যে দাগ ফেলে”^{১০} এই ‘গুপ্ত তছনছ’ এই অর্থে হতে পারে যে সে নিজেকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ভাবত এবং জানত তার আত্মহানি কেউই অগ্রাহ্য করতে পারবে না; ভবিষ্যতের ‘তছনছ’ অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। তার যে ‘excessive need for admiration’ ছিল তা ধরা পড়ে যখন তৃতীয় পরিচ্ছেদে রমেন পুনরায় দেখা করতে এসেছিল এবং এমনিই এসেছে তা শুনে সে প্রশ্ন করে- “আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মেলে না, না? -কেন? মেলে তো। তবে সব ব্যাপারে কি আর... রমেনের এমন জবাবে লতিকারানির আকুলতা চকিতে খসে যায়”^{১১}। এ তার কিসের ‘আকুলতা’ ছিল? হয়তো তার প্রশংসা করে রমেন কিছু উত্তর দিলে তার এই ‘আকুলতা’ মিটত- কিন্তু তা হয়নি। পরবর্তীকালে সময় যখন চৌদ্দ-পনের বছর এগিয়েছে তখন দেখি পঞ্চাশোত্তীর্ণা লতিকারানির সাথে আবারও দেখা করেছে রমেন। লতিকা উৎসাহের সাথে তার দেহের ক্ষতস্থানগুলো (স্কিন ডিজিস) তাকে দেখাতে চায়। তার উৎসাহ দেখে মনে হয় সে ভেবেছিল আগের মতোই তার লাভণ্যময় শরীরের সান্নিধ্য কামনায় রমেনের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাই পরম আগ্রহে, বিশ্বাসে রমেনের চোখে পুনরায় নিজের সৌন্দর্যের স্বাণ নেওয়ার

বাসনায় ‘রমেনের কাছে বাড়তি মর্যাদা আদায়ের কামনায়’- “লতিকারানি গলা থেকে কাপড়ের খুঁট সরতেই কণ্ঠা। তারপর সাদা আঁচলের তাল নম্রলয়ে বুকের ঢাল ধরে নামায়। ফরসা শরীরে সেই চিকন ত্বক দেশ... নারী সৌকর্য জীর্ণ”^{১২}। কিন্তু ততোদিনে রমেনের মনে হয় “সেই প্রসাধিত টান টান উচ্ছল অঙ্গমালা... ঘনকালো চুলের বহর... ঝকঝকে দাঁতের সারি... দুচোখে তীক্ষ্ণতা- সে সব মহার্ঘ আয়োজন কে ছেনে মুছে নিল একই সৌষ্ঠব থেকে”^{১৩} তখন আর লতিকার জন্য কোনোরূপ কামনা অবশিষ্ট ছিল না, ছিল শুধুই পঞ্চাশোত্তীর্ণা এক বৃদ্ধার প্রতি সহমর্মীতাবোধ। এখানেই আরও একবার প্রমাণিত হয় সর্বজনকথকের বর্ণনায় লতিকার দেহসৌন্দর্যের যে বর্ণনা গল্পকার তুলে ধরেছেন লতিকা সে বিষয়ে সচেতন ছিল বলেই তার সৌন্দর্যে রমেনকে মুগ্ধ করতে চেয়েছিল। তার এই অতিরিক্ত ‘Self-importance’-বোধ রমেনের কাছ থেকে প্রত্যাখাত হওয়ার পরেও যায়নি। এরপর সে যখন সঙ্গলাভের কামনায় বাড়ির কাজের লোক মতি দাসকেও আহ্বান জানায়- “এত বড় ঘর বারান্দায় আমরা মাত্র দুটি প্রানী... বিছানায় বাড়তি বালিশে চাপড় মেরে লতিকা দেখায় আজ থেকে এখানে এটাতেই শোবে”^{১৪}। মতিও যখন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েও শেষ অবধি তাকে ত্যাগ করে তখনই যাবতীয় অহং-এ আঘাত লাগে। নিজের রূপ বা ধন-সম্পদ কিছু দিয়েই সে কাউকে আটকাতে পারলো না- “এতখানি বাড়ি ঘর, কিছু ধান জমি অতীত বৈভব সম্পন্ন পরিবারের বউ লতিকা। তার মানে লাগে... আটকাতে গেলে হাত পা সবই সবল চাই তো”^{১৫}। একদম শেষে সে তার পঙ্গুত্বের কারনে হীনতাবোধ করেছে এর পূর্বে এভাবে করেনি। তার overcompensation তার Narcissistic personality-কে জিইয়ে রেখেছে। যা থাকার কারণে সে অন্য কারোর কথা ভাবেনি (lack of empathy)-শুধুমাত্র নিজেকে ঘিরেই তার চিন্তা কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে সে ভেবেছিল রমেন বা মতি কোনো পুরুষই তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। তার এই ধরনের ব্যক্তিত্ব, পুরুষসঙ্গলাভের মোহ এবং তার বাসনা পরিপূর্ণ না হওয়াই তার জীবনের অতৃপ্তির অন্যতম কারণ।

লতিকা চরিত্রের পরিণতিতে তার একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থা দেখে পাঠকের মন আবেগবিশ্বল হলেও তার চারিত্রিক গঠনে আত্মকেন্দ্রিক/Self-centred ধরণ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মধ্যে জৈবিক কামনা-বাসনা থাকবে এ নিত্যন্তই স্বাভাবিক। কিন্তু, ভালোবাসাহীন দেহজ কামনার উপরেই কোনো সম্পর্ক দাঁড়াতে চাইলে তাকে আমরা ঠিক সুস্থ সম্পর্ক বলতে পারি না। ‘ভালোবাসা’- এমন একটি পবিত্র বন্ধন যা অন্যান্য প্রানীদের থেকে মানুষকে পৃথক করে। লতিকা ও রমেনের পরস্পরের থেকে আকর্ষণের ইতিবৃত্ত গল্পের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেখানে কোনো ‘ভালোবাসা’ ছিল না। বিধবা লতিকার যেমন ছিল পুরুষসঙ্গলাভের মোহ রমেনও তার দৃষ্টিতে ‘ফরসা সুশ্রী নরম যুবতী বিধবার’ প্রতি কামের তাড়নাতেই আকৃষ্ট হয়েছিল এবং প্রায় ভুলতে বসেছিল তার নিজের পরিবারের কথা। কিন্তু ভালোবাসাহীন কামের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নয় বলেই পরবর্তীতে পঞ্চাশোত্তীর্ণা লতিকার বার্ষিক্যে তার কোনোরূপ ভালোলাগা অবশিষ্ট ছিল না। লতিকাও তাকে ভালোবাসেনি। স্বামীর মৃত্যুর পরে যেমন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তেমনই কাজের লোক মতি দাসকে সে নিজের স্বামীর ব্যবহৃত শাট পরতে দিয়েছিল- “নতুন লোকটার গায়ের জামায় ভাঁজ কেটে হঠাৎ নিজের পুরনো মানুষের গন্ধ”^{১৬}। মতির প্রতি কিন্তু কোনরকম আকর্ষণের ইতিহাস আমরা খুঁজে পাই না বরং অনেক সময় তাকে ‘মতিদা’ হিসেবেও সম্বোধন করতে দেখছি। রমেনের কাছ থেকে প্রত্যাখানের পর লতিকা যখন সেই রাতেই মতিকেও আহ্বান জানায়



তখন ধরে নিতেই হয় সে অবশ্যই কাউকে কোনদিনই ভালোবাসেনি। সবটা না বুঝলেও মতি এটুকু বুঝেছে- “ ‘তার’ বদলে যেন আমি...”^{২৭}। মতি তাই নিজের আত্মসম্মান অটুট রেখে তার সাধের করতাল বুক নিয়ে একাই রাত্রিযাপন করে, আর লতিকা একরাশ একাকীত্ব নিয়ে বিছানায় পড়ে থেকে ভাবে-“ করতালটা শুধু পিতলের নয়। সুর তুলে জীবন্ত হয়...। বড্ড আফসোসে লতিকা দু ঠোঁটে বিড়বিড় করে, তবুও তো মানুষটা একজন সঙ্গীকে বুক জড়িয়ে রাত পার করল...!”^{২৮}

লতিকার হৃদয়ের অতৃপ্তি শুধুমাত্র গল্পের শেষে নয়; বরং গল্পকার শুরু থেকেই বিভিন্ন উপায়ে পাঠককে দেখিয়েছেন। যেমন- দ্বিতীয়বার যখন রমেন লতিকার সাথে দেখা করতে যায় তাদের নিভৃত আলাপের মাঝে ছিল মালতি এবং লতিকার ক্রাচ। ‘মালতি’ এবং ‘ক্রাচটিকে’ প্রতীক হিসেবে দেখা যেতে পারে এইভাবে যেমন- বৃষ্টির সন্ধ্যায় তাদের মাঝে- “পাশের কুঠুরিতে রান্নাঘর। চায়ের ছোট কেটলি কাপ ডিশ চামচ ধোয়ার শব্দ”^{২৯} অর্থাৎ মালতির উপস্থিতি। সে লতিকার হারানো কিশোরী জীবনের প্রতীক। কারণ গল্পকারের বর্ণনায়- “খোঁড়া পায়ে লতিকা কিশোরী হতে গিয়ে পারে না। সে যে সেই অতিক্রান্ত যুবতীত্বে আটকে যায়”^{৩০} চা তৈরির পরে মালতির কিশোরী কণ্ঠের ডাকে লতিকার চমক ভাঙ্গে- “নিজেরই হৃত কিশোরীত্বে সে কণ্ঠ আচমকা হানা দিল লতিকার কানে”^{৩১}। অর্থাৎ প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ মালতির মতো কিশোরী হতে চাওয়ার ইচ্ছে এই দৃশ্যে ফুটে উঠেছে। তাদের উভয়ের মধ্যে ক্রাচটিও বিশেষত্ব বহন করেছে। রমেনকে বিদায় জানানোর সময়- “ডানদিকে লতিকারানি পুরুষটানে কাছাকাছি হাঁটতে চাইলেও যে দুই ক্রাচ সামাজিক বৈধব্যের মতো বাধা দেয়”^{৩২}। রমেন যখন পূর্বের মতো আমতেলের স্বাদ পাচ্ছিলো না তখন পূর্বের আবেগকে ফিরিয়ে আনার আকুতির দৃশ্যে ধরা পড়ে নামকরণের দ্বারাই লেখক পাঠককে লতিকার হৃদয়ের অতৃপ্তির আভাস শুরু থেকেই দিতে চেয়েছেন। মনের কথা প্রকাশে ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। অন্তরঙ্গতা বা হৃদয়ের উষ্ণতা প্রকাশের মাধ্যমও এই কথা বা সংলাপ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে যখন মালতির আবির্ভাবে রমেন ও লতিকার মধ্যে মনের সাবলীল আদানপ্রদান সম্ভব হচ্ছিল না তখন বিদায় মুহূর্তে বাইরে এসে লতিকা ‘বাক্য দিয়ে ঘনিষ্ঠতা বোনে’- “সে দিন যা ভয় পেয়েছিলাম না...চাপা গলায় লতিকাকে শুধায় রমেন,...সত্যি ভয় পেয়েছিলেন...”^{৩৩} শুধুমাত্র সংলাপের বুনোনে উত্তাপ সৃষ্টি করার কৌশল গল্পকারের দক্ষতার পরিচয়বাহী। অপরদিকে, পঞ্চাশোত্তীর্ণা লতিকা যখন একই প্রসঙ্গের অবতারণা করে পুরনো মুহূর্তে ফিরতে চাইছিল- “আমি এখনও সে ভয় পুষে নাড়াচাড়া করি... -সেই ভয়ঙ্কর বয়সের ভয়?...সে রচনা তেমন উষ্ণতা জাগায় না রমেনের বুকের কোটরে”^{৩৪} স্পষ্টভাবেই তা বর্তমান মনের নিরুত্তাপ অবস্থার পরিচয় বহন করেছে।

তিন

গল্পে রমেনের মনস্তত্ত্বে দৃষ্টিপাতের পূর্বে গল্পের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুর দৃশ্য/scene-এ দৃষ্টিনিক্ষেপে দেখা যায় গল্পটি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। জীবনের মাঝখান থেকে একটি Initial incident-এর মাধ্যমে কাহিনী শুরু হয়েছে বিধবা লতিকার মৃত স্বামীর অস্থি দেড়-দুই বছর পরে বিসর্জন দেওয়ার দৃশ্যের মাধ্যমে- “রড সিমেন্টের স্ল্যাব ফেলে দুদিকে রেলিংয়ের ব্যবস্থায় স্থায়ী জেটি।... সামনে নোনা কাদা ছুঁয়ে মত্ত গাঙ। জল চলেছে ঢেউ কেটে”^{৩৫}। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে দৃশ্য স্থানান্তরিত হয়ে রমেনের স্ত্রী ও সন্তানের উপর আলো ফেলা হয়েছে। তার ছেলের জ্বর সামান্য স্বাভাবিক হতেই গল্পকার বর্ণনা

করেছেন- “মাঝখানে তিন বছরের শিশুটা রমেনের গা বেয়ে বুকের ওপর।... কোন কোষে যে অনন্ত খনন ক্রিয়া চলে। হৃদয়ের বাৎসল্যকক্ষ উন্মত্তায় ভরে যায়। সে তাপাঙ্ক পরিমাপের কোনো যন্ত্র আছে...”^{২৮}। এই দৃশ্যের পরেই তার লতিকার সাথে দেখা হয়। লক্ষ্যনীয়, এই যোগাযোগের পরে আর একবারও রমেনের স্ত্রী-সন্তানের প্রসঙ্গ আসেনি। হয়তো সাময়িকভাবে হলেও পরিবারের কথা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল মোহময় আকর্ষণের কাছে- যা বোঝাতে গল্পকার আর তার পরিবার প্রসঙ্গ গল্পে আনেননি। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে একটি বৃষ্টিদিনের প্রাকৃতিক বর্ণনা পাই, যেদিন রমেন আবেগে বিহ্বল হয়ে লতিকার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। এই প্রকৃতি তারই পটভূমি রচনা করেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে লতিকার সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় একটি দৃশ্য দেখে রমেন-

“সামনে নিকোনে উঠোন মোটা পৈঁপে গাছ... ঘাটের কাছে বাড়ির বউটা বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে... বাচ্চাটার বাবা বস্ত্রাখানেক নারকেল উঠোনের রোদে মেলে দেয়। পুকুরের জলে জোড়া হাঁস হাঁসা সাঁতার দেয়... আনন্দের রেখা”^{২৯}

প্রথমত, একটি সুখী পরিবারের দৃশ্য যা দেখে তার মনে হয় ওখানে অনেক স্বস্তি আছে! এটা হতে পারে রমেনের নিছকই মনে হওয়া অথবা তার জীবনে স্বস্তির অভাব ছিল যা একটি সুখী পরিবারকে দেখে সে উপলব্ধি করতে থাকে। মূলত, শেষ পরিচ্ছেদেও তার নিজের স্ত্রী-সন্তানের কথা মনে পড়েনি, কোনোরকম গ্লানির অনুভূতিও হয়নি। উপরন্তু মনে হয় লতিকার চেহারা পূর্বের মত থাকলে তাকে গ্রহণেও রমেনের হয়তো কোনো বাঁধা থাকতো না। প্রকৃতপক্ষে, দৃশ্যটির মাধ্যমে লেখক, পাঠককে একটি সুখী পরিবারচিত্র দেখিয়েছেন। পাঠক, কল্পনা করুন রমেনও এরকম একটি সুখী পরিবারের সদস্য হতে পারতো, বাস্তবে যা হয়নি। শুধুমাত্র তার নিজের কথা নয় দ্বিতীয়ত, মতি দাসের দৃষ্টিতেও দেখি সে বলেছে- “লোকটা ব্যথা নিয়েও যায়”^{৩০} কিন্তু এ কীসের ‘ব্যথা’? হয়তো তার পূর্বপ্রত্যাশা না পূরণ হওয়ার আক্ষেপাঘাত! (সে ভেবেছিল লতিকা পূর্বের মতোই লাভন্যময়ী থাকবে)। প্রত্যাশাই আঘাতকে আত্মহীন জানায়। শুধু লতিকা নয় রমেনও অতৃপ্তি বৃদ্ধি নিয়ে ফিরে যায়।

ভালোবাসার সাথে দেহজ কামনার গুরুত্বকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, রমেনের কাছ থেকে প্রত্যাখান প্রাপ্তির পরে চব্বিশ ঘণ্টা না কাটতেই তার মতির প্রতি এরূপ আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে লতিকা কাউকে ভালোবাসেনি। নিজের অভিসন্ধিকে সন্তুষ্ট করতে তাদেরকে ব্যবহার করেছিল। অভিসন্ধা ও পরাসন্ধার চাপে শেষপর্যন্ত তার ‘অহং’ ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে যায়। মতিও শেষ অবধি লতিকাকে একলা রেখে নিজের করতালকে বৃদ্ধি নিয়ে চলে গেল। স্বামীহারা লতিকারানি না রমেন না মতি কাউকে আঁকড়েই জীবনে সুখ পেল না- এখানেই গভীর ব্যঙ্গনা দোলায়িত হয়। তবু, মনে হয় এই তো হওয়ার কথা ছিল। ভালোবাসাহীন নিছক মোহ দিয়ে গড়া সম্পর্ক পূর্ণতা পায় কি? দেহজ সৌন্দর্য যেমন চিরস্থায়ী নয় তেমনই মানুষকে স্বীয় কামনার স্বার্থে ব্যবহার করে সুখ পাওয়া গেলেও এ যে চিরস্থায়ী না তা পাঠকেরও অজানা নয়। ‘আমতেল’- তার সুগন্ধী রেখে যায় গল্পের প্রতিটি ভাঁজে। আসলে, লতিকার এই একাকীত্বটুকুই প্রাপ্তি ছিল- সে তাই পেয়েছে অথচ তা জানা ও বোঝার পরেও তার জন্য যে পাঠকের হৃদয়ে কোথাও একটা শূন্যতার রেশ তৈরি হয়- এটাই গল্পকারের কলমের জোর, তাঁর চরিত্র বোনার অনায়াস দক্ষতা। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমতেল’ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এক ভিন্ন, স্বতন্ত্র জ্যোতি নিয়ে অক্ষয়, অমর হয়ে আছে এবং থাকবে- এ আশা করতেই হয়।



তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ ১৪০০, 'গীতবিতান', ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলিকাতা- ১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ১৬৭-১৬৮
- ২। চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৯, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ২২৪
- ৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩১
- ৪। 'Ego, superego, and id', New World Encyclopedia, 20 Sept, 2017
- ৫। Mitra P, Fluyau D (2022). "Narcissistic Personality Disorder". StatPearls. Treasure Island, Florida: StatPearls Publishing. PMID 32310461. Retrieved 1 May 2022'
- ৬। "Narcissus Greek mythology". britannica.com. Britanica. Archived from the original on 5 June 2023. Retrieved 14 September 2021
- ৭। 'Narcissistic Personality disorder', Wikipedia
- ৮। Mitra P, Fluyau D (2022). "Narcissistic Personality Disorder". StatPearls. Treasure Island, Florida: StatPearls Publishing. PMID 32310461. Retrieved 1 May 2022'
- ৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২২৩
- ১০। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২২৬
- ১১। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩০
- ১২। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৫
- ১৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৫
- ১৪। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৮
- ১৫। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৯
- ১৬। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৪
- ১৭। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৯
- ১৮। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৯
- ১৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩০
- ২০। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩১
- ২১। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩১
- ২২। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩১
- ২৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩২
- ২৪। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৬
- ২৫। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩১
- ২৬। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৭
- ২৭। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২২৩
- ২৮। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২২৭
- ২৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩২
- ৩০। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৩৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। বসু, অরুণপরতন (ভাষান্তর), তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা: স্নায়ুরোগ', ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০০৯, দীপায়ন প্রকাশনী।
- ২। সরকার, সুনীল কুমার, তৃতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৫৯, 'ফ্রয়েড (Freud: Life and Psychoanalysis)', শ্রী মহানাম অঙ্গন রঘুনাথপুর ভি আই পি রোড কলিকাতা- ৫৯, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।
- ৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, 'প্রতিচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং।

আকরগ্রন্থ:

- ১। চট্টোপাধ্যায়, বাড়েপ্তর, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৯, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং।

অতীতের ধূসর জগত সৌন্দর্য অভিসার : প্রসঙ্গ বলেন্দ্রনাথের

প্রবন্ধ

চিরঞ্জীব মুখার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সৌন্দর্য পিয়াসী বলেন্দ্রনাথ এর ইতিহাসের তথ্যস্তুপের ভিতরে জাতির প্রাণ স্পন্দন, প্রেম ও সৌন্দর্যের যুগ্ম বিহার। গৌরবান্বিত অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস, অতীতচারিতার মধ্যে যে রোমান্টিক বেদনা বোধ, মন্দির ময় ভারতে যে সাংস্কৃতিক শক্তি তাঁর ক্ষণকালীন জীবনে চিরকালীন মন্ত্র শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। পাঞ্জাবের সাথে বাগদাদের স্থানিক দূরত্ব বলেন্দ্রনাথের লেখায় হারিয়ে যায়। ইসলামি গম্বুজ মিনার আর হিন্দু দেব দেবীর চিত্র একাকার হয়ে যায়।

সূচক শব্দ: ইতিহাস, অতীত, সৌন্দর্য, প্রাচীনত্ব, উড়িয়া।

মূল আলোচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র সন্তান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা হয়েও বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে উপেক্ষিত। স্বল্পায়ু জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্য ভাঙারে অপ্রতুল দিলেও উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যে তা অনন্য। বিষয়বস্তু গ্রহণের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য, প্রগাঢ় সৌন্দর্য বোধ, বিদেশি শিক্ষা, মোহমুক্ত স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের দুর্লভ গুণাবলীর পরিচায়ক। বলেন্দ্র লেখনী ভাবে ও ভাষায় নতুন। এ ভাষা বুদ্ধি, যুক্তির ভাষা নয়, বরং অনুভূতি প্রকাশের ভাষা যেখানে ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত।

রোমান্টিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সৌন্দর্য পিয়াসী। তাঁর সৌন্দর্য সন্ধানী কবি মন পরিভ্রমণ করেছে ভারতবর্ষের তীর্থ পথে। কিট্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গি A thing of beauty is a joy for ever কে গ্রহণ করে প্রবন্ধকার তাঁর মানস দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন অতীতের দিকে। এটাই ছিল ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক কবি সাহিত্যিকের মানস পরিক্রমা। বলেন্দ্রনাথ ও অতীতের ধূসর জগত সৌন্দর্য অভিসারে যাত্রা করেছিলেন। ‘খন্ডগিরি’, ‘প্রাচীন উড়িয়া’, ‘কণারক’, ‘বারাণসী’ প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর প্রাচীনত্ব এর মোহ ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টি ও শ্রুতিকে একীভূত করেছেন। অর্থাৎ এখানে মিশ্রণ ঘটেছে একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি যা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে তাকেই লেখক এখানে প্রকটিত করেছেন আপন ছায়া স্মৃতি ঘেরা বর্ণনার মাধ্যমে। এ প্রবন্ধ গুলিতে বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি প্রগাঢ় ঐতিহ্য নিষ্ঠাও চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করেছে। নিছক তথ্য যুক্তি দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হননি, গ্রহণ করেছেন ইতিহাস আশ্রিত রোমান্স রসকে। আপন কালের সঙ্গে অতীতের যে ব্যবধান রয়েছে তাকে নিজস্ব ভাব ও ভাবনার দ্বারা সুনিবিড় ঐক্য দান করেছেন। উড়িয়ার ঐতিহ্য ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ ঐতিহ্য মূলক প্রবন্ধের সৃষ্টি। বলেন্দ্রনাথ এর উড়িয়ার প্রতি এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িয়ায় একমাত্র স্থান যেখানে মুসলমান নৃপতিগণের বিধ্বংসকারী আক্রমণের পরেও দেশের অপরূপ শিল্পকীর্তি বিনষ্ট হয়নি এবং দেব মন্দিরের পাষাণে

মসজিদের প্রাচীর নির্মিত হবার সুযোগ মেলেনি। তাই হিন্দু ধর্ম অনুরাগী শিল্প রসিক বলেন্দ্রনাথ এই উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করে ‘প্রাচীন উড়িষ্যা’, ‘উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র’ প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ইতিহাসের তথ্যস্বত্বের থেকে জাতির প্রাণস্পন্দনকে যেন আবিষ্কার করেছেন বলেন্দ্রনাথ। প্রেম ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ উড়িষ্যার প্রাচীন আত্মটিকে প্রাবন্ধিক আপন সৃষ্টির মায়াজালে আবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন – “শুধু ধর্ম নহে, শুধু ব্রাহ্মণ্যের গর্ব অথবা বৌদ্ধ সন্ন্যাস মহাত্ম্য নহে, শুধু একটা বিপ্লবের ইতিহাস নহে, কিন্তু এই দেব মন্দিরের ভাস্কর্যে এদেশের প্রশান্ত প্রাচীন সভ্যতার একটি অখন্ড চিত্র, একটি সম্পূর্ণ মহিমা চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।”^১

উড়িষ্যার বিগত দিনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এ দীর্ঘশ্বাস গৌরবান্বিত অতীতের জন্য, আজ এসব মন্দিরের নিয়মিত ঘন্টা ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হয় না। চারিদিকে শুধুই নিস্তব্ধতা, নির্জনতা। এই নির্জনতা হৃদয় কে বেদনার্ত করে তোলে। কিন্তু সে বেদনা অনুভব করবে তেমন মানুষ কই? বর্তমানে সাথে সে অতীতের সুগভীর পার্থক্য। বর্তমানে যা নিছক পাষান মাত্র, অতীতে এসবই ছিল চেতনা সমৃদ্ধ। তাই তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছেন – “... হে দুরাগত পাস্ত্র, এইখানে আসিয়া একবার তোমার পূর্বপুরুষের সমাজচিত্র দেখিয়া যাও।”^২ অবহেলিত এই সকল মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তাই লেখকের সন্দেহ জেগেছে মনে। নির্দিধায় নিজের মনে প্রশ্ন তুলেছেন – “এই উৎকলীয়েরা কি সেই কলা কুশল দিকের বংশধর? ইহাদের পিতৃ পুরুষেরাই কি স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিলাস কলার এমন অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন?”^৩

এইখানে শুধুই অতীতচরিতা কিংবা রোমান্টিক মনের পরিচয় নয়, আরো একটি বিষয় বেদনার ভাষায় রূপ পেয়েছে---তা হল লেখকের স্বদেশানুরাগ দুর্ভিক্ষ পীড়িত উড়িষ্যার প্রান্তে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত মঠ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আপন দেশের ঐতিহ্যকে বাহবা জানিয়েছেন, অস্পষ্টতাকে সহজেই ভেঙে ফেলেছেন--ভালোবাসা দিয়ে ঐঁকে দিয়েছেন পুরোনো দিনের অক্ষিত চিরকালীন সত্য স্বরূপ কে। যেখানে – “মালা এখনো গ্রথিত হয়, কিন্তু তাহার চেয়ে পূর্বাদর নাই, বীণা নীরব হইয়াছে, সু সঙ্গীত বড় শোনা যায় না। উৎসবের সময়ে উড়িষ্যার গৃহে গৃহে শুধু এক অত্যন্ত বেসুরা সানাই প্রাণপণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সংগীতের কলঙ্ক রটনা করে মাত্র।”^৪

মন্দিরের দেশ উড়িষ্যা। উড়িষ্যার ঐতিহ্যময় পথে দাঁড়িয়ে লেখক নিমেষেই পৌঁছে গেছেন সুদূর অতীতের রাজ্যে। যেখানে প্রাচীন ভারতীয় চারশিল্পের সম্যক প্রকাশ। এতো তাঁর তপস্যা। প্রাচীনত্বের সাধনার মগ্ন হৃদয় কখনো বা মন্দিরের মনোরম সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি উড়িষ্যার ধর্ম জীবনকেও স্বল্প পরিসরে গ্রোথিত করেছেন। ‘খণ্ডগিরি’, ‘উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র’ প্রভৃতি প্রবন্ধ এরই সাক্ষ্য বহন করে – খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্মযুগের সমাধি”^৫। ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধ ধর্মকে আত্মসাৎ করে সন্ন্যাস বাহুল্য হলে প্রাচীন ধর্ম ভাবনায় পরিবর্তন ঘটে। তাই লেখক বলেছেন – “... তাহারই ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া কালক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে।”^৬

তাই – “এখানে ব্রাহ্মণ নাই, শূদ্র নাই, উচ্চ নাই, নীচ নাই, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র মান, ক্ষুদ্র গর্ব এ রাজ্যের নহে।”^৭



এই সর্বলোকের, সর্বকালের দেবতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন এবং বহু দূর প্রান্তের বহু সহস্র মানুষ যে পথ দিয়ে হেঁটে আসছেন সে পথের এক অতিরমণীয় চিত্র একেছেন বলেন্দ্রনাথ। এ চিত্রের সঙ্গে পুরাতন কালের নিগুঢ় যোগসূত্র রচিত হয়েছে। তাই তিনি বলেন – “... দূরে মেঘের মতো নীল শৈলশ্রেণী কখনও ছায়াসুপ্ত, কখনও রবি কিরণে উদ্ভাসিত।”^৮

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যাকে বলেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। হিন্দু ধর্মানুরাগী শিল্প রসিক বলেন্দ্রনাথ তাঁহার উড়িষ্যার দেব ক্ষেত্র প্রবন্ধে লিখেছেন – “উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অশ্রদ্ধেয়ী পাষণ্ড শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্ত প্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরম তলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন গৌরব রক্ষা করিতেছে।...; সমস্ত উৎকল দেশ যেন দেবতার বিহার ভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।”^৯

উড়িষ্যার দেব ক্ষেত্রে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরবাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের পরিবর্তে সমন্বয় ঘটেছিল। অতীত মুগ্ধ রোমান্টিকতা আর স্বদেশপ্রেমিকতার যথার্থ মিলন গড়ে উঠেছে “বারাণসী” প্রবন্ধে। এখানেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা আছে। ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার উত্থান পতনের গভীর সম্পর্ক সূচিত হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – “... সুতরাং, যেদিক দিয়েই দেখ, বারাণসীতে আসিয়া বিপুল মানব সমাজের সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয় এবং এই সনাতন সম্বন্ধ নিবন্ধনেই বারাণসীর গৌরব ভূ-ভারতে অদ্বিতীয়।”^{১০}

এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে যে প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবি করতে পারে অনায়াসে সেটি হল “কণারক”। প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্পকীর্তির এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন কোনারকের সূর্য মন্দির, সৌন্দর্য সন্ধানী শিল্পী বলেন্দ্রনাথ কোনারকের অনিন্দ্যরূপ ঐশ্বর্য নিকেতনে প্রবেশ করেছেন এবং তন্ময় মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি সুনিপুণ রেখা পাতের সাহায্যে অতীতের মিশ্র রূপ সজীব করে তুলেছেন। কোনারকের অতীতকালীন অভিজাত ধর্মীয় মাহাত্ম্য, সূর্য মন্দিরের অনবদ্য ও অনিন্দ্য কারুকার্য এবং কলা বৈগুণ্যে বর্তমান শৈবালিঙ্গ পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয়ের বর্ণনায় যে নিখুঁত চিত্ররূপের সৃষ্টি করেছেন তা থেকে রূপদক্ষ শিল্পী বলেন্দ্রনাথের রহস্য সন্ধানী শিল্পী মনের প্রকাশ পাওয়া যায়। বালির স্তূপে প্রোথিত অতীত ভারতের ধর্ম মন্দির কোনারকের বিলুপ্ত, গৌরবময় ঐতিহ্যের চিত্রটি সৌন্দর্য সাধক শিল্পীর তুলির টানে এক অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। একটি পরিত্যক্ত নির্জন দেবালয়কে ঘিরে বলেন্দ্র হৃদয় বিস্ময়ে মুগ্ধ। একই জায়গায় বসে বিলীয়মান পুরাতনকে তিনি বিচিত্ররূপে সজ্জিত করে তোলেন আর নিজীব সজীবতা দান করেন। যেখানে এক সময় – “... কত লোকে কতদিন অন্তরের দারুণ নির্ববেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্বোধন করে, পাছে কোনদিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটান না যায়, বৃদ্ধ পিতা-মাতার অশ্রুজল বন্ধন ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে---হে দেবতা, রক্ষা করো, মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া দাও...”^{১১}

আর বহুকাল পরে – “...কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত প্রায় উপসংহার শৈবাল শয্যায্য এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে -

এবং অন্তগামী সূর্যের রশ্মি রেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতা দৃশ্যের মতো বোধ হয়।”^{১২}

বলেন্দ্রনাথের গভীর ঐতিহ্য প্রীতির স্পর্শ চিহ্নিত এই “কণারক” প্রবন্ধটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্র” প্রবন্ধের অন্তর্গত “মন্দির” প্রবন্ধটি। দুটি প্রবন্ধই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবোজ্জ্বল দুটি বিশিষ্ট ধর্ম মন্দির অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভুবনেশ্বরের মন্দির উপলক্ষ করে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য রসসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন “দেবতা দূরে নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য মিলন বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব অচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোন কালে নুতন নহে; সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান; অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না---কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছেন।”^{১৩}

দার্শনিক জটিল ধর্মতত্ত্ব কবির ব্যাখ্যা সার্থক হয়ে উঠেছে। বলেন্দ্রনাথের মত এই প্রবন্ধে প্রাচীন ঐতিহ্যে বিমুগ্ধ রোমান্টিক কবি অশ্রুনিবিড় বেদনার্ত কণ্ঠ কোথাও ধ্বনিত হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন – “ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে তাহাতে দেখিতে পাই যে, আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আমার মধ্যে শান্ত শিবমদ্বৈতম্ স্তব্ধভাবে আবর্তিত।”^{১৪}

আবার প্রবন্ধের শেষে তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেছেন – “... পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এককালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।”^{১৫}

কিন্তু বলেন্দ্রনাথ এর “কণারক” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতো ধর্মীয় তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু বিগত দিনের কোনারকের যে বৈভব আজ বিলুপ্ত তার কথা স্মরণ করে লেখক যে মর্মান্বিত তার প্রমাণ মেলে।

আর্য সমাজের কর্ম উপলক্ষে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল – “লাহোরের বর্ণনা” রচনাটি তারই প্রতিকৃতি মাত্র। যদিও রচনাটি অসমাপ্ত, তবুও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব রূপটি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। এখানেও ধূসর অতীতের মায়া বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হয়েছেন বাগদাদের অসংখ্য বিস্তৃত দিন তাঁকে অতীত মুখী করে তুলেছে। এর সাথে মিশেছে বলেন্দ্রনাথের হৃদয়বেগ। বর্তমান লাহোরের মধ্যে লেখক দেখেছেন আরব্য মরীচিকার ছায়া। তাই তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন – “পাঞ্জাবের আতপ্ত আকাশপটে লাহোর সহরটি যেন আরব্যোপন্যাসের প্রাচীন খলিফা দিগের একটি অতি পুরাতন পরিত্যক্ত রাজধানী। হারুণ-অল-রসিদ-শাসিত বাগদাদের সে নিত্যোৎসবময় পুরাতন সমারোহ এখানে এখন দুর্লভ--- রাজপথে ছদ্মবেশে খলিফারাও ভ্রমণ করেন না এবং নিত্য নিশীথে নুতন নুতন উপন্যাস সুলভ ঘটনাও সংঘটিত হয় না---কিন্তু তথাপি ইহার গম্বুজে মিনারে, তোরণে প্রাচীরে, গৃহদ্বারে অলিন্দে, বাটীর সম্মুখের বিচিত্র খোদিত গোল বারান্দায়, বাতায়নে গবাক্ষে, ইহার আঁকাবাঁকা অপ্রশস্ত রাজপথ ও অসংখ্য গলিপথে এবং এই সকল পথের বিচিত্র বেশী জনতায়...খালিফী বাগদাদের কাহিনী মনে পড়ে, এবং নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে ও অবাধ প্রচুর সূর্য কিরণে মনে যেন আরব্য মরীচিকার ছায়া ঘনাইয়া আসে।”^{১৬}



ভারতবর্ষীয় সৌন্দর্য বিচারের প্রতি তিনি মুগ্ধ ছিলেন। “হিন্দু দেবদেবীর চিত্র” প্রবন্ধে লিখেছিলেন – “দেবতা প্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানব চরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্যটুকু অনুভব করিয়াছে, তাহাতে একটি নির্দিষ্ট গঠন দেয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই জন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেব ভূমিতে আসিয়া হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর কিছুতে নহে।”^{১৭}

এই ‘অন্তরতম অন্তর সুন্দর’ই বলেন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎস। কখনো বা দেব দেবীর চিত্রাঙ্কন এ মানবীয় জীবন ব্যঞ্জনা কে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৌন্দর্য সাধক বলেছেন – “... এই মৃত্যুই মর্তের প্রধান সৌন্দর্য -পৃথিবীর সকল সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম এই যে সকলই আছে, অথচ সর্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতে ইহলোকে সকল সুখ-দুঃখ নিহিত।”^{১৮}

‘দিল্লীর চিত্রশালিকা’ প্রবন্ধে লেখকের হৃদয় অতীতচারী। অতীত পৃথিবীর বাদশাহী আমলের বিলাস বর্ণনা করেছেন তিনি এই প্রবন্ধে। বিস্মৃতির অবগুষ্ঠণে ঢাকা পড়লেও ভারতবর্ষের কত শত রূপময় ছবি প্রাবন্ধিকের অনন্য সাধারণ ব্যাখ্যার গুণে আমাদের দৃষ্টিতে যেন মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। তাঁর কথার গুণে, গদ্যরীতির আভিজাত্যে বিলুপ্ত নগরীর স্মৃতি নতুনতর রূপ লাভ করেছে। বলেন্দ্রনাথ একটার পর একটা পাতা উল্টেছেন আর পাঠককুল যেন এক প্রাচীন প্রাচ্যচিত্রকলার মহৎ রূপের সন্ধান পেয়েছে। ভারতবর্ষীয় রূপের তীর্থে শিল্পী যেমন পরিভ্রমণ করেছেন তেমনি আবার সেইরূপের পথেই আমরাও হারিয়ে গেছি বার বার। রাজকীয় বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পীর গদ্যরীতি ও যেন রাজকীয় হয়ে উঠেছে – “চিত্রিত প্রাসাদ কক্ষে যেরূপ ঘন নিবিড় কোমল বিচিত্রাভপুষ্পিত পারস্য গালিচার উপরে উষ্ণীষশোভিত শির সুদীর্ঘচাপকাননিবন্ধবপু রাজ সভাসদগণের আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে, ওই রূপ পুরু খাপী কুসুম সুকুমার স্পর্শ নানা পুষ্প লতা বিচিত্র গালিচার উপরে কনককারু খচিত আমেদাবাদী কিং খাবের গোলাপমন্ডিত গুটিকতক সুগঠিত গভীর আরাম উপাধান বৈ আর বড় কিছু থাকিবে না।...”^{১৯}

এই বর্ণনার গুণে বহুদিন সুগু সৌন্দর্য জেগে উঠেছে, ভারতীয় শিল্পের গৌরব সূচিত হয়েছে। বর্ণনার ধ্বনি গৌরব এবং চিত্রধর্মিতার খুব সহজেই লেখক হৃদয়ে আত্মিক যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি তাঁর ভাব বিভোরতা। পৃথিবীর এইসব দুর্লভ রূপের সন্ধান করেছেন তিনি। ‘দেয়ালের ছবি’ ও ‘দিল্লীর চিত্রশালিকা’-এ দুটি প্রবন্ধে ভাব এবং রূপগত মিল আছে। সৌন্দর্যপিপাসু তরুণের চোখে পৃথিবীর রূপ যেন মায়াজাল পরিয়ে দিয়েছে। এমনকি প্রাবন্ধিক নিজেই সে কথা স্বীকার করে বলেছেন – “এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরি রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি আর আমার মনের মধ্যে ইহার জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মতো আসে যায়, বিচরণ করে। আমি ইহাদের সুখ দুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই।”^{২০}

পরিশেষে বলা যায় যে, বলেন্দ্র প্রতিভা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রবন্ধের কঠিন শিল্পশৈলীতে কালজয়ী সাফল্য দেখিয়েছিলেন। তার প্রতিভা ছিল অসমাপ্ত, পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই তা অন্তমিত হয়েছে। তবুও বলেন্দ্রনাথকে অ-রচিত বাংলা স্টাইলিস্ট গদ্যের মহানায়ক বলতে দ্বিধা নেই। তাঁর রচনায় বহুলতা না থাকলেও বৈচিত্র ছিল। ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা এবং বিপরীতমুখী প্রবণতা তাঁর সাহিত্যকর্মের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষণকালীন জীবনে প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন বলেন্দ্রনাথ, সঙ্গে যোগ হয়েছিল

ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আর তাতেই বিস্ফোরণ ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিতে। ইতিহাসের তথ্যতুপ থেকে জাতির প্রাণ স্পন্দনকে আবিষ্কার করার দুর্লভ অন্তস্পর্শী দৃষ্টি বলেন্দ্রনাথের ছিল বলেই তিনি নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং নতুন দিগন্ত উৎসারিত করে দিয়েছিলেন। এখানেই প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘প্রাচীন উড়িষ্যা’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫২০
- ২। তদেব, পৃ. ৫২০
- ৩। তদেব, পৃ. ৫২৩
- ৪। তদেব, পৃ. ৫২২
- ৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘খণ্ডগিরি’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭; পৃ. ৫০৮ ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪৯৯
- ৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪৯৯
- ৭। তদেব, পৃ. ৪৯৫
- ৮। তদেব, পৃ. ৪৯৬
- ৯। তদেব, পৃ. ৪৯৫
- ১০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘বারাণসী’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৩০
- ১১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘কণারক’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫১৮
- ১২। তদেব, পৃ. ৫২০
- ১৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বিচিত্র প্রবন্ধ, ‘মন্দির’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪০১, পৃ. ৯৩
- ১৪। তদেব, পৃ. ৯৬
- ১৫। তদেব, পৃ. ৯৬
- ১৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘বোম্বায়ের রাজপথ’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৩১
- ১৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘হিন্দু দেবদেবীর চিত্র’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৪১৭, পৃ. ৬০
- ১৮। তদেব, পৃ. ৬০
- ১৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘দিল্লীর চিত্রশালিকা’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৪২
- ২০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘দেয়ালের ছবি’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪১৭।

মধু-মানসের সন্ধানে

সায়ক মুখার্জি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
সূর্যমণিনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতক আক্ষরিক অর্থেই পরিবর্তনের কাল। নতুন চিন্তাধারা আর শিক্ষার নব উন্মেষ এই সময়ের মননে যে কল্লোল তুলেছিল তাতে সৃষ্টি হয়েছিল এমন কিছু প্রতিভা যাঁরা হয়ে উঠেছেন পথিকৃৎ। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার শুধু নয়, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চেতনার বিস্তার, নানান দর্শনের সঙ্গে পরিচিতি এই সময়ের যে ব্যক্তিত্বদের আমাদের সামনে উপস্থিত করে তার মধ্যে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) অন্যতম। মাইকেলের সাহিত্য উনিশ শতকের নবজাগৃত জাতীয়তাবাদের উন্মেষপর্বে এক নবতর অনুপ্রেরণা দেয়। শুধু নয়, ঔপনিবেশিকতার সেই আবধ্য সময়ে মধুকবি হয়ে ওঠেন স্বাদেশিকতার প্রথম যুগের উদ্যোগীদের একজন। এ প্রবন্ধে আমরা মধুসূদন দত্তের মনস্তত্ত্বের সেই দিকটিতেই আলোকপাত করব।

সূচক শব্দ: ঔপনিবেশিক পর্ব, মধুসূদন দত্ত, জাতীয়তাবাদ, নাটক, কাব্য, উনিশ শতক।

মূল আলোচনা: উনিশ শতক দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের কাল। বিভিন্ন বিপরীতমুখী চিন্তাস্রোতের এমন বিচিত্র সমাবেশ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুব বেশি ঘটেনি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাজগতে যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা নাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলার সমাজ জীবনকে। সাধারণভাবে এই কারণেই এই সময়কে নবজাগরণের কাল বলেন অনেক সমালোচক। পঞ্চদশ শতকে ইতালির রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই অভিহিতকরণ। ইতালিতে মানুষের চিন্তায়-ভাবনায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে সেসময়। খ্রিস্ট ধর্মের নিয়ন্ত্রণ, সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং চার্চের চোখ রাঙানিকে তুচ্ছ করে একদল মানুষ প্লাবিত হয়েছিল নবজীবনের নতুন মন্ত্রে। দান্তের কবিতায় যার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও, পেত্রার্কের কবিতা ছিল তার জ্বলন্ত ইস্তাহার। তাছাড়াও ভার্জিল, তাসো প্রমুখ লেখকের পাশাপাশি ছিলেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফায়েলের মতন শিল্পীরা। সব মিলিয়ে পঞ্চদশ শতকে ইতালির নবজাগরণ এক নব অভ্যুদয়ের নবীন যাত্রা। উনিশ শতকে বাংলার সমাজ মননেও এ ধরনের এক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের সমস্ত গোঁড়ামি, অন্ধকার, ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং যাবতীয় দৈবিক জীবনবিমুখ ধারণার প্রতিকল্পে ঐহিক জীবনবাদী এবং মানবতাবাদী ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও জীবনবোধের চর্চা এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরলোকের পরিবর্তে ইহলোক, আত্মার পরিবর্তে দেহ আর অবাস্তব জীবনবিমুখতার বিপরীতে প্রবলভাবে বাস্তব, যুক্তিবাদ আর নশ্বর জীবনের জয়যাত্রার সে ছিল এক সূচনালগ্ন। মানুষকে এই আধুনিক ভাবনায় ভাবিয়ে তুলেছিল ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। ইংরেজি শিক্ষার ফলেই এইসব সম্ভব হয়েছিল। একইসঙ্গে বহু মানুষ, যাঁরা নতুনভাবে ভাবছিলেন তাঁদের একত্র সমাহার আমাদের বিস্মিত করে। ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, বিশ্বাসের পরিবর্তে বিজ্ঞান এবং সমর্পণের পরিবর্তে প্রশ্ন এযুগের মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। প্রচলিত সমস্ত সামাজিক

নিয়ম-কানুন এবং বাধাবন্ধ তাই তুচ্ছ হয়ে গেল। ‘হিন্দু কলেজ’-এর প্রতিষ্ঠা (১৮১৭) থেকে শুরু করে নানান সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ এবং বিতর্ক উনিশ শতকের চিন্তাজগতকে প্রভাবিত করেছিল। ইয়ংবেঙ্গল এবং তার সমসাময়িক ব্যক্তিত্বের প্রয়াস এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল। আবার, বিপরীত ভাবনার মানুষেরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে। ‘জ্ঞানান্বেষণ’, ‘সোমপ্রকাশ’-এর মতো প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ‘সমাচার চন্দ্রিকা’, ‘নববাবুবিলাস’-এর মতো রক্ষণশীল পত্রিকা বা বই। প্রাচীন ও নবীনের এই দ্বন্দ্ব ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর প্রকাশক তথা সেই সময়ের জনপ্রিয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ধরা পড়েছে।

“কালগুণে এই দেশে, বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর, নাহি সরে রব।।
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট, গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে, মূর্গি মাস নিয়া।।
একদিকে কোষাকুষী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে, ডেবিলে খায় খানা।।
ভূতের সংসারে এই, হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত!
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফ্যালাে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে!
বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব, জন্তু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে ঈশু।।
হাসি পায় কাল্মা আসে, কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী, আর নাহি থাকে।”^১

নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুয়ানীর হেঁসেল ছেড়ে খ্রিস্ট ভজনার যে পথ সে সময়ে বেছে নিয়েছিল তাতে খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরাগের চেয়েও বেশি ছিল নিজ অবস্থার প্রতি বিমুখতা। রঘুনন্দনের শাসন লক, হিউম, রুশো, ভলতেয়ারের পাঠকদের বেঁধে রাখতে পারেনি। তাই এই বিরোধ। ইংরেজ তখনও বিদেশি শাসক হয়ে ওঠেনি, বরং তাদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় ভারতীয়দের হীনাবস্থা এই উদ্দীপ্ত শিক্ষিত সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার বাণী সেই উদ্দীপনাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। হতচকিত বাঙালি সমকালীন দুর্দশাগ্রস্ততার উত্তরে তার প্রাচীন ইতিহাসের দ্বারাে করাঘাত করে অনুসন্ধান করতে চাইল অতীত রত্নরাজির। তাই, প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে শুরু হল তীব্র সংগ্রাম। রামমোহনের হাতে যার সূত্রপাত, বিদ্যাসাগরের সময়ে তার পূর্ণ বিকাশ। সব মিলিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে জাতীয়তার উন্মেষ তা আমাদের পৌঁছে দেয় বিশ শতকের রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে। এই শতকের শেষেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) এবং তারও আগে নানান সমাজসংস্কারমূলক প্রয়াস বাঙালি নিতে পেরেছিল তার এই জাগৃতির কারণে। বিদ্রোহ, মানবতাবাদ আর প্রশ্ন করার অধিকার—আধুনিকতার এই অপরিহার্য তিনটি লক্ষণ এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর সেই উনিশ শতকেরই মানসপুত্র মধুসূদন।



যশোরের সাগরদাঁড়ির রাজনারায়ণ দত্ত আর জাহ্নবী দেবীর পুত্র মধুসূদন কলকাতায় এলেন তাঁর কৈশোরেই। এই কৈশোর অবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল এক স্বাতন্ত্র্যবোধ। তা তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনেও বরাবর অম্লান থেকেছে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা তাঁকে চিহ্নিত করবে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি হিসেবে। প্রথম আধুনিক মানুষ রামমোহনের উদার ভাবনাই যেন মূর্ত হয় বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবির মানসে। স্বদেশ বা স্বদেশিকতা বলতে ঠিক যা বোঝায় তা বাঙালির বৌদ্ধিক চর্চায় তখনও স্পষ্ট না হলেও তার প্রকরণগুলি অঙ্কুরিত হচ্ছিল মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যসাধনায়। একেবারে ছোটবেলায় পল্লিবাংলার স্নেহসিঞ্চিত প্রকৃতি তার শ্যামল প্রান্তর কপোতাক্ষের শান্ত স্রোতধারা মধুসূদনের শিশুমনে চিরস্থায়ী যে প্রভাব ফেলেছিল তা শত ঝঞ্ঝাতেও মুছে যায়নি। পরবর্তী জীবনে নানান চিঠিপত্রে কিংবা কবিতার আড়াল থেকে হঠাৎ করে যেন এক ঝলক পল্লিবাংলা উঁকি দিয়ে গেছে।

“প্রকৃতির অতি সৌন্দর্যময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্যশোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর, এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য, তাহার কোনটিরই সেখানে অভাব নাই। ...কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয় তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রাচীন বট বা অশ্রুথ বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটি মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ।”^২

প্রবাসে দৈবের বশে যখন তিনি বিপর্যস্ত সেসময়েও তাঁকে কপোতাক্ষ তীরের বাল্যবেলার সেই স্মৃতি খানিক শান্তনা দিয়েছে। পিতা রাজনারায়ণ সহ বাড়ির অনেকেই কাব্য ভালোবাসতেন। জাহ্নবী দেবীও ছিলেন সঙ্গীতের অনুরাগী। তাঁর কাছেই শিশু মধুসূদনের রামায়ণ-মহাভারতের প্রথম পাঠ। সঙ্গীতপ্রিয়, নরম স্বভাবের শিশু মধুসূদনের কিন্তু গ্রামের নিশ্চিন্ত নিবিড় ছায়ায় বেশিদিন ঠাঁই হল না। তবে, স্বদেশকে জানার গুরুটা হয়ে গিয়েছিল সাগরদাঁড়িতেই। সদর আদালতের প্রভাবশালী উকিল মুন্সি রাজনারায়ণ তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতার ‘হিন্দু কলেজ’-এ। সেটা ১৮৩৭ সাল। ‘হিন্দু কলেজ’-এ মধুসূদনের ছাত্রজীবন ঘটনাবল্। এই কলেজেই পড়িয়েছেন ডিরোজিওর মতো অধ্যাপক। যদিও তাঁর জীবন শেষ হচ্ছে ১৮৩১-এ, আর মধুসূদন আসছেন তার ছ’বছর পরে। তবু সেই সময় পর্যন্ত ডিরোজিওর যুক্তিবাদী চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কলকাতার শিক্ষিত তরুণদের। এই ডিরোজিওই কিন্তু প্রথম, যিনি ভারতভূমিকে মাতৃ সম্বোধন করেন, যাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে অতীত ভারতের গৌরব।

“স্বদেশ আমরা! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্ত্রে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগন-বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার

দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
 দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
 অশ্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
 কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ,
 তার কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
 এ শ্রমের একমাত্র পুরস্কার গণি,
 তব শুভধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!”^৩

এই কলেজেরই শিক্ষক ছিলেন ডি. এল. রিচার্ডসন। তাঁর কাছেই মধুসূদনের ইংরেজি শিক্ষায় হাতেখড়ি। রিচার্ডসন নিজেও ছিলেন কবি। কবিতা, থিয়েটারের প্রতি উৎসাহী করে তোলার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনা করা এবং একইসঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তিনি ছাত্রদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন জ্ঞানের নতুন দিগন্ত। ইংরেজি ভাষার মাধুর্য মধুসূদনের কাছে নিবিড় হয় এই ‘হিন্দু কলেজ’-এই। আর তাঁর মনে কবি হওয়ার—মহাকবি হওয়ার প্রবল বাসনার সূত্রপাতও এই সময়েই। গণিতের কৃত্রিম হিসেব বাদ দিয়ে তিনি জীবনকে খুঁজতে চেয়েছিলেন কবিতায়। তাই একক প্রচেষ্টায় শুরু করেছিলেন হাতে লেখা পত্রিকা, লিখেছেন প্রবন্ধ যাতে বলেছেন নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। আমরা স্তম্ভিত হই এক সদ্য যুবকের এই পরিণত ভাবনা দেখে।

“In India, I may say in all the Oriental countries women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it.”^৪

এই ‘হিন্দু কলেজ’-এই মধুসূদনের কবিতা লেখার শুরু। ১৮৪২ সালের মধ্যেই তাঁর বেশ কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। সে কবিতায় যেমন রয়েছে কোনও এক অনির্দেশ্য নারীর প্রতি অনুরাগ, তেমনই রয়েছে এক দেশের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। যে দেশ বহুদূরের। ইংল্যান্ড তখনও শাসকের বাসভূমি নয়, মধুর মতো অনেক যুবকেরই কাছে নাব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধাত্রীভূমি। তাই সে দেশে যেতেই হবে। কবি হব, খুব বড় কবি—মধুসূদনের এ বাসনার লালন-পালন চলছিলই। আর তাতে ক্রমাগত উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন ভূদেব, গৌরদাসের মতো বন্ধুরা।

“I sigh for Albion’s distant shore,
 Its valleys green, its mountains high;
 Tho’ friends, relations, I have none
 In that far clime, yet oh! I sigh



To cross the vast Atlantic wave
For glory, or a nameless grave!"^৬

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সদ্য প্রকাশিত কবিতার বইয়ের ভূমিকা ও টীকা পড়ে মধুসূদন স্বপ্ন দেখেন এমনই এক কাব্যগ্রন্থ রচনার, যা হবে সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সৃষ্টি। এই উচ্চাশা বাংলাদেশের কোনও এক কিশোরের পক্ষে খুব বড় ধরনের স্বপ্ন বললে মধুসূদনকে বোঝা যাবে না। ‘হিন্দু কলেজ’-এর তাঁর সহপাঠীদের বর্ণনায় পাচ্ছি মধুসূদনের প্রবল স্বাধীন ব্যক্তিত্বের টুকরো টুকরো ছবি। প্রতিদিন নতুন নতুন কবিতা লিখে (অবশ্যই ইংরেজিতে) বন্ধুদের চমকে দেওয়া, কখনও এক মোহর দিয়ে চুল ছাঁটা, কিংবা ইংরেজি উচ্চারণে সাহেবিয়ানা বা ইংরেজদের মতো পোশাক এ সমস্ত কিছুই মধুসূদনই যেন একটিই প্রচেষ্টা— নিজেকে শ্বেতাঙ্গদের সমান বলে পরিগণিত করা। উপনিবেশিত ভারতবর্ষের এক যুবকের পক্ষে এই ভাবনা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। দেশ তো একটা বিমূর্ত ধারণা। পরিবেশ, মানুষ, তার ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, সমস্ত কিছু মিলিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে স্বদেশ। এই ধারণার প্রাথমিক একক হল ব্যক্তিমানুষ। যে যুগে বাঙালি তথা ভারতীয়রা ইংরেজদের তুলনায় নিজেদের জেনেছিল Sub-human বলে, নিজেদের সংস্কৃতিকে স্থান দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতির অনেক নিচে; সেই যুগেই একজন যুবক বিশ্বাসে-ব্যবহারে, বহিরঙ্গে-অন্তরঙ্গে প্রাণপনে অস্বীকার করেছিল সমস্ত অসাম্যকে। ইউরোপীয়দের পাশে স্বীয় স্থান দাবি করেছিল মানবতার স্বাভাবিক অধিকারে। বাবা-মায়ের নির্ধারিত কন্যাকে বিবাহ না করে নিজ ইচ্ছেকে প্রাধান্য দেওয়াও সেই স্বাধীন চিন্তেরই আরও এক প্রয়াস। শুধু তাই নয়, কোনও এক অশিক্ষিত, অপরিচিত কন্যার সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে—এমন সাধারণ তো মধুসূদন নন কখনই। তাই বোধহয় ধর্মত্যাগের পরিকল্পনা—সেও একান্ত গোপনে। ১৮৪৩-এ যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছেন মধুসূদন, তাঁর বন্ধুদের কেউই তা জানতেন না।

‘হিন্দু কলেজ’-এ মধুর পড়া হল না। ‘বিশপস কলেজ’-এ ঠাঁই নিলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও সাদা আর কালোর তারতম্য। পোশাক বিধি নিয়ে বা পানীয়ের সমবন্টনের দাবিতে মধুর প্রতিবাদ—সেও তো এক অনমনীয় ব্যক্তিত্বেরই স্বাক্ষর। মধুসূদনের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি যুক্ত করে পড়লে আমরা দেখতে পাই মাথা নত করে ছোটো হয়ে টিকে থাকার যেকোনও ন্যূনতম সম্ভাবনাকে তিনি বিনাশ করেছেন অঙ্কুরেই। চেয়েছেন বড় কবি হতে। শুধু বড় কবি হতে নয়, একজন ঋজু আধুনিক মানুষ হতে। সেই নীতি মেনেই তাঁর কাব্যচর্চা। তাই কিটস, বায়রন, মিলটনের ভাষাকে আয়ত্ত করে তাঁদেরই কবিতা উৎসর্গ করে তাঁদের মতো হবার অদম্য প্রচেষ্টা। মধুর জীবনে সমস্ত কিছুই এমন আচমকা ঘটেছে যার পূর্বাভাস ছিল না কোথাও। আকস্মিকভাবেই ‘বিশপস কলেজ’ থেকে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওনা তাঁর জীবনের আর একটা বাঁক। সম্পূর্ণ সহায়সম্বলহীন অবস্থায় পিতার আশ্রয় ছেড়ে, মায়ের চোখের জলকে পিছনে ফেলে যে মধুসূদন মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন আর প্রায় সাত বছর পর যিনি ফিরে এলেন তাঁদের মধ্যে তফাৎ বিস্তর। এর মধ্যে বাংলাদেশেও ঘটে গেছে বেশকিছু সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন। মাদ্রাজে মধুসূদনের কর্মজীবন বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। শিক্ষকতা করেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন আর সেই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। ১৮৫১-তে ‘Hindu Chronicle’ সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছেন, ‘Madras Circulator and General Chronicle’, ‘Athenaeum’ ও ‘Spectator’ নামের পত্রিকাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমনকি ‘Athenaeum’-এর প্রধান

সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন কিছুদিন। বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে থাকলেও এদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনার দিকে তাঁর নজর ছিল। এই মাদ্রাজ প্রবাস কবিযশ প্রার্থী মধুসূদনের প্রস্তুতিপর্ব। স্বপ্নলোকের নীলনয়না ততদিনে অপস্রিয়মান। মধু নেমে আসছেন বাস্তবে। এ এক আত্মবিখণ্ডনের সময়। তাই ‘Timothy Penpoem’ ছদ্মনাম গ্রহণ। টিমোথি অর্থাৎ একধরনের তৃণ যাকে রোপণ করা হয়েছে বিদেশে। আবার, এই সময়ের কবিতাগুলির শিরোনামে উদ্ধৃত থাকত, ‘Disjecta Membra Poetae’। যার মানে করলে হয়, এ তো কবিতা নয়, এ হল বিভাজিত কবির বিচ্ছিন্ন দেহাংশ। বারো মাসে তের পার্বণের দেশের ছেলে মধুসূদনের স্বেচ্ছা-নির্বাহিত এ প্রবাস। তবু, অন্তরে সেই পল্লিবাংলার আহ্বান তাঁকে উন্মনা করে। ‘মাদ্রাজ সার্কুলেটর’-এর মতো বড় পত্রিকায় এসময়ে তাঁর যেকটি কবিতা প্রকাশিত হল তার একটিতেও সেই বাংলারই ছবি। কবির স্বীকৃতি মাদ্রাজ দিয়েছিল ‘ক্যাপটিভ লেডি’-র লেখককে। আর দিয়েছিল ‘ফিমেল আরফ্যান অ্যাসাইলাম’-এর পিতৃ-মাতৃহীন ছাত্রী রেবেকা ম্যাকটাভিসের সাথে পরিচয়, প্রেম আর নিবিড় সান্নিধ্যের সুযোগ। কিন্তু, ক্যাপটিভ লেডি পড়ে বেথুনের মন্তব্য তাঁকে খানিকটা যেন সচেতন করিয়ে দিল তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। যদিও মধুসূদনের মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তি শুধুমাত্র বেথুনের কথায় যে ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চার প্রয়াস ত্যাগ করেছেন এমনটা নাও হতে পারে। কেননা, এর কিছু আগে অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯-এ এক চিঠিতে বন্ধু গৌরদাসকে তিনি লিখছেন,

I say, old Gour Dass Bysack! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana, Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old, Gour Dass Bysack?^৩

আগেই বলেছি এই সময়টা মধুসূদনের হয়ে ওঠার কাল। ততদিনে তিনি জেনে ফেলেছেন কবিতা তাঁকে লিখতে হবে তাঁর নিজের ভাষাতেই। মাতৃভাষার অমূল্য রতন যা অবোধ স্বপ্নবিলাসিতায় অবহেলা করেছেন সেই হবে তাঁর ভবিষ্যত অবলম্বন। তাই যেন তিনি তৈরি হচ্ছেন। ১৮ আগস্ট ১৮৪৯-এ আরও এক চিঠিতে সেই গৌরদাসকেই লিখছেন,

“Perhaps you do not know that I devote several hours-daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?”^৪

স্বাদেশিকতার পথে একলা পথিক যে মধুসূদনকে আমরা আবিষ্কার করতে চাইছি এতক্ষণ ধরে, তাঁর ব্যক্তিজীবনের খানিক খানিক অংশ আলোচনার পর এবার আমরা বলব তাঁর সাহিত্যজীবনের কথা। ১৮৫৬ সালে মধুসূদন আচমকাই রেবেকা আর তাঁর সন্তানদের ছেড়ে মি. হোলট ছদ্মনামে প্রায় পালিয়েই আসেন কলকাতায়। তখন তিনি আবার কপর্দকশূণ্য। বন্ধুদের সহায়তায় গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থাটুকু হল। কিন্তু যিনি মহাকাব্য লিখবেন, বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছে দেবেন আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে, তাঁর তো আদালতের কেরানি হয়ে থাকলে চলে না। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তখন মঞ্চস্থ হবে ‘রত্নাবলী’ নাটক। তা অনুবাদের ভার

পড়ল মধুসূদনের উপর। সেটি করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন বঙ্গরঙ্গভূমির দুর্দশার কথা। মধুসূদনের জীবনে একটি শব্দ যদি বারবার ফিরে এসে থাকে তা হল চ্যালেঞ্জ। ‘রত্নাবলী’ নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন মধুসূদন। আর তৎক্ষণাৎ তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর পথ। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রচনা করলেন ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক। বিষয়বস্তু পৌরাণিক হলেও প্রকাশভঙ্গিতে তা আধুনিক। পরবর্তীকালের ‘কৃষ্ণকুমারী’ বা ‘পদ্মাবতী’ নাটকের ক্ষেত্রেও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তিনি। তবে আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করব ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনা সঙ্গীতের দিকে।

“শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।

উঠ, তাজ ঘুম ঘোর, হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।”^৮

এ আহ্বান উপনিবেশিকতার প্রথম যুগে একেবারে নতুন বইকি। যে সূর্যকে প্রাচীতে উদিত হতে দেখলেন নাট্যকার তার ছটা একদিন ছড়িয়ে পড়বে গোটা বিশ্বময়—এ তো জাতীয়তাবাদেরই পূর্ব ঘোষণা। কিন্তু, জাতি গঠনের এই পথ বড় বন্ধুর। এখানে আত্মসমালোচনার কঠিন শাসনেই অগ্রসর হতে হয়। তাই তো, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনে মধুসূদন যে শ্রেণিকে তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করলেন, তাঁর নিজেরও সংলগ্নতা ছিল সমাজের সেই অংশের সঙ্গেই। এই সময়ের দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে এ পত্রিকার সম্পাদনার ভার কিছুদিনের জন্য নেন মধুসূদন। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন সেকালে ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ ছিল স্বদেশী চিন্তার অন্যতম রাজনৈতিক পত্রিকা। হরিশচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যা তখন মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন,

“হরিশের মৃত্যু দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক হইবে, এ সময়ে স্বাধীন চিন্তার পক্ষ সমর্থন করিতে তাহার মত আর কেউ নাই।”^৯

আবার ১৮৬৪ সালে ‘নীলদর্পণ’-এর অনুবাদ মধুসূদনকে কী ভীষণ লাঞ্ছনার মুখোমুখি করেছিল সে খবরও অনুসন্ধিৎসুরা নিশ্চয়ই রাখেন। এই অপরাধে তাঁকে চাকরিচ্যুত হতে হয়। স্বদেশের জন্য মধুসূদনের এই ত্যাগ সাধারণভাবে যাঁরা তাঁকে বিজাতীয় বলে চিহ্নিত করতে চান তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

বলছিলাম, চ্যালেঞ্জের কথা। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাথে কথায় কথায় বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলনের চ্যালেঞ্জটাও নিয়ে ফেললেন মধুসূদন। ১৮৬১-তে প্রকাশিত ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য সেই চ্যালেঞ্জেরই সার্থক পরিণতি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন শুধু নতুন একটা কিছু করা নয়, পয়ারের কৃত্রিম বন্ধন ছিন্ন করে শব্দের অর্থকে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এখানেও সেই বাঁধন ছেঁড়ার প্রচেষ্টা। রামায়ণের প্রচলিত আখ্যান আধুনিক কবির হাতে নূতনতর ব্যাখ্যায় ধরা দিল। আমরা পেলাম বাংলা ভাষার সার্থক মহাকাব্য। কিন্তু আমাদের প্রাপ্তি এত সামান্য নয়। চিরাচরিত সংস্কারের পরিবর্তে এ মহাকাব্য আমাদের পৌঁছে দিল এমন এক ভাষ্যে, যেখানে কবির সহানুভূতি পরাজিতের প্রতি। যিনি বীর, তবু

ভাগ্যবিড়ম্বিত। সেই মেঘনাদ কিংবা রাবণকে তিনি পরিয়ে দিলেন জয়টিকা। আক্রমণকারী রাম-লক্ষণ আর আক্রান্ত রাবণ-মেঘনাদের মাঝে মূর্ত হল দেশ। স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গের এ উদাহরণ মধুসূদন নিশ্চয়ই দেখেছেন তাঁর কাব্য রচনার বছর চারেক আগে সংঘটিত মহাবিদ্রোহে। যদিও তাঁর চিঠিপত্রে তার কোনও উল্লেখ নেই। তবু কী আশ্চর্য রাম-রাবণের প্রচলিত আখ্যানের এই বিপরীত ভাষ্যই কিন্তু দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের। তাই তো বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বারবার উদ্ধৃত করেন এই কাব্য থেকে। আবার, হিন্দু পুনর্জাগরণের অন্যতম পথিকৃত স্বামী বিবেকানন্দ দরাজ প্রশংসা করেন এ কাব্যের। একইসঙ্গে ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দেন এর নিন্দুকদের প্রতি।

“তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। আগে ভাল করে দেখ, লোকটা কি বলছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা ছুঁচো বধ কাব্য লেখা হল! তা যত পারিস্ লেখনা, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই য়াঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব critic-দের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?”^{১০}

স্বদেশ নির্মাণের স্বপ্নে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, তার আর একটি ভরকেন্দ্র হল নারী শিক্ষা। নারীকে শিক্ষিত করতে হবে, তাকে করে তুলতে হবে প্রকৃত অর্থেই আধুনিক, ভাঙতে হবে অবরোধ। এই ছিল সেকালের মূল কথা। আর, কাব্যে এই চেতনার সূত্রপাত মধুসূদনের হাত ধরেই। যোদ্ধবেশে প্রমীলার যে ছবি ‘মেঘনাদবধ’-এর কবি এঁকেছেন তা কল্পিত দেবত্বের কৃত্রিম আসন থেকে নারীকে পুরুষের সহযোদ্ধা করে তোলার সফল, সাহসী দৃষ্টান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর এই স্বচ্ছন্দ বিচরণ মহাবিদ্রোহের সময় আমরা দেখেছি। কিন্তু মধুসূদন যেন তাকে ঐশ্বর্যে অলঙ্কারে মহিমাম্বিত করে অমর করে রাখলেন।

দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুলবধু;

রাবণ শ্বশুর মম; মেঘনাদ স্বামী;—

আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;

দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?”^{১১}

মধুসূদনের কাব্য পরিক্রমায় নারীর উপস্থিতি কেন্দ্রীয় ভূমিতে। তাই তো রাবণ, মেঘনাদ, রাম, লক্ষণের পাশাপাশি প্রমীলা, মন্দোদরি, সীতা, সরমা স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল। তাই তো তাঁর কাব্যের নাম ‘তিলোত্তমাসম্ভব’, ‘ব্রজাঙ্গনা’; নাটকের নাম ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘কৃষ্ণকুমারী’, ‘পদ্মাবতী’। তারা কখনও যোদ্ধা, কখনও বা কল্যানময়ী জননী, কখনও বা লাস্যময়ী প্রেয়সী। তবে, নারীকে সবচেয়ে বিস্ময়কররূপে আবিষ্কার করেছেন তাঁর ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে। শুধু উনিশ শতক নয়, পরবর্তী দুশো বছরের বাংলা সাহিত্যেও যার তুলনা বিরল। আরাধ্যা দেবী নয়; পুরুষের অঙ্কশায়িনী, লজ্জানতা, মনোমোহিনী, বিদুষী সহধর্মিণী নয়; এমনকি কল্পলোকের প্রেয়সীও নয়; এখানে নারীর পরিচয়—তারা বীর। উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে এগারো জন

পৌরাণিক নারীর দৃষ্ট উচ্চারণে যে প্রশ্ন ধ্বনিত হয় তার সামনে হতবাক হয়ে পড়ে পুরুষতন্ত্র। আসলে এরা ধিক্কার জানায় লৈঙ্গিক অসাম্যকে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী দশরথের প্রতি কেকয়ীর কিংবা আপোষকামী নীলধ্বজের প্রতি জনার যে প্রশ্ন তা তো আসলে একজন রাজাকে, একজন পুরুষকে এক নারীর স্পষ্ট জিজ্ঞাসা। আবার, স্বীয় প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে তারা, রুক্মিণী, সূৰ্পনখার যে উচ্চারণ আধুনিক নারীবাদী ব্যাখ্যায় তা লিঙ্গ রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দৃষ্ট ঘোষণা। বীরাঙ্গনা কাব্য তাই নারী স্বাধীনতার তূর্য্য নিনাদ।

ব্যক্তি মধুসূদনের ছায়াপাত সবচেয়ে স্পষ্টরূপে ঘটেছে যে চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে তাতেও দেখি তাঁর জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কার, মাতৃভাষা, পল্লিপ্রকৃতির প্রতি অনুরাগ। ‘বঙ্গভাষা’, ‘কমলে কামিনী’, ‘অন্নপূর্ণার বাঁপি’, ‘কাশীরাম দাস’, ‘কৃতিবাস’, ‘জয়দেব’, ‘কালিদাস’, ‘মেঘদূত’, ‘শ্রীপঞ্চমী’, ‘আশ্বিন মাস’, ‘সীতাদেবী’, ‘কপোতাক্ষ নদ’ প্রভৃতি নামকরণেই তা স্পষ্ট। মহাকাব্য লিখবেন, ইংল্যান্ড যাবেন, মহাকবি হবেন—এই বাসনায় অশান্ত জীবন কেটেছে তাঁর। আপন ধর্ম ছেড়ে পরের ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা তো শুধু বহিরঙ্গ। শেষ সমাধিলিপিতেও নিজের পরিচয় তাই রেখে গেছেন কপোতাক্ষ তীরের সাগরদাঁড়ির শ্রীমধুসূদন নামেই। সাহেবপাড়ায় বসবাসকারী বাংলা উচ্চারণে অনভ্যস্ত ফিরিঙ্গি কেতাদুরস্ত মানুষটির অন্তরে কিন্তু বেঁচে ছিল একটা স্বদেশ। যে দেশকে তিনি জানতেন অত্যন্ত নিবিড়াভাবে। যে পল্লির মাটিতে মিশে আছে জননী জাহ্নবীর চোখের জল, যার বিজয়া দশমীর করুণ সুর আর্দ্র করে প্রবাসী কবির হৃদয় সেই বাংলার মনঃকোকনদ মধুহীন হয়নি, হতে পারে না। কেননা ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের মেঠোপথ পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যের রাজপথ যিনি নির্মাণ করলেন; উপনিবেশিক পর্বে দাঁড়িয়ে যাঁর লেখনিতে শুরু হল বি-উপনিবেশায়ন; তিনিই তো দেশকে চেনালেন একান্ত আপনার করে। তাই, তাঁর দেশপ্রেমে বিদেশির প্রতি বিতরাগ নেই, রয়েছে স্বদেশের জন্য গৌরব। শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যে জাতি তৈরি হবে তার তো নিজেকে চেনাটা বড় জরুরি। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বয়কটের নওর্থক রাজনীতির যুগে রবীন্দ্রনাথের গানে স্বাদেশিকতার সদর্থক যে উদ্ভাস দেখা যায়, তার পূর্বসূরি নিঃসন্দেহে মধুসূদনের এই স্বাদেশিকতাবোধ।

“যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,

ধরণীর বিশ্বাধর চুম্বন আদরে

প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,

ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে

জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে

(তুমারে বপিত বাস উর্ধ্ব কলেবরে,

রজতের উপবীত শ্রোতঃ-রূপে গলে,)

শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে

(স্বচ্ছ দরপণ!) হেরি ভীষণ মুরতি;—

যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে;

দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;—

চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে;—

সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী;”^{১২}

মধুসূদনের জন্মের দুশো বছর পরে বাঙালির কাছে আবার প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে তার আত্মপরিচয়। আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির রণক্লান্ত দিনে যদি উদার, মানবতাবাদী, প্রকৃত দেশপ্রেমের ভাষ্যের অব্বেষণ করতে হয় তাহলে আবার পুনরায় বসতে হবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মুখোমুখি।

তথ্যসূত্র:

- ১। গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, *আচারদ্রুংশ*, অলোক রায় (সম্পা.), ২০০২, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ভারবি, পৃ. ১১২
- ২। বসু, যোগীন্দ্রনাথ, তৃতীয় সং. ১৩১২, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*, কলকাতা, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, পৃ. ১৫
- ৩। Derozio, Henry Louis Vivian, *Fakir of Jangheera*, অনু. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাপ্তি: যোগীন্দ্রনাথ বসু, তৃতীয় সং. ১৩১২, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*, কলকাতা, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, পৃ. ২৪
- ৪। Dutt, Michael Madhusudan, *On Poetry Etc.*, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), ১৯৬৫, *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬২৪
- ৫। Dutt, Michael Madhusudan, *I sigh for Albion's Distant shore*, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), ১৯৬৫, *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৪৩৮
- ৬। Dutt, Michael Madhusudan, *Letters*, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), ১৯৬৫, *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৩১
- ৭। ঐ, পৃ. ৫৩৮
- ৮। গুপ্ত, যোগীন্দ্রনাথ, প্রাপ্তি, পৃ. ১৮৯
- ৯। 'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়', হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মন্দিরা, ভাদ্র, ১৩৬২
- ১০। চক্রবর্তী, শরচ্চন্দ্র, ১৩৫৩, *স্বামি শিষ্য সংবাদ (উত্তর কাণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, অষ্টম সংস্করণ, পৃ. ১১৮-১১৯
- ১১। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *মেঘনাদবধ কাব্য*, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), ১৯৬৫, *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৬
- ১২। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *পরিচয়*, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), ১৯৬৫, *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৬২।

তারারশঙ্করের কবি : জীবন চেতনার শৈল্পিক রূপায়ণ

জবা মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: কবি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিতাই চরণ। নিতাইয়ের কবিতা হয়ে ওঠার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। পারিবারিক পেশাকে গ্রহণ না করে কবি হওয়ার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরেই ঘর ছাড়া হয়েছিলেন তিনি। তার জীবনে প্রথমে ঠাকুরঝি এবং পরবর্তীতে ঝুমুর দলের বসন্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নানান ঘাটি প্রতিঘাত উপেক্ষা করে একজন কবি হয়ে ওঠার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে।

বাংলা সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি নানান দিকে তাঁর অবাধ বিচরণ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের ঠিক পরই তাঁর নাম উঠে আসে। একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের নানান কাহিনী তুলে ধরেছেন তার অসামান্য লেখনীর মধ্য দিয়ে। কল্লোল পত্রিকায় ‘রসকলীর’ গল্পটির মধ্য দিয়ে তার গল্প উপন্যাসের যাত্রা শুরু। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে বীভৎস রূপ দেখা দিয়েছিল যার ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের জীবন যাপন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। একদিকে পুঁজিবাদী শ্রেণী অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চবর্গ দ্বারা বর্গের উপর শোষণ পীড়নের মাত্রা বেড়ে যায় পুঁজিবাদী শ্রেণীর লোকের কারণে শোষণ পীড়ন সমাজে বেড়ে যায় ফলে চারিদিকে এক সংকট দেখা যায়। অসহযোগ আন্দোলন আবার অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা চিন্তায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। ঠিক একই সময় দাঁড়িয়ে লেখক তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবি উপন্যাসটি লেখেন। তাঁর লেখনীতে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনের নানান কাহিনী, শ্রেণীগত বৈষম্য তুলে ধরেছেন। অনায়াসেই প্রাজ্ঞের তাদের কলমে উঠে এসেছে। রাঢ় অঞ্চলের মানুষের অভাব, অনটন, ভাষা, সুখ-দুঃখ এসব গুলোই তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। কবি উপন্যাসে বাউল, কবিতা, ঝুমুর দল, বেদে এইসব শ্রেণীর মানুষদের জীবনের সংগ্রাম তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ: জীবন সংগ্রাম, ঝুমুর দল, টপ্পা গান, মাহিন্দারি।

মূল আলোচনা: কবি উপন্যাসের মূল কাহিনীর প্রধান চরিত্র নিতাইচরণ। নিতাই এর কবিতা হয়ে ওঠার জীবন কাহিনী। ডোম বংশের ছেলে হয়েও পারিবারিক পেশা দাসবৃত্তিকে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেয়নি সে। কবিতার দোহার হিসাবে কাজ করে। চন্ডি মায়ের পূজা উপলক্ষে কবি গানের আসরে এক কবিতা এর অনুপস্থিতিতে নিতাই চরণ নিজেকে কবিতা হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। মা এবং মামার অনুরোধ উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। স্টেশনে থাকে সেখানে বন্ধু রাজার সাথে কুলিগিরির কাজ করে। নিতাই এর গুণমুগ্ধ শ্রোতা ছিল ঠাকুরঝি সে ছিল রাজার শ্যালিকা। ঠাকুরঝি দুধ দিতে আসত নিতাইকে। এক সময় ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাই এর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। অন্যের সংসার

ভাঙতেসে রাজি নয় তাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় এরপর নিতাই ঝুমুর দলে যোগ দেয়। ঝুমুর দলের নারীদের নাচ ছিল অশ্লীলতাপূর্ণ এবং দেহ ব্যবসায়ী। দলের সঙ্গে পরিচয় হয় বসন্তের। সম্পর্ক গড়ায় ভালোবাসায়। বসন্তের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ঠাকুরঝি পাগল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়। পরবর্তীতে বসন্তের সঙ্গে নিতাই গাট ছড়া বাঁধে। এক সময় বসন্তের কঠিন মরণব্যাপি দেখা দেয় এবং বসন্ত মারা যায়। নিতাই কাশি চলে যায় কিন্তু কাশিতে তার গানের কদর না পাওয়াই ফিরে যায় গ্রামে এখানে গিয়ে সে ঠাকুরঝির মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পায়। গভীর শোকে ভেঙে পড়ে নিতাই। জীবনের প্রতি তার ঘৃণা জন্মায়। পরক্ষণেই নিতাই তার পরিবারসিক সব কিছুর মধ্যে ঠাকুরজির উপস্থিতি অনুভব করে নিজেকে বোঝায়।

নিতাই বন্ধু রাজন নিতাইয়ের কবিয়ালি জীবনে বন্ধুর ভূমিকা অনেকটাই। রাজনের শ্যালিকা ঠাকুরঝি ছিল নিতাই এর গানের অন্যতম শ্রোতা এবং মনের মানুষ। যদিও ঠাকুরঝি ছিল বিবাহিতা তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মনের ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। নিতাইয়ের জীবনে গানই একমাত্র সত্য। এই গানের জন্য তাকে তার পরিবার ত্যাগ করে চলে আসতে দেখা যায়। কিছুদিন ঘনশ্যাম গোসাঁই এর বাড়ি মাহিন্দাড়ি করে এরপর বন্ধু রাজনের সঙ্গে রেলওয়ের কুঠরিতে থেকে কুলিগিরির কাজ করলেও কিন্তু প্রাণের টানে অবসর সময় সে কবিয়াল হওয়ার জন্য গান বাঁধে। এক সময় সে কবিয়াল রূপেই পরিচিত পায়। প্রথমে গ্রামে এবং পরবর্তীতে ঝুমুর দলের সঙ্গে এসে গান করে। নিতাই তার গান রচনা করে ঠাকুরঝির অনুপ্রেরণায়। সে মনে করে কুলিগিরি তার কাজ নয়। সে কবি গান করেই তার জীবন অতিবাহিত করবে। নিতাই এবং রাজনের শ্যালিকা ঠাকুরঝিকে যেন কল্প লোকের কোন নারী মনে করে, তাকে নিয়ে গান বাধে, রাজন ব্যঙ্গর ছিল ঠাকুরঝিকে কালো বললে নিতাই এর মধ্যে খারাপ লাগে এবং সুর বেঁধে বলে- “কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কান্দ কেনে?” গানের মধ্যে যেমন ঠাকুরঝির মন খারাপের উপশম করা হয় আবার অন্যদিকে সমাজের কালো মানুষের প্রতি যেএকটা তীব্র ঘৃণা আছে সেটার বিরুদ্ধেও লেখক নিতাই এর মুখ দিয়ে কথাঘাত করেছেন। একসময় নিতাইয়ের গান গাওয়ার জন্য বাইরের ডাক আসে এবং সেখানে থেকে ফেরার পথে নিতাই ঠাকুরঝির জন্য উপহার নিয়ে আসে নিতাই ও কবিয়াল বেশে ফিরে আসে। এই বেশ ভূষা দেখে ঠাকুরঝির মনে ফাগুনের দোলা লাগে। একটা সময় নিতাই বুঝতে পারে সে এবং ঠাকুরঝি দুজন দুজনের প্রতি আসক্ত। তার মনের মধ্যে পাপ বোধ জাগ্রত হয়। ঠাকুরঝি অন্য কারোর স্ত্রী ফলে অন্যের সংসার সে ভাঙতে রাজি নয়। তীব্র অনুশোচনা বোধে তাকে মর্মান্বিত করে। আবার অন্যদিকে তার মনে হয় তাদের সম্পর্ক যতই নিন্দনীয় হোক তার পক্ষে ঠাকুরঝিকে ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। এই দুইয়ের মধ্যে পরে তার মনের দোলাচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং গানের সুরে বলে ওঠে

চাঁদ তুমি আকাশে থাক-

আমি তোমায় দেখব খালি

ছুতে তোমায় চাইনা কো হে-

সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।

ঠাকুরঝির পরিবার তাদের কথা জানতে পেরে তার প্রতি অনেক অত্যাচার করে। নিতাই নিজে থেকেই তাকে ছেড়ে চলে যায়। রাজন তার শ্যালিকা ঠাকুরঝিকে বিয়ে করতে



বললে নিতাই সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। নিজের মনের মনিকোঠায় ঠাকুরঝির জায়গা এই পরমসত্যকে বেছে নিয়ে নিতাই বসন্তের ডাকে পাড়ি দেয় ঝুমুর দলে।

দেহ ব্যবসায়ী ঝুমুর দলের বসন্ত ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ এবং সদা হাসোজ্জ্বল এক প্রেমময়ী নারী। যার প্রেমের টানে বশীভূত হয়ে পড়ে নিতাই। তার মধ্যে ঠাকুরঝির ছায়া দেখতে পায়। ঝুমুর দলে ছিল অশ্লীল গান বাজনা এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের অশ্লীল নৃত্য। নিতাইয়ের কবিরাল সত্তার বাইরে গিয়ে দলের চাহিদা মত তাকে গান রচনা এবং পরিবেশন করতে হত। এক সময় বসন্ত মরণব্যাপিতে আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীতে মারা যায়। নিতাই ও ঝুমুর দল ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। অন্যদিকে ফলে তার মৃত্যু হয়। নিতাই এর সংস্পর্শে এসে বসন্ত নিজেকে পাল্টে নেয়। বসন্তের হীন দেহ ব্যবসার কথা জানার পরেও তাকে তার ভালো লাগে একসময় গট ছড়া বাধে দুজনে। তার মনে বসন্ত ছিল পবিত্র। নিজের আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে তাই বসন্তের সেবা যত্নে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! বসন্তের মৃত্যু হয়, বসন্তও তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। ডাকাত বংশের ছেলে হয়েও নিতাই চরণ ছোট থেকে এই পোশাকে মেনে নিতে পারেননি, ঘৃণা করেছে। বেছে নিয়েছে কবি গানকে। প্রকৃত কবিরাল হয়ে উঠেছে। ঠাকুরঝি তার গানের প্রতি ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, আর এই শ্রদ্ধায় নিতাই কে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের সম্পর্কের পূর্ণতা পায়নি। নিতাই পরবর্তীতে বসন্তের আশ্রয়ে চলে যায়, সমাজ সংসার সবকিছু ত্যাগ করে। কিন্তু সেখানেও সে যখন বসন্ত কে হারায় তখন তার মনে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা দেখা যায়। পুরো দুনিয়া তার কাছে মূল্যহীন হয়ে ওঠে। তাই সে গেয়ে ওঠে-

“এই খেদ মোর মনে মনে

ভালোবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এই জীবন।

হায়! জীবন এত ছোট কেনে-?

এ ভুবনে?”

জীবনের প্রতি অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে নিতাই দুঃখে কষ্টে কাশী যাত্রা করে এবং মনস্তির করে সেখানে গিয়ে গান বেঁধে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তার গান কাশীর মানুষদের ভালো লাগেনি। তখন তার রাজন, বিপ্রপদ ঠাকুর এবং ঠাকুরঝির কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল গ্রামের নদী, মাঠ, মেঘ, অন্ধকার, কৃষ্ণচূড়া প্রকৃতির কথা। যে গান কাশীর মানুষদের মন জয় করতে পারেনি। অথচ সেই গান শুনে রজন ঠাকুরঝিরা প্রশংসা করেছে। তখন নিতাই গ্রামের টান অনুভব করে।

গ্রামে ফিরে এসে সে গান বাঁধবে। নিতাই গ্রামে ফিরে এসে পদ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদে তার চোখে জল চলে আসে এবং রাজনের কাছ থেকে ঠাকুরঝির মস্তিষ্ক বিকারে মৃত্যু হয়ে শুনে প্রচণ্ড আঘাতে, বেদনায় ভেঙে পড়ে কিন্তু তারপরই তার মনে হয় সে মরেনি, যে বেঁচে আছে এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে, চির পথিক কবি নিজের মনকে এটা ভেবেই সান্তনা দেয়। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নিতাই, রাজা ঠাকুরঝি, বসন্তের মতো চরিত্রের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাদের জীবনের কথা গান হয়ে ওঠে এসেছে নিতাই কবিরাল এর কণ্ঠে। কবি তার আপন মনে নিজের অন্তর থেকে জীবনের সুখ দুঃখ, অনুভূতি, আবেগ গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিম্নবর্ণের মানুষদের নিত্যদিনের কথা নিতাই

কবিয়াল এর কণ্ঠে গান হয়ে ফুটে উঠেছে। পরিবারের নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য সে এগিয়ে চলে।

কিন্তু নিতাই এর জীবনে বারংবার করুন পরিণতির দেখা দিয়েছে। জীবনের কোন নিশ্চয়তা দেখা যায়নি। কবিয়াল হওয়ার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে পথে নামে। তার জীবনে গান রচনা করার পেছনে ঠাকুরঝিও বসন্ত নামে দুজন রমণীর অনুপ্রেরণা অনেকটাই রয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যখনই সে কাউকে ঘিরে বাঁচতে চেয়েছে ঠিক তখনই তার থেকে ভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রথম রমণী ঠাকুরঝি পরস্তু হওয়ায় তাদের সম্পর্কের পূর্ণতা পায়নি। নিতাই তার সংসার ভাঙতে চাইনি আর দ্বিতীয় রমণী বসন্ত যার মধ্যে নিতাই ঠাকুরঝির ছায়া দেখতে পায়। কিন্তু সেই বসন্তের প্রাণও মরণব্যাপিতে কেড়ে নেয়। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিতায়ের জীবনে না পাওয়ার আকাজ্খাই থেকে যায়। তার জীবনে কবিয়াল হয়ে ওঠা হলেও মানব প্রেমের ব্যর্থতা তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

নিতাই চরণের জীবনে ঠাকুরঝি এবং বসন্ত এই দুই নারী তার জীবন ধারাকে বাস্তবায়িত করার দিকটি অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। একদিকে ঠাকুরঝির সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে নিতাইয়ের গান বাধার ইচ্ছা আবার পরবর্তীতে বসন্তের সঙ্গে ঝুমুর দলে গিয়ে তাদের/সেই দলের পছন্দ মত গান গেয়ে সকলের মন জয় করে নেয়। নিতাই ক্রমশ নিজের ভেতরের কবির যে সত্তা সেটাকে দমন করে রেখে ঝুমুর দলের ইচ্ছা অনুযায়ী গান রচনা করে। এখানে নিতাই তার অসামান্য গুণের প্রমাণ দিয়ে সকলের মন জয় করে। এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় মানুষদের যেন একই সুতোয় গাঁথছেন ঔপন্যাসিক। নিতাই পরিবারের থেকে অবহেলিত হয়েছে। নৈশ বিদ্যালয়ে বছর তিনেক পড়ার পর বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার আর পড়াশোনা হয়নি। একদম ছোটবেলা থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প তার মুখস্থ ছিল। এমন কি কোথাও কবিগান হলে নিতাই ছিল একমাত্র মন মুগ্ধকর শ্রোতা। কোন বাধাই তাকে গানের জগত থেকে সে যেন ঈশ্বর প্রদত্ত কর্তৃ নিয়ে জন্মেছিল। তার জীবনের সারমর্ম ছিল এই শিল্পী সত্তাকে আঁকড়ে ধরেই সারাটা জীবন সে কাটিয়ে দেবে। প্রতিটি সাফল্যের পেছনে কারো না কারোর অনুপ্রেরণা থাকে। নিতায়েরও জীবনে তার শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে বসন্ত ও ঠাকুরঝির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রকৃতপক্ষে নিতাই মূলত স্বভাব কবি, শিল্প কবি নয়, মানুষ কবি। সে যেন দৈত্য কূলে প্রহ্লাদ। তার সঙ্গে ঠাকুরঝির সম্পর্ক যেন রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে মনে করিয়ে দেয়। নিতায়কে ঝুমুর দলে গিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে বহু মানুষের মন জয় করতে নানান ধরনের গান গাইতে হয়েছে। অনেক কিছু গান শিখতেও হয়েছে। পদাবলী, টপ্পা গান এগুলি সে বসন্তের কাছ থেকে শিখেছে। নিতাই এর গানের পিছনে দুই নারী অবদান রয়েছে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির থেকে একজন কবির ভাবনার গভীরতা অনেক দূর বিস্তৃত। যাকে গভীরভাবে ভালোবাসা যায় তার প্রতি মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে যেমন আত্মহারা হয়ে পড়ে না তেমনি আবার সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রতি নির্দয় থাকতে পারে না। একজন কবি, তার জীবনে সুখ দুঃখ যতই তাকে ব্যথিত করুক না কেন যতক্ষণ সে তার নিজের সৃষ্টি দ্বারা তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারবে না ততক্ষণ তার জীবন কবিয়াল সত্তার প্রকাশ ঘটবে না। একজন প্রকৃত কবির শিল্পী মনের মনোভাব টাই এই রকম। নিতাইকেও উপন্যাসিক তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসামান্য লেখনীর সাহায্যে সবকিছুর উর্ধ্বে নিতায়ের শৈল্পিক মনোভাবকে একজন শ্রেষ্ঠ মানব মনের পরিচয় পাওয়া যায়।



কবি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত গানগুলি অসামান্য শৈল্পিকতায় এক কাব্যিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে শ্রদ্ধেয় মোহিতলালের ভাষায় - “উপন্যাস খানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে পারি, আমরা একটি নতুন ভাবমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছি; সেই ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে কবিয়াল নিতাইয়ের ওই গানগুলি; সেই গানের অন্তর্নিহিত সুরই যেন সর্বদা অন্তঃলীন হইয়া বহিতেছে।” নিতাই ছোট থেকে সত্য ও সুন্দরের নৃজারী। তার কবিয়াল হওয়ায় তার একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা। কখন ঠাকুরঝির প্রতি গভীর বেদনায় তার ভেতর থেকে গান বেরিয়ে এসেছেন। মামা গৌরচরণের কাছ থেকে চরম আঘাত পাওয়াই তার বেদনা বোধ থেকে কবিতার সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে কোন সৃষ্টির মূলে থাকা বেদনার থেকে। আবার বসন্তের সান্নিধ্য লাভ হওয়ার পরেও তাকে চিরদিনের মত জীবন থেকে হারিয়ে নিতাইয়ের অন্তর থেকে গভীর শোকে গান হয়ে প্রকাশ পায়।
নিতাই-বসন্ত-ঠাকুরঝি বিশেষ জীবন জিজ্ঞাসাটিকে এক নির্বিশেষে মানবীয় চেতনাময় পটভূমিতে পরিব্যপ্ত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কবি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা : ৭০০০৭৩
- ২। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, তারাশঙ্কর : দেশকাল সাহিত্যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৬/২, রোমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কোলকাতা : ৭০০০০৯
- ৩। গোস্বামী, ড: সনাতন, প্রজ্ঞাবিকাশ ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কোলকাতা : ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৬।

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে রাজনৈতিক চেতনা

সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

হরিশচন্দ্রপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ: বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে এক অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা সমরেশ বসু। সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যের তিনি এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীঃ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে যে ত্রয়ী-বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হয়েছিল, তারা বাংলা সাহিত্যকে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের বাইরে এক নবতর শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে তার পরবর্তী পর্বে বাংলা সাহিত্যে শক্তি ও সামর্থ্যের বিচারে যথার্থ স্বীকৃতযোগ্য সাহিত্যফলক হিসাবে সমরেশ বসুর নামটি উঠে আসে। সমরেশ বসু এক স্বতন্ত্র ধারার লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শূন্যতাবোধ ও একাকীত্বের অজুহাত ছেড়ে সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্ব থেকেই তিনি নিচুতলার মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখকে গল্পের বিষয় করে সদর্থক জীবনভাবনার ও জীবনরসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি নিশ্চয়ই ঐতিহ্য-বহির্ভূত বা শিকড়বিহীন নয়। কিন্তু সমগ্র শিল্পপ্রতিভার গুণেই তিনি ঐতিহ্যের ভূমিতে দাঁড়িয়েও স্বয়ং এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

সমরেশ বসুর ছোটগল্পের মূল কথা প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যদি সংক্ষেপে সংহত করে আনতে চাই, তবে তা হল আজকের জটিল জীবনে ব্যক্তির সংকট। এই মানবিকতা, ব্যক্তির একান্ত অর্ন্তজগতকে এই নির্দিষ্ট স্বীকৃতি দান, সমরেশ বসুর গল্পে সর্বদা অন্ধান। তাঁর যে কোনো গল্পই প্রমাণ করে তাঁর অসামান্য তথ্যজ্ঞান, প্রমাণ করে তাঁর অনুপুংখ নির্ভুল অবধানতার কথা। অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে ঘিরে যে মানসিক বাতাবরণ সৃষ্ট হয় সেটাই তাঁর গল্পের টান এবং এই বাতাবরণ সৃষ্টির মূলে আছে জীবন সম্বন্ধীয় একটা অ্যাটিটুড। একটা নৈতিক প্রেক্ষণবিন্দু। যথার্থ জীবন সমালোচনা সেই প্রেক্ষণবিন্দুর দান। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা সেই সমালোচনার ফল। জানতে চাওয়ার রূপ ও রূপান্তর ধরে বদলেছে তাঁর গল্প বলার কলা-কৌশল। “আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কাহিনীবাহীন গল্পের মধ্যেও অন্তঃস্রোতে একটি আশ্চর্য প্রবাহ বয়ে চলে। “- এ উক্তি সাহিত্যিক সমরেশ বসুর। তথাকথিত গল্পবিহীন গল্পের মধ্যে যে অন্তর্নাট্য গূঢ় স্রোতের মতো টানে, ভাসায় ডোবায়- কিন্তু শেষপর্যন্ত তুলে দেয় বৃহত্তর উপলব্ধির তটে – সেই ফল্গুনটো লেখকের একাধিক গল্পে অনুভূত। এটাই সমরেশ বসুর গল্পের আঙ্গিকরীতির গোড়ার কথা, শেষের কথা।

সূচক শব্দ: কথাশিল্পী, বিশ্বযুদ্ধ, সাহিত্যফলক, শিকড়বিহীন, ছোটগল্প, শ্রমজীবী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মনিরপেক্ষ, তেভাগা আন্দোলন, ভূমিহারা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট, আঙ্গিকরীতি।

মূল আলোচনা: নব-বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় আদি-বাল্মীকির সংশয়দীর্ণ চিন্তে আপন কবিত্বে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠার জন্য নারদীয় বাণীকে স্মরণ করে লিখেছিলেন –

“সেই সত্য যা রচিবে তুমি –

ঘটে যা তা সব সত্য নহে, কবি তব মনোভূমি

রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জানো।”



(রবীন্দ্র- রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ- ২৬১)

কবির মনোভূমি শুধু স্থানের সীমাকেই অতিক্রম করে না, তা কালের গণ্ডি পেরিয়ে কালাতীত এক চিরন্তন সত্যকে লালন করে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সেই মনোভূমিতে একাকার হয়ে যায়।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ-এ ও কালের কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু ওরফে কালকূট মানসভ্রমণে বেরিয়ে আদি কবির মনোভূমিতে বিচরণ করতে চেয়েছেন। উনিশ'শ বিয়াল্লিশের ভারতছাড়ো আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ রূপ দর্শনে লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁর ছোটগল্পে তিনি যেমন সমাজের নিচুতলার মানুষের কথা বলেছেন, তেমন রাজনীতির প্রসঙ্গও এসেছে মানুষের সাথে অস্থিত হয়েই। দ্বিধা-দীর্ঘ সমস্যা জর্জরিত আধুনিক সমাজকে সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন। সমরেশ বসু দায়বদ্ধ শিল্পী। তাঁর উপন্যাসে বাস্তব জীবন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে।

সমরেশ বসু জীবনকে যেমন বহুভাবে বহু দিক থেকে দেখেছেন, তেমনি সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন সেভাবে। 'সাহিত্যের যা কিছু দায় সে তো জীবনের কাছেই'-এই ছিল সমরেশ বসুর কথা। মূলত সমরেশের প্রথাবিরোধী দুঃসাহসিক গদ্য তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এক ব্যতিক্রমী আসন দিয়েছে। এক অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান তাঁর গদ্যশৈলী। তিনি প্রচলিত গদ্যরীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নূতন এক গদ্যের জনক হয়েছেন। যে গদ্য অন্য কারো সঙ্গেই মেলে না। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীও স্বতন্ত্র। মধ্যবিভক্ত হয়েও মধ্যবিভক্তের ভগ্নমি, নোংরামি, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতার, স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর তীব্র গদ্যের চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মেকি, অস্তঃসারশূন্য, কূপমন্ডুক মধ্যবিভক্ত চরিত্র। রক্তমাংসের নারীপুরুষ, যারা সব অর্থহীন মৃত্তিকাসংলগ্ন, তারাই এসেছে তাঁর সাহিত্যের টানাপোড়েনে।

সমরেশ বসুর সাহিত্যিক জীবনের শুরুতেই আসে নিচুতলার মানুষজন এবং লেখকের সাম্যবাদী দর্শনের তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা। নিম্নবিভক্ত মানুষেরও আছে বেঁচে থাকার অধিকার, শ্রমের অধিকার। সমরেশ বসুর গল্প পরিক্রমা শেষে মনে হয়, এত গ্লানি-রিজ্তা ও অন্ধকার সত্ত্বেও জীবনের মতো রহস্যময় আর কিছুই নয়। সমরেশের ভাষা-শব্দাবলী নিয়ে সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যতোখানি না ধরা পড়েছে, তার চেয়ে গল্পের শরীরে জীবনের ভাবমাধুর্য ফুটে উঠেছে। তিনি জীবনের তলানিটুকু ছেঁকে-নিংড়ে গল্পের মূল্যবোধে ও নৈতিকতায় প্রতিস্থাপিত করেছেন।

সমাজ সমস্যা, শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লব, সমাজের নীচের তলার মানুষদের নানা আশঙ্কা ও প্রেমের বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন সাহিত্যিক সমরেশ বসু। জীবনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তিনি। মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছ ধারণাই তাঁর মূলধন। তাঁর উপন্যাস যেমন বৃহত্তর জীবনের ক্যানভাস, ছোটগল্প সেখানে ক্ষুদ্র জীবনরূপের ভিতর বৃহৎ ব্যঞ্জনার ছবি। খন্ড খন্ড অংশের মধ্য দিয়ে বৃহৎ ভাবনার ইঙ্গিত স্থাপনে সমরেশের দৃষ্টিকোণ তীক্ষ্ণ এবং জোরালো। তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্পে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র ফুটে উঠেছে।

সমরেশ বসুর প্রথম মুদ্রিত ছোটগল্প 'আদাব' (১৯৪৬খৃঃ) গল্পে দেখা যায় দেশভাগের যন্ত্রণায় সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ নৌকার হিন্দু মাঝি, মুসলমান সুতা-মজুরের

জীবনকথা। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের ডাকা ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’-এর ফলে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উক্ত গল্পে প্রত্যক্ষরূপে রাজনীতির কথা না বলা হলেও, রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে যুগে যুগে সাধারণ মানুষ নিজেকে বলিদান দেয় সে কথাই লেখক শুনিয়েছেন। ব্যক্তি নামহীন দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে লেখক অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেছেন। হিন্দু-মুসলিম রায়টের ভয়াবহ পরিণতিতে মানুষ একে অপরের হত্যালীলায় মাতোয়ারা। রাজনৈতিক মতাবলম্বীরাই সেই পাশবিক কর্মের অংশীদার। কিন্তু ‘নারাইনগঞ্জে’র সূতাকল শ্রমিক বা ‘বুড়িগঙ্গার হেইপারে সুব ইডা’র নৌকার মাঝির মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের কাছে দলাদলি, খুনোখুনি একেবারেই অর্থহীন। তাদের একমাত্র কাম্য পরিবারের সুখ-শান্তি। তারা চায় পরবের দিনে নিজ সুখি গৃহকোণে ফিরে যেতে, স্ত্রী-সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে। তাই প্রথমে দুই কুশীলব একে অপরের প্রতি সন্দিহান হলেও পরে একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্মের কারবারীরা তাদের সেই শান্তিকে কেড়ে নিতে চায়। লেখক তাই পরম মমতায় দুই ভিন্নধর্মী মানুষের আলাপচারীতায় তুলে ধরেছেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের জীবনবোধকে। “আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু’গা লোক মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?” মুক্তিকা প্রোথিত দুই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সমগ্র সমাজকে দিয়েছেন বিশ্বমানবিকভাবে জাগ্রত হওয়ার মন্ত্র।

‘জলসা’ গল্পে লেখক দেখালেন প্রশাসনের সাহায্যে বুর্জোয়া মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের ওপর কতটা অত্যাচার চালাতে পারে। শ্রমিকদের তাক লাগিয়ে দেওয়া জলসার আয়োজনের আড়ালে সংগঠিত হয় এগারশো শ্রমিকের ছাঁটাই – এর কাজ। দুর্জয় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে চন্দ্রিকা, সরমা, স্বৈরিনী, ছেদি, হীরালাল, মেহেরারুণ। কিন্তু এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই সংগ্রামী শ্রমিকদের যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তখন জলসার মঞ্চে বাজতে থাকে ‘রঘুপতি রাঘব রাজারাম’। ধর্মের নেশায় মানুষকে বঁদু করে রেখে তলে তলে সারা হয় শ্রমিক ছাঁটাই। ‘ইয়ে আজাদি বুটা হ্যায়’ – এর জমানায় রচিত ‘জলসা’ গল্পে গান্ধীবাদ, ধর্মের অসাড়া ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের অবনমন ধর্মগুলিই বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

রাজনীতি ও সমাজ সচেতন লেখক সমরেশ বসুর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ‘প্রতিরোধ’ গল্পেও রয়েছে অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের কথা। বিত্তবান জোতদার গোষ্ঠী দরিদ্র সাধারণ মানুষকে শোষণে অত্যাচারে জর্জরিত করেও যখন অবদমিত করতে পারে না তখন চালায় নির্বিচার হত্যালীলা। তারা লুণ্ঠ করতে চায় কৃষকের রক্তে বোনা ধান, সোনার ফসল। মার খেয়েও দরিদ্র কৃষক সংগঠিত হতে শেখে। গ্রামের মেয়েরাও এই কৃষক আন্দোলন তেভাগার সংগ্রামে অস্ত্র তুলে নেয়। মনাই, রাধা ও সুবলের আখ্যান এই সংগঠিত আন্দোলনেরই পরিচয়বাহী। পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তরের করাল গ্রাসে কবলিত নিরন্ন কৃষকদল সঙ্গবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য গল্পে। তারা চায় সোনার ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের ঘরে তুলতে।

আকালের কালে যখন খাওয়া জুটত না তখন সুবল গান গাইত। সেই গান ছিল মনাই ও রাধার মতো কৃষকদের সাক্ষনার বাণী। আকালের পর যখন কৃষককুল সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে তখন সুবলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শ্রেণীশত্রুদের প্রতি বিদ্বেষবাণী – “রহিম চাষী মনাই চাষীর ক্ষয় ধরে গো হাড়ে / আড়তদার রঘু সাউ গুদামে বইসা চাউলের পোকা ঝাড়ে।”^২ গান গেয়েই সে ক্ষান্ত হয় না, সে কৃষককুলকে এই অরাজকতা দূরীকরণের জন্য উদবুদ্ধ করে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটানোর জন্য একদিন শুরু হয় মনাই-শ্রীশ-ফকির-মধু-

হেমদের লড়াই। কিন্তু পীতাম্বর শা - সোনা মিঞা-র মতো জোতদাররা চুপ করে বসে থাকে না। নিজেদের স্বার্থে তারা কৃষকদের সমিতির ঘরে আগুন লাগায়, আর প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে মনাইদের নামে হলিয়া বার করে। কৃষককুল রমণীরা এই তেভাগা আন্দোলনে অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই কুললক্ষ্মীরা মাঠের ধান লুঠ হওয়া বাঁচাতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়। জোতদাররা নিজেদের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের সহায়তায় হত্যালীলা সম্পন্ন করে। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত গল্পটি রাধা ও তার অনাগত সন্তানের আত্মত্যাগে ও সংঘবদ্ধতার নিরিখে লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে।

সমরেশ বসুর রাজনৈতিক বিশ্বাস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ‘কিমলিস’ গল্পের মধ্যে। উত্তর- চব্বিশ পরগণার বস্তি ও কারখানা অঞ্চলের পটভূমিতেই গল্পটি রচিত। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতেই উদ্ভব হয়েছিল বিপ্লবের। বিপ্লবের প্রতীক হল লালঝান্ডা। সেই সাম্যবাদী তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমরেশ বসু বেছে নিয়েছিলেন সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষদের। বনোয়ারী কাহারের ছেলে বেচন ছিল সামান্য চটকলের স্পিনার। লেখাপড়া না জানা দরিদ্র যুবক, চুরি- বাটপাড়ি নয়, কারখানার রেশন হরতালের দাবীতে তাঁর জেল খাটতে হয়েছিল। ফেরার পর তার আদব-কায়দা, পোশাক - পরিচ্ছদ সবকিছু বদলে গেছে। মা, বাবা, বউ, প্রতিবেশী সকলের কাছে বেচন যেন নতুন এক মানুষ। আসলে বেচন শুধু বেশভূষায় নয়, মনের দিক থেকেও নতুন হয়ে এসেছে। পুলিশের অত্যাচারে সে মাথা নোয়ায়নি। কম্যুনিষ্ট তত্ত্ব সে কিছুটা বুঝেছে। তার এই কম্যুনিষ্ট হয়ে আসায় শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি বাড়িওয়ালা কালিকাপ্রসাদ ভীত হয়। তাই সে বেচনের বাবাকে হাত করে তাকে বস্তি থেকে তাড়াতে চায়।

বস্তিবাসীর কাছে কম্যুনিষ্ট বা ‘কিমলিস’ সম্পূর্ণ অজানা বস্তু। বেচন নিজেও ভালোভাবে জানে না কিন্তু বিশ্বাস করে “টাইম যব আ যায়ে গা, ক্রান্তিওকারী সব হো যায়গা একদম ঠিক সে তব কমিনিস বন যায়গা।”^৩ বেচন এখানে ব্যক্তি-সংকটের নিরিখে কম্যুনিষ্ট হতে চেয়েছে। মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের তাত্ত্বিক যোগ এক্ষেত্রে খুবই ক্ষীণ। যদিও সে জেল থেকে মার্কসের কম্যুনিজম, লেনিনের মার্কসবাদী শিক্ষা এবং নরেশ গুপ্তের ভুখা মজদুর বই তিনটি সঙ্গে এনেছে। কম্যুনিষ্ট নারায়ণবাবুর ব্যাখ্যা সহজে বেচনের মাথায় ঢুকতে চায় না। দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থা মাথার ভেতর গোলমাল সৃষ্টি করে। কিন্তু লেখক সমরেশ দেখান কমিউনিসম কেবল পুথিগত বিদ্যা নয়, তা শ্রমিকের জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিবাদী চেতনা- “তুঁ খানা বিনা সব মর যায় গা তো জমানা কৌন বদলে গা।”^৪ তাই বেচন ধীরে ধীরে বস্তিবাসীদের মতো হয়ে যায়। শ্রমিক নেতাদের সামনে সে শ্রমিকদের পক্ষে বক্তৃতা সময় তার ওপর নেমে আসে আকস্মিক আঘাত। এই আঘাতে লুটিয়ে পড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বেচন তার পরিবারে প্রতিষ্ঠা পায়। তার অভিজ্ঞতা তাঁকে নেতার স্থান দেয়, যা সমাজ বদলেরই প্রতীক স্বরূপ। চেতনার স্তর থেকে সে উচ্চারণ করে যে সে এখনও কমিউনিস্ট হয়নি, সবে তো সূত্রপাত - “আভি কাঁহা বনচুকা। কোই রোজ বন্ যায়েগা।”^৫ ‘কিমলিস’ যথার্থ রাজনৈতিক বিশ্বাসের গল্প।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপক রদবদল ঘটে এবং পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। ১৯৪৯ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বহু রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার হন। সমরেশ বসুও তার ব্যতিক্রম নন। কারাবাসের আগে লেখক প্রত্যক্ষ করেন মিল বন্ধের নামে অকারণ বোমাবাজি, তাঁর মনে হয়েছিল এই ঘটনা

শ্রমিক হিতৈষ- পার পরিপন্থী। তাই কারাবাস ফেরত লেখকের মনে পাটিতে পুনরায় যোগদানে অনীহা দেখা দিয়েছিল। ১৯৬৪- তে রচিত ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পটি সমরেশ বসুর জেলবন্দী জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। এই সময় থেকেই লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে ব্যক্ত হতে থাকে। শুরু হয় পাটি বনাম ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। উক্ত গল্পেই প্রথম এক রাজনৈতিক বন্দীর জবানী প্রকাশিত হয়েছিল।

‘স্বীকারোক্তি’ গল্পের নায়ক অনল রাজনৈতিক বন্দী। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে এক বিশেষ চেম্বারে রাখা হয়েছিল। সেখানে তার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল পাটি পূর্বজীবনের নিয়মভঙ্গের অপরাধজনিত শাস্তিগুলির খণ্ড চিত্র। এরপর অনলকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল লর্ড সিনহা রোডের একটি বাড়ীতে এক পাগলের সাথে। এইসময় সে অনুভব করেছিল পাটির তিন কমরেডের প্রশ্নের হিংস্রতা। গল্পের নায়ক তাই ঘোষণা করেছিল সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। “বাল্যে পিতামাতার কাছে, যৌবনে স্ত্রী বা প্রেমিকার কাছে, কর্মজীবনে পাটির কাছে এবং বর্তমানে পাটির গোপন তথ্য পুলিশের কাছে।”^৬

প্রতিক্ষেত্রেই এই অস্বীকার যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে। জীবন সত্যের গভীরে অবগাহন করে অনল বুঝেছে পাটির অ্যাকশন কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা মানে তাদের চরণদাস হয়ে থাকা। রাজনীতির নামে আপন স্বার্থ- সিদ্ধিকারী এই বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা লেখকের বহু গল্পেই প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বীয় রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় লেখক লক্ষ্য করেছিলেন পাটির মধ্যে একদল নৃশংস, সশস্ত্র, হত্যার নীতিতে বিশ্বাসী মানুষের বিদ্যমানতা। সমরেশ বসু ছিলেন মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী। তাই ‘স্বীকারোক্তি’ পরবর্ত্তর ‘সিদ্ধান্ত’ গল্পটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গল্পের মুখ্য চরিত্র কুণাল পাটির সেই সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্য। যার মা-বাবা উভয়েই পাটির ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। বাবার কাছেই কুণালের রাজনীতিতে দীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সে ভিন্ন মত অনুসরণ করে। কুণালের বাবা তাদের মতবাদের সমালোচনা করায় তিনি হয়ে ওঠেন তাদের শত্রু। তাই পাটি কুণালকে পিতৃহত্যা সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়। পাটি তাকে শেখায় সংগ্রাম ও আদর্শের কাছে সম্পর্কের কোন স্থান নেই। কিন্তু কার্যসিদ্ধির কালে আদর্শ অপেক্ষা পিতার স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বড়ো হয়ে উঠেছে। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় নিজেকে নিঃশেষ করার,- “বাঁ হাত বাড়িয়ে পুরিয়াটা তুলে নিলাম। এর মধ্যে সেই অব্যর্থ বস্তু আছে মৃত্যু। মৃত্যু। মুখে স্পর্শ মাত্র আর এটাও নিঃশব্দে ঘটবে।”^৭

সমরেশ বসু সুবিধাবাদী রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন ‘পাতিহাঁস’ গল্পে। গল্পের মুখ্য চরিত্র কমিউনিস্ট নেতা দেবনাথ দত্ত ছিল একদা পাটিজান। কমিউনিস্ট পাটি যখন নিষিদ্ধ হয় তখন জেল খেটেছে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সে যখন রিকশার ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানার মালিক হয়ে যায় তখন বাস্তব জীবনে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কে সে পাল্টে ফেলে। তার মধ্যে ছাত্রজীবনের বিপ্লবী- সত্তাটি বর্তমান থাকলেও তার কারখানার শ্রমিকরা যখন মজুরি বৃদ্ধির জন্য হরতাল করে এবং বাইরের মিস্ত্রি দিয়ে কাজ না করতে দেওয়ার দাবীতে অনড় থাকে তখন দেবনাথ নির্দিধায় তাদের বলতে পারে - “রিমেমবার, ইউ বেগারস - নো ইউ আর নট প্রোলেটারিয়েট। তোরা ভিখিরির দল, ভিখিরি কখনও রিয়্যাল শ্রমিক আন্দোলন করে না।”^৮ শ্রমিক দরদী লেখক এখানে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে খাড়া হন এবং মালিক যখন বুঝতে পারে শ্রমিক আন্দোলনে কেবলমাত্র শ্রমিকের ক্ষতি হয় না, মালিক পক্ষও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তারা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। তাই দেবনাথকেও কারখানা



বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে হয়। লেনিন কথিত ন্যাশনাল বুর্জোয়া হয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হয় এবং সে ভাবে বিপ্লবে তারও ভূমিকা আছে।

সমরেশ বসুর গল্পে রাজনৈতিক পালাবদলের চিত্র বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকে আত্মস্থ করে একদল তরুণ সাহিত্যিকদের আগমন ঘটেছিল। সমরেশ বসু ছিলেন তাঁদের প্রকৃত পূর্বসূরী। রাজনীতি সাধারণ মানুষের মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তারই বাস্তব উদাহরণ ‘শহীদদের মা’ গল্পটি। একটি পরিবারে মা ব্যতীত বাকী চার সদস্য রাজনৈতিক দলের কর্মী। কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী। রাজনীতি নিয়ে মতবিরোধ ভাইয়ে ভাইয়ে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। স্বামী ও ছেলেদের মাঝখানে পড়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে এক নারী। স্বামী বা সন্তান কাউকেই বর্জন করার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। স্নেহের বিভাজন তিনি জানেন না। জননী বিমলার ছোট ছেলে বাদল এক বছর আগে রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছে। বাদলের দলের লোকেরা তার স্মরণে শহীদবেদী করেছে। তখন শহীদদের মা হিসেবে বিমলাকেও ডেকেছিল। বাবা বা দাদাদের ডাকেনি কেননা তারা অন্য পার্টির লোক। সংসারে বিমলা চারটি পার্টির লড়াই দেখেছেন। বাদলের মৃত্যুতে স্বামী বা তার অপর সন্তানদের দলের হাত আছে কিনা তা তিনি জানেন না। সন্তানের অকাল বিয়োগ ব্যথায় তিনি ব্যথিত। জননী যন্ত্রণা কাতর নারীর কানে তাই স্বামীর ডাক পৌঁছায় না। পরম মমতায় যে সাংসারিক কর্তব্য তিনি এতদিন পালন করে এসেছেন, পারিবারিক লোকদের পার্টির লোক হয়ে ওঠায় সেই কর্তব্য পালনে তার অনীহা। তিনি রান্না না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছেলেদের জানিয়েছেন, “তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।”^১ ভিন্ন রাজনৈতিক মত আত্মিক সম্বন্ধের মাঝে যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দেয় সেই কথাই গল্পে শিল্পিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সমরেশ বসু একদিকে শ্রমিক জাগরণ, অপরদিকে দলীয় স্বার্থপরতার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেন। এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন পার্টির পরিচালকরা অনেক সময় দলকে তাদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। ‘মানুষ’ গল্পের ধীরেশ চরিত্রটি সেই রকমই এক ব্যক্তি। ১৯৫২ সালের পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পটভূমি উক্ত গল্পে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী দল বামপন্থী দলগুলিকে দমনের অছিলায় সৃষ্টি করেছিল সন্ত্রাসবাদ। বহু রাজনৈতিক হত্যার অভিঘাতে সভা সমিতিগুলোও তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়েছিল। এই পর্যায়ে ধীরেশ গাঙ্গুলির মতো কিছু রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার লোভে ধ্রুবর মতো সৎ পার্টি কর্মীকে হত্যা করেছিল। সেই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অপর এক পার্টিকর্মী সুজিত ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জেল থেকে ফিরে এসে সুজিত চেয়েছিল ধ্রুব হত্যার স্থানে নিয়ে গিয়ে ধীরেশের স্বীকারোক্তি আদায় করতে। ধ্রুবকেও ধীরেশ তিনবারের চেষ্টায় হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল। হত্যার দিন বোমা-বারুদ যুক্ত সেই ধূমপান নিষিদ্ধ ঘরে সে বিনা কারণেই ধ্রুবর সাথে দেখা করতে এসে সিগারেট খেয়ে তার জ্বলন্ত টুকরো ঘরে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেখান থেকে ধ্রুবর জীবনে নেমে এসেছিল চরম বিপর্যয়। লেখক দেখিয়েছেন যুগে যুগে ঘরের শত্রুরাই ঘরকে খণ্ডিত করে। লেখক সমরেশ বসুর গল্পের চরিত্ররা বেশিরভাগই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপ। ‘মানুষ’ গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

আশির দশকে রচিত লেখকের পরিণত মনস্ত্বের গল্প ‘স্বধর্ম’। এখানে পার্টি বনাম ব্যক্তি নয়, পার্টির কক্ষচ্যুত ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্বের কথা লেখক বলেছেন। একদা একনিষ্ঠ,

তार्কিক মেধাবী পার্টিকর্মী লোকনাথ তার স্বধর্মকে আবিষ্কার করল পার্টি জগতের বাইরে এসে। সত্যিকারের নীচুতলার মানুষদের জন্য বুলি সর্বস্বতা নয়, কিছু করে দেখানোর তাগিদে লোকনাথ স্ত্রী বিশ্বা এবং অন্যান্য কমরেড বন্ধুদের কাছে ধিকৃত হয়। একজন পার্টিকর্মী হিসেবে আত্মায় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, পিণ্ডদান এবং অন্যান্য লৌকিক আচারের প্রতি বিশ্বাস তার স্ববিরোধীতাকে প্রমাণ করে। তাই পার্টিতে তার থাকা উচিত নয়। স্ত্রী ও দলত্যাগের পর তার সমস্ত কার্যাবলী পার্টির বন্ধুদের অদ্ভুত মনে হয়। গরীব-দুঃখী তার কাছে আসে, বিপদে সাহায্য চায় বলে পাড়ার মোড়লরা তাকে পছন্দ করে না। অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে ষোলো বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে কেউ একটি কথা ও না বলায় লোকনাথ মেয়েটিকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এতে জনগণের মিশ্র প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরেন লেখক। চারপাশের ভদ্র- লোকেরা মনে করে, লোকনাথের মতো ভদ্রলোকের এ ব্যাপারে নাক গলানো উচিত হয়নি। কারণ ওটা ওর জায়গা নয়। সমাজের ওপরতলার মানুষরা পার্টির ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের সুবিধাবাদ, ভদ্মামির জগতে তারা এভাবেই টিকে থাকেন। তাদের কাছে লোকনাথের মতো ব্যতিক্রমী চরিত্র হয় বুদ্ধিহীন নতুবা চমক সৃষ্টিকারী কোনও নায়ক। আর পার্টির বন্ধুরা মনে করে – “এখন মনে হচ্ছে লোকনাথের মাথা খারাপ হয়নি, ব্যক্তি মহত্বের মোহ ওকে পেয়েছিল।”^{১০}

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের রং পাল্টানোর কথাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ‘বিবেক’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিভূতি মুখার্জী সেই ধারার অনুসারী। ১৯৬৭ সালে বামফ্রন্টের সরকার গঠন বিভূতিকে আন্দোলিত করেছিল। কিন্তু সেই সরকারের পতন তার মনে জাগিয়ে তুলল সংশয়ের কালো মেঘ। কলেজ জীবন থেকেই বিভূতি ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সে আকৃষ্ট হয়েছিল সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি, যার মূলমন্ত্র ছিল শ্রেণীশত্রু সংহার। কমিউনিস্ট পার্টির এই অবক্ষয়ের কালপর্বে কংগ্রেসের মদতপুষ্ট পুলিশের আক্রমণে বিভূতি গ্রেপ্তার হয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেল থেকেই সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জেল থেকে ছাড়া পেয়েও রং পাল্টাতে থাকে। কিন্তু স্ত্রী জ্যোতির প্রশ্ন – “..... কিন্তু যে নিরাপরাধ লোকগুলোকে তোমরা খুন করেছো তার কি হবে?”^{১১} বিভূতির মধ্যে জাগিয়ে দেয় তার বিবেককে। পার্টির কর্মসূচী তার মনে কোনো দাগ কাটতে পারে না। যে নিরাপরাধ ফেরিওয়ালাকে সে খুন করেছিল, তার বিধবা স্ত্রী কুসুমের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যায়।

রাজনীতি সমরেশ বসুর জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে তাকে বাদ দেওয়ার কথা তিনি কোনোদিন ভাবেন নি। তবু কমিউনিস্ট পার্টির নৈতিক অধঃপতন তাঁকে বিচলিত করেছিল। তাই আশাবাদী লেখক সেই পতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। যাদের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধিত হবে এবং পার্টি আবার স্ব-মহিমায় বিরাজ করবে।

তথ্যসূত্র:

- ১। সমরেশ বসুঃ ‘গল্পসমগ্র’ ৩য় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, পূর্নমুদ্রণ : নভেম্বর ২০২২, পৃ.৩৮০
- ২। ঐ, পৃ.৩৮৭
- ৩। সরোজ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘সমরেশ বসু রচনাবলী’ ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ.৮০৩

- ৪। অচেনা সমরেশ, ড. আলমগীর মোল্লা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ২০১২, পৃ.৪০
- ৫। ঐ, পৃ. ৪০
- ৬। ড. বুমা রায়চৌধুরী, 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন' ২য়, পূর্বাংশ ২০০৭, পৃ.২৮১
- ৭। ড. নিতাই বসু সম্পাদিত 'সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র', ২য় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ.৩৪৫
- ৮। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমরেশ বসু রচনাবলী ৭', আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৮০৪
- ৯। ড. নিতাই বসু সম্পাদিত 'সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র' ২য় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৪৩৫
- ১০। অচেনা সমরেশ, ড. আলমগীর মোল্লা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১২, পৃ.৪০
- ১১। ড. নিতাই বসু সম্পাদিত 'সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র', প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ.৩৬৪।

ভুসুকুপাদ ও জীবনানন্দের শিকারের চিত্রকল্প : বিশ্বস্ততা ও প্রতারণার আখ্যান

চন্দন বারিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: চিত্রকল্প কবির অন্যতম মূলধন। সাংকেতিক চিত্রকল্প গূঢ় নিহিতার্থের চাবিকাঠি। চিত্রকল্পের কুশলী-প্রয়োগ সেই আদিকাল থেকে আজও প্রবহমান। বাংলা আদি চর্যা-কবির চিত্রকল্পের ব্যবহার দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন। একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি জীবনানন্দ চিত্রকল্পের জাদুকরতুল্য। চর্যাকবি ভুসুকুপাদ ও জীবনানন্দের চিত্রকল্প-ভাবনায় আশ্চর্য মিল পাওয়া গেলেও দুজনের কাব্য-ভাবনায় বৈপরীত্য লক্ষণীয়। এক কবির কাব্য-চেতনায় বিশ্বস্ততা, শুদ্ধতা ও প্রেমের গভীরতা ধরা দিলেও আপর কবির কাব্য-ভাবনায় ফুটে উঠেছে বিশ্বাসহীনতা, প্রতারণা ও স্বার্থপরতার যাপনচিত্র।

সূচক শব্দ: চিত্রকল্প, পুঁজিবাদ, ভুবনায়ন, শিকারী-পরিবৃত্ত, বোধি-সংক্রমণ, ধনতান্ত্রিক-সভ্যতা, আত্মবিনাশী-আধুনিকতা, যন্ত্রযুগ, আধিপত্যবাদ, কামুক-উল্লাস, কদর্য-পুঁজিসভ্যতা।

মূল আলোচনা:

এক

বাংলা সাহিত্যে এ যাবত প্রাপ্ত প্রথম সাহিত্য নিদর্শন ‘চর্যাগীতি পদাবলী’ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সাধন-সংগীতের সংকলন হলেও এটি যে আদতে কাব্য-সংকলন সে কথা প্রমাণিত। চর্যা আবিষ্কারের এক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও কাব্য-সংকলন হিসেবে তার মর্যাদা আজও অপ্রাপ্য। ভাষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণায় আমরা ভুলতে বসেছিলাম যে, চর্যাগীতি আদতে একটি সাহিত্য-গ্রন্থ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ভাবনা থেকে সরে আসতে পারেননি। চর্যাগীতির ভাষাগত গুরুত্বের কথা স্বীকার করেও তাকে কাব্যের উচ্চাসনে বসাতে তাঁর স্পষ্ট দ্বিধা ছিল। অথচ তিনি গ্রন্থটিকে গভীর অভিনিবেশে পাঠ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর অভিলেখ্যাগারে রবীন্দ্রনাথ পঠিত গ্রন্থগুলির মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত চর্যার গ্রন্থখানিও আছে। রবীন্দ্র-পঠিত এই গ্রন্থটি সর্বত্র মার্জিনাল নোটে জর্জরিত। কাব্য রসিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটি সাধারণত হওয়ার কথা নয়।

নর-নারীর প্রেম, প্রেমজ কামনা-বাসনা কালে কালোত্তরে সাহিত্যের আবহমান বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে। প্রেমের বিচিত্র রূপ-রঙের কথা বর্ণনা করেছেন সাহিত্য-রূপকারগণ। কালপ্রবাহের সাথে সাথে প্রেম-ভাবনার ধারণাও গেছে পালটে। ধরা দিয়েছে বহুমাত্রিকতায়। এই সন্দর্ভের বয়ানের পরিসরে দুই কালের কবি যুগলের প্রেম-ভাবনা যুগগত কারণে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার অনুসন্ধান সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে। আলোচনার একপ্রান্তে আছেন প্রাচীন চর্যা-কবি ভুসুকুপাদ, অপরপ্রান্তে জীবনানন্দ।



দুই

চর্যাপদে সাহিত্যের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে নর-নারীর প্রেম ও প্রেমজ-কামনা বহুইচ্ছিক বৈচিত্র্যে ছড়িয়ে আছে। কখনো প্রেমের সার্থকতা ঘটেছে মিলনের প্রাপ্তিতে, কখনোবা জুটেছে অপ্রাপ্তির ব্যর্থতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদের পুথিতে ভুসুকুপাদের আটটি পদ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুটি পদে শিকারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ছয় সংখ্যক পদটিতে সরাসরি হরিণ শিকারের চিত্রকল্প পাওয়া যাচ্ছে। অপর তেইশ সংখ্যক খণ্ডিত পদটিতে শিকারের প্রসঙ্গ ও মৃগ-মেদ ভক্ষণের কথা পাওয়া গেলেও হরিণ-হরিণীর প্রেমজ কামনা-বাসনার কথা তার মধ্যে নেই। শুধু মাত্র মায়াজাল বিছিয়ে মায়ী হরিণকে বেঁধে ফেলার কথা জানা যাচ্ছে।

চর্যাগীতির ছয় সংখ্যক পটমঞ্জরী রাগে গীত পদটির পদকার ভুসুকুপাদ। পদটিতে হরিণ শিকারের চিত্রিকল্পে চর্যার সাধনতত্ত্ব প্রকাশের সাথে সাথে হরিণা-হরিণীর প্রেমের প্রণাঢ় প্রশান্ততাকে প্রকাশ করেছেন কবি। ভুসুকুর হরিণ মাংসের আশ্বাদনাকাজ্ঞাকে ছাপিয়ে অপরিচিত হরিণের প্রতি হরিণীর প্রেম মুকুলিত হয়েছে। পদটিতে দেখা যাচ্ছে একদল শিকারী জঙ্গলের চারদিক ঘিরে হাঁক-ডাক শুরু করে দিয়েছে। হরিণের মাংস আহারের জন্য তাদের এই প্রয়াস। কবি ভুসুকুও এই দলে আছেন।

“কাহারে ঘিণি মেলি অচ্ছহ কীস।

বেড়িল হাক পড়অ চৌদীস।।

আপণা মাংসে হরিণা বৈরী।

খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহরী।।”^১

(একালের বাংলায় রূপান্তর)

“কাহারে লভিব আমি ছাড়িব কাহাকে।

ঘিরেছে আমারে তারা চারিদিক হেঁকে।।

আপনার মাংস হেতু মৃগ নিজ-বৈরী।

ভুসুকু-শিকারী তারে বধিবারে তৈরি।।”^২

হাঁক ডাকের ফলে হরিণা হরিণীর চিত্তে চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। হরিণা-হরিণী ছুটে চলেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। চিন্তিত হয়েছে একে অপরের প্রাণ-সঙ্কটে। হরিণী হরিণকে বলেছে—

“হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিআ তো।

এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভাণ্ডো।।

তরসন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।

ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসঙ্গ।।”^৩

(একালের বাংলায় রূপান্তর)

“হরিণেরে ডাকি কহিছে হরিণী ‘মোর কথা শোন তুমি,

যত দ্রুত পার দূরে চলে যাও ত্যাজিয়ে এ বনভূমি’।

ত্বরিতগতিতে তরঙ্গবেগে ধাইল হরিণ মন্ড,

ভুসুকু বলেন মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করেনা তত্ত্ব।।”^৪

প্রেমিকা-হরিণী প্রেমিক-হরিণকে জৈবিক সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় বাতলে দিচ্ছেন। হরিণ হরিণীর নির্দেশিত পথে প্রাণ-হনন থেকে পরিভ্রাণ পেয়েছেন। পদটিতে প্রেমের বিশ্বস্ততা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রেমিক প্রেমিকার দ্বারা প্রতারণিত হননি। তেইশ সংখ্যক পদটিতে

জানা যাচ্ছে পদকার ভুসুকু শিকারে যেতে আগ্রহী শুধু নয়, পাঁচটা সফল শিকার করে মাংস আহারে বদ্ধপরিকর।

“জই তুমহে ভুসুকু অহেরি জাইবৈঁ মারিহসি পঞ্চজনা।

নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।।

জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি।

হাণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পাদ ঘর ণ পইস হিণি।।”^৫

(একালের বাংলায় রূপান্তর)

“যখন ভুসুকু শিকার করিবে

মারিয়ো গো পাঁচজনা।

কমল কাননে

প্রবেশ করিতে

হোয়ো তুমি একমনা।।”^৬

মায়া জাল পেতে মায়া হরিণীকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তাকে বধ করে আহারের জন্য প্রস্তুত করা হবে। এই অখ্যানটিতে হরিণীকে বেঁধে ফেলার যে প্রচেষ্টা তার মধ্য দিয়ে পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজের নারীকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার ও তার ওপর অধিকার স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

“হাণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পা ঘর পইস হিণি

মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী”^৭

(একালের বাংলায় রূপান্তর)

জাগিয়া থাকিলে

রহিবে সকাল

ঘুমালে নামিবে নিশা।

মাস হারা তুমি

না-পাবে ভুসুকু

নলিনী বনের দিশা।।

মায়াজাল ভেদি

বধিয়াছ তুমি

মায়া হরিণীর প্রাণ।

সহজ-সংকেত

বুঝিতে পেরেছি

পেয়ে শ্রীগুরুর জ্ঞান।।”^৮

চর্যা-সমকালীন সমাজ জীবনে নারীকে একান্ত করে পাওয়ার বাসনা শুধুমাত্র ভুসুকু পাদের পদে নয়, অন্যান্য পদকারের রচিত পদেও পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে কাহুপাদ রচিত দশ সংখ্যক পদটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কাহুপাদ ডোম্বিনীকে পাওয়ার জন্য সবকিছু ছেড়ে ঘৃণা-হীন নগ্ন কাপালিক যোগী সাজতেও প্রস্তুত। কিন্তু ডোম্বী একক পুরুষের বাহুডোরে বদ্ধ হতে চান না। সে আসক্তি প্রকাশ করে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের প্রতি। ডোম্বী উন্মুক্ত জীবন-চেতনায় বিশ্বাসী। তাইতো সে—

“এক সো পদমা চৌসটী পাখুড়ী।

তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।”^৯

(একালের বাংলায় রূপান্তর)

“এক সে পদমে চৌষটিটি পাপড়ি রয়েছে পাঁথা -

তাহারি উপরে অবলীলাভরে ডোম্বনী নৃত্যরতা।।”^{১০}



আসলে ডোম্বী একাধিক পুরুষের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ সম্পর্কে বিশ্বাসী। চৌষটি পাপড়ী তারই প্রতীক। বহু পুরুষের আসক্তির বিষয়টি—‘সরবর ভাঙ্গীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ’ পংক্তিটিতে আরো স্পষ্ট হয়েছে। আর এতেই প্রেমিক কাহ্নের আপত্তি। তিনি প্রথমে ডোম্বীর কাছে জানতে চেয়েছেন, যে ডোম্বী কার নৌকায় যাওয়া আসা করে—

“হা ল ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহ্নি নার্বৈ।।”^{১১}

(একালের বাংলায় রূপান্তর)

“ওগো ডোম্বি পুছি আমি সহজ কথায়।
চলাচল কর তুমি কাহ্নার নৌকায়।।”^{১২}

কাহ্ন তার কাঙ্ক্ষিত উত্তর না পেয়ে সরাসরি হুমকি দিয়েছে ডোম্বীর প্রাণ হননের।

“সরবর ভাঙ্গীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।

মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।।”^{১৩}

(একালের বাংলায় রূপান্তর)

“সরোবর ভেদি ডোম্বি খাইছ নলিন।

আঘাতিব তোরে ডোম্বি হবি প্রাণহীন।।”^{১৪}

কাঙ্ক্ষিত নারীকে একক ভাবে না পেয়ে পুরুষের মনে যে অতৃপ্তির আকাজক্ষা জনিত ঈর্ষ্যা দেখা দিয়েছে তা পুরুষতত্ত্বের আধিকার বোধ থেকে জাগরিত হয়েছে। এই বোধের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ ঘটেছে ভূসুকুপাদের তেইশ সংখ্যক পদটিতে। আসলে এটা প্রতিহিংসা, প্রতারণা, বা বিশ্বাসঘাতকতার আখ্যান নয়, পুরুষের প্রগাঢ় প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। জীবনানন্দের মধ্যেও এই ভাবনার অনুবর্তন ঘটেছে তাঁর ‘আকাশলীনা’ কবিতায়। সুরঞ্জনা কে তিনি বারণ করেছেন ওইখানে না যেতে, ওই যুবকের সঙ্গে কথা না বলতে। জীবনন্দও ঈর্ষান্বিত হয়েছেন তাঁর প্রিয় নারীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে দেখে।

“সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।
কী কথা তাহার সাথে?—তার সাথে!”^{১৫}

তিন

জীবনানন্দ বাংলা কবি-কুলের আধুনিক চেতনা-নির্মাণের কাব্য-কার। আধুনিক মূল্যবোধহীন নষ্ট-ভ্রষ্ট পৃথিবীর মানবিকতার পথসন্ধান ক্লান্ত নাবিক তিন। জীবনানন্দের কাব্যে শিকারের চিত্রকল্প বারবার এসেছে। শিকার ও শিকারী নিয়ে জীবনানন্দ নিরন্তর ভেবেছেন। তাঁর প্রিয় চিত্রকল্প শিকারীর হননোদ্যত মূর্তি ; বিশেষ করে হরিণ শিকারের। সুরিয়ালিস্ট বা ইম্প্রেশনিস্টদের মতো কিংবা ইমেজিস্টদের মতো হরিণকে তিনি নানা রূপে দেখেছেন।

‘ক্যাম্পে’ ও ‘শিকার’ এই দুটি কবিতায় শিকারের চিত্রকল্পে হরিণ-হরিণীর প্রেম-প্রতারণার যে চিত্র কবি এনেছেন, তা হিংস্র জন্তুব এ - পৃথিবীতে রণ-রক্ত সফলতা ছাড়া আর কিছু নয়। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি যেভাবেই পঠিত হোক না কেন কবিতাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে প্রেম হননের গল্প। প্রেমে প্রতারণার গল্প। যে গল্পের মূলে রয়েছে পণ্যজীবী সভ্যতার সঙ্গে মানবিকতার দ্বন্দ্ব। ক্যাম্পে কবিতায় বর্ণিত—

হরিণ = পুরুষ = প্রেমিক

হরিণী = নারী = প্রেমিকা

বন্দুক = হিংস্র আধুনিক সভ্যতা

-এ নিরপরাধ হরিণ আসলে সব প্রেমিক - পুরুষেরা। যারা প্রেমের মধ্য দিয়ে দু’দণ্ড শান্তি পেতে চায়। কিন্তু প্রশান্তির বদলে প্রাপ্তি ঘটে প্রতারণার। গল্পে দেখা যায় ঘাই হরিণীর ডাকে প্রেমিক হরিণ যখন প্রেমের টানে গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে আসে আর ঠিক তখনই হিংস্র আধুনিক সভ্যতার বন্দুক গর্জে ওঠে। কোন কিছু বোঝার আগেই প্রাণ চলে যায় নিরীহ প্রেমিক হরিণের। ভুসুকু পাদের কবিতায় প্রেমিক - হরিণ প্রেমিকা - হরিণীর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনের সংকট থেকে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দের প্রেমিক - হরিণ - প্রেমিকা হরিণীর কামনার প্রেমের ডাকে প্রতারিত হয়েছে। হয়তো সে প্রতারণার গন্ধ পেয়েছিল। কিন্তু তার পরেও বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, প্রেমিকাকে। আসলে ঘাই হরিণী ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক জন্তুব সভ্যতার কাছে। হয়ত বা সে তার প্রেমিককে প্রতারণা করতে চায়নি। জীবনানন্দও বিষয়টিকে বিস্মৃত হননি। তিনি বলেছেন —

“পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে,

মানুষেরা শিখায় দিয়েছে তারে এই সব।” ^{১৬} (ক্যাম্পে কবিতা)

আসলে কালগত কারণেই দুই কবির প্রেম ভাবনার মধ্যে এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। আধুনিক মূল্যবোধহীন নষ্ট-ভ্রষ্ট পৃথিবী ‘রণ-রক্ত সফলতা’ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এ হেন হনন-প্রবৃত্তি দেখে জীবনানন্দ বারবার শিউরে উঠেছেন। গভীর প্রাকৃতিক মুগ্ধতায় যে ‘পৃথিবীকে মায়াবী নদীর পারের দেশ’ বলে মনে হতো, সেই কবি ভয়ঙ্কর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে বলতে বাধ্য হলেন— ‘পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন’। তাই এই যন্ত্রযুগে প্রেমেরও কোন মূল্য নেই, প্রেমিক প্রেমিকের মধ্যে নেই বিশ্বাসযোগ্যতা। শুধুই কি প্রেমিকারাই প্রতারণা করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে? প্রেমিক পুরুষেরাও কি সেই কাঙ্ক্ষিত প্রেমের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে পেরেছেন? তারাও কি আদর্শ প্রেমিকের প্রতিমূর্তি থেকে বিচ্যুত হননি? আসলে এই জন্ত্রযুগের প্রেমিকরাও সম্পূর্ণ নকল প্রেমিক। প্রেমিকের ছদ্মবেশে আবির্ভূত দেহ-কামুক শিকারী মাত্র। সে আদর্শেই আবহমান প্রেমিক নয়। যার নজর নারী সুষমা ও সৌন্দর্যের দিকে নয়, নারীর শরীর-তন্ত্রের দিকে। নারীর শ্বাস্ত্র বীজক্ষেতের দিকে।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় বার বার শিকারের রূপকল্প ব্যবহার করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন। পুঁজিবাদী ভোগ-লিপ্সিত এ ভুবনে মানবতার কোন মূল্য নেই। হয় দক্ষ শিকারী হও, নয়তো অপরের শিকারে পরিণত হওয়া ছাড়া অন্য কোন ভবিতব্য নেই। এই ভবিতব্য-চক্র থেকে বেরোবার কোন পথই খোলা রাখেনি এ ভুবনায়নের দুনিয়া। আক্রান্ত মানুষ বেরোবার ফাঁক-ফোকর খুঁজছে আশ্রয় ভাবে। কিন্তু সেই চক্রব্যূহ থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাচ্ছে না মানুষ। জীবনানন্দ স্বয়ং এই শিকারী পরিবৃত্ত মানুষ। শিকারী পরিবৃত্ত জীবনানন্দকে

গবেষক ও কবি-সমালোচক জহর সেনমজুমদার ছয় জন শিকারীর দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখেছেন। শিকারীর দলকে তিনি এভাবে চিহ্নিত করেছেন—

প্রথম শিকারী = কবির সত্ত্বাভ্যন্তরিত বোধ বা বোধি-সংক্রমণ
 দ্বিতীয় শিকারী = মৃগয়া সভ্যতার ব্যাধ বা ঘাতক
 তৃতীয় শিকারী = ছদ্মবেশ ধারণকারী স্থূল প্রেমিক
 চতুর্থ শিকারী = মুদ্রা সভ্যতা বা ধনতান্ত্রিক পাশা খেলা
 পঞ্চম শিকারী = যুদ্ধ দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম সভ্যতার রক্ষক সৈনিক
 ষষ্ঠ শিকারী = কাল প্রবাহ চালিত অনতিক্রমণীয় মৃত্যু।^{১৭}

আসলে জীবনানন্দ এই আধুনিক পুঁজি সভ্যতার কদর্য রূপটিকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন এ আধুনিকতা আসলে আত্মবিশ্বাসী আধুনিকতা। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী রক্তপিপাসু হাড়ি কাঠে মানবিকতার বলি দিয়ে যন্ত্রযুগের বোধহীন ঘূর্ণাবর্তে আমরা আবর্তিত হয়ে চলেছি। আমাদের নিজেদের বিশ্বাস, ঐতিহ্যকে ভুলে আপন করে নিয়েছি বস্তু-বিশ্বের হৃদয়হীন আধুনিকতাকে। আধুনিকতার এই চক্রব্যূহের ভেতরে আছে ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদের নিগূঢ় ষড়যন্ত্র। সব কিছু ভুলে ক্রমাগত প্রশ্নহীন স্থূল আমোদে মুখ গুঁজে অতিরিক্ত ভোগবাদের ভুবনে আত্মলীন হয়ে পড়েছি আমরা। হতে বাধ্য করা হয়েছে আমাদের। জীবনানন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক জীবন, আধুনিক মানুষ, আধুনিক সভ্যতা কোন কিছুই আজ আর সুস্থ নেই, স্বাভাবিক নেই। সূচেনা কবিতায় কবি লিখেছেন—

“আজকে অনেক রুঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
 পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
 ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
 দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
 তাই বোন বন্ধু পরিজন প’ড়ে আছে;
 পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।”^{১৮} (সূচেনা, বনলতা
 সেন।)

রণে, রক্তে যে সফলতা আসে সে সফলতা কখনোই চিরস্থায়ী নয়; মানুষ ক্রমে স্থির দিকনির্ণয়ের চেতনা এবং চেতনা-পরিমাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; আর তাই আজকের জীবনে ঢুকে পড়েছে সন্দেহ, ভয়, অপ্রেম, দ্বेष ও অবক্ষয়। তাই প্রেমেও আর সেই প্রত্যয় নেই; নেই বিশ্বস্ততা। তাই প্রেমিক-প্রেমিকা কেউই আর আবহমান প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে উঠতে পারবে না। জীবনানন্দ তাঁর শিকার কবিতায় আর এক প্রেমিক হরিণের অপ্রাপ্য প্রেমের আখ্যান শুনিয়েছেন। হাজার বছর আগে পুরুষ প্রেমিক, যে ভালোবেসেছিল পাড়াগাঁর গোধূলি মোদির মেয়েটিকে। সে প্রেম পূর্ণতা পায়নি। কবিতার পরের অংশে এই প্রেমিক রূপান্তরিত হয়েছে বাদামী হরিণে। সুন্দর এক বাদামী হরিণ কোন এক হরিণীর প্রতি সৌন্দর্য নিবেদন করতেই সারারাত চিতা বাঘের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও হিংস্র পণ্য সভ্যতার কাছ থেকে তার প্রাণকে রক্ষা করতে পারেনি। সারারাত অনিদ্রা আর শ্রমের ফলে সে ক্লান্ত বিহ্বল। ঘুম-হীনতার কারণে প্রায় বিধ্বস্ত শারীরিক ক্লান্তি কিংবা মানসিক আতঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় যখন সে নদীর শীতল ঢেউয়ে শরীর ভাসালো আর ঠিক তখনই আধুনিক পুঁজি সভ্যতার বন্দুক গর্জে উঠলো। নদীর শীতল স্বচ্ছ জল হয়ে উঠল ‘মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল’। আর তার ঠিক পরেই সুস্বাদু হরিণের মাংসের ডিস, ব্যবসায়ী

সভ্যতার কামুক উল্লাস, সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল। আসলে এ রাক্ষসী ব্যবসায়ী সভ্যতা প্রেমের কোন মূল্য বোঝে না। প্রেমিক প্রেমিকের হৃদয়ের ওমের কোন মূল্যই নেই তার কাছে। সে বোঝে শুধু ভোগ বিলাসের হিংস্র উল্লাস।

জীবনানন্দ শুধুমাত্র আধুনিকতার ধ্বংসাত্মক রূপটিকেই চিহ্নিত করেননি, তার সম্ভাব্য কারণটিকে অনুসন্ধান করে তাঁর মনে হয়েছে এর বীজ লুক্কায়িত রয়েছে সভ্যতার প্রাগলভ্য থেকেই। তাঁর বহু আলোচিত ‘১৯৪৬-৪৭’ নামক কবিতার কবি বলেছেন— ‘সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দেব’ এই পঙ্ক্তির নিহিতার্থে জীবনানন্দ মূলত সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে তীর জৈব হিংস্রতা বিরাজমান সেই জৈবিক হিংস্রতাকেই চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত মানবিক মূল্যবোধের দুনিয়ায় কে কার শিকারী সে বোধ তমসাস্ফন্ন, পথহারা। কে কাকে শিকার করতে চাইছে সেটা বোঝাও সহজ নয়। কবি লিখেছেন—

“ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে

দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল

হ’য়ে আছে ব’লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়,”^{১১} (১৯৪৬-৪৭)

নর-নারীর প্রেম বিষয়ক ভাবনার আলোকে এই ভাবেই পাল্টে গেছে দুই কালের দুই কবির সৃজন-বিশ্বে। এককালে যা ছিল বিশ্বস্ততা ও একে অপরের প্রতি প্রেমের শুদ্ধতার প্রতিক্রম, কিন্তু আজ তা পরিবর্তিত হয়েছে ছলনা ও প্রতারণায়। বাণিজ্য সভ্যতার কুটিল প্ররোচনা প্রেমের আবহমান সত্তায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে সন্দেহ, ঈর্ষা, হিংসা ও স্বার্থপরতার বিষ। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যজীবনে এই চেতনা বারে বারে ফিরে এসেছে বিভিন্ন শিকারের রূপকল্পে। বিশেষ করে হরিণ শিকারের। অন্যান্য শিকারের কথাও এসেছে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে। কদর্য পুঁজি সভ্যতার ভোগ লিপ্সিত রূপকে সমালোচনা করেছেন কবি। বেনিয়া সভ্যতার ক্রমাগত প্ররোচনায় মানুষ-মানুষী শিখে গেছে ছলনা প্রতারণার ঘৃণ্য কৌশল। জীবনানন্দের কবি-আত্মা নারীদের প্রতি গভীর আক্ষেপে বলতে বাধ্য হয়েছেন ‘তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে’, শুধুমাত্র নারীরা নয় পুরুষেরাও শিখ গেছে ছলনা করতে, প্রতারণা করতে আধুনিক দেহ-কামুক বেনিয়া সভ্যতার হিংস্রতার প্রতিদান।

উৎস পরিচয় ও টীকা:

১. নির্মল দাশ সম্পাদিত, ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’, তৃতীয় দেজ সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ১২৬
২. গৌতম ঘোষদস্তিদার, ‘চর্যাপদাবলী’, পৃ. ২২
৩. নির্মল দাশ, প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৬
৪. বিক্রমজিৎ মণ্ডল সম্পাদিত, ‘নন্দিনী’ চর্যাপদ সংখ্যা (রূপান্তর, দেবানন্দ বসু), পৃ. ৮৪
৫. নির্মল দাশ, প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭৩
৬. গৌতম ঘোষদস্তিদার প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯
৭. নির্মল দাশ, প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭৩
৮. গৌতম ঘোষদস্তিদার প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯
৯. নির্মল দাশ, প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৭
১০. বিক্রমজিৎ মণ্ডল সম্পাদিত, প্রাগুপ্ত সংখ্যা, পৃ. ৮৬
১১. নির্মল দাশ, প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৭
১২. গৌতম ঘোষদস্তিদার প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৬

১৩. নির্মল দাশ, প্রাণ্ডু গ্রন্থ, পৃ. ১৩৮
১৪. গৌতম ঘোষদত্তিদার প্রাণ্ডু গ্রন্থ, পৃ. ২৬
১৫. জীবনানন্দ দাশ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি প্রকাশনী, পৃ. ৭৪
১৬. তদেব, পৃ.২৯
১৭. আধ্যাপক-কবি জহর সেনমজুমদার তাঁর 'শিকারী পরিবৃত্ত জীবনানন্দ' গ্রন্থে উক্ত নাম শীর্ষক প্রবন্ধে শিকারীর দলকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন।
১৮. জীবনানন্দ দাশ, প্রাণ্ডু গ্রন্থ, পৃ.৫০
১৯. তদেব, পৃ.১১৩।

জাতীয় চেতনা কী আসলে কল্পিত সম্প্রদায়

অভিষেক মণ্ডল

গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স কোলকাতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয়তাবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করলে জাতীয়তাবাদের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান ও সামাজিক নির্মাণে অ্যাডারসনের 'কল্পিত সম্প্রদায়' একটি মৌলিক গ্রন্থ। তিনি দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মত ঐতিহ্যগত সামাজিক বন্ধনগুলির পাশাপাশি মুদ্রিত পুঁজিবাদের উত্থান মানুষকে একটি অভিন্ন জাতীয় সত্তায় কল্পনা করতে সক্ষম করে। এই গ্রন্থটি জাতীয়তাবাদের উৎস নিয়ে ইউরোকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, একইসাথে জাতীয়তাবাদের পরিসর বিভিন্ন উপাদানের ওপর কীভাবে নির্ভরশীল তা দেখে। ভাষা, ধর্ম, জাতি প্রভৃতি উপাদানগুলি জাতীয়তা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভিন্নতা সত্ত্বেও এক ঐক্যবদ্ধতার কল্পচিত্র নির্মাণে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল জাতীয়তাবাদ।

সূচক শব্দ: জাতীয়তাবাদ, কল্পিত সম্প্রদায়, পরিচিতি নির্মাণ, জাতি, আধুনিকতা।

মূল আলোচনা: উত্তর-ঔপনিবেশিক কালপর্বে আমরা জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক চর্চায় বিভিন্ন মতাদর্শ লক্ষ্য করেছি। এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে পশ্চিম ও অ-পশ্চিমের দ্বন্দ্ব। একইভাবে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে উভয় শিবিরের ভিন্ন মতবাদ বিংশ শতকের শেষের দিকে লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকের মতে জাতিরাষ্ট্র হল ঔপনিবেশিক কালপর্বে পশ্চিমের আমদানিকৃত ফসল। নেশন এর উদ্ভব বা জাতীয়তাবাদের এই পশ্চিমী ব্যাখ্যা তাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়নি। জাতিরাষ্ট্রের উৎপত্তিতে পশ্চিমের বস্তুগত ও মতাদর্শিক আধিপত্যের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করতে আমি গুরুত্বপূর্ণ দুজন তাত্ত্বিকের লেখা ব্যবহার করব। Benedict Anderson এর *Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* এবং Ernest Gellner এর *Nation and Nationalism*। তাদের লেখা এই বই দুটি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। অ্যাডারসনের কল্পিত সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের অধ্যয়নে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং নৃতত্ত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক সমাজে পরিচয় নির্মাণ সম্বন্ধীয় আলোচনায়ও এই গ্রন্থ দুটি বিশেষ অবদান রাখে।

জাতীয়তাবাদের আলোচনায় এই গ্রন্থ দুটি ছিল যুগান্তরকারি সূচনা। 1983 সালে গ্রন্থদুটি যখন প্রকাশিত হয় তার আগে পর্যন্ত এই ভাষ্য প্রচলিত ছিলো যে, জাতীয়তাবাদ হল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বহু যুগ ধরে চলে আসা একটি ব্যবস্থা। উভয় তাত্ত্বিক এই মতবাদকে খণ্ডন করে দেখান তাদের গ্রন্থে। জাতীয়তাবাদের এইরূপ সরলরৈখিক ব্যাখ্যাকে তারা অস্বীকার করেছেন, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে উভয় তাত্ত্বিকের অবস্থান যদিও বা ভিন্ন ছিলো।

তা সত্ত্বেও অ্যাভারসন এবং গেলনারের তত্ত্বের মধ্যে একটি জায়গায় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন তাদের মতে - জাতীয়তাবাদ হল একটি আধুনিক বিষয়, নেশনের ফলে আধুনিকতা আসেনি, আধুনিকতাই নেশনকে নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে নেশন সম্পর্কে উভয় তাত্ত্বিকের পরস্পর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। অ্যাভারসনের মতে নেশন নির্মিত হয়েছে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় যেখানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা নেশন নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছে (Anderson: 1983, 1-8)। তার মতে নেশন নির্মিত হয়েছে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ তাদের নিজেদের অনুধাবন করে একটি বৃহৎ সর্বজনীন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে। সেই সর্বজনীন সাংস্কৃতিক পরিচিতিই জাতীয় পরিচিতির ধারণা প্রেরণ করে। অন্যদিকে গেইলনার নেশন বলতে বুঝিয়েছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা হিসাবে। তার মতে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজের উত্তরণ ঘটেছে ব্যক্তির বিকাশকে কেন্দ্র করে। সেই শিল্পভিত্তিক সমাজই রাষ্ট্রের একমাত্র ধারক ও বাহক। তিনি দেখিয়েছেন রাষ্ট্র ছাড়া নেশনকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র থাকলেই nation, nationalism and nationality এই তিনটি বিষয় থাকবে (Gellner: 1983, 1-5)।

আধিপত্য বিস্তারে কল্পিত সম্প্রদায়:

রাষ্ট্র বারে বারেই জাতীয়তাবাদকে পুনর্নির্মাণ করতে চাইবে, একটি কমন ভাষা তৈরি করে সমজাতীয় গোষ্ঠী তৈরি করতে চায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র হেজেমনি প্রতিষ্ঠা করে। ফুকো একই ভাবে দেখিয়েছেন আধুনিক রাষ্ট্র শাসন করে অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে, বল প্রয়োগ করে বা শাস্তি দিয়ে নয়। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে এইরূপ জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র তাই জাতীয়তাবাদের মত কল্পিত রাজনৈতিক চেতনা তার জনগণের মধ্যে উদ্ভূত করে, এই চেতনা একাধারে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ফসল। অ্যাভারসনের গ্রন্থ অনুধাবন করলে মনে হবে যে জাতীয়তাবাদ একটি মতাদর্শ কিন্তু জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদ কোনও মতাদর্শ নয় এটি আসলে জ্ঞাতি সম্পর্কের মত kinship বা বলতে পারি আত্মীয়তার বন্ধন অনেকটা ধর্মের ন্যায় পবিত্র।

কল্পিত সম্প্রদায় বা “*Imagined Communities*” জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিস্তার নিয়ে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা বেনেডিক্ট অ্যাভারসনের একটি প্রভাবশালী নির্মাণ, যার প্রথম প্রকাশ ঘটে 1983 সালে। এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কীভাবে জাতিগুলো সামাজিকভাবে নির্মিত একটি সত্তা হিসেবে গড়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করা। অ্যাভারসনের মতে জাতিগুলো আসলে একটি “কল্পিত সম্প্রদায়”, একটি জাতির সদস্যরা, যদিও তারা বেশিরভাগ সদস্যদের কখনো দেখেনি, জানে না, বা চেনে না তবুও তারা নিজেদেরকে একটি কমন সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে কল্পনা করে (Anderson: 1983, 15)। এই অনুভূতি বা চেতনা ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রতীকগুলোর মাধ্যমে তৈরি হয়। প্রতিটি জাতির কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা তাকে অন্য জাতি থেকে আলাদা করে। জাতি সর্বজনীন নয়; এর ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সীমারেখা থাকে। আবার জাতি ধারণাটি পুরনো শাসনব্যবস্থা, যেমন রাজতন্ত্র বা ধর্মীয় সাম্রাজ্যের বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়, যেখানে জনগণের স্ব-শাসনের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। জাতি একইসাথে তাদের সদস্যদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে, যা ব্যক্তিকে তার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করতে সক্ষম করে (Anderson: 1983, 16)।

জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে উপাদানগুলি বিশেষ অবদান রাখে বা যে চেতনা জাতীয়তাবোধ তৈরি করে তার প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। অ্যান্ডারসন দেখান ইউরোপে পবিত্র ভাষা যেমন ল্যাটিন এর গুরুত্ব কমে যায় এবং আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক জাতীয় চেতনার সঞ্চার ঘটায়। অ্যান্ডারসন প্রথমে ব্যাখ্যা করেন পবিত্র ভাষাগুলি যেমন ল্যাটিন, প্রাচীন চীনা বা আরবি, এই ভাষাগুলি একসময় ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে আধিপত্য বিস্তারের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই ভাষাগুলোই দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে সংযুক্ত রাখত। তবে এই প্রধান ভাষার ব্যবহার শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল — যেমন পুরোহিত, পণ্ডিত এবং শাসক প্রভৃতি। সময়ের সাথে সাথে এই পবিত্র ভাষার প্রভাব কমে আসে। এর কারণগুলোর মধ্যে ছিল ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন এবং নবজাগরণের ফলে সংস্কার আন্দোলন, স্থানীয় ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ। ছাপা-খানার আবিষ্কার ধর্মীয় গ্রন্থ গুলিকে স্থানীয় ভাষায় মুদ্রণের সুযোগ করে দেয়, তবে এর আড়ালে ছিল মুদ্রণ ব্যবস্থার পুঁজিবাদী অভিসন্ধি, যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়। এর ফলে ধর্মীয় যাজকদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। মুদ্রণ ব্যবস্থার পুঁজিকরণের সাথে সাংস্কৃতিক হেজেমনি হ্রাস পায় এবং স্থানীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তির ফলে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি ও নিশ্চিত হয় (Anderson: 1983, 67-82)।

পবিত্র ভাষার পতনের সাথে সাথে স্থানীয় ভাষাগুলির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার বাড়ে। প্রকাশকরা বৃহত্তর শ্রেণীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য স্থানীয় ভাষায় বই ছাপানো শুরু করেন, যা স্থানীয় ভাষাগুলিকে মান্যতা দেয়। স্থানীয় ভাষার ব্যবহার মানুষের মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করে, যেখানে তারা নিজ ভাষায় যোগাযোগ ও ধারণা বিনিময় করতে পারে। এর ফলে একদিকে চার্চের গুরুত্ব কমে কারণ মানুষকে আর ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যার জন্য চার্চ মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। এটি জাতীয় পরিচয়ের গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ মানুষ নিজেদের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করে, একই ভাষায় কথা বলে, একাত্ম বোধ সৃষ্টি হয়। অ্যান্ডারসন ব্যাখ্যা করেন যে স্থানীয় ভাষার উত্থান মানুষের সামনে সম্প্রদায়ের নতুন ভাবে কল্পনা করার সুযোগ দেয়, যেমন—জাতি (nation)। অতীতের ধর্মীয় বা রাজবংশীয় সাম্রাজ্যের তুলনায়, জাতিগুলি ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক, শ্রেণি বা অবস্থান যাই হোক না কেন একই ভাষায় কথা বলে একটি কল্পিত সমাজ বা গোষ্ঠীর অংশ হয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়।

গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কিভাবে অজ্ঞাতভাবে বা অ-সচেতনভাবে জাতীয় চেতনার জন্ম দিয়েছিল, যা পরে ঔপনিবেশিত জাতির মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টি করেছিল। তিনি অফিসিয়াল জাতীয়তাবাদ” এর ধারণা দিয়ে বলেন শাসক শ্রেণীগুলি, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা, জাতীয়তাবাদী আদর্শ গ্রহণ করেছিল এবং তা ব্যবহার করেছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে। এটি আসলে একটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া, যেখানে ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজস্ব ক্ষমতা বজায় রাখতে জাতীয়তাবাদ ব্যবহার করেছিল, কিন্তু এই জাতীয়তাবাদই পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শুরুতে, জাতীয়তাবাদ ছিল জনপ্রিয় আন্দোলনের অংশ যা পুরোনো রাজবংশ এবং সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শাসকরা এটিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ: অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান, রুশ এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মতো রাজবংশীয় সাম্রাজ্যগুলি তাদের ভিন্ন



ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে জাতীয়তাবাদ ব্যবহার করেছিল। এই সাম্রাজ্যগুলি একটি একক জাতীয় পরিচয় চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, যদিও তাদের জনগণের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, বা ইতিহাসের কোন মিল ছিল না (Anderson: 1983, 83-110)। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জাতীয়তার ধারণা কতটা জটিল এবং কখনও কখনও শাসকদের জন্যও এটি বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ এটি জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পারে যা পরবর্তীতে শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করতে পারে।

সাংস্কৃতিক প্রতীক এবং স্মৃতি সৌধ ছিলো তার জাতীয়তা নির্মাণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। পতাকা, জাতীয় সংগীত, এবং স্মৃতিসৌধ জাতীয় পরিচয়ের দৃশ্যমান প্রকাশ হিসেবে কাজ করে এবং একটি অভিন্নতার অনুভূতিকে আরও সুদৃঢ় করে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই এই ধরনের চিহ্ন প্রস্তুত করে। রাষ্ট্রের জন্য স্মৃতিসৌধ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রতিটি জাতি এই সৈনিকদের আপন হিসেবে দাবি করে, এবং একটা ভ্রাতৃত্ব বোধে আবদ্ধ থাকে। অজানা সৈনিকের প্রকৃত উৎস যাই হোক না কেন, এই জাতিগুলো তাদের নিজেদের কল্পিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান দিয়েছে (Anderson: 1983, 9-12)। অ্যান্ডারসনের এই সিদ্ধান্ত খুবই প্রাসঙ্গিক, স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট দিন গুলিতে যেমন স্বাধীনতা দিবস হোক বা প্রজাতন্ত্র দিবস, এই উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে জাতীয় সঙ্গীত এবং রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ এই সকল ঘটনাকেই একটা জাতীয় প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। এই প্রতীক চিহ্ন গুলোর সাথে সাধারণ মানুষ বিশেষ ভাবেই একাত্ম বোধ করে।

অ্যান্ডারসন এর ন্যায়, আর্নেস্ট গেলনারের “*Nations and Nationalism*” and “*Nationalisms and the New World Order*” এই দুটি লেখা আধুনিক বিশ্বে জাতীয়তাবাদের উত্থান, প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গেলনার জাতীয়তাবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন একটি রাজনৈতিক নীতিরূপে, যা দাবি করে যে রাজনৈতিক এবং জাতীয় সীমানা একত্রিত বা সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। তিনি আলোচনা করেছেন কীভাবে জাতীয়তাবাদ সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে রাজনৈতিক আকাজক্ষায় রূপান্তরিত করে এবং রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটায়। গেলনার যুক্তি দেন যে জাতীয়তাবাদ চিরন্তন বা প্রাকৃতিক কোনো ধারণা নয়, বরং এটি শিল্পায়নের একটি ফলাফল। শিল্প সমাজে কার্যকর যোগাযোগ এবং সামাজিক গতিশীলতার জন্য একটি সাংস্কৃতিকভাবে একক জনগোষ্ঠী প্রয়োজন, যা জাতীয়তাবাদ তৈরি করে (Gellner: 1983, 1-5)। কৃষিভিত্তিক সমাজে স্থানীয় ও লোক সংস্কৃতি প্রাধান্য পেত। কিন্তু শিল্প সমাজে একটি একক “উচ্চ সংস্কৃতি” তৈরি করে, যা জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি। গেলনার কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্প সমাজে রূপান্তরের ধাপগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে জাতীয়তাবাদ স্থানীয় পরিচিতি থেকে এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় পরিচিতিতে রূপান্তরিত হয়। জাতীয়তাবাদ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অভিন্ন পরিচিতির অধীনে নিয়ে আসে। তবে গেলনার এর সমালোচনা করেন, কারণ এটি জাতিগত বিভাজন এবং সহিংসতার ঝুঁকিও বাড়ায়, বিশেষত যখন সাংস্কৃতিক একরূপতা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চাপানো হয় (Gellner: 1994, 29-36)।

জাতীয়তাবাদ একটি প্রতর্ক:

অ্যান্ডারসন এর এই গ্রন্থের সমালোচনা বিভিন্ন মহল থেকে উঠে এসেছে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরালো সমালোচনা এসেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের *Whose Imagined*

Community? প্রবন্ধ থেকে। তিনি বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের “imagined communities” ধারণার সমালোচনা করেন এবং ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে তার সীমাবদ্ধতাগুলি তুলে ধরেন। তার মতে অ্যান্ডারসন জাতিকে “imagined community” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে মুদ্রণ প্রযুক্তি যেমন বই, সংবাদপত্র এর মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত বোধ করে, যদিও তারা কখনও ব্যক্তিগতভাবে একে অপরকে চেনে না বা জানে না। পার্থ চট্টোপাধ্যায় যুক্তি দেন যে অ্যান্ডারসনের এই তত্ত্ব মূলত ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে এবং তারা ধরে নেয় যে ঔপনিবেশিক জাতিগুলো একই পথ অনুসরণ করেছে। কিন্তু তিনি দেখান মুদ্রণ ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে নির্মিত। মেকলে, ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিল। তবে এটি তাদের উন্নত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলোকে উপেক্ষা করে। চট্টোপাধ্যায় জোর দেন যে ঔপনিবেশিক জাতিগুলো কেবল ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অনুকরণ করেনি বরং, তারা এই ধারণাগুলিকে সক্রিয়ভাবে রূপান্তরিত করে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। তার মতে যদি বাকী পৃথিবীর জাতীয়তাবাদ সমূহকে কিছু নির্দিষ্ট মডেলার ধরন হতে নিজেদের কল্পিত সম্প্রদায় বেছে নিতে হয়...তাহলে তাদের কি-ই বা অবশিষ্ট থাকবে কল্পনার জন্য?’ (Chatterjee: 1993, 5)। বিরোধী জাতীয়তাবাদ একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র তৈরি করে যেখানে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রভাব সীমিত ছিল। এই ক্ষেত্র প্রায়ই স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ও পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা গঠিত হয়।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদের দুটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত ক্ষেত্র, যা ঔপনিবেশিক বিরোধী জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। বস্তুগত ক্ষেত্র (material domain) হল রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলিকে বোঝায়, যেখানে ঔপনিবেশিক জাতিগুলো ইউরোপীয় মডেল গ্রহণ করে আধুনিকায়ন করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র (spiritual domain) ছিল সেই স্থান, যেখানে ঔপনিবেশিক জাতিগুলো তাদের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতাকে তুলে ধরেছিল এবং যা তাদের প্রতিরোধের মূল ভিত্তি হিসাবে প্রতিস্থাপিত করেছিল। বস্তুগত পরিসরে পশ্চিম তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে, পূর্ব তাকে অনুকরণ করেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পরিসর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ‘নির্যাস’কে (essence) বহন করে, যেখানে পশ্চিম ফাটল ধরাতে পারেনি (Chatterjee: 1993, 7)। তিনি আধ্যাত্মিক পরিসরের বিভিন্ন ক্ষেত্র সনাক্ত করেন, যেমন ভাষা, ধর্ম, পরিবার, বর্ণ, শ্রেণী ইত্যাদি। তিনি এই দৃষ্টান্তে অ্যান্ডারসনের এই তত্ত্বের সার্বজনীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

চট্টোপাধ্যায় দেখান, এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গঠিত হয়েছিল। তিনি এটাও তুলে ধরেন যে ঔপনিবেশিক বিরোধী জাতীয়তাবাদের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য ছিল, নারী, শ্রমিক, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রান্তিককরণের ফলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত হয়নি, বা বলা যায় সমাজের প্রান্তিক বর্গ এই চেতনা থেকে বহু যোজন দূরেই অবস্থান করেছিল। তিনি একটি প্রবন্ধের শিরোনামে এই প্রশ্ন তুলে ধরেন- জাতি কাদের কল্পনা দ্বারা গঠিত? তিনি দেখান ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় পরিচয় গঠনে প্রায়শই অভিজাত শ্রেণি প্রাধান্য বিস্তার করে এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো উপেক্ষিত হয়। অর্থাৎ পশ্চিমের দেখানো জাতীয়তাবাদ এর পথ ধরে পূর্বের জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। তবে চট্টোপাধ্যায়, অ্যান্ডারসন এর কল্পিত



সম্প্রদায়ের এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ অস্বিকার না করে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে দেখেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে চট্টোপাধ্যায়, অ্যান্ডারসনের “imagined communities” ধারণাকে প্রসারিত করেন এবং ঔপনিবেশিক জাতিগুলোর নিজস্ব সক্রিয় ভূমিকা ও বিরোধী জাতীয়তাবাদের বিশেষত্বগুলোর উপর জোর দেন। তার সমালোচনা উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বের জাতীয়তাবাদকে আরো সূক্ষ্মভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

গেলনারের তত্ত্বের প্রধান সমালোচনা হল শিল্পায়নের সঙ্গে জাতীয়তাবাদকে অত্যাধিক সংযুক্ত করা। জাতীয়তাবাদের এই দুটি লেখাই ইউরোপের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, এশিয়া ও আফ্রিকার মত দেশের জন্য জাতীয়তাবাদের উত্থান ভিন্ন ছিলো। জাতীয়তাবাদকে শিল্পায়নের কাঠামোগত প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখিয়ে, তিনি জাতীয় পরিচয়ের আবেগিক এবং মানসিক দিকগুলোকে উপেক্ষা করেছেন। অথবা ঔপনিবেশিক শক্তির নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে জাতীয়তাবাদ একটা রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তাদের লেখায় উপেক্ষিত হয়েছে। অবশ্য গেলনারের বিশ্লেষণ একুশ শতকের জাতীয়তাবাদের গতিপ্রকৃতি বুঝতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত বিশ্বায়ন, বাড়তে থাকা পপুলিজম এবং বহুসাংস্কৃতিকবাদ রাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। সমালোচনা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদ নিয়ে এই লেখা গুলি অন্যতম প্রভাবশালী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এটি জাতীয়তাবাদের উত্থান রাষ্ট্র, সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণে একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে।

উপসংহার: রাষ্ট্র ছাড়া nation, nationalism, and nationality কল্পনা করা যায় না। উপরিউক্ত সমস্ত বিষয় অনুধাবন করলে জাতীয়তাবাদের নির্যাস পাওয়া যায়। নির্যাসটি সত্য আবার বিমূর্ত। নেশন বা জাতীয়তা হল একটি কল্পিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা। এই চেতনা নির্মাণের বিভিন্ন স্তর ও পদ্ধতি আছে যেটি ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক। তবে এই জাতীয় চেতনা নির্মাণের সাথে যে বিষয়টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং এই ব্যাখ্যার মধ্যে তার বিশেষ উল্লেখ নেই সেটি হল অপর নির্মাণ। এই অপর নির্মাণে প্রয়োজন নেতৃত্বের। অপর নির্মাণ কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয় এটি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটে সুতরাং আমি বলতে পারি অপর নির্মাণ একটি রাজনৈতিক বিষয়। জাতির চেতনা ঠিক একই ভাবে এই অপর নির্মাণের মধ্যে দিয়ে ঘটে। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী (ভাষা), সম্প্রদায় (ধর্ম), নিজেদের পরিচিতি নির্মাণ করে অপরকে নির্মাণ করে। জাতীয়তার চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্রে হেজেমনি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র এই কাজটি সম্পন্ন করে। রাষ্ট্রের মধ্যে কখনো কখনো জাতীয় পরিচয়ের থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় প্রভৃতি পরিচয়গুলি অধিক গুরুত্ব পায় বা বলা যেতে পারে জাতীয় পরিচয়ের মাত্রা ছড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বল প্রয়োগ করতে হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় রাষ্ট্র এই বিভিন্ন পরিচিতিগুলিকে জাতীয় পরিচিতি নির্মাণে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখে। তবে বর্তমানে বহুসাংস্কৃতিকবাদ, অভিবাসন, জনপ্রিয় রাজনীতি, মৌলবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির জন্য রাষ্ট্রের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে সুতরাং জাতীয়তাবাদের আলোচনায় গেলনার এবং অ্যান্ডারসন কি আর বর্তমানে প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে।

তথ্যসূত্র:

- Anderson, B. (2020). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. In *The new social theory reader* (pp. 282-288). Routledge..
- Chatterjee, P. (1991). Whose imagined community?. *Millennium*, 20 (3), 521-525.
- Chatterjee, P. (1993). The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. *Princeton UP*.
- Chatterjee, P. (2013). Anderson's utopia. In *Grounds of comparison* (pp. 161-170). Routledge.
- Gellner, E. (1994). Nationalisms and the New World Order. *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences*, 47 (5), 29-36.
- Gellner, E. (2008). *Nations and nationalism*. Cornell University Press.

বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ ও ‘দেবীগর্জন’ নাটকে লোকসংস্কৃতির

নানা উপাদান

তপন কুমার বাল্লা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

কেশবপুর, আরামবাগ, হুগলী

সংক্ষিপ্তসার: বিজন ভট্টাচার্য জীবনের শুরুতেই গণনাট্য সজ্জের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলত মাটির কাছাকাছি মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তার ফলে বাংলার লোকায়ত জীবনের প্রভাব তাঁর নাটকে বর্তমান। লোকজীবনের ভিত্তি তাঁর নাটকের মূল স্তম্ভ। লোকজীবনের বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজাপদ্ধতি, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতিকে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসায় প্রত্যক্ষ করেন। ‘দেবীগর্জন’ নাটকে যেমন আছে লোকবৃত্তান্ত তেমনি মাতৃকাশক্তির আভাস। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লোকানুষ্ণের কারণেও নাট্য জনপ্রিয়তার প্রত্যাশায় লোকভাষার অসামান্য শক্তিমত্তাকে স্বীকার করে বিশিষ্ট লোকভাষা ‘নবান্ন’-এর চরিত্রমুখে তুলে দিয়েছেন। তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ লোকভাষা প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট নাট্যপরিবেশে সৃষ্টি করেছে এক অব্যর্থ ব্যঙ্গনা। লোকসমাজের অপরিহার্য উপাদানগুলির অন্যতম হল লোকভাষা। নাট্যকার আচার-ব্যবহারগত লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে তাঁর নাটকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকশাস্তি ইত্যাদির নিপুণ ব্যবহার ও উল্লেখ তাঁর ‘নবান্ন’কে শিল্পোত্তীর্ণ হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ ও ‘দেবীগর্জন’ নাটক দুটিতে লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে লোকজীবন ও লোকজ নানা উপাদানের সংমিশ্রণে নাট্যকারের শিল্পী সত্ত্বার সিদ্ধি ও সার্থকতা।

সূচক শব্দ: নাট্যকার, লোকসংস্কৃতি, লোকজীবন, প্রতিবাদ, গণনাট্য, লোকনাট্য, সঙ্গীত, লোকধর্ম, গণচেতনা।

মূল আলোচনা: লোকজীবন বলতে বোঝায় সমগ্র মানবজীবনকে। লোকজীবন তথা লোকসংস্কৃতির মধ্যে মানব সমাজের বিশেষ জনগোষ্ঠীর দিকটি বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। সমষ্টিগত জনসমাজই লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা। যার পটভূমিতে থাকে অগ্রসর সমাজ, কৃষি ও পল্লীজীবন। লোকসংস্কৃতির লোকজীবনের মধ্যে মিশে থাকে লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকউৎসব, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকধর্ম এবং লোকসংস্কারের নানান ছাপ। জন্মের পর থেকে যে সব রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কারের সংস্পর্শে আমরা বেড়ে উঠি— সেই চিন্তাধারার আত্মীকরণই লোকসংস্কৃতি। প্রকৃতপক্ষে—

“এক কথায় ‘লোকসংস্কৃতি’ শব্দটির মধ্যে সমগ্র মানব সমাজের বিশেষ এক এক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত থাকে—যাকে আমরা সেই সেই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দর্পণ বলে অভিহিত করতে পারি।”^১

বাংলা সাহিত্যে লোকজীবনের নানা দিকগুলিকে নানা আঙ্গিকে, প্রয়োগে সাহিত্যকারেরা তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধে আলোচিত বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলির বিষয়বস্তুতে উঠে আসে

লোকজীবনের কথা, কোনো এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর শোষণ বঞ্চনার ছবি। লোকপুরাণের সঙ্গে বাস্তবজীবনের সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর নাটকগুলিতে।

বিজন ভট্টাচার্য তাঁর রচিত অধিকাংশ নাটকেই বাংলার গ্রাম্যজীবনের চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ মিলিয়ে মোট ২৫টা নাটকের নাম আমরা জানতে পেরেছি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন গান রচয়িতা, সুরকার, Composer, গায়ক, নাট্যকার, পরিচালক, সঙ্গীত নির্দেশক ও অভিনেতা। সুতরাং লোক উপাদান ছিল তাঁর নাটকের প্রস্থানভূমি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথাযথই বলেছেন—

“তাঁর কথা বলা, অভিনয় করা, গান গাওয়া থেকে মনে হয় বাংলাদেশের গ্রাম্যপ্রকৃতি আর মানুষের ভিতর বদ্ধমূল তাঁর শেকড়। লোকসংস্কৃতি সবসময়ই তাঁর প্রস্থানভূমি। বিজনদাকে তাই সব অর্থেই বলা যায় মাটির মানুষ।”^২

বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্যকার। আলোচিত প্রবন্ধে বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ ও ‘দেবীগর্জন’ এই নাটক দুটিতে নাট্যকার তুলে ধরেছেন লোকজীবনের নানা লোক উপাদান। ১৯৪৪ সালে তাঁর ‘নবান্ন’ অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলার গণনাট্যের পথ চলা শুরু হয়। ‘আগুন’ বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘নবান্ন’। ‘আগুন’ ও ‘জবানবন্দী’ নাটক দুটির মধ্যেই ‘নবান্ন’-এর বীজ নিহিত ছিল। ‘নবান্ন’ নাটকের রচনাকাল রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্বে। আমিনপুর গ্রামের কৃষক সমাজের সাধারণ মানুষ তার সুখ-দুঃখ উৎসব আনন্দ, লোকজীবনের কথা এসব থাকলেও তাদের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, অত্যাচার যে কত মর্মান্তিক তা যেমন এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে; তেমনই কৃষক-জীবনের সজীববদ্ধ প্রতিরোধও এই নাটকে ধরা পড়েছে। নাট্যকার নিজেই লিখেছেন—

“একদিন ফেরবার পথে কানে এল, পার্কের রেলিঙের ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পূজা-পার্বণের গল্প, ভাববার চেষ্টা করছে তাদের অবর্তমানে গ্রামে তখন কী হচ্ছে। আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম। নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।”^৩

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লোকানুশঙ্গের কারণেও নাট্য জনপ্রিয়তার প্রত্যাশায় লোকভাষার অসামান্য শক্তিমত্তাকে স্বীকার করে বিশিষ্ট লোকভাষা ‘নবান্ন’-এর চরিত্রমুখে তুলে দিয়েছেন। তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ লোকভাষা প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট নাট্যপরিবেশে সৃষ্টি করেছে এক অব্যর্থ ব্যঞ্জনা। লোকসমাজের অপরিহার্য উপাদানগুলির অন্যতম হল লোকভাষা।

নাট্যকার আচার-ব্যবহারগত লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে তাঁর নাটকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকশাস্তি ইত্যাদির নিপুণ ব্যবহার ও উল্লেখ তাঁর ‘নবান্ন’কে শিল্পোত্তীর্ণ হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সদ্য কাটা ফসলে উঠোন পরিপূর্ণ। আনন্দে সবাই মেতে উঠেছে। ধর্মগোলা স্থাপন করেছে। হিন্দু মুসলিম সকলকে আগামী দিনের দুর্দিনের কথা মাথায় রেখে শস্য মজুত রাখছে। ফকির বিড়বিড় করে উঠেছে—

“আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যে সে বয়ান।

হিন্দু মুসলিম যতেক চাষি দোস্তালি পাতান।।

এছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।

আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।”

নাটকের শেষ দৃশ্যে চাষীদের আনন্দ উৎসবের বর্ণনায় বাংলার লোকসংস্কৃতিকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষক রমণীর গানে তা ধরা পড়েছে—

“নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলায় হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর সাতনলি।
ক’নে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।।”

লোকসংস্কৃতির প্রাঙ্গণে জোর প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে নাটক শেষ হয়।

বিজন ভট্টাচার্য জীবনের শুরুতেই গণনাট্য সজ্জের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলত তিনি মাটির কাছাকাছি মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তার ফলে বাংলার লোকায়ত জীবনের প্রভাব তাঁর নাটকে বর্তমান। লোকজীবনের ভিত্তি তাঁর নাটকের মূল স্তম্ভ। লোকজীবনের বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজাপদ্ধতি, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতিকে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসায় প্রত্যক্ষ করেন। ‘দেবীগর্জন’ নাটকে যেমন আছে লোকবৃত্তান্ত তেমনি মাতৃকাশক্তির আভাস।

বলাভাল, দেবীগর্জনের পূর্বনাম ছিল ‘কলঙ্ক’। ‘কলঙ্ক’ একাক্ষের কাহিনির পটভূমিতে রয়েছে বাঁকুড়া জেলার একটি সাঁওতাল পরিবারের কাহিনি। এই পরিবারের কর্তা এক বৃদ্ধ মোড়ল। তাঁর সংসারে আছে তাঁর স্ত্রী গিরি পুত্র মঙ্গল এবং পুত্রবধু রত্না। এরা সব লোকায়ত জীবনের শরিক। সেইদিক থেকে ‘দেবীগর্জন’ লোকায়ত জীবনের আর এক নাট্যরূপায়ণ।

এ নাটকে দেখা যায় সাঁওতালরা গোষ্ঠীজীবনের সংহতি রক্ষায় বন্ধপরিকর। বহিরাগত বা বিদেশীদের তারা তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাতে দিতে দেয় না। নাট্যকার সাঁওতালদের জীবনের শরিক হওয়ার সুযোগে ‘কলঙ্ক’ একাক্ষের কাহিনি গ্রন্থনায় উৎসাহী হন। ‘কলঙ্ক’ একাক্ষের পূর্ণঙ্গ নাট্যরূপের নাম পাল্টে রাখা হয় ‘দেবীগর্জন’।

‘দেবীগর্জন’ লেখা হয় ১৯৬৬-তে। নাটকটি তিনটি অঙ্কে, এগারোটি দৃশ্যে গঠিত। এই নাটকের তৃতীয় দৃশ্যটি ব্যঞ্জনধর্মী। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের দাবা খেলার দৃশ্য। দাবা খেলা লোকসংস্কৃতির উপাদান। আসলে গ্রাম্যজীবন নিপীড়িত জনগণের মধ্যে নতুন পঞ্চায়েত গড়ে তোলার যে আওয়াজ উঠেছে, তাতে পুরানো পঞ্চায়েতের মাতব্বররা বিচলিত। দাবার রাজা-মন্ত্রী-গজ-নৌকা-বোড়ের চলাফেরার মধ্যে দিয়ে ত্রিভুবন সেই নতুন লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছে প্রভঞ্জনকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিভুবন ও প্রভঞ্জনের সংলাপ উল্লেখ করা যায়। যেমন—

ত্রিভুবন। হাঁতিঠো তুমার বড় বুড়া হইয়েছে প্রভঞ্জন-মন্ত্রীর মাথাঠো আমার অনেক উঁচা।

প্রভঞ্জন। পাও দিয়া মন্ত্রীর মাথাঠো দাবাই চলবে আমার হাঁতি শুণ্টা তুলি। দাবার ছকের মাধ্যমে জীবনের ছক ধরা পড়ে। সামন্ততান্ত্রিক হাতির চালবিগত, গণতান্ত্রিক মন্ত্রীর চাল আধুনিক। গণনাট্যের এই যে ধারাবাহিক পরিবর্তনের ছক, তা লোকনাট্যেরই নতুন আঙ্গিক পরিকল্পনা।

‘দেবীগর্জন’ নাটকের মূল কাহিনি মংলাদের প্রতারিত জীবনের প্রতিবাদ এবং সাঁওতালদের লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গ। এই প্রতিবাদ ছাড়া সাঁওতালদের লোকায়ত জীবনের আরও নানা দিক উদঘাটিত হয়েছে ‘দেবীগর্জন’ নাটকে। নাটকের ভূমিকার নাট্যকার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এই নাটকের কাহিনি দাঁড়িয়ে আছে—

“উষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল
চাষিদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে।”

নাট্যকারের কথাতাই প্রকাশ পায়, এ নাটকের কাহিনির গতি আবেগঘন লোকসংস্কৃতির
বহতা ধারায়। বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল এই নাটকের পটভূমি। নাটকের
প্রথম অংকে প্রথম দৃশ্য শুরু হয়েছে সাঁওতাল কুলিকামিন ছেলেমেয়েদের গান দিয়ে। যেমন—
“হাতে মগের বাতি মাথাত বেতের ঝুড়ি, চলিলাম দাদা গ
পাতালপুরী। চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা রুমরুম সুমরি শুকরি যাঁইছে
পাতাল নিঝুম।”

এই গান লোকজ উপাদান, লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত লোকগান।

লক্ষ করা যায় কুলিকামিনরা গান গাইতে গাইতে পথ অতিক্রম করে গেলে ‘সোনার
খালায় সূর্য ওঠে।’ দৃশ্যমান হয় বাউরী পল্লীর জনৈক বৃদ্ধ মোড়লের এক দোচালা ছাউনি। এই
মোড়ল একজন চাষী। ছাউনির উঠান পরিষ্কারভাবে নিকানো। ছাউনির দাওয়ায় বসে মোড়ল
আর তার বউ গিরি শালপাতার চুটি বিড়ি খাচ্ছে। আর মাঝে মাঝেই তারা কাশছে। সর্দার
জোতদারের খোলানো খাবার তড়ায় ব্যস্ত হয়। মাড়াইয়ের পর ধানের ভাগ বাঁটোয়ার হবে।
তাই মোড়লের এত ব্যস্ততার কারণ। গাঁইতি, ঝুড়ি, কোদাল কাঁধে নিয়ে জোয়ান ছেলেরা
ইতিমধ্যে সব কাজে বেরিয়ে পড়েছে। এসব গ্রামবাংলার বাস্তব ঘটনা। গাঁইতি, ঝুড়ি, কোদাল
এসব লোকজ উপাদান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“বিজন তাঁর বালাজীবন থেকেই গ্রামবাংলার নিভৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলে
ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পান। সেইসব অঞ্চল বৈচিত্র্যে ভরা।
গ্রামবাংলায় যেমন বাস করে সামন্ত প্রভুরা তেমনি নানাবর্ণের
নানাবৃত্তির মানুষও। বিজন গ্রামের সেইসব মানুষকে কাছ থেকে
দেখেছেন। তিনি দেখেছেন গ্রামবাংলার কৃষিজীবী ভূমিহীন চাষীদের।
তারা নানাভাবে শোষিত। তাদের দারিদ্র, অজ্ঞতা ও অসহায়তা
আকাশচুম্বী। বিজন গেছেন বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুরের আদিবাসী
এলাকায়। দেখেছেন তিনি তাদের সংগ্রামী জীবন। সেই জীবন যেমন
দারিদ্র্য আর অবহেলায় পূর্ণ, তেমনি তাদের বিশ্বাস সংস্কার
পূজাপদ্ধতি আচার ব্যবহার এবং জীবনযাপন প্রণালীও বিজন গভীর
অভিনিবেশে প্রত্যক্ষ করেন। বাউরী, বেদে, বাউল, সাপুড়ে, ওঝা,
গুণীন, মাঝি, চাষী, কীর্তন গায়ক, বৈষ্ণব, শক্তি উপাসক প্রভৃতি
মিলে গ্রামবাংলার জীবন চিত্র বিচিত্র রসে ভরা। বিজন সেই
রসবৈচিত্র্যের সন্ধানে সদা উৎসুক থাকতেন। তিনি রাজনৈতিক
চেতনায় ঋজু হয়েও যেমন ছিলেন স্বদেশীচিন্তায় উন্মুখ, তেমনি
মাতৃকাজির মহিমায় স্নাত। শোষিত মানুষের বঞ্চনার নাট্যরূপ
দিতে তাঁর ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ। এই চিন্তাতেই তিনি যোগ দেন
গণনাট্য সংঘে। কিন্তু দেশের লোকায়ত ধর্ম ও দর্শন হিন্দুধর্মের প্রতি
আকর্ষণকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। গ্রেট মাদার তত্ত্বের প্রতি
আকর্ষণ তাঁর বরাবরই ছিল। এই আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া গেছে
নবান্ন রচনার পরেই ‘জীয়কন্যা’ রচনার সময় (১৯৪৬)। তার কুড়ি

বছর পরে যখন বিজন ‘দেবীগর্জন’ লেখেন তখনও সেই গ্রেট মাদার

তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।”^৪

স্বাভাবিকভাবেই তাই তার নাটকে স্বভাবতই উঠে এসেছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান এবং পৌরাণিক তত্ত্ব।

বাঙালি লোকজীবনে বিয়ের অনুষ্ঠান বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ‘দেবীগর্জন’-এ লক্ষ করা যায় মংলা ও রত্নার বিয়ের ছবি। গণনাট্যসুলভ গ্রামীণ লোকসংস্কার বিদ্যমান। আসন্ন সংগ্রামের মাঝে মংলা ও রত্নার বিয়ে comic রিলিফ দিচ্ছিল। গরীব গ্রামবাসীরা নাচে গানে মেতে উঠেছিল। মংলা ও রত্নার বিয়ের প্রেমভালবাসার রঙিন স্বপ্নের সময়েই ঘটে যায় নাটকীয় বৈপরীত্য। প্রভঞ্জন সর্দারের জমিজমা নিলাম করার জন্য ঢাকঢোলের আওয়াজ তুলে হাজির হলে বিয়ের নিবিড় স্বপ্ন ভেঙে যায়। নতুন বউ যেন এই অশুভ অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে। এখানে লক্ষ করা যায় লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। বলা প্রয়োজন—

“লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান লোকবিশ্বাস। এ লোকবিশ্বাসকে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে কখনো কখনো লোকবিশ্বাস আচার ব্যবহারগত লোকসংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়। যখন লোকসমাজের বিশ্বাসকে লোক বা ব্যক্তি মৌখিক ভাষায় প্রকাশ করে তখন তা বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয়। আর যখন তা আচার ব্যবহারে প্রকাশ পায় তখন তা আচার ব্যবহারগত লোকসংস্কৃতির অংশ হয়। অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ আচার ব্যবহারগত লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকবিশ্বাসকে লোকসংস্কার হিসেবে অভিহিত করেন।”^৫

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে লোকসমাজে প্রচলিত বিবাহের প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে। এ নাটকে দেখা যায় খোলানে যাবার আগে গিরিকে সে জানায় ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময় হল। গিরি তখন সর্দারকে স্মরণ করিয়ে দেয়— লেদুয়া বুড়া একটি পাত্রীর খবর নিয়ে দেখা করতে আসবে। লেদুয়া তাকে কি খেতে দেওয়া হবে, তাই নিয়ে সর্দার চিন্তিত হয়। লেদুয়ার সম্মানে সর্দারের ইচ্ছা ছিল শ্যার মারা হবে। কিন্তু শ্যারের থেকে খাসির খরচ তুলনায় কম, মাত্র শ’ টাকা। এছাড়া লেদুয়াকে পচাই-এর পরিবর্তে বিলাইতি মদ পরিবেশন করা হয় কিনা তাই নিয়ে সর্দার ও গিরির মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্দার ও গিরির সংলাপ উল্লেখ করছি—

গিরি। তো যাও কেনে, খোলান যাও।

সর্দার। অঁ হঁ হাঁ ছেল্যাটাকে সাদি দিব মনে করলাম।

হঁ হঁ, আসবে তো, আজই আসবে; কিন্তুক ধানে পয়সায় হালঠো যা হঁইয়েছে না, তাত করি সাদি দিবার মনঠো নাই। —মেজাজঠো,— ভাবছিলাম তো একটা শ্যার-ই মারব বটে যেদিন লেদুয়া আসবে। তা আর হবেক নাই। একটা খাসি কম হয় তো শ-ও টাকা, মুরাদ নাই আজ ফুড়া কে দেই।

গিরি। মুরাদ নাই, মেজাজঠো আছে হঁ!

সর্দার। কী মুরাদ নাই বলিস তুই?

গিরি। অঁ হঁ, সর্দার হোস তো বটে!
বাস্তবিকই সর্দারির সম্মান প্রতিপত্তি প্রদর্শনের বিষয়টি সর্দার চিন্তার মধ্যে না এনে পারে না।
ছেলের বিয়ে দেবার আনন্দে গিরি টাকা পয়সার ব্যাপারে দরাজ হতে চায়। অবশেষে নিজের
মনের আনন্দে সে গান ধরে—

“করি চিরি পাটি পারি
খৈছামে ফুলধরি,
ফুল পহেরি
তখন ভেঙ্গ খবরি।”

এই গান গাইতে গাইতে গিরি সর্দারের কোমর ধরে নাচতে থাকে। কিন্তু সর্দারের আর
দাঁড়াবার সময় নেই। সে চলে যায় কাজে। কিন্তু গিরি তখনও আপন মনে নাচে আর আনন্দে
গান গেয়ে চলে। এইখানেই প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি।

আবার দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণায় দেখা যায় প্রভঞ্জন সর্দারের খামারবাড়ি খোলান।
খোলানে ধানের মরাই, ডাঁই করা খড় আর মাচাং। সেখানে ইতিমধ্যেই মেয়ে কামিনরা ধান
ঝাড়তে লেগেছে। কুলো দিয়ে ধান ওড়াতে ওড়াতে তারাও সমবেত কণ্ঠে গান ধরে—

“গুনের ননদ ময়না
নিশাকালে শিয়াল ডাকে
ঘরেতে মন রয় না।
গুনের ননদ ময়না
ধনীর প্রাণে সয় না
ধান ঝাড়িতে দোসর পাইলাম না।”

নাটকের প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে খোলানে কুলোয় ধান উড়াতে উড়াতে সমবেত
বিবাহের দিন ধার্য হলে একটা নারীর মধ্যে তার হবু বরকে নিয়ে যে রোমান্টিক প্রেম
ভালবাসার দানা বাঁধে তারই চমৎকার ইঙ্গিত এই লোকগান।

আলোচ্য অংকের চতুর্থ দৃশ্যে লোকজীবনের প্রেক্ষিতটির একটি সুন্দর বিবাহের বর্ণনা
লক্ষ করা যায়। সাঁওতাল পুরনারীদের মুখে গীত গানের মধ্যে এই চালচিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।
যেমন—

“সাজ সীতা সাজ সীতা সুন্দর সাজে,
সাজ রামা সাজা রামা সুন্দর সাজে।
সুন্দর সুন্দরীক্ দেখে
সোনার কলস ভাসে জলে
বৃন্দাবনের দুইটি ফুলে
একটি ফুলে রাধা দোলে।”

অবশেষে লোকায়ত বিবাহপর্ব সমাপ্ত হয় যথারীতি আনুষ্ঠানিক আচারের অনুষ্ঠানের
মাধ্যমে। ছেলে বউ নিয়ে বাড়ি এলে চারিদিকে উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়। খুশিতে ডগমগ
গিরি সর্দারের গায়ে ঢলে পড়ে। উপস্থিত সবাইকে মিঠাই মন্ডা, সুরাপান ও তামাক দিয়ে
অভ্যর্থনা জানানো হয়।

আদিবাসী লোকসমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নের খাদ্যতালিকায়—
অপরিহার্য থাকে গুয়াপান। এমনকি কুটুম্ব মুখ যাতে বেজায় না হয় তার জন্য তিন তিন

হাঁড়ি মছয়া রাখা আছে। আদি সমাজে হাঁড়ি মছয়া ছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বর বধূবরণের উদ্দেশ্যে বরণ ও স্ত্রী আচারের ব্যবস্থা আছে। এই কাজে যেসব স্ত্রীলোক স্বতঃনিযুক্ত হয়, তারা বরের কাছে বিদায় নিতে চায় সোনা দানা রুপা। তারা টাকা পয়সা চায় না। কিন্তু অবশেষে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে রফা হয় কাঁচা টাকার বিনিময়ে। নাট্যকার এখানে লোকসমাজে প্রচলিত বিয়ের অনুষ্ঠানে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নাটকে ব্যবহৃত উল্লেখিত উপাদানগুলি লোকসমাজে প্রচলিত রীতিকে উল্লেখ করে নাট্যকার লোকজীবনের চিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন।

সাঁওতালদের ঘরে পোষা হয় কুকর্যা অর্থাৎ মোরগ। সাঁওতালরা ভরা ফাল্গুনে পলাশ পেয়ে খুশি হয়। পলাশ না পেলে লাল শালুকও সংগ্রহ করে। রত্না ও মংলার কথোপকথনে সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে।

রত্না। তো সেই ভাঁটফুল, টুকচা লালের ছিটা গায়ে, আনিস, মাখাত পরতাম।
মংলা। পলাশ ফুলঠোই তো আনিবার পারি। কহেক না?
রত্না। পলাশ ফুল পাবি না এখন।
মংলা। নাই পলাশ তো লাল শালুক আনব পদ্মবন থিকা!
রত্না। লাল শালুক! —পদ্মবনে সাপ থাকে রে মংলা!

‘দেবীগর্জন’ নাটকে লোকসমাজে প্রচলিত সমবেত সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। বিয়ের পরে স্বামীকে কাজে পাঠিয়ে বিরহিনী নববধূ রত্নার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সখীরা গান ধরে—

“ই মেয়েঠো নায় না
ই মেয়েঠো খায় না
ই মেয়ের ইঁইয়াছে কী?
ই মেয়ে বাঁধে না চুল,
পরে না দুল।
ই মেয়ের ইঁইয়াছে কি?”

সাঁওতালদের জাত ব্যবসা বুড়ি-ঝাঁপি কুলোকাটা বোনা। সর্দার প্রভৃতির দ্বারা প্রতারণিত হয়ে জমি জোত খুইয়ে বুড়ি-ঝাঁপি বোনে। এইসব সামগ্রী পাইকারের কাছে বিক্রি করে তাতেই কোনোক্রমে সংসার চলে। বাংলার লোকশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল বুড়ি-ঝাঁপি কুলোকাটা বোনা।

‘দেবীগর্জন’-এর বিষয় কৃষক বিদ্রোহ। রামায়ণ পাঠে জানি, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই ধ্বংসকার্য সম্পন্ন হয় বসন্তকালে। তাই দুর্গাপূজার প্রচলন ঘটে বসন্তকালে। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠে আমরা জানতে পারি; রামচন্দ্র শরৎকালেই দেবীর বোধন ঘটিয়েছিলেন। বসন্তের পরিবর্তে শরৎকালে এই বোধন হয় বলে, এর নাম দেওয়া হয় অকালবোধন। এই অকালবোধনের দ্বারাই রামচন্দ্র রাবণবধে সফল হন।

পুরাণের অকালবোধনের কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে কাজে লাগিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য। এ নাটকে দেখা যায় মংলা প্রভৃতির বধের সময় মহাকালীর তাণ্ডব নাচের অনুসরণে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। নাট্যকার ‘কাহিনী’ অংশে জানিয়েছেন—

“ধর্মঠাকুর পাপের পঙ্ক কুণ্ড থেকে নতুন জীবন সত্যের অভিজ্ঞান নিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন। গুরু হয়েছে মুখোশধারী বহুধরপীর গাজন উৎসব। সজ্জবদ্ধ ভূঁই চাষির কঠ তখন

গলিত সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিসর্জনের বাজনার তালে তালে

এখন আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে দেবীগর্জন।”^৬

লক্ষ করার বিষয় হল, এই নাটকে পৌরাণিক দেবীর আদলে পরিকল্পিত ভূমি দেবী। এই দেবীর কোলে আশ্রিত সন্তানরাই তো সমগ্র চাষী পরিবার। মায়ের কোল খালি হলে ভূমিদেবীর কোলে আশ্রিত সন্তানরা বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে স্বাভাবিকভাবেই গর্জে উঠবে। নাটকের শেষে দেখা গেল শোষণের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োগ এবং বিদ্রোহে জয় লাভ।

বাস্তবিক অর্থে— ‘দেবীগর্জন’ নাটকে ব্যবহৃত সংগীতের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রধানত লোকনাট্যরীতি অনুসরণে নাটকে সংগীতের ব্যবহার করেছেন এবং সে ব্যবহার অপ্রচুর নয়। লোকনাট্য সংগীত ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য থাকে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাও অনুসরণ করেছেন। তাঁর নাটকে সংগীতের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার লোকনাট্যরীতির অনুসৃতি হলেও নাট্যকারের লোকসংস্কৃতিপ্রীতি এক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য মঞ্চ ও দর্শকদের প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সংগীতের ব্যবহার করেছেন। আর ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি সমৃদ্ধ লোকনাট্যের সম্ভার হাতে দিয়েছেন। লোকনাট্য সম্ভার থেকে তিনি আরো নিয়েছেন গীতের মাধ্যমে কথোপকথন করার রীতিকে। বাংলা লোকনাট্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একাধিক চরিত্রের কথোপকথনে সংলাপের পরিবর্তে সংগীতের ব্যবহার। এ নাটকে দেখা যায় পঞ্চায়েত সমিতির সভা বসলে ত্রিভুবন ও চাষীদের কথোপকথন থেকে বোঝা যায় সে একজন সুবিধাবাদী, বেইমান। ত্রিভুবন চাষীদের সভায় প্রভঞ্নের পক্ষে ওকালতি করতে এসেছে। অতএব চাষীদের নতুন কথা ভাবতে হবে। তখন প্রবীণ সর্দার দশরথ উঠে দাঁড়িয়ে চাষীদের কঠিন মোকাবিলার সংকল্প গ্রহণে তৎপর হতে বলে। সে সবার কপালে রক্ত তিলক ঐঁকে দেয়। এখানে নাট্যকার চাষীদের শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলবার জন্য অতি সুকৌশলে গদ্য সংলাপের পরিবর্তে তাদের মুখে সংগীত ব্যবহার করেছেন। চাষিরা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গান ধরে—

“মাকে আনতে চলরে ভাই কালীদহের কূল

মাকে আনতে চলরে ভাই ক্ষীর নদীর কূল

মাকে আনতে—

গলায় দিব চাঁদমালা চরণে জবাফুল।

মাকে আনতে—

পদ্মপত্রে জনম তোমার ওগো মা ব্রাহ্মণী

তুমি মা কৈলাসেশ্বরী জগতি জননী

মাকে আনতে—”

গান গাইতে গাইতে চাষীরা প্রভঞ্নের বাড়ির দিকে যাত্রা করে। মঞ্চ অঙ্ককার হয়ে আসে। তীব্র কৌতূহলে পাঠক পরবর্তী ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে সাঁওতাল পাড়ায় রাতবিরেতে বাঘের দেখা মেলে। সাপেরও আবির্ভাব ঘটে। বাঘ মারার জন্য সাঁওতাল নারীরা দাঁ হাতে নেয়। এসবই লোকজ উপাদান। বাস্তবিকপক্ষে—

“সাঁওতাল সমাজ পরিচালিত হয় পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা। সেই

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রাম্য মোড়ল আপন স্বাধিসিদ্ধির প্রয়োজনে আপন কুক্ষিগত করে দরিদ্র সাঁওতালদের শোষণ করলে, সাঁওতালরা বাঁচার



তাগিদে নতুন পঞ্চয়েতী ব্যবস্থার দাবি করে। এই ব্যবস্থায় ধর্মগোলা সর্বসাধারণের সম্পত্তি। ‘দেবীগর্জন’ নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে নতুন পঞ্চয়েতী ব্যবস্থার দাবিতে ধর্মগোলার অধিকার আদায়ের মাধ্যমে। ধর্মগোলার দরজা খোলা হয় ধর্মঠাকুরের পূজার মাধ্যমে। সেই পূজারও একটা উপযুক্ত সময় আছে। নাটকে দেখানো হয়েছে শোষিত বঞ্চিত সাঁওতালরা ধর্মগোলার অধিকার পাবার জন্য উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাতেই রামচন্দ্রের অকালবোধনের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে প্রমাণ হয়, সাঁওতালরা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতনতা কৃষক বিদ্রোহের বীজ বপনে সহায়তা করে সাহস জোগায়।”^৭

বলা ভাল ‘দেবীগর্জন’ নাটকের নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৌরাণিক তত্ত্ব এবং লোকসংস্কার। দেবীর গর্জনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার যেমন শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন এবং দেবীর আড়ালে কৃষক সমাজের মধ্যে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়াস অনবদ্য হয়ে উঠেছে। অতপর শোষক সম্প্রদায়ের পরাজয় ত্বরান্বিত হয়। পৌরাণিক তত্ত্ব ও দেবীর প্রতি এই বিশ্বাস বা ধর্মতত্ত্ব বাক্যকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

‘দেবীগর্জন’-এ অনেক লৌকিক ছড়া ও প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের শুরুতে যখন পূবাকাশে উষার সূচনা হতে চলেছে তখন ছড়া গান গেয়ে পথচলার দৃশ্য অপূর্ব। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে— কামিনেরা যখন কুলোয় শস্য প্রস্তুত করছে, তখনও শ্রমসংগীত হিসাবে ছড়াগানের সার্থক ব্যবহার করা হয়েছে। বহুরূপীর দলও বাংলার লোকজীবনে আনন্দের উৎসব হাজির করে। রত্নার একাধিক সংলাপে লোকসংস্কার, লোকপ্রবাদ শোনা গেছে।

সর্দার পরিবারের দুর্দশার জন্য এক সময় গিরি মনে করে, পুত্রবধূ রত্নাই ‘অপয়া’। এটি একটি লোকসংস্কার। বহুরূপীর দলকে দশরথ রক্ততিলক পরিয়েছে। তাদের বিশ্বাস রক্তের রঙ লাল, তাই এই লাল রঙ বিপ্লব ও বিদ্রোহের চিহ্ন। এটি একটি লোকসংস্কার।

নাট্যকার আদিবাসী সাঁওতাল বাউরি কৃষকদের জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মোট ৭টি গান ব্যবহার করেছেন। একটি গান নাটকে দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। সব গানই লোকগানের আদলে রচিত। এছাড়া লোককীড়া হিসেবে দাবা খেলার উল্লেখ আছে। ভবিষ্যৎ কৌশলগত বিরোধকে দাবা খেলার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন নাট্যকার। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় ‘দেবীগর্জন’ গণনাট্যের আড়ালে একটি সার্থক লোকনাট্য।

আলোচনার সমাপ্তিতে একথা বলা যায়, লোকজীবনের লোক উপাদানে নাট্যকার চরিত্রের সংলাপের বুননে বাস্তবজীবনের ঘাত-অভিঘাতগুলি নাটকে রূপ দিতে চেয়েছেন। ‘দেবীগর্জন’ নাটকের মধ্যে লোকজীবনের গণচেতনার সজ্জবদ্ধরূপটি আমরা খুঁজে পাই। যেখানে বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসী কুলি-কামিনদের অন্ত্যজ জীবনের ছবি সেইসঙ্গে তাদের শ্রেণিসংগ্রামের গণঅভ্যুত্থানের দিকটিকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার, ‘নবান্ন’ নাটক দিয়ে যা শুরু। ‘দেবীগর্জন’ নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে বিজন ভট্টাচার্য ভূমিকায় যা লিখেছিলেন তাতে নাট্যকারের লোকসংস্কৃতির চিন্তাচেতনার মূল ভিত্তিভূমিকাকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—

“কৃষিভিত্তিক বাংলার সাংস্কৃতিক রূপরেখায় শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়ে নিগুঢ় সেই cultural cell-টিকে

আমাদের খুঁজে নিতে হবে এবং প্রাণচৈতন্যের বহতা অক্ষুণ্ণ রেখে
বর্তমান জীবন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তার নিরাকরণ করতে
হবে।”^৮

এখানেই নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ ও ‘দেবীগর্জন’ নাটক দুটিতে
লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে লোকজজীবন ও লোকজ নানা উপাদানের সংমিশ্রণে নাট্যকারের শিল্পী
সত্ত্বার সিদ্ধি ও সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

- ১। বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১।
- ২। নাট্যকথা, ‘প্রসঙ্গ বিজন’, বিশেষ সংখ্যা, ২০০৯, পৃ. ৫৫।
- ৩। বিজন ভট্টাচার্য, ‘নবান্ন’, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১৪।
- ৪। জগন্নাথ ঘোষ, কৃষি বিপ্লবের নাটক দেবীগর্জন, সাহিত্য সঙ্গী, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১৪।
- ৫। ড. রতন সিদ্ধিকী, অমৃতলাল বসুর নাটক ও লোকসংস্কৃতি, অনার্য, ২০১৭, ঢাকা, পৃ. ২৭৬।
- ৬। বিজন ভট্টাচার্য, দেবীগর্জন, দে’জ পাবলিশিং, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
- ৭। জগন্নাথ ঘোষ, কৃষি বিপ্লবের নাটক দেবীগর্জন, সাহিত্য সঙ্গী, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৪১।
- ৮। বিজন ভট্টাচার্য, দেবীগর্জন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন : উনিশ শতকের এক অনালোচিত বাঙালি সমাজসংস্কারক ও তাঁর উত্তরাধিকার

জগবন্ধু সরদার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
পাটুড় কলেজ

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস-মূলত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, ডিরোজিও প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক কেন্দ্রিক। কিন্তু বাংলার এই নবজাগরণ প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে বহু সমাজ হিতৈষী ছিলেন-যাঁদের অবদান মূলধারার ইতিহাসচর্চায় আড়ালে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৩১-১৮৯৩)। তিনি ছিলেন একজন গ্রামীণ বাংলার সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক। এই গবেষণাপত্রে ঐতিহাসিক দলিল, প্রামাণ্য উৎস ও পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ পর্যালোচনা করে তাঁর জীবন ও কর্মের ভিত্তিতে বাংলার নবজাগরণে তাঁর অবদান এবং উত্তরাধিকার বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করা হয়েছে। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সমাজসংস্কারমূলক কর্মসূচির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল- বিধবাকে বিবাহ এবং গোবরডাঙ্গা পৌরসভা প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রভাব। এছাড়া তিনি বাল্যবিবাহ রোধের চেষ্টা, বিধবা-বিবাহের সমর্থন, নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর শিক্ষার প্রসারে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রভাবে তিনি শিক্ষাকে কেবল পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং কৃষি ও হস্তশিল্পের সঙ্গে শিক্ষার বাস্তব সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালান। এর ফলে তিনি গ্রামীণ সমাজে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। জাতীয়তাবাদী স্বদেশী চেতনাও তাঁর চিন্তার অন্যতম মূলভিত্তি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে ভারতবাসী কেবল সমাজসংস্কার নয়, রাজনৈতিক মুক্তির পথেও অগ্রসর হতে পারবে। কিন্তু ইতিহাসচর্চার মূলধারায় তাঁর অবদান অনালোচিত রয়েছে। তাই শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের অবদান পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কারণ, তাঁর কাজ প্রমাণ করে যে, বাংলার নবজাগরণ কেবল শহুরে শিক্ষিত সমাজের সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং গ্রামীণ বাংলাতেও তা গভীরভাবে প্রভাব পড়েছিল। যা উনিশ শতকের সমাজসংস্কারের বহুমাত্রিক দিক উন্মোচনের মাধ্যমে ইতিহাসচর্চায় নতুন দিক উন্মুক্ত করবে।

সূচক শব্দ: শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বাংলার নবজাগরণ, সমাজসংস্কার, বিধবা বিবাহ, উপেক্ষিত সমাজসংস্কারক, উত্তরাধিকার।

মূল আলোচনা: উনিশ শতক বাংলা তথা ভারতে বহুমাত্রিক পরিবর্তনের যুগ। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তার প্রভাবে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে এক নবচেতনার সূচনা ঘটে। নবজাগরণের ধারায় আমরা সাধারণত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বের নামই উচ্চারণ করি। কিন্তু এর বাইরে এমন অনেক সমাজসংস্কারকই আছেন, যাঁদের অবদান আঞ্চলিক বা সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বৃহত্তর বাংলার ইতিহাসে তা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৩১-

১৮৯৩)। তাঁকে সমকালীন সংবাদপত্রে এবং আঞ্চলিক স্মৃতিচারণায় একজন শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও গ্রামীণ উন্নয়নের পথিকৃৎ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরহিতো ব্রতী হয়েছিলেন। ডেভিড কপ্ফ লিখেছেন, - “The forgotten reformers like Srish Chandra Bidyaratna reveal that the Bengal Renaissance was not merely a Calcutta-centric elite movement, but also penetrated into the rural landscape of Bengal.”^১ কিন্তু বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে মূলধারার আলোচনায় তাঁর নাম সচরাচর উঠে আসে না। কারণ, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নথিপত্রে তাঁর কাজের উল্লেখ খুবই সীমিত এবং অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় শহুরে শিক্ষিত অভিজাত সমাজসংস্কারকরা বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন। ফলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতো আঞ্চলিক কর্মীরা প্রান্তিক থেকে গেছেন। নীতীশ সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, - “Bengal’s nineteenth-century social reforms cannot be confined to a few towering names; there were many regional reformers who carried forward the spirit of change in less known corners of Bengal.”^২ এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন ও কর্মের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা এবং তাঁর সমাজসংস্কারমূলক অবদানকে নবজাগরণের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পুনর্মূল্যায়ন করা। এর মাধ্যমে বোঝা সম্ভব হবে যে, ইতিহাসচর্চার মূলধারায় যাঁরা উপেক্ষিত থেকেছেন, তাঁদের আলোচনায় আনা কেবল ইতিহাসের শূন্যতা পূরণ নয়, বরং উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারের বহুমাত্রিকতাকে যথার্থভাবে তুলে ধরা।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম, শিক্ষা ও কর্ম জীবন:

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বতন চব্বিশ পরগণা জেলার কুশদহ-এর অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামে। বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা পৌরসভার খাঁটুরা গ্রামে, এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সংস্কৃতচর্চা ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতা ছিলেন খ্যাতনামা কথক রামধন তর্কবাগীশ। মাতা ছিলেন সূর্যমণি দেবী। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী শ্রীশচন্দ্র শৈশব থেকেই সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রচর্চার পরিবেশে বেড়েওঠেন। তিনি খাঁটুরার পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ছাত্র শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আসেন। তিনি দর্শন, ন্যায় ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি ১৮৫৬ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে “বিদ্যারত্ন” উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে রবীন্দ্র কণ্ঠ-এর টাকায় তিনি আর্থিক পুরস্কারও লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে (তৎকালীন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন) অধ্যয়ন করেন। তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চা এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানচর্চায় যুক্ত ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ করে ১৮৫৬ সালে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঐ কলেজের সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। কিছুদিনপর ঐ বছরই নব্বই টাকা মাসিক বেতনে ঐ কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এরপর ‘জজ পণ্ডিত’-এর কার্যভার নিয়ে মুর্শিদাবাদে ব্রিটিশ আদালতে কর্মরত হন। কিছুদিন পর তৎকালীন বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁকে বনগাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করেন। তাঁর প্রশাসনিক প্রচেষ্টায় বারাসাত সাব-ডিভিশন স্থাপিত হয়। তিনি এই পদে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করেন।



তিনি ১৮৭০ সালের ১-লা মে গোবরডাঙা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত পুরপ্রধান হন- যা তার প্রশাসনিক ভূমিকার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। গোবরডাঙার পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, রেললাইন স্থাপন, রাস্তা সংস্কার এবং অন্যান্য নাগরিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান আজও স্থানীয় ইতিহাসে স্মরণীয়।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড:

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৩১-১৮৯৩) অধ্যাপনা ও প্রশাসনিক কর্মের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যপ্রেমী। তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বঙ্গীয় নবজাগরণে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপান্তরে এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছিল। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এবং নিজের যুক্তিবাদী চিন্তা ও মানবিকতার টানে সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। তিনি ততকালীন শহরকেন্দ্রিক নবজাগরণ আবহের বাইরে গ্রামীণ বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মের আলো জ্বালিয়েছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন-যা একদিকে বিদ্যাসাগরের প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে, অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা প্রকাশ করে।

সমাজ সংস্কার:

১. উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে বিধবা বিবাহের প্রশ্নটি ছিল এক জটিল সামাজিক সমস্যা। প্রাচীন শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা, উচ্চবর্ণীয় সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ-এই তিনের সমন্বয়ে বিধবার জীবন অসহনীয় ছিল। তাদের পুনর্বিবাহের অধিকারকে রক্ষণশীল সমাজ কঠোরভাবে অস্বীকার করতো। এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো প্রগতিশীল সমাজসংস্কারকরা আন্দোলন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও যুক্তি-তর্কের প্রভাবে ১৮৫৬ সালে তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি “Hindu Widows’ Remarriage Act, 1856”-এর খসড়া রচনা করেন। পরবর্তী ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই এই আইন কার্যকর করেন।

রক্ষণশীলদের কঠোর বিরোধিতা ও প্রগতিশীলদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোদ্ধা হিসেবে সক্রিয়ভাবে এই সংস্কার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। সমকালীন পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, তিনি ‘বিধবা বিবাহ সমিতি’ (১৮৫৬)-এর কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন এবং কলকাতা ও মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবা পুনর্বিবাহ প্রচারে জনসচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন। বিধবা-বিবাহকে তিনি নারীমুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে দেখেছিলেন। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, “শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন বিধবা বিবাহ আন্দোলনের এক নীরব যোদ্ধা, যিনি বিদ্যাসাগরের ছায়াতলে থেকেও আন্দোলনকে কার্যকর রূপ দিতে সহায়তা করেছিলেন”^৩

“Hindu Widows’ Remarriage Act, 1856” কার্যকর হলে বিদ্যাসাগর, ৭-ই ডিসেম্বর, রবিবার, ১৮৫৬ (২৩-শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ) নিজ খরচে (দশ হাজার টাকা) ভারতের প্রথম আইনি বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন, কলকাতার ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে (বর্তমান ৪৮-এ ও ৪৮-বি কৈলাশ বসু স্ট্রিট)। এক্ষেত্রে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও পরিবারের বিশেষ করে মাতা সূর্যমণি দেবীর বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে পাত্র হলেন ২৫ বছরের বিপত্নীক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি বর্ধমানের পলাশাডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীমণি দেবীর বিধবা কন্যা ১০ বছরের কালীমতি দেবীকে বিবাহ

করেন। এই ঐতিহাসিক বিধবা বিবাহ আসরে উপস্থিত ছিলেন-বিদ্যাসাগর সহ রামগোপাল ঘোষ, ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব, জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, জজ হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন,-

“সাহিত্য সবিভা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক।

বিধবা বিবাহ করা পথ প্রদর্শক।।

লভিয়াছে পাঠালে খ্যাতি চমৎকার।

কবিতার পুরস্কার একায়ত্ত তার।।”^৪

তৎকালীন সমাজে বিধবা বিবাহকে ধর্মবিরোধী ও সমাজবিধ্বংসী বলে কটাক্ষ করা হতো। যারা এ ধরনের বিবাহে উদ্যোগী হতেন, তাদের সামাজিক বয়কট করা হতো। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁকে নানা প্রকার বিদ্রূপ ও আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবুও তিনি সামাজিক প্রতিরোধকে তোয়াক্কা না করে সংস্কারের কাজে লিপ্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীকালে তাঁর সংগ্রামী চরিত্রের প্রশংসা করে লেখেন, “তিনি ছিলেন সত্যকারের লড়াইয়ের মানুষ, যিনি বিরোধিতার মুখেও আদর্শকে বিসর্জন দেননি।”^৫ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সক্রিয় ভূমিকা বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কার্যকর ও গতিশীল করে তুলেছিল।

২. ঊনবিংশ শতকে বাংলায় বাল্যবিবাহ ছিল একটি প্রচলিত প্রথা। মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া শুধু শিক্ষার পথ বন্ধ করত না, বরং অসংখ্য সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করে বোঝাতেন যে, অল্পবয়সে বিবাহ কেবল শরীর ও মনের বিকাশ রোধ করে না-জাতির ভবিষ্যতকেও অন্ধকার করে তোলে। ১৮৭৩ সালে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,- “অপরিশ্রুত বয়সে বিবাহ জাতির ধ্বংসের মূল কারণ।”^৬ ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে যখন “Age of Consent Bill” নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়, তখন তিনি আইনটি সমর্থন করেন। অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি এই আইনকে হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যারত্ন যুক্তি দেন যে, সমাজসংস্কার ধর্মবিরোধী নয়, বরং তা ধর্মের প্রকৃত মানবিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে।

৩. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন জাতিভেদ প্রথার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি মনে করতেন জাতিভেদ শুধু হিন্দু সমাজকেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজকে বিভক্ত করেছে। তিনি মনে করতেন যে, যতদিন জাতিভেদ প্রথা থাকবে, ততদিন ভারতবর্ষে প্রকৃত সামাজিক সংহতি সম্ভব নয়। অর্থাৎ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভারতীয় সমাজে এক বৃহত্তর মানবিক চেতনার কথা প্রচার করেছিলেন।

৪. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মসমাজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন তাঁর চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবেও তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বহুবার ব্রাহ্মসমাজের সভায় বক্তৃতা দেন এবং বহুবিবাহ, সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধ আচার-অনুশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। তাঁর বক্তৃতাগুলিতে যুক্তিবাদী মনোভাব, মানবতাবাদ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষা সংস্কার:

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শহরমুখী শিক্ষা প্রবাহের বাইরে গ্রামীণ শিক্ষার প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যম নয়, বরং একটি সমাজ-নির্মাণের হাতিয়ার। তিনি লিখেছিলেন,- “শিক্ষাই জাতির মঙ্গলসোপান, শিক্ষা ব্যতীত স্বাধীনতা, উন্নতি, ন্যায়পরায়ণতা কল্পনা করা যায় না।”^৭ তাঁর শিক্ষা চিন্তা ও দর্শনে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়, নারীশিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, প্রান্তিক গোষ্ঠীর শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১. বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরণ করে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন নারীশিক্ষার প্রসারে সক্রিয় হয়েছিলেন। তিনি বলেন- “সমাজে নারীকে অশিক্ষিত রেখে জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়; শিক্ষার মাধ্যমে নারীর অধিকার স্বীকৃতি দিতে হবে।”^৮ তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৬০-এর দশকে মেদিনীপুর ও তমলুক অঞ্চলে বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ লিখেছিল,- “গ্রামে নারীগণের অজ্ঞতা দূরীকরণে বিদ্যারত্ন মহাশয় মহত্বপূর্ণ কর্ম করিতেছেন।”^৯ তিনি মেদিনীপুর গার্লস স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ‘সমাচার দর্পণ’ মন্তব্য করেছিল,- “বিদ্যারত্ন মহাশয় মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন, তাহা দক্ষিণ বাংলার সামাজিক চিন্তায় এক নব প্রভাতের সূচনা করিল।”^{১০}

২. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজ শাসনের অধীনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হলেও, প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত ছিল। তাই তিনি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য “লোকশিক্ষা” কে গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে,- “যে জাতির ছেলে-মেয়েরা বর্ণপরিচয় জানে না, সে জাতি উচ্চশিক্ষার আলো পায় না।”^{১১} তাঁর প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর, হুগলি ও নদীয়া জেলার বহু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,- “In the southern part of Bengal, Srish Chandra Bidyaratna took pioneering steps to establish village schools where English and Bengali education went side by side.”^{১২} আবার তাঁর কাজের মূল্যায়ন করে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন,- “শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন এক জন সত্যিকার শিক্ষানুরাগী, যিনি শিক্ষাকে কেবল শহরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখিতে চান নাই।”^{১৩}

৩. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সমাজের প্রান্তিক নিম্নবর্ণের শিক্ষার প্রতিও বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার অধিকার কেবল উচ্চবর্ণ বা ধনী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এজন্য তিনি “লোকশিক্ষা প্রসার সমিতি” গঠন করেছিলেন এবং দলিত ও আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিনা খরচে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার প্রমাণ সরকারি নথিতে মেলে,- “In the Midnapore district, Vidyaratna opened schools where students from marginalized communities were admitted without any discrimination.”^{১৪}

৪. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মনে করতেন যে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তাই তিনি শিক্ষার সঙ্গে কৃষি, হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করেন। এর ফলে ছাত্ররা পড়াশোনার পাশাপাশি জীবিকা অর্জনে সক্ষম হতো। নীতীশ সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন,- “In rural areas, Bidyaratna was one of the pioneers who introduced practical education linked to economy and self-

reliance.”^{১৫} এই ধারণা একদিকে আত্মনির্ভর স্বদেশী চেতনার সঙ্গে যুক্ত ছিল, অন্যদিকে উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছিল।

৫. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পুথিগত শিক্ষার পাশাপাশি চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষা, সততা, পরিশ্রম ও ন্যায়পরায়ণতার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষা নয়, মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষাই সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি। তাঁর দৃষ্টিতে, - “নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার কোন মূল্য নেই।”^{১৬}

৬. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চা, ইতিহাস ও দর্শনের সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা ভারতীয় সমাজকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবে। এজন্য তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে, - “অজ্ঞানই অন্ধকার, বিজ্ঞানই আলো। সমাজকে আলোকিত করিতে হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক।”^{১৭}

জাতীয়তাবাদী ভাবনা

উনিশ শতকের শেষভাগে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। এক্ষেত্রে বিদ্যারত্নও তাঁর লেখনি ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যবোধের বিকাশ ঘটতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৩৫ খ্রিঃ ‘মেকলে মিনিট’-এর সমালোচনা করে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্যকে স্থান দেওয়ার কথা বলেন। ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে তিনি যুবসমাজকে, জাতীয় অতীত গৌরব সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যারত্ন তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র “সমাজদূত”-এর মাধ্যমে সমাজসংস্কার, শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

উত্তরাধিকার ও প্রাসঙ্গিকতা

বাংলার নবজাগরণের ধারায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের ন্যায় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন একক নেতৃত্বে বৃহত্তর সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত করতে পারেননি। এমনকি শহুরে নবজাগরণের মূলধারায় নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। তাই গভীর ইতিহাসচর্চায় তিনি এক অনালোচিত সমাজ সংস্কারক। তাই তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ডের উত্তরাধিকার আলোকপাত করা খুবই প্রাসঙ্গিক। যেমন-

১. শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সমাজ সংস্কারের উদ্যোগগুলি নবজাগরণের প্রবাহকে গতিশীল করেছিল- যা পরবর্তীকালে আধুনিক সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি রচনায় সাহায্য করেছিল। রঞ্জিত মিত্র লিখেছেন, - “The reformist vision of Srish Chandra Vidyaratna anticipated modern ideas of social justice and equality, highlighting the enduring relevance of his contributions.”^{১৮}

২. ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিদ্যারত্নের শিক্ষা উদ্যোগের প্রভাব পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে লিখেছেন, - “Bidyaratna’s educational vision sowed the seed of cultural nationalism in Bengal long before the Indian National Congress took shape.”^{১৯}

৩. তাঁর নারী কল্যাণের চেষ্টা পরবর্তী সময়ে নারীশিক্ষা আন্দোলন এবং বাঙালি নারী কল্যাণের মাপকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় যে, বিদ্যারত্নের কর্ম ও



চিন্তাধারা নারীসমাজকে স্বাধীনভাবে শিক্ষার আলোতে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস ছিল।

৪. তিনি দেশপ্রেম, স্বনির্ভরতা ও জাতীয়তাবাদকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন- যা স্বদেশি যুগে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ সুশোভন সরকার মন্তব্য করেছেন, - “Smaller reformers like Vidyaratna, through their newspapers, created a bridge between local communities and the larger nationalist discourse.”^{২০}

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন ও কর্ম মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তাঁর কার্যক্রম গ্রামীণ সমাজসংস্কার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তেমনই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, নারীশিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকগুলিকে আলোকিত করে। কলকাতা-কেন্দ্রিক সমাজ সংস্কারকরা, যেমন- রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ইতিহাস চর্চার কেন্দ্রে এসেছিলেন। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ততখানি আলোচনার কেন্দ্রে আসতে পারেননি। তবুও তাঁর কার্যক্রম “Bottom-up reform”-এর একটি বিরল উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর ভূমিকা বর্তমান গবেষক, সমাজকর্মী এবং শিক্ষাবিদদের কাছে গভীরভাবে আলোকপাতের বিষয়। তাই বলা যায় যে, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের উত্তরাধিকার শুধু ইতিহাসের অংশ নয়; বরং আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. Kopf, David, 1979, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton, Princeton University Press, p. 156.
২. Sengupta, Nitish, 2001, History of the Bengali-Speaking People. New Delhi, UBS Publishers, p. 288.
৩. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ১৯৯৫, বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১৭
৪. মিত্র, দীনবন্ধু, ১৯৪৪, সুরধনী কাব্য, দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ.৩৩
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬০, রবীন্দ্রনাথ রচনাকারী, দ্বাদশ খণ্ড, শান্তি নিকেতন, বিশ্বভারতী, পৃ.৪৪৩
৬. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৮১, জাতিভেদ ও সমাজসংহতি, বঙ্গবাসী পত্রিকা, কলকাতা, পৃ.৪৩
৭. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৭৮, সমাজ ও শিক্ষা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, কলকাতা, পৃ.১৪
৮. বিদ্যারত্ন শ্রীশচন্দ্র, ১৮৬২, নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ, সর্বশুভকরী পত্রিকা, কলকাতা, পৃ.২১
৯. Mukherjee, Harish Chandra, 1862, The Hindoo Patriot, Vol. IV, Calcutta, Madhusudan Ray's Press, p. 112.
১০. সমাচার দর্পণ, শ্রীরামপুর মিশন, ১৮৭৮, পৃ.৪২
১১. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৭৪, লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বঙ্গ দর্শন, কলকাতা, পৃ.৫
১২. Bhattacharya, Asutosh. 1968, Education in Colonial Bengal, Calcutta, Calcutta University Press, p. 214.
১৩. সেন, সুকুমার, ১৯৫৬, বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্য, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.২৬৭
১৪. Government of Bengal. Education Report, 1881, p. 57.
১৫. Nitish Sengupta, History of the Bengali-Speaking People, New Delhi,

UBS Publishers, 2001, p. 289.

১৬. দে, অমলেন্দু, ১৯৮১, বাঙালি সমাজচিন্তা, প্রগতি প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ-৮৯
১৭. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৮১, লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বঙ্গ দর্শন, কলকাতা, পৃঃ-৬
১৮. Mitra, Ranjit, 2004, Banglar Samajik Itihas, Kolkata, Ananda Publishers, p.178
১৯. De, Amalendu, 1987, Social Reform and Nationalism in Bengal, Kolkata, Calcutta University Press, পৃ. 123
২০. Sarkar, Sushobhan, 1990, From Reform to Nationalism in Bengal. New Delhi, Orient Blackswan, p. 211.

গ্রন্থপঞ্জি:

আরও গ্রন্থ/পত্রিকা/প্রতিবেদন:

১. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৮১, জাতিভেদ ও সমাজসংহতি, বঙ্গবাসী পত্রিকা, কলকাতা
২. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৭৮, সমাজ ও শিক্ষা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, কলকাতা
৩. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৬২, নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ, সর্বশুভকরী পত্রিকা, কলকাতা
৪. বিদ্যারত্ন, শ্রীশচন্দ্র, ১৮৮১, লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বঙ্গদর্শন, কলকাতা
৫. সমাচার দর্পণ, ১৮৭৮, শ্রীরামপুর মিশন, শ্রীরামপুর
৬. Government of Bengal, Education Report, 1881, Calcutta

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দাশ, কুমারেশ, ২০০২, কুশদহ সংবাহিকা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা
২. ড. বন্দোপাধ্যায়, নিরঞ্জন (সম্পাদক), ২০১৫, গোবরডাঙ্গা খাঁড়ার ইতিহাস ও কুশদহ প্রসঙ্গ, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
৩. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ১৯৯৫, বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৪. মিত্র, দীনবন্ধু, ১৯৪৪, সুরধনী কাব্য, দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬০, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলি, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
৬. সেন, সুকুমার, ১৯৫৬, বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৭. দে, অমলেন্দু, ১৯৮১, বাঙালি সমাজচিন্তা, প্রগতি প্রকাশনী, কলকাতা
৮. Kopf, David, 1979, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton
৯. Sengupta, Nitish, 2001, History of the Bengali-Speaking People, UBS Publishers, New Delhi
১০. Bhattacharya, Asutosh, 1968, Education in Colonial Bengal. Calcutta University Press, Calcutta
১১. Mitra, Ranjit, 2004, Banglar Samajik Itihas, Ananda Publishers, Kolkata
১২. De, Amalendu, 1987, Social Reform and Nationalism in Bengal, Calcutta University Press, Calcutta
১৩. Sarkar, Sushobhan, 1990, From Reform to Nationalism in Bengal, Orient Blackswan, New Delhi,
১৪. Basu, Manorama, 1987, Women and Education in Colonial Bengal, Progressive Publishers, Calcutta।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ডাইনী’ : মিথ্যা অপবাদে জীবন

বিনষ্টির গল্প

ফিরোজ আলি মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: গরিব, অসহায়া নারীদের ডাইনী অপবাদ দেওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরে এই জঘন্য অপরাধ চলে আসছে সমাজে। শিক্ষাহীনতা, অন্ধবিশ্বাস, স্বার্থপরতা, কুটিলতা এই অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়, অপরাধকে বাড়িয়ে তোলে। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার অন্যতম এক হাতিয়ার হল মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। এই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নারীদের উপর নির্বিচারে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়, এমনকি পুড়িয়েও মারা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের অন্ধ কুসংস্কারের শিকার হয়ে অনেক নারীদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। স্বাধীনভাবে, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকবার অধিকার তারা হারিয়ে ফেলে। এমনই এক সমাজ পরিত্যক্তা এবং সমাজের দ্বারা প্রাপ্ত মিথ্যা ডাইনী অপবাদে দুষ্ট এক অসহায়া নারীর জীবন বেদনা ও জীবন বিনষ্টির কাহিনি আলোচ্য ‘ডাইনী’ গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।

সূচক শব্দ: ডাইনী, অন্ধ কুসংস্কার, নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজ, মিথ্যা অপবাদ, নারীর অসহায়তা, নারীর জীবন বেদনা ও জীবন বিনষ্টি, নিঃসঙ্গ ও একাকী জীবন, ধনী ব্যক্তিদের প্রভাব।

মূল আলোচনা: সময় ও সমাজ আধুনিকীকরণের সূত্র ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপুল প্রসারের যুগে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিসীমা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমরা জানি প্রদীপের তলায় অন্ধকার থাকে। সময় ও সমাজ, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির যতই বিবর্তন বা উন্নতি ঘটুক না কেন এই উন্নতির আলো, জ্ঞানের আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছাতে পারেনি। বিজ্ঞান-বিদ্যা-যুক্তির পাশাপাশি অন্ধ কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসও সমাজে সমানভাবে বিরাজিত। যা মানুষের অন্তরকে সংকীর্ণ করে তোলে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। এই অন্ধ কুসংস্কার ও বিশ্বাস মূলত গ্রামীণ সমাজে লক্ষ করা যায়। অন্ধ কুসংস্কারের অনেক বৈচিত্র্য আছে। তার মধ্যে একটি হল অসহায়া গরিব নারীদের ডাইনী অপবাদ দেওয়া। রূপকথার গল্পে ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাইনী-ব্রহ্মদৈত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে তাদের বিকট, বীভৎস রূপ লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাস্তবে যাদের ডাইনী অপবাদ দেওয়া হয় তাদের কোনো বিকট, বীভৎস রূপও লক্ষ করা যায় না। এ যেন অসহায়া দরিদ্র নারীদের উপর অত্যাচার করার এক গ্রামীণ হাতিয়ার। যে সমস্ত নারীরা এই অপবাদের শিকার হয় সমাজে তারা স্বাধীনভাবে, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকবার অধিকারটুকু হারিয়ে ফেলে। সমাজে তারা ব্রাতা হিসাবে গণ্য হয়। তাদের উপর নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘ডাইনী’ গল্পে গ্রাম্য কুসংস্কার ও মিথ্যা অপবাদের শিকার এক নারীর জীবনের করুণ পরিণতি তুলে ধরেছেন।

‘ডাইনী’ গল্পটি প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। গল্পের প্রেক্ষাপট ছাতিফাটার মাঠ। এই মাঠ নিরক্ষর চাষীদের নিকট রহস্যময়। এই মাঠের রূপ—

“অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে

সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ! ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে।...কোনো বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না; কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।”^১

এই ছাতিফাটার মাঠের পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা। সেই জলাটার উপরে রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে সেখানে চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করে “এক ডাকিনী, ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর, ত্রুর এক বৃদ্ধা ডাকিনী।”^২ যার নাম সোরধনি বা সরা। সবাই তাকে ডাইনী বলেই জানে। তার কাছে কেউ আসে না। তার প্রতি কেউ যত্নও নেয় না। তার আত্মজনও কেউ নেই। একাকী, নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাকে জীবন কাটাতে হয়। বৃদ্ধাবস্থায় তার জীবন অতিবাহিত হয় ভিক্ষার দ্বারা—

“...দুই তিনটা বাড়িতে গিয়া দাঁড়ালেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে; সের খানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক বিক্রী করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে।”^৩

সোরধনি কোনো ডাইনী নয়, তার কোনো বীভৎস, বিকট রূপও লক্ষ করা যায় না, সে পুরোপুরি এক রক্ত-মাংসের মানবী। সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে একাকী অবস্থায় তাকে বসবাস করতে হয়েছে। তার বেদনা, দূরবস্থাকে কেউ বোঝার চেষ্টা করেনি। তার মধ্যে কোনো নিষ্ঠুরতা, ত্রুরতার পরিচয় পাওয়া যায়নি, বরং উদারতা ও মানবিকতারই পরিচয় পাওয়া গেছে। ছাতিফাটার মাঠে তত্ত্বরৌদ্রে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত এক তরুণীকে জল ও সামান্য পাটালি সে দিয়েছে, শুধু তাই নয় তরুণীর কোলে থাকা শিশুটির প্রতিও সে মমতা দেখিয়েছে। তাই সে তরুণীকে উদ্দেশ্য করে বলে—“দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে।”^৪ এছাড়া এক বাড়ুরী যুবকের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নিজের রূপোর চুড়ি ও পাঁচটি টাকা দিয়ে নাতি-ঠাকুরমার সম্বন্ধ তৈরি করতে চেয়েছে সোরধনি। কিন্তু কেউ তাকে স্বাভাবিক মানবী বলে মনে করেনি। সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করেছে। মানুষের এহেন নির্দয় আচরণ দেখে সোরধনি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে। এই মিথ্যা অপবাদের সে শিকার হয়েছে দশ-এগারো বছর বয়সে। অন্যথা এই বালিকাকে প্রথম ডাইনী অপবাদ দেয় বামুন বাড়ির হারু ঠাকুর। মূলত নিজের শিশুপুত্রের অসুস্থতার জন্য সোরধনির দৃষ্টিকে দায়ী করে হারু ঠাকুর। সেই সময় থেকে সবাই তাকে ডাইনী মনে করে অবহেলা, ঘৃণা করতে থাকে। নিজের গ্রাম পাথরঘাটা থেকে পালিয়ে সে বোলপুরে চলে আসে। সেখানে এক জনৈক ডোম যুবকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে স্বামী মারা গেলে সোরধনি ছাতিফাটার মাঠে এসে আশ্রয় নেয়। এই আশ্রয়ও তার জীবনে স্থায়ী হয় না। গ্রামবাসীদের ভয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বের হয় সে। তবে অন্য কোনো নতুন স্থানে তার আর যাওয়া হয় না। ছাতিফাটার মাঠে কালবৈশাখীর ঝড়ে কন্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা ডালে বিদ্ধ হয়ে মারা যায় সে। নিরঙ্কর গ্রামবাসীরা মনে করতে থাকে যে—

“বৃদ্ধা ডাকিনী...আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুল্মের মস্তপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।”^৫

এই ‘কালো রক্ত’ প্রমাণ করে দেয় সোরধনি কোনো ডাইনী ছিল না, কিন্তু মরে গিয়েও তার ডাইনী অপবাদ ঘোচে না। সারাজীবন তাকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সুখ কী জিনিস? তা তার জানাও হয় না, ভোগ করাও হয় না।

কাহিনির সূত্র ধরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মিথ্যা অপবাদ এক নারীর জীবনকে কীভাবে ধ্বংস করে দেয়। এই অপবাদের কলঙ্ক বালিকাবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বহন করে যেতে হয়েছে সোরধনিকে। এই জটিল যন্ত্রণাময় অপবাদের নিগড় থেকে সে মুক্তি পেতে পারেনি। সোরধনি যদি ধনী গৃহের কন্যা হত তাহলে এই অপবাদের শিকার সে হত না। অনাথা, অসহায়া দরিদ্র বালিকা বলেই তা সম্ভব হয়েছে। গ্রামের মানুষদের কাছে ভালোবাসা পাওয়া তো দূরের কথা বরং ঘৃণা, তচ্ছল্য ও অপমানই সে পেয়েছে। এই অপবাদ তার জীবনের স্বাভাবিকতাকে, বেঁচে থাকবার অধিকার ও আনন্দকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সোরধনি বাস্তবের সেই সমস্ত নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে যাদেরকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় বা নির্যাতন করে পুড়িয়ে মারা হয়। এই মিথ্যা অপবাদের মধ্য দিয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয় তা হল গ্রামীণ সমাজের প্রভাবশালী, ধনী মানুষদের আধিপত্য। তাদের কামলালসা বা কোনো স্বার্থ যখন কোনো গরিব নারীদের দ্বারা পূরণ হয় না তখনই সেই নরপিষাচরা মিথ্যা অপবাদের অস্ত্র দিয়ে সেই নারীদের আঘাত করে, নারীদের অস্মিতাকে নষ্ট করে দেয়। তাদের জীবনের যাবতীয় সুখ কেড়ে নেয়। তাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকবার অধিকারটুকু ছিনিয়ে নেয়। সেই দূরবস্থার শিকার হয়েছিল সোরধনি। এই সব প্রভাবশালী, ধনী মানুষদের দেওয়া মিথ্যা অপবাদ সমস্ত গ্রামবাসী সত্য বলেই মেনে নেয়। এইসব প্রভাবশালী ব্যক্তির গরিব নারীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পাশবিক আনন্দ লাভ করে। আর অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত থাকে দীর্ঘদিন ধরে মানবমনের গহনে অবস্থিত গ্রামীণ অন্ধ কুসংস্কার। যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়। সোরধনির জীবন আনন্দস্রোতে প্রবাহিত হতে পারত, কিন্তু মিথ্যা অপবাদ তার জীবনকে বিনষ্টির পথে ঠেলে দেয়। তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায় আলোচ্য গল্পে এক অসহায়া নারীর মর্মান্তিক জীবন বেদনা ও জীবন বিনষ্টির কাহিনি যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। একবিংশ শতকে ডাইনী অপবাদে নারীদের উপর অত্যাচার প্রায়শই লক্ষ করা যায়। যা মানবসমাজে কাম্য নয়। তাই বলা যায় যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি-মানবিকতার আলো যদি গ্রামের মানুষদের অন্তরে জ্বলে ওঠে তাহলে এই জঘন্য অপরাধ কর্মের অবসান ঘটবে, অনেক নারীর অস্মিতা ও প্রাণ রক্ষা পাবে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দোপাধ্যায়, তারাক্ষর। তারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ১৯৭৬। পৃষ্ঠা-২৪৩
২. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৩
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৩
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৬
৫. ঐ, পৃষ্ঠা-২৫৩।

যষ্ঠী

অমরেশ বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ: বাংলাতে নবজাত শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে যষ্ঠী পূজার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত। তিনি মূলত সন্তানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি সন্তানহীন মহিলা বা দম্পতিদের সন্তান প্রদান করেন। সন্তানের গর্ভকালীন অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া, বেড়ে ওঠা পর্যন্ত সুস্থ-সবল থাকা এবং দীর্ঘায়ু হওয়ার কামনা দেবীর নিকটে করা হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্মের ষষ্ঠ দিনেও যষ্ঠী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়। যষ্ঠী দেবী মূলত প্রাগায্য লৌকিক দেবী, কোনো প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে দেবী যষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে তাঁর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাঁকে মনসা বা মঙ্গলচণ্ডীর মতোই আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অর্বাচীন পুরাণে প্রকৃতির অংশজাত বলা হয়েছে। দেবী যষ্ঠীকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, যেমন যষ্ঠীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

সূচক শব্দ: যষ্ঠী, ষট্‌কৃত্তিকা, রাজা প্রিয়ব্রত, অরণ্যযষ্ঠী, যষ্ঠীমঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম চক্রবর্তী, শংকর।

মূল আলোচনা: শিশুর জন্মাবার পর ষষ্ঠ দিনে দেবী যষ্ঠী নবজাত শিশুদের আশীর্বাদ করতে আসেন। বাংলাতে নবজাত শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে যষ্ঠীদেবীর পূজার রীতি বহুদিনের, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে জানা যায়, চৈতন্যের জন্মের ষষ্ঠ দিনে যষ্ঠীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।^১ প্রখ্যাত গবেষক মনে করেন, দেবী যষ্ঠীর কল্পনা ষট্‌কৃত্তিকা থেকে—যখন শিবের বীৰ্যপাত ঘটে গঙ্গাতে, গঙ্গা তার অসহনীয় তাপ সহ্য করতে না পেরে সেটি নিক্ষেপ করেন নদীতটের একটি শরবনে। সেখানে এক অনুপম সুন্দর শিশুর জন্ম হয়। তাঁকে লালন-পালন করতে আসেন ষট্‌কৃত্তিকা। ষট্‌কৃত্তিকা স্তন্য দান করবেন বলে কার্তিকের ছ’টি মুখ উদ্গত হয়, তাই তিনি ষনুখ। এই হিসেবে কার্তিক শিবের ঔরসজাত হলেও পার্বতীর গর্ভজাত পুত্র নন। কার্তিক ষট্‌কৃত্তিকার স্তন্যসন্তান, এই ষট্‌কৃত্তিকা থেকেই যষ্ঠীদেবীর কল্পনা। কিন্তু কৃত্তিকার সংখ্যায় ছয়জন হলেও দেবী যষ্ঠী একক। পুরাণে দেবী যষ্ঠীর এক নাম দেবসেনা, দক্ষিণ ভারতে কার্তিকের দুজন স্ত্রী, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম দেবসেনা।^২

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়) এবং দেবীভাগবত পুরাণে (নবম স্কন্ধ, ৪৬ অধ্যায়) দেবী যষ্ঠীর উপাখ্যান রয়েছে। পুরাণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী যষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী এবং মনসা দেবী প্রকৃতির অংশ। দেবী যষ্ঠী প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশজাত তাই তিনি যষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি সন্তান প্রদানকারিণী, সন্তানদের আয়ু প্রদায়িনী, ধাত্রী, রক্ষাকত্রী। দেবীর পূজা কীভাবে প্রবর্তিত হল সে সম্পর্কে জানা যায় যে, স্বয়ম্ভু মনুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রতর মনে বৈরাগ্য আসাতে তিনি বিবাহ না করে তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। পরে ব্রহ্মার আজ্ঞায় প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন কিন্তু কিছুতেই পুত্রলাভ হল না। তখন কশ্যপ রাজাকে পুত্রোষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়ে যজ্ঞচরু তাঁর মালিনী নামক পত্নীকে ভোজন করতে বলেন। চরু ভোজন করে রাজপত্নীর গর্ভসঞ্চার হল



ঠিকই কিন্তু সেই গর্ভধারণ চলল বারো বছর ধরে। অতঃপর রাজমহিষী মালিনী এক অতি সুন্দর মৃত পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। এই ঘটনায় অন্তঃপুরের মেয়েরা এবং পরিচিত অপর মহিলারা ক্রন্দন শুরু করলেন, রানী মালিনী জ্ঞান হারালেন। দুঃখে কাতর রাজা প্রিয়ব্রত মৃত সন্তানকে নিয়ে শ্মশানে গেলেন এবং সন্তানকে বুকে চেপে ধরে রোদন করলেন। তিনি মৃত পুত্রকে ত্যাগ না করে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক পরমা সুন্দরী রমণী সেখানে রথে করে আবির্ভূত হলেন। রাজা এই স্থিরযৌবনা, অত্যন্ত মনোহরা নারীর নিকট জানতে চাইলেন তিনি কার কন্যা, কার স্ত্রী। নারীটি উত্তরে জানালেন তিনি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, তাঁর নাম দেবসেনা, ব্রহ্মা তাঁকে দেবসেনাপতি স্কন্দের নিকট সম্প্রদান করেছেন। তিনি স্কন্দের স্ত্রী এবং প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ তাই ষষ্ঠী নামে পরিচিত।

দেবী নিজের পরিচয় প্রদান করে রাজা প্রিয়ব্রতর শিশুটিকে কোলে নিয়ে মহাজ্ঞানে অবলীলায় জীবিত করে তুললেন। অতঃপর সেই অপূর্ব কান্তিময় শিশুর হাসিমুখ রাজার নয়নগোচর হল, দেবী শিশুটিকে নিয়ে আকাশপথে গমন করতে শুরু করলে রাজা কাতর হয়ে ষষ্ঠীদেবীর স্তব করতে লাগলেন। রাজার স্তবে দেবী প্রসন্ন হয়ে তাঁকে জানালেন, যেহেতু ত্রিলোকে রাজা প্রিয়ব্রতর আধিপত্য বিস্তারিত হয়েছে, তাই তিনি দেবীর পূজাবিধি প্রকাশ করে স্বয়ং ভক্তিময় হয়ে দেবী ষষ্ঠীর আরাধনা শুরু করুন। এইসকল কথা রাজাকে বলে দেবী তাঁকে পুত্র ফিরিয়ে দিলেন। রাজা প্রিয়ব্রত গৃহে ফিরে সকলকে পুত্রের জীবন ফিরে পাওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন এবং বিধান অনুসারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করলেন এবং জনসাধারণকেও সে বিষয়ে বিলক্ষণ প্রবর্তিত করলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত এবং দেবীভাগবত পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর উপাখ্যানে পাওয়া গেল, ষষ্ঠী মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর মতো প্রকৃতির অংশজাত—উক্ত দুটি পুরাণই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণ, কোনো প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে দেবী ষষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। দেবী ষষ্ঠীকে মনসা বা মঙ্গলচণ্ডীর মতোই আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অর্বাচীন পুরাণে প্রকৃতির অংশজাত বলা হয়েছে। বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন—“The name of the goddess Sashti cannot be found in any ancient Sanskrit Purana or any other Sanskrit religious literature. Some of the latter Puranas, however, such as the Devi-Bhagavata and Brahmavaivarta Purana, give some account of her. According to the former Sashti is an epithet of Durga in the form of Katyayani, one of the sixteen divine mothers. In order to set up the aristocracy of the goddess Sashti in this way, some of the later Puranas have sought to picture her as identical with Durga.”^{৩০} মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর মতোই দেবী ষষ্ঠীও লৌকিক দেবী। প্রাচীনকাল থেকেই শিশুমৃত্যু বা নবজাতকের রোগ-ব্যাদিতে পীড়িত হওয়ার ঘটনা, মানুষকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল, সেই জায়গা থেকেই সন্তানপ্রাপ্তি, সন্তানের গর্ভকালীন অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া, বেড়ে ওঠা পর্যন্ত সুস্থ-সবল থাকা, দীর্ঘায়ু প্রভৃতির কামনা থেকেই তারা বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করে। দেবী ষষ্ঠীর উদ্ভব হয়তো এভাবেই ঘটেছে। পরবর্তীকালে তাঁকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য অর্বাচীন পুরাণে প্রকৃতির অংশ বলে কীর্তিত করা হয়েছে।

বাংলাতে দেবী হারীতী শিশুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে হারীতীর সঙ্গে দেবী ষষ্ঠীর পার্থক্য রয়েছে, হারীতীর পূজার মাধ্যমে নবজাতক শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা দূর করা হয় অর্থাৎ হারীতী শিশুমৃত্যুর কারণ, তিনি শিশুর অপহরণকারীণী। অপরদিকে দেবী ষষ্ঠী কল্যাণময়ী

তিনি সন্তানের কল্যাণ বিধান করেন। হারীতী বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের, ষষ্ঠী পৌরাণিক হিন্দু সমাজের, দুজনের মধ্যে মূল প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান, দুজনের উদ্ভব হয়তো ভিন্ন উৎস থেকে।

বাংলাতে বিভিন্ন পল্লীতে ষষ্ঠীতলা বিদ্যমান, সেখানে বছরে একাধিকবার সন্তানের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। কিংবা ষষ্ঠীতলা ছাড়াও গৃহে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। উল্লেখ্য গৃহে বা বাহিরে যেখানেই দেবীর পূজা হোক, তাঁর কিন্তু কোনো মূর্তি নেই। বছরের বিভিন্ন ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর পূজা করা হয়, বিভিন্ন নামে তাঁর পূজা পরিচিত।

স্কন্দ পুরাণে দেবীর বারো মাসে বারো নামে পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়—চান্দনী ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী, কার্দসী ষষ্ঠী, লুণ্ঠন ষষ্ঠী, চপেটা ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী, নাড়ী ষষ্ঠী, মূলক ষষ্ঠী, অনু ষষ্ঠী, শীতল ষষ্ঠী, গোরুপিনী ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী। বাংলাতে প্রচলিত বিভিন্ন ষষ্ঠীরা হলেন—খুলা ষষ্ঠী, কোরা ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী, লোটন ষষ্ঠী, মূলা ষষ্ঠী, গোট ষষ্ঠী, পাটাই ষষ্ঠী, শীতল ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী, নীল ষষ্ঠী।^৪ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে, বিভিন্ন দেবীর উদ্ভব হয়ে কালক্রমে যেমন এক চণ্ডী নামের মধ্যে অভিন্নতা লাভ করেছে। অনুরূপভাবে বিভিন্নকালে সমাজের বিভিন্নরকম অবস্থায়, বিবিধ পটভূমিকায়, বিভিন্নরূপে শিশুর রক্ষাকর্ত্রী বিভিন্ন দেবী কালক্রমে সকলেই এক ষষ্ঠী নামের মধ্যে অভিন্নতা লাভ করেছে।^৫

বাংলাতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে লৌকিক কাহিনি রয়েছে, একাধিক বাঙালি কবি ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য লিখেছেন। ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রবর্তনের বিষয়ে অরণ্য ষষ্ঠীর কাহিনি এখানে বিবৃত করা হল : সপ্তগ্রামের রাজা শত্রুজিৎ। দেবী ভাবলেন সমাজের উচ্চস্তরে যদি তাঁর পূজার প্রচলন ঘটাতে হয়, তবে সর্বপ্রথম শত্রুজিৎ-এর দ্বারা পূজিত হওয়া জরুরি। একথা ভেবে তিনি ব্রাহ্মণ বৃদ্ধা মহিলার রূপ ধারণ করে রানীর নিকটে গেলেন এবং তাঁকে জানালেন, তিনি বর্ধমান থেকে এসেছেন গঙ্গাস্নানের জন্য, যেহেতু দিনটি অরণ্য ষষ্ঠীর পূজার দিন তাই তিনি রানীকে সঙ্গে করে পূজা সম্পন্ন করতে চান। রানী কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন ষষ্ঠীর পূজা করলে কী হয়। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধা দেবী ষষ্ঠীর মাহাত্ম্যকীর্তনের কথা রাজমহিষীকে শোনালেন—একদা সায়বেনে নামে এক বণিক ছিল। ষষ্ঠীর কৃপায় বণিকের সাত পুত্র হয়। বণিকের স্ত্রী তার সাত পুত্রসহ সর্বদাই ভক্তিভরে দেবী ষষ্ঠীর আরাধনা করত। একদিন ছোটো পুত্রবধূসহ দেবীর পূজার আয়োজন সমাপ্ত করে বণিকপত্নী কোনো কাজে বাইরে গেলেন। ছোটোবউ গর্ভবতী ছিল এবং পূজার সামগ্রী দেখে তার খুব খাবার লোভ হল। অবশেষে লোভ সংবরণ করতে না পেরে খেয়ে ফেলল। শাশুড়ি যখন এসে দেখে পূজার দ্রব্যে অসম্পূর্ণতা, ছোটোবধূ জানালো একটি কালো বিড়াল এসে এসব খেয়ে গিয়েছে। ষষ্ঠীর বাহন হল কালো বিড়াল। ছোটোবউ নিজে পূজার দ্রব্য খেয়ে বিড়ালের উপর দোষ চাপানোর জন্য বিড়াল খুব ক্রোধিত হল। তাই কালো বিড়ালটি প্রতিশোধ নিতে মনস্থির করল। যথাসময়ে ছোটোবউ সূতিকাগৃহে পুত্রসন্তান প্রসব করলে, কালো বিড়ালটি সদ্যোজাত শিশুটিকে চুরি করল। এরপর ছোটোবউয়ের ক্রমে আরও ছয়টি পুত্রসন্তান জন্মাল, কিন্তু কালো বিড়ালটি ছয়টি পুত্রকেই সূতিকাগৃহ থেকে হরণ করে নিয়ে পালাল। পরবর্তীতে ছোটোবউ পুনরায় গর্ভবতী হল, এবারে সে প্রসবের সময় অরণ্য-মধ্যে উপস্থিত হল। সেখানে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে সারারাত শিশুটিকে কোলে করে পাহারা দিল। কিন্তু ক্ষণিকের তন্দ্রাচ্ছন্ন মুহূর্তের সুযোগে কালো বিড়ালটি আবার শিশুটিকে মুখে করে নিয়ে পালাল। ছোটোবউ সহসা জেগে

উঠে ছুটতে ছুটতে বিড়ালটিকে অনুসরণ করল কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চৈতন্য হারাল। বিড়ালটি শিশুটিকে মুখে করে যষ্টীদেবীর নিকটে চলে গেল। এই ঘটনায় দেবী যষ্টী কালো বিড়ালটিকে তিরস্কার করলেন, ছোটোবউয়ের উপর অতিনিষ্ঠুর আচরণের জন্য। জ্ঞান ফেরার পর দেবী ছোটোবউকে জানালেন যে সে মোটেই দেবীর প্রতি ভক্তিমতী নয় এবং পূজার দ্রব্য ভক্ষণ করে সে খুবই গর্হিত কাজ করেছে। তবে করুণাময়ী দেবী অনুযোগ জানালেও শেষপর্যন্ত ছোটোবউয়ের অপরাধ মার্জনা করে দিলেন। আর হারানো সাতপুত্রকেও ফিরিয়ে দিলেন, ছোটোবউ ঘরে ফিরে দেবী যষ্টীর পূজা শুরু করল। রাজমহিষী বৃদ্ধার নিকট থেকে এই কাহিনি শ্রবণ করে দেবী যষ্টীর প্রতি ভক্তিমতী হলেন। রাজপরিবারে দেবী যষ্টীর মহাসমারোহে পূজা সম্পন্ন হল, সমাজে দেবীর পূজাবিধির প্রকাশ হল।

কবি কৃষ্ণরাম দাস যষ্টীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন, তাঁর কাব্য ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রচিত হয়। দেবী অরণ্য যষ্টীর মাহাত্ম্য অবলম্বন করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। যষ্টীমঙ্গলের অপর বিশিষ্ট কবি রুদ্ররাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্য পূর্ববঙ্গে খুলনা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য কবি তাঁর কাব্য রচনার যে বিবরণ দিয়েছেন সেখান থেকে জানতে পারা যায়, একবার কবির কন্যা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন যষ্টীদেবী কবির স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে, তাঁকে তাঁর মাহাত্ম্যসূচক একটি কাব্য রচনা করতে আদেশ করেন। সেই আদেশ পালন করতে গিয়ে কবি যষ্টীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং এর ফলেই কবির কন্যা রোগমুক্ত হয়। কবি রুদ্ররামের কাব্যের বিষয় অরণ্য যষ্টী নয়, তাঁর কাব্যের বিষয় সংস্কৃত পুরাণ থেকে গৃহীত। শংকর নামে এক কবি যষ্টীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁর কাব্য মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। কবি শংকর রচিত যষ্টীমঙ্গল এর কাহিনি পূর্বতন কবিদের চেয়ে আলাদা। কাহিনিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল : একদা যষ্টীদেবী নিজের পূজা প্রচারের বিষয়ে সুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় গেলে তাঁর পূজা প্রবর্তন হবে। সুলোচনা, দেবীকে বলেন, দিলীপনগরে জয়সিংহ নামে এক রাজা রয়েছেন, তাঁর সাত রানী কিন্তু একটিও সন্তান নেই, দেবী সেখানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ভিক্ষা করবার ছলে রাজার কাছে গিয়ে নিজের পূজা চেয়ে নিতে পারেন। অথবা রাজা অস্বীকৃত হলে ঘাটের কাছে ছোটো রানীর সঙ্গে দেখা করে তাকে পুত্রবর দিতে পারেন। এভাবে রাজবাড়ীতে তাঁর পূজা প্রচলিত হলে সর্বত্রই তাঁর পূজা হবে। দেবী রাজসভাতে গেলে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়, তাই তিনি ঘাটে গিয়ে ছোটো রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পুত্রবর দেন। যথাসময়ে ছোটো রানী পুত্র প্রসব করলে অন্যান্য রানীরা এই ঘটনায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে জলে ফেলে দেয় এবং রানীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। ছোটো রানীর শাস্তি হয়, শেষপর্যন্ত তাঁর অবস্থান হয় ঘোড়াশালে। কিন্তু যষ্টীদেবীর কৃপায় ছোটো রানীর সব দুর্গতির অবসান হয়, শুধু তাই নয় দেবী ছোটো রানীসহ অপর ছ'জন রানীকেও একটি করে পুত্র উপহার দেন। এভাবে দিলীপনগরে যষ্টীপূজা প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য এই কাব্যে যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে তাঁর নাম জলযষ্টী। পূর্বে উল্লেখিত যষ্টীদের মধ্যে এই দেবীর নাম পাওয়া যায় না, গবেষকরা মনে করেন শিশুকে হত্যাতো জলের বিপদ থেকে পরিত্রাণ করার জন্যই হয়তো জলযষ্টীর পরিকল্পনা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, অর্বাচীন কয়েকটি পুরাণে দেবী যষ্টীর সম্পর্কে আলোকপাত থাকলেও যষ্টীদেবী মূলত প্রাগৈতিহাসিক দেবী, পরবর্তিকালে আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে দেবী যষ্টীর পৌরাণিক থেকে লৌকিক সব কাহিনিতেই

মূলগত ঐক্য বিদ্যমান—তিনি সন্তানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি সন্তানহীন মহিলা বা দম্পতিদের সন্তান প্রদান করেন। শুধু তাই নয় শিশুর বড়ো হওয়া পর্যন্ত সুরক্ষার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত। পুরাণে বা লোকায়ত ঐতিহ্যে অনেক ষষ্ঠীদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, এর থেকে মনে হয়, একাধিক সময়ে একাধিক পটভূমিকায় উদ্ভূত দেবীরা ষষ্ঠী নামে অভিন্নতা লাভ করেছেন। দেবী ষষ্ঠীর পূজার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, আসলে মানুষের জীবনে হয়তো সন্তানের চেয়ে বড়ো সম্পদ আর নেই। তাই সুদূর অতীত থেকে সন্তানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা চলে আসছে, বর্তমানকালেও সে ধারা কত বলিষ্ঠ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে হয়তো শিশুমৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমেছে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বাল্যকালে শিশুদের অনেকটা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তবুও মানুষ কিন্তু এখনও ষষ্ঠীদেবীর নিকট কৃপাপ্রার্থী। এখনও নবজাত শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজার রীতি বাংলাতে বহুলভাবে বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র:

- ১। Ashutosh Bhattacharyya, “The Cult of Sashti in Bengal”, ‘Man in India’, 1948, vol.XXVIII, p.155
- ২। সুকুমারী ভট্টাচার্য, “ষষ্ঠী”, ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০, পৃ ২৯৯, ৩০১
- ৩। Ashutosh Bhattacharyya, “The Cult of Sashti in Bengal”, ‘Man in India’, 1948, vol.XXVIII, p.152
- ৪। সুকুমারী ভট্টাচার্য, “ষষ্ঠী”, ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০, পৃ ৩০১
- ৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, দ্বাদশ সং, কলকাতা, এ মুখার্জী, ২০০০, পৃ ৭৩৬।

প্রতিস্পর্ধী জাতীয়তাবাদের খোঁজ : উনিশ শতকে বাঙালির

ক্রীড়াচর্চা

রাহুল পণ্ডা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

সারসংক্ষেপ: ইংরেজদের আগমন জাতি হিসেবে বাঙালির সামনে নানান অস্বস্তি তৈরি করেছিল, কিছু ক্ষেত্রে হীনমন্যতাও, যার মধ্যে অন্যতম ছিল খেলা। ব্রিটিশরা আগাগোড়া শরীরচর্চার অনুধ্যানে সক্রিয়, উপমহাদেশে ক্ষমতাবিস্তারের সময়ও সেই চর্চায় ছেদ পড়েনি। সে তুলনায় সদ্যগঠিত কলকাতা শহরে বসতি গড়ে তোলা বাঙালি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মধ্যে ক্রীড়াচর্চার বিশেষ ইচ্ছে বা ইতিহাস কিছুই ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের দেখে, এবং মূলত শারীরিক কারণে ক্রমাগত অপমানিত হতে হতে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির মধ্যেও এক ধরনের ক্রীড়াচর্চার প্রয়াস দেখা দেয়। এর পেছনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল জাত্যাভিমানের প্রশ্ণটিও। বর্তমান প্রবন্ধে বাঙালির ক্রীড়াউৎসুক সেই পর্বটিকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা হয়েছে।

সূচক শব্দ: উনিশ শতক, জাতীয়তাবাদ, বাঙালি জাতিসত্তা, ক্রীড়া, শরীরচর্চা।

মূল আলোচনা: ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাঙালি মোটেই ক্রীড়ামোদী জাত নয়। মধ্যযুগের অজস্র পুঁথি-পাতড়া, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণকীর্তন হাতড়ে ফেললেও সহজলভ্য নয় শারীরিক খেলার নমুনা। ধর্মমঙ্গলে যতই যুদ্ধবিগ্রহ থাক, মেয়েদের প্রকাশ্য অসি হাতে লড়াই থাক, রাঢ়-বঙ্গের মানুষ সমরে বা ক্রীড়ায় কোনোকালেই স্বচ্ছন্দ নয়। চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডে মুকুন্দ চক্রবর্তী দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন শ্রীমন্তের পাঠ্যসূচীর, অথচ কোনোরকম শারীরিক শ্রমের উল্লেখ করেননি।^১ চৈতন্য সমকালীন নবদ্বীপের ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে। সেখানে নবান্যায়ের কথা থাকলেও, ক্রীড়াচর্চার কোনো উল্লেখ নেই। সাহিত্যের পাতায় যেটুকু যা লভ্য সবই প্রায় অক্ষ, দাবা, কড়ির মতো ইন্ডোর গেমস। স্বভাবতই সেন আমল থেকে কোনো রকম বাধা না পেয়ে বৈদেশিক শক্তি ক্রমাগত উপকে এসেছে ছোটোনাগপুরের মালভূমি, বিপরীতে বাঙালিও তাদের পদানত হয়েছে নির্বিবাদে। এর পিছনের কারণ অনেকরকম হতে পারে, কিন্তু শারীরিক বলের খামতি যে অন্যতম, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।^২

অথচ সেই বাঙালিই আবার সুনির্দিষ্টভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে শুরু করে ফুটবল মাঠ থেকে কুস্তির আখড়ায়। কলকাতার বনেদী পরিবারগুলিতে গড়ে ওঠে শরীরচর্চার সংস্কৃতি। শুরু হয় হিন্দুমেলা, যেখানে এক দশকেরও বেশি সময়ে ধরে কুস্তি, লাঠিখেলা, ব্যায়াম ইত্যাদিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন এমন মরিয়া চেষ্টা? কী প্রমাণ করার দায় ছিল সেদিনের বাঙালির?

আসলে এই সব প্রচেষ্টাকে সদিচ্ছার ফসল ভাবলে ভুল হবে। এর পিছনে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ছিল। ছিল অপমান এবং জাতীয়তাবাদের ঢঙ্কানিনাদ। অপমানটা প্রথমে বলা যাক।

ইংরেজরা কলকাতায় বসতি গড়েই ঠাট্টা শুরু করে বাঙালির চেহারা নিয়ে। শাসকপক্ষ বারবার মনে করিয়ে দিতে থাকে শারীরিক গড়নে গৌড়ের লোক যথেষ্ট পুরুষালী নয়, চাল-চলনে তাদের মেয়েলি ছাপ, রুগ্ন শরীরে ক্লান্ত অবসন্নতা। তাদের হাত-পায়ের গড়ন স্থূল এবং হাস্যকর। একটি স্বাধীন জাতির শারীরিক চলনের মধ্যে যে উদ্ভিন্ন আত্মবিশ্বাস এবং জোরালো শক্তি থাকে, বাঙালির মধ্যে তা নেই। যে কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী শক্ত-সমর্থ বৈদেশিক জাতিগুলির সামনে বাঙালি প্রায় কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। বাঙালির এই হীনবল প্রসঙ্গে ব্রিটিশদের বর্ণনাগুলি চিত্তাকর্ষক। দুটি সুপরিচিত নমুনা দেওয়া যেতে পারে,

১। 'The physical organization of the Bengalee is feeble even to effeminacy. He lives in a constant vapour bath. His pursuits are sedentary, his limbs delicate, his movements languid. During many ages he has been trampled upon by men of bolder and more hardly breeds.'^৩

২। 'By his legs you shall know a Bengali...The Bengali's leg is either skin and bones...or else it is very fat or globular, also turning at the knees, with round thighs like a woman's. The Bengali's leg is the leg of a slave.'^৪

বোঝাই যাচ্ছে এই ব্যঙ্গের মাত্রা নিদারুণ ভাবেই শারীরিক, এবং টিপছিন্ন লক্ষ্য বাবু-বাঙালির দৈহিক দুর্বলতা। যেন খুব সচেতনভাবেই ইংরেজ শাসকরা বাঙালিকে দাগিয়ে দিতে চাইছিলেন 'দুর্বল', 'অক্ষম', বা 'নিকৃষ্ট' জাতি হিসেবে। এর মধ্যে প্রথম মন্তব্যটি করেছিলেন স্বনামধন্য টমাস ব্যাংকিংটন মেকলে। ইনি সেই মেকলে যাকে প্রাচ্যের শিক্ষা থেকে ইতিহাস, কোনোকিছুই খুশি করতে পারেনি। কিন্তু বাঙালি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি খড়গহস্ত হয়েছিলেন তিনি। অপমানজনক এই মন্তব্যের যা শিক্ষিত বাঙালি সমাজে বহুদিন শুকোয়নি, যে কারণে মন্তব্যের প্রায় অর্ধশতাব্দী বাদে বঙ্কিম সখেদে বলেছিলেন, মেকলে যেভাবে বাঙালিকে অপমান করেছিলেন সেভাবে কোনো জাতির মানুষ করেনি।^৫ তবে সমালোচনাটি বিরূপ অর্থে যতটা না গৃহীত হয়েছে, বাঙালিকে আত্মগ্লানি এবং বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেছে ঢের বেশি। বঙ্কিমের অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যেও সেই হতাশার ছায়াই যেন বা ধরা পড়ে, 'বাঙালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা'।^৬

এই খেদ এবং হীনমন্যতার প্রতিক্রিয়া নবচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত বাঙালি সমাজে দেখা গেল দুই ভাবে। প্রথমত, নিজেদের অনতি-অতীত খুঁজে দেখার চেষ্টা শুরু করলেন কেউ কেউ, সেখানে কোনো হিন্দু নায়ক আছে কিনা যার বাহুবলে একদা স্তম্ভিত হয়েছিল ভারতবর্ষ। যাদের পাওয়া গেল তাদের টেনে সাহিত্যের পাতায় শুরু হল বীরগাথা রচনা। প্রতাপাদিত্যের ভূরি ভূরি কাহিনি বা বঙ্কিমের 'সীতারাম' থেকে 'আনন্দমঠ', এই মানসিকতারই ফসল। পত্র-পত্রিকাতেও অহরহ লেখা হচ্ছিল বিভিন্ন বলবর্ধক লেখা, অতীত ইতিহাস হেঁকে বলিষ্ঠ বাঙালির চিত্রকল্প তুলে আনছিলেন লেখকরা। আর দ্বিতীয়ত, শহর কলকাতা জুড়ে গড়ে উঠছিল কুস্তি, ব্যায়ামাগার, শারীরিক কসরতের বিবিধ ঠেক। কলকাতাবাসী উচ্চবিত্ত হিন্দু অভিজাত সমাজ,

ইংরেজ সংস্পর্শে আসার কারণে অপমানের জ্বালা এদেরই বেশি ছিল, ফলে কুস্তির আখড়াগুলিও এঁদের পরিমণ্ডলেই প্রথম গড়ে উঠতে শুরু করে।

কিন্তু ঠিক কবে থেকে শুরু হচ্ছে এই সুস্বাস্থ্যের যোজনা? ক্রীড়া গবেষক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ‘দুর্বল বাঙালি-র অপবাদ মোচনের জন্য ১৮৬০-র দশক থেকে শুরু হয়েছিল বাঙালির শরীর সংস্কৃতিচর্চা এবং ঐ সম্বন্ধীয় আখড়া বা সংগঠনের প্রসার। নবগোপাল মিত্রের ‘হিন্দুমেলা’ ঐ প্রেক্ষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।’^৭ এই প্রসঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে জানার দরকার আছে হিন্দুমেলার ইতিহাসকে। হিন্দু স্কুলের ছাত্র বাবু নবগোপাল মিত্রের উচ্চাশা ছিল স্বদেশী ভাবনার বিস্তার ঘটাবেন দেশ জুড়ে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের সূত্রে স্বদেশীভাবনার ফ্যাশান চলছিল তখন কলকাতার বাবুসমাজে। এই আলোড়নের চরিত্র বোঝাতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, ‘রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-er বার আনা বিলতি, চার আনা দেশী। ইংরাজ যেমন patriot, আমিও সেই রকম patriot হব – এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল।’^৮ রাজনারায়ণদের এই দোআঁশলা জাতীয়তাবাদের বীজই উদ্ভূত করেছিল নবগোপালকে, এবং স্বদেশীয়ানার প্রকাশের পথ হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন বিবিধ শরীরচর্চা। দ্বিজেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, ‘নবগোপাল একটা ন্যাশানাল ধুরা তুলিল; আমি আগাগোড়া তা’র মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি, জিম্নাস্টিক, প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল।’^৯

এই আগ্রহের আতিশয্যে, এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যক্ষ মদতে ১৮৬৭ সালে শুরু হল ‘চৈত্রমেলা’। এই মেলাই চার বছর বাদে নাম পালটে হয়ে যায় ‘হিন্দুমেলা’। উদ্যোক্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র এবং মনমোহন বসু। চৈত্রমেলার দ্বিতীয় বছরে গ্রহণ করা হয়েছিল ছয় দফা একটি কর্মসূচী। এই কর্মসূচীতে স্বজাতীয় হিন্দুদের উন্নতিসাধন, স্বজাতীয় সঙ্গীত এবং স্বজাতীয় শিল্পদ্রব্যকে উৎসাহদান, স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উদ্‌বোধনের পাশাপাশি একদম শেষ নির্দেশিকাতে বলা হয়েছিল, ‘যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।’^{১০} শুধু মুখের কথা নয়, দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে রীতিমতো আয়োজন করা হয়েছিল ব্যায়াম-কৌশলের প্রদর্শনীর। সম্পাদকের বিবৃতি থেকে জানা যায়, ‘প্রথমতঃ লাঠি খেলা, পরে লাঠিতে ভর দিয়া লফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎপরে কুস্তি করা হয়।’^{১১} এছাড়া ‘ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে কতগুলি যুবক’ ব্যায়াম প্রদর্শন করেছিলেন, ‘একজন যুবক আশ্রোরোহণ পূর্বক বেড়া লঙ্ঘন’ করেছিলেন, আর পরিশেষে আয়জিত হয়েছিল ‘নৌকার বাচ’।^{১২} এই বছরই মেলায় পাঠ করা হয় ব্যায়াম-বিষয়ক কবিতা, ‘বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম।/ সুস্থ চিতে সুস্থ দেহে, পাইবে আরাম।।/ কেনো বঙ্গবাসীগণ এমন দুর্বল।/ নীচদের কায় শ্রম, তাই এমন।।/ অন্য সব জাতি শ্রমে, সদাই আদরে।/ তাই তারা নানা মতে সুখ ভোগ করে।’^{১৩}

মেলায় চতুর্থ বছরেও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে ‘ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ, নৌকার বাচ, অশ্বচালন’ ইত্যাদি আয়োজনের।^{১৪} অমৃতবাজার পত্রিকা সে বছরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে লিখেছিল, ‘আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এ সঙ্গে শারীরিক বলবীর্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ

করুন।^{১৫} পরের বছরের অধিবেশনে দৈহিক প্রদর্শনী দেখে অমৃতবাজার আরও উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া জানায়, ‘যাঁহারা এই ব্যায়াম চর্চায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হউক, ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হউক, তাহাদিগের নামে কবিতা বান্দী হউক, তাহাদিগকে সাধুবাদ করা হউক...’।^{১৬} ব্যায়ামবীর এবং কুস্তিগীরদের যথোচিত পুরস্কৃত অবশ্য প্রত্যেকবারই করা হতো। এই মেলার সৌজন্যেই যেমন শ্যামাচরণ ঘোষের মতো প্রথম যুগের বাঙালি কুস্তিগীর উঠে আসতে পেরেছিলেন, যাঁকে ১৮৭১ সালে স্বয়ং ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে সাহেব মেলার পক্ষ থেকে পদক প্রদান করেন। এছাড়া আর এক খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর অন্নদাপ্রসাদ মিত্রও এই মেলাতেই প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

১৮৭৩ সাল নাগাদ মেলার সপ্তম অধিবেশনে খবর পাওয়া যাচ্ছে, ‘বাবু নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যায়ামচর্চার নিমিত্ত স্কুল খুলিয়াছেন এখন তাঁহার এই মাত্র যত্ন যে, ইহার কিসে শ্রীবৃদ্ধি হয়।’^{১৭} সে বছরের মেলায় ‘ব্যায়াম কসরণ লাঠি খেলার পর’ জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। অষ্টম বছরে খেলার প্রদর্শনী এতদূর পর্যন্ত মনোরঞ্জক ছিল যে অমৃতবাজার একে ‘অলিম্পিক’-এর সঙ্গে তুলনা করে।^{১৮} নবম বছরে অমৃতবাজারের রিপোর্টিং থেকে জানা যাচ্ছে, ‘জাতীয় সভার ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যায়াম কৌশল আমরা সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রসিদ্ধ ডাক্তার পরলোকগত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুত্র (সুবিখ্যাত ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) অসীম শক্তির পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা দেখিলাম তিনি অর্দ্ধমণ ওজনের একটি প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবলীলাক্রমে বাহুদ্বয়ের মাংসপেশির উপর বারম্বার ধারণ করিতে লাগিলেন।’^{১৯} পরের বছর অধিবেশনের সময়ে বাঙালি যুবক বনাম ফিরিসি গোরাবাদের লড়াইতে এই জিতেন্দ্রনাথই তাঁর সতীর্থদের নিয়ে বাঙালি যুবকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মেলার একাদশতম অধিবেশনের আগে ইণ্ডিয়ান লীগ এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দুমেলায় গুরুত্ব ক্রমে ফুরিয়ে আসে।

পূর্বাপর আলোচনায় এটুকু বেশ বোঝা যায় কলকাতাকে শরীরচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল হয়েছিল হিন্দুমেলা। বিশেষ করে মেলার মাধ্যমে এক শ্রেণির বাঙালির মনে এই খোয়াইশ বুনো দেওয়া গিয়েছিল মুগ্ধ-ডাম্বেল ভেঁজে গোরা সৈনিক বা রাজপুত-মারাঠাদের মতো সম্মান কুড়ানো সম্ভব হবে। বহুশতাব্দী ধরে অবদমিত বাঙালি সমাজের এই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাকে সুমিত সরকার সঠিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘natural for young Bengalis to seek psychological compensation in a cult of physical strength and a somewhat exaggerated faith in the efficacy of purely military methods.’^{২০}

স্বভাবতই এরপর হিন্দুমেলায় দেখানো পথে একের পর এক জিমন্যাস্টিক ও কুস্তি আখড়া গড়ে উঠতে থাকে কলকাতা জুড়ে। আপার সার্কুলার রোড, সিমলা, শাঁখারিটোলা, মির্জাপুর, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলায় ‘ব্যায়াম বিদ্যালয়’ ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর উদ্যোগে চালু হয় জিমন্যাস্টিক ক্লাস। প্রথমে ঐচ্ছিক থাকলেও, পরে তা করে দেওয়া হয় বাধ্যতামূলক। বলতে কি বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ, উনিশ শতকে জাত মনীষীরা কেউই প্রায় আখড়ার মাটি থেকে রেহাই পাননি সেসময়। এই মানসিকতাই আরও দু’দশক পরে ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ‘অনুশীলন সমিতি’-র জন্ম দেয় কলকাতার বুকে। সরলা ঘোষালের নেতৃত্বে মেয়েদেরও কুস্তি ও লাঠি খেলার খবর মিলছে তখন।^{২১} বস্তুত, শৈশবের অঙ্গ হিসেবেই এগুলি তখন স্বীকৃতি



পাচ্ছিল বাঙালি সমাজে। বঙ্কিম তাঁর ধর্মতত্ত্ব বইতে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে লিখেছেন, 'অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। ... এই ব্যায়ামের মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষা ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।'^{২২}

পত্র-পত্রিকার পাতাতেও বাঙালির বীর্য-বন্তা নিয়ে নিয়মিত লেখালিখি হচ্ছিল তখন। ১২৮৫ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমের বহু আলোচিত প্রবন্ধ 'বাঙ্গালীর বীরত্ব'। ১২৮৯ সালে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনেই লিখলেন 'বাঙ্গালিদিগের পৌরুষ'। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হল শরীরচর্চা সংক্রান্ত প্রথম বাংলা পত্রিকা 'ক্রীড়া ও কৌতুক'। সম্পাদক রাধেশচন্দ্র শেঠ ও শশীশেখরেশ্বর রায়। এর পিছু পিছু এল আর একটি পত্রিকা বিষ্ণুচরণ ঘোষের 'ব্যায়াম'। এছাড়া 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা এবং শিশুদের জন্য প্রকাশিত 'মুকুল' পত্রিকাতেও নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হত শরীরচর্চা বিষয়ে। ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা যে বাঙালি জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা পরবর্তীযুগের বাংলাসাহিত্য থেকেও আন্দাজ করা যায়। শরীরচর্চার রেফারেন্স সেখানে ফিরে ফিরে এসেছে। সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজে একাধিক উপন্যাসে ('সোনার কেব্লা' এবং 'জয়বাবা ফেলুনাথ'), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'উপনিবেশ'-এ, রাজশেখর বসুর গল্প 'চমৎকুমারী'-তে, উপেন্দ্রকিশোরের 'মহাবলী স্যাভো', প্রভাতকুমার মুখোজ্যের 'বলবান জামাতা', এমনকি পটলডাঙ্গার টেনিডাও তখন গড়ের মাঠে গোরা ঠেসিয়ে অভ্যস্ত। এভাবেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে বাঙালির সমাজ-মানসে শরীরচর্চা ক্রমশ কিংবদন্তীর মর্যাদা পেয়েছে। সেইসঙ্গে খেলাধুলোর আতিশয্যে আর একটি বিষয়ও তৈরি হয়েছে, নিজেদের জাতিত্ব সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যের বোধ। এই জাতিত্ব বাঙালিকে এরপর ঠেললো ফুটবল মাঠের দিকে।

ব্যায়াম বা শরীরচর্চা যদি বাঙালির ক্রীড়াভ্যাসের প্রথম ধাপ হয়ে থাকে, দ্বিতীয় ধাপে আসে ফুটবল। ব্যায়ামবীর বাঙালি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনুধাবন করলো শরীরচর্চায় ব্রিটিশদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া যতটা না আনন্দের, তার চেয়ে অনেক বেশি আহুদের বিষয় ফুটবল-ক্রিকেটের মতো ব্রিটিশ-সংস্থাপিত খেলাগুলিতে সর্বসমক্ষে ইংরেজদের পরাজিত করতে পারলে। আসল লড়াইটা যেহেতু রাজনীতির ময়দানে জেতা সম্ভব নয়, তাই বিকল্প হিসেবে উঠে আসলো ফুটবলের মাঠ।

প্রশ্ন উঠতে পারে শুধু ফুটবল কেন? অন্য খেলাগুলোর কি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল না তখন? অবশ্যই ছিল। ক্রিকেট নিয়ে তো রীতিমতো মাতামাতি চলত তখন। ময়দানে আর্মি-সিপাহীদের খেলা দেখতে জমে উঠত ভিড়। স্বদেশীয় রাজা-রাজড়াও পিছিয়ে থাকতেন না। বাংলাদেশের দুই প্রাচীনতম রাজবংশ, নাটোর এবং কুচবিহারের রাজারা, নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন। তাঁদের নিজস্ব দল ছিল, কলকাতায় কেনা মাঠ ছিল, ভাড়া করা সিজনড প্লেয়ার ছিল। সারা দেশজুড়ে টুর্নামেন্ট খেলে বেড়াত কুচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের টিম। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের তিনটি ক্রিকেট টিম ছিল। ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলা ক্রিকেটাররাও এসে খেলতেন কুচবিহারের হয়ে। অন্যদিকে নাটোরের রাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ লাখখানেক টাকা খরচ করে বালিগঞ্জে ৪৫ একর জমিতে মাঠ বানিয়েছিলেন। তাঁরও নিজস্ব দল ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী হওয়ায় তিনি বিদেশ থেকে প্লেয়ার না কিনে দেশের খেলোয়াড়দের উপরই ভরসা রাখতেন বেশী। কলকাতায় তাঁদের ম্যাচ ঘিরে নিয়মিত ভিড় লেগে থাকত সাহেববাবুদের। তথাকথিত বড়োলোক এবং ভদ্রলোকদের এই খেলাটি নিয়ে সাধারণ মানুষেরও বিলক্ষণ আগ্রহ ছিল

সেসময়। ১৯০৫ সালে রঞ্জিত সিংজি কলকাতায় খেলতে এলে তাঁকে দেখতে মাঠে দশ হাজার লোকের ভিড় হয়। পরে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে মহারাজকে হুডখোলা গাড়িতে চাপিয়ে রোড শো, ক্যালকাটা টাউন হলে বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া ইত্যাদি পাগলামি চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এছাড়া হকির শুরুও তো কলকাতাতেই। বেটন কাপ থেকে সর্বভারতীয় হকি ফেডারেশন, হকির গোড়াপত্তন এই ব্রিটিশ রাজধানীতেই। হকি নিয়ে কলকাতার দর্শকদের উচ্ছ্বাসের কথা ধ্যানচাঁদ নিজের আত্মজীবনীতেও বলে গেছেন।^{২৩} এতদসত্ত্বেও ক্রিকেট বা হকি নয়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠলো ফুটবল, কারণ চর্চা সত্ত্বেও ফুটবল বাদে বাকি খেলাগুলিকে আয়ত্ত করা বাঙালির পক্ষে খুব একটা সহজ হয়নি। পক্ষান্তরে ফুটবলকে নগেন্দ্রপ্রসাদের হাত ধরে বাঙালি কেবল গ্রহণই করেনি, নিজেদের মতো করে আত্মস্থও করেছিল, ‘Soccer was rapidly taken over and indigenized in Bengal...’।^{২৪}

যে কারণে ময়দানে প্রথম ব্রিটিশ ফুটবল ক্লাব ডালহৌসি তৈরি হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই ১৮৮৭-তে তৈরি হয়ে যায় বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম ফুটবল ক্লাব শোভাবাজার, সৌজন্যে শোভাবাজার রাজপরিবার। এর কিছুদিন বাদেই প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিমদের প্রথম ক্লাব জুবিলি (পরে মহামেডান স্পোর্টিং) আর উন্ননকুইতে মোহনবাগান। মোহনবাগানের আঙুপিছু উয়াড়ি, হাওড়া স্পোর্টিং, টাউন ক্লাব। এর মধ্যে উয়াড়ি ছিল ঢাকার ক্লাব, সেখানকার জমিদার মিত্রদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি। সন্তোষের রাজপরিবারও ফুটবল নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী সন্তোষ ট্রফি। শুধু ক্লাব খোলাই নয়, খেলার মাঠেও ক্লাবগুলি ক্রমশ সাফল্য পাচ্ছিল। ১৮৯২ সালেই শোভাবাজার প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে হারিয়ে দেয় ব্রিটিশ দল সারে রেজিমেন্টকে। ১৯০০ সালে ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে জেতে ট্রোডার্স কাপ। সব মিলিয়ে বিশ শতকের গোড়াতেই কলকাতা ময়দানে খেলা এবং ন্যাশানালিজম প্রায় হাত ধরাধরি করে সমার্থকতা লাভ করতে শুরু করেছিল, ‘...by the turn of the century football had become a new and unique cultural nationalist force in Bengal society’।^{২৫} স্বভাবতই মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছিল টক্কর নেওয়ার, আর জাতীয় আবেগের বহুৎসবে সন ১৯১১-তে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শিল্ডজয় ছিল নিছকই সময়ের অপেক্ষা।

তথ্যসূত্র এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য:

- ১। মুকুন্দ চক্রবর্তী, ‘চণ্ডীমঙ্গল’ (‘কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল’), সম্পাদক – সুকুমার সেন, সপ্তম মুদ্রণ, দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৭, পৃ - ২২৩
- ২। তবে সেসময়ে বুদ্ধিজীবী মহলে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে ইংরেজ আসার ফলেই বাঙালির বাহুবল বিশেষভাবে ক্ষয় পেয়েছে। বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে ‘জালপ্রতাপচাঁদ’ বইতে মন্তব্য করেছেন, ‘যাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইংরেজ প্রসাদৎ ইদানীং বাঙ্গালায় কুস্তি আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের ভুল। ইংরেজী শিক্ষায় ও শাসনে বরং আমাদের কুস্তি উঠিয়া গিয়াছে। ... অনেকের বিশ্বাস, আমরা চিরকালই এইরূপ দুর্বল। যাঁহারা ইংরেজি গ্রন্থ পড়িয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস শিখিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস সম্ভব। ... এখন বাঙ্গালীর আর বলবীৰ্য্য নাই সত্য, কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর দোষে নহে; রাজশাসনের দোষে।’ [সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘জাল প্রতাপচাঁদ’, প্রকাশক – গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১২৯৭, পৃ - ১৫]

- ৩। নির্মালাকুমার ঘোষ, 'কুন্তি, কসরৎ ও কলিকাতা', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৪১৯, পৃ - ৬১
- ৪। Ronojoy Sen, 'NATION AT PLAY', Penguin Viking, 1st edition, Gurgaon, 2015, p - 95
- ৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রচনাবলী' (২য় খণ্ড), অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৯০, পৃ - ৮০৯
- ৬। ঐ, পৃ - ৫৪০
- ৭। কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'খেলা যখন ইতিহাস', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৯, পৃ - ১৬
- ৮। বিপিনবিহারী গুপ্তর কাছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণ, 'পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ - ৩০৬
- ৯। ঐ, পৃ - ৩০৭
- ১০। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত', সংকলক - ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী এবং অশোক উপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রাচী প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০০, পৃ - ১৫
- ১১। ঐ, পৃ - ২৮
- ১২। ঐ, পৃ - ২৯
- ১৩। ঐ, পৃ - ২৯
- ১৪। ঐ, পৃ - ৩৫
- ১৫। ঐ, পৃ - ৩৬
- ১৬। ঐ, পৃ - ৪০
- ১৭। ঐ, পৃ - ৪৪
- ১৮। ঐ, পৃ - ৪৮
- ১৯। ঐ, পৃ - ৫১
- ২০। Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, New Delhi, People's Publishing House, 1973, p - 469
- ২১। সরলা ঘোষাল ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি কলকাতায় জিমনাসিয়াম খুলেছিলেন। সেখানে নিয়মিত লাঠি খেলা এবং শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ দিতেন তিনি। (*NATION AT PALY*, p - 97) এছাড়া বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসেও মেয়েদের লাঠি খেলার প্রসঙ্গ রয়েছে। বিশেষত বড়ো বোন তিলু তো খুবই ভালো লাঠি খেলত।
- ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রচনাবলী' (২য় খণ্ড), অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৯০, পৃ - ৫৯৫
- ২৩। *NATION AT PLAY*, p - 146
- ২৪। Partha chatterjee, *The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power*, Princeton, Princeton University Press, 2011, p - 303
- ২৫। *NATION AT PLAY*, p - 57।

একবিংশ শতকে নারীদের জন্য বিবেকানন্দের বার্তা : ক্ষমতায়ন ও কর্মমুখী প্রয়োগ

নির্মল হালদার

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ডঃ বি. আর. আশ্বেদকর ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন

সারসংক্ষেপ: স্বামী বিবেকানন্দ একজন যুগান্তকারী চিন্তাবিদ হিসেবে প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে নারীকে দেখেছেন 'শক্তির' প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তাঁর মতে, নারী জাতির সার্বিক উন্নতি ছাড়া কোনো সমাজের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি নারী শিক্ষাকে সমাজের প্রথম ও প্রধান সোপান হিসেবে মনে করতেন, তবে তা ছিল প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তে এমন একটি শিক্ষা যা নারীর আত্মিক, চারিত্রিক ও বৃত্তিমূলক বিকাশ ঘটাবে। তিনি নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সমাজে পুরুষের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। একবিংশ শতাব্দীতেও তাঁর এই প্রগতিশীল ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মমুখী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে তাঁর দর্শন আজও শক্তিশালী দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আধুনিক সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও সার্বিক কল্যাণের জন্য বিবেকানন্দের এই কর্মমুখী প্রয়োগগুলো অপরিহার্য।

সূচক শব্দ: সোপান, ব্রহ্মচারিনী, স্বাবলম্বী, আধ্যাত্মিক, সহিষ্ণুতা, প্রযুক্তি।

মূল আলোচনা: স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব যিনি শুধু আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর ভাবনায় নারী জাতির জাগরণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে সমাজে নারীরা সম্মানিত ও শিক্ষিত নয়, সেই সমাজ কখনো উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। বৈদিক যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করত। কিন্তু কালের চক্র ক্রমশ নারী স্বাধীনতা হ্রাস পেতে থাকে। বিদেশি শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা খর্ব হতে থাকে।^১ একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দের এই নারী ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক এবং কীভাবে তা আজকের সমাজে নারীর সার্বিক কল্যাণে কর্মমুখী প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে সুভদ্রা সর্বস্তরের মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

“নারী শুধু নারীই নয়।

নয় সে দিন ভিখারি।।

সূর্যসম ভূষিতা সে।

দানব নিধনের তরবারি।।”^২

স্বামী বিবেকানন্দ নারীর অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নারী ভাবনা ছিল প্রচলিত সামাজিক ধারণার থেকে অনেক বেশি প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক। বিবেকানন্দ নারীকে কেবলমাত্র পুরুষের পরিপূরক বা গৃহস্থালীর সদস্য হিসেবে দেখেননি। তিনি নারীকে সাক্ষাৎ 'শক্তির' প্রতিক্রিয়া মনে করতেন। তাঁর মতে, সমগ্র জগৎ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই শক্তির প্রকাশ নারীত্বের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে সমাজে নারী অবহেলিত, সেই সমাজ কখনো উন্নতি করতে

পারে না। তিনি বলতেন, “যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের, সে দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই।” তাঁর এই ভাবনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যিনি সকল নারীর মধ্যে জগতজননীকে দেখেছিলেন এবং স্ত্রীকে প্রকৃতির অংশ জ্ঞানে ‘মা’ বলে সম্বোধন করতেন। বিবেকানন্দ নারীশিক্ষাকে সমাজের উন্নতির প্রথম এবং প্রধান সোপান বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং তাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। তবে তিনি শুধু প্রচলিত ইউরোপীয় শিক্ষা সমর্থন করেননি। তিনি এমন শিক্ষা চেয়েছিলেন যা নারীর আত্মিক ও চারিত্রিক বিকাশ ঘটাবে, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দেবে, এবং তাদের কর্মঠ ও স্বাবলম্বী করে তুলবে। তিনি বলতেন, “মেয়েদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেরা চিন্তা করুক, নিজেরাই সমাধান খুঁজে বের করুক। ত্যাগী, শিক্ষিতা নারীরাই ভার নিক নারী-শিক্ষার, তারা পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করুক।” তিনি মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষার কথা বলেছেন যা তাদের মধ্যে সাহস, চরিত্র, এবং আত্মমর্যাদা গড়ে তুলবে। সাংসারিক সকল ব্যাপার হতে নিমুক্ত থেকে তাঁরা সকলে আধ্যাত্মিকতার সুমহান আদর্শ নিজ নিজ জীবনে পরিস্ফুট ও উপলব্ধি করেছিলেন।^৭ বিবেকানন্দ নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, নারীদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কোনো পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করতে হবে। তাঁর মতে, নারী জাতির মধ্যে লজ্জা, দয়া-মায়া, স্নেহ, সেবা বিরাজ করে, কিন্তু তাদের উন্নতি না হলে দেশের কল্যাণ সম্ভব নয়। তিনি নারীর ক্ষমতায়নকে কেবল পুরুষদের করুণা বা সমর্থন হিসেবে দেখেননি, বরং নারীর অন্তর্নিহিত দিব্য শক্তির স্বীকৃতি ও তার প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। ভারতীয় নারীরা চলমান ভারতীয় ইতিহাসে, সামাজিক উত্থান-পতনে, স্থান-কালের নিরিখে, রাজনৈতিক বাতাবরণে কখনো আশীর্বাদধন্য হয়েছেন। কখনো প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।^৮

ভারতীয় নারীর মাতৃত্বের আদর্শকে তিনি বিশেষভাবে মহিমান্বিত করেছেন। তাঁর মতে, “ভারতীয় জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই এর প্রথম ও শেষ কথা।” তিনি মাতৃত্বকে স্বার্থহীনতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। তবে এই মাতৃত্বের ধারণা নারীর সীমাবদ্ধতা নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভালোবাসার প্রকাশ। তিনি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মতো পৌরাণিক চরিত্রের আদর্শকে তুলে ধরেছেন, যা ভারতীয় নারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। নারীদের ভূমিকাটিও এখানে উল্লেখযোগ্য ছিল। সুখী পরিবার, সুন্দর উত্তরসূরী, শৃঙ্খলিত সমাজ, সামাজিক রীতি-নীতির ধারাবাহিকতা সুরক্ষায় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। পরিবার প্রথা সমাজের অগ্রগতিতেও সৈনিকের ভূমিকা পালন করত।^৯ তিনি বিশ্বাস করতেন, মায়েরাই সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির শিক্ষা দিতে পারেন। বিবেকানন্দ নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করেননি। তিনি বলতেন, “মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক প্রাণী হিসাবে স্ত্রী-পুরুষ জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সকলেই সমান।” তিনি বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করে এই সমতার কথা বলেছেন, যেখানে একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজমান। তাঁর মতে, পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে, নারীরাও তা পারবে। তিনি সমাজে নারীদের যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন এবং ভারতের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হিসেবে নারী জাতির প্রতি অবহেলাকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করতেন, একটি রাষ্ট্রের অগ্রগতির

অন্যতম মাপকাঠি হলো সেই রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান। আধ্যাত্মিক শক্তির জাগরণের পাশাপাশি বিবেকানন্দ নারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পবিত্রতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন যে নারীরা শুধু শিক্ষিতই হবে না, বরং চারিত্রিকভাবে উন্নত এবং আত্মবিশ্বাসী হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য, পবিত্রতা, উদারতা এবং আধ্যাত্মিকতার মতো সদগুণগুলি নারীর মধ্যে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে, এই গুণাবলীই নারীর মধ্যে মহত্ব নিয়ে আসে এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সত্যের গৌরব, আধ্যাত্মিকতার আলো, পবিত্রতার মহিমা- সবকিছুই সেই দেবী নির্ভুলভাবে অনুভব করেন।^৬ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের নারী ভাবনা ছিল নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ, সার্বিক শিক্ষা, পূর্ণ স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সমাজে সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপর কেন্দ্র করে। তাঁর এই মৌলিক চিন্তাধারা আজও নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা।

স্বামীজির শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্বামীজি স্ত্রী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনায় একটি মাত্র ব্রত হল নারীর প্রগতি ও নারী শিক্ষা। নারীকে পুরুষ শাসিত সমাজে সমান মর্যাদা ও অধিকার দিলে নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে। নারীদের দূরভাগ্যের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য স্বামীজি শিক্ষাকে একমাত্র পথ বলে বিবেচিত করেন। বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজ চেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি তাই মনুষ্যত্বের শিক্ষার অর্থাৎ Man – Making – Education এর কথা বলেছেন। তাই স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন মেয়েরা যদি শিক্ষিতা ও ঠিকমতো মানুষ হয় তাহলে তাদের সন্তান সন্ততিরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। নিজের মায়ের প্রতি প্রগাঢ় বন্দনার ভাবই স্বামী বিবেকানন্দ এর চরিত্র এ নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছিল। মানুষই তাহলে দেবতাদের সৃষ্টি করেছে (এবং আজও করে) চিরাভ্যস্ত কিছু-কিছু ভাবনার বশে, যা তাদের প্রাগৈতিহাসিক-প্রপিতামহদের সময়েই অর্জিত; পরবর্তীকালের মানুষ সেটারই উত্তরাধিকার বহন করেছে; করছে।^৭ ঊনবিংশ শতকে ভারতে আধুনিকতার আবাহনকারী প্রবুদ্ধ সমাজের সমাজ সংস্কারক কর্মসূচীর কেন্দ্র ছিল নারী শিক্ষা। বিবেকানন্দ মনে করতেন শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের মত নারীদের ও সমান সুযোগ থাকা দরকার। বিবেকানন্দ নারীজাতিকে অসম্মান, অশিক্ষা থেকে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। কারন তিনি মনে করতেন মেয়েরা শিক্ষিত না হলে একটি জাতি সুগঠিত হতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ নারীজাতির ক্ষমতায়ন অর্থাৎ স্বনির্ভরতার জন্য যে শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দ নারীর ক্ষমতায়নকে জাতির অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে দেখতেন এবং তিনি নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, নারী সমাজের অর্ধেক অংশ, তাই নারীর উন্নতি ছাড়া সমাজের পূর্ণ উন্নতি অসম্ভব। তিনি বলতেন, নারীরা যেন শুধু পরিবারের সুশীল সদস্য না থেকে সমাজের সক্রিয় অংশীদার হতে পারে, এজন্য তাদের সমান শিক্ষা ও সুযোগ দিতে হবে। বিবেকানন্দ নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে তারা নিজেরাই নিজের ভাগ্য গড়তে পারে এবং সমাজে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ঘরে-বাইরে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং নারীদের ন্যায্য অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে এ-ধরনের বৈষম্যমূলক মানসিকতার পরিবর্তনসাধনই নারীবাদের এর মূল লক্ষ্য।^৮ তিনি নারীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীর চরিত্র

ও মনোবলই সমাজের মূল শক্তি। তিনি প্রাচীন ভারতীয় নারীদের সাহস, জ্ঞান ও গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করতেন। বিবেকানন্দের মতে, নারীর ক্ষমতায়ন মানে শুধু শিক্ষার সুযোগ দেওয়া নয়, বরং নারীর সামাজিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের সুযোগ নিশ্চিত করাই প্রকৃত ক্ষমতায়ন।

বর্তমান যুগে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিবেকানন্দের ভাবনা আজও আমাদের নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারে অনুপ্রাণিত করে। কর্মমুখী শিক্ষা এবং পেশাগত জীবনে নারীর অংশগ্রহণ, যা তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলে, তা বিবেকানন্দের আত্মনির্ভরশীলতার ধারণারই প্রতিফলন। আজকের সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনীতি, প্রশাসন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা – প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি চেয়েছিলেন যে নারীরা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে এবং সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখবে। লিঙ্গ বৈষম্য এখনও বিশ্বের বহু সমাজে একটি সমস্যা। বিবেকানন্দের নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ধারণা এই বৈষম্য দূরীকরণে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। দেশের মানুষের কাছে ভারতীয় নারীর অবস্থা সম্পর্কে স্বামীজী যখন ক্ষোভ, উদ্বেগ আর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সেই একই সময় পাশ্চাত্যে কিন্তু তিনি ভারতীয় সমাজে নারীর গৌরবজনক অবস্থানের কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন।^১ নারীর প্রতি সহিংসতা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যাগুলি মোকাবিলায় তাঁর দর্শন আজও পথ দেখায়। আধুনিকতার নামে যে চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা যায়, তার মোকাবেলায় বিবেকানন্দের নারীর চারিত্রিক পবিত্রতা ও দৃঢ়তার উপর গুরুত্বারোপ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি এমন নারী চেয়েছিলেন যিনি কেবল শিক্ষিতই নন, বরং চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন এবং আত্মবিশ্বাসী। বর্তমান যুগে যখন নারী নানা সামাজিক ও মানসিক চাপে ভুগছে, তখন বিবেকানন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরণের আহ্বান তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিজের ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে চিনতে পারা এবং আত্ম-সচেতনতার মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করা – এই শিক্ষা আজও কার্যকর। প্রতিটি স্তরে নারীশিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে গ্রাম ও প্রান্তিক অঞ্চলের মেয়েদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাদের পড়াশোনা উৎসাহিত করা। নারীদের বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। স্থানীয় থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি করা এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করা। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নারী শিক্ষার ধারণা তখনও পর্যন্ত বিকাশমান অবস্থাতেই ছিল এবং তা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের উচ্চ স্তরের মধ্যে।^{২০} নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণে কঠোর আইনের প্রয়োগ এবং সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সম্মান, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ ও পবিত্রতার মতো মূল্যবোধ জাগ্রত করা। স্বামী বিবেকানন্দের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাভাবনা একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটেও নারীর কর্মমুখী প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলিতে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর দর্শন নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ এবং সামাজিক অগ্রগতিতে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণের উপর জোর দেয়। গ্রামের মেয়েদের থেকে শুরু করে শহরের মেয়েদের পর্যন্ত সকলের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি (Digital Literacy) এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো। কোডিং, ডেটা সায়েন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সাইবার সিকিউরিটির মতো আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা

অর্জনে সহায়তা করা। শুধুমাত্র প্রথাগত ডিগ্রি নয়, বরং নারীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যেমন- স্বাস্থ্যসেবা (নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল), কৃষি-প্রযুক্তি, পর্যটন ও আতিথেয়তা, ফ্যাশন ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি। নারীদের ছোট ও মাঝারি শিল্প (SME) শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ‘আত্মনির্ভর ভারত’ বা ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র মতো উদ্যোগে নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে উৎসাহিত করা। শিক্ষা অভিযানে সমাজে কন্যা শিশু এবং নারীদের মূল্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য হস্তক্ষেপের সময় পুরুষতন্ত্রের প্রবল আধিপত্যমূলক সংস্কৃতির দিকটিকে খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যক। মেয়েদের প্রতি সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি ঝেড়ে ফেলে তাদের মর্যাদা দিতে হবে। নারীদের প্রতি পুরুষকে সংবেদনশীল আচরণ শেখানো দরকার।^{১১}

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, নারীরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো। প্রশাসনিক পদে নারীদের নিয়োগে উৎসাহিত করা এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা। উল্লেখ্য, চলতি বছরই স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ভাষণের সময় প্রধানমন্ত্রী সেনা স্কুলে এবার মেয়েরাও পড়াশোনা করতে পারবে বলে ঘোষণা করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লিঙ্গবৈষম্য প্রসঙ্গে আক্রমণ করার সময় ভারতীয় নৌবাহিনী ও বায়ুসেনাকে উদাহরণ হিসেবে দেখান বিচারপতিরা।^{১২} কর্পোরেট জগতে নারীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং উচ্চ পদে তাদের নিয়োগে সহায়তা করা। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে কর্মক্ষেত্রে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। নারী অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সামাজিক আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self-Help Groups) এবং এনজিওগুলির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। বিবেকানন্দের আত্মনির্ভরশীলতার ধারণা একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলের নারীদের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ এবং সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে পারে। নারীদের জন্য হস্তশিল্প, বুটিক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ই-কমার্স (e-commerce) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি ইত্যাদি স্বকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তা করা। বাড়ি থেকে কাজ (Work from Home) বা ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুযোগ তৈরি করা, যা নারীদের পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি উপার্জনে সহায়তা করবে। লৌকিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার আর একটা ব্যবহারিক লক্ষ্য তৈরি হয়ে যায়।^{১৩}

বিবেকানন্দ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ চেয়েছিলেন, যা নারীর স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ছাড়া অসম্ভব। প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উপর বিশেষ জোর দিয়ে নারীদের জন্য সহজে সুলভ ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। যোগা, ধ্যান এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মাধ্যমে নারীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করা। নারীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা। আধুনিকতার নামে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে বিবেকানন্দের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, আত্মত্যাগ এবং সহানুভূতির মতো মূল্যবোধগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল পারিবারিক মূল্যবোধগুলিকে সংরক্ষণ ও প্রসারে নারীদের ভূমিকা নিশ্চিত করা। নারীর প্রতি সম্মান, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করা। বিবেকানন্দ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একবিংশ শতাব্দীতে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ



মোকাবিলায় নারীর ভূমিকা অপরিহার্য। নারীদের পরিবেশ সুরক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং স্থিতিশীল জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতন করা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর বড় ভূমিকা রয়েছে, তাদের মাধ্যমে কৃষি, বন ও জল ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করা। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নারীর কর্মমুখী প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি শুধু অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা নারীর আত্মিক ও চারিত্রিক বিকাশের মাধ্যমে একটি উন্নত ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের লক্ষ্যকে তুলে ধরেছিল। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই কর্মমুখী প্রয়োগগুলি অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ অন্য সমস্ত শিক্ষাই গৌণ। ধর্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন, পালন প্রভৃতির দিকে জোর দিতে হবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর কেউ যদি মনে করেন যে তারা মঠের থ্রুকে কাজ করবেন তাহলে তারা করতে পারবেন। তারা মঠের থেকে কি কি কাজ করবেন সেই রূপরেখা স্বামীজি করেন। তাঁরা মঠে থাকার সিদ্ধান্ত নেবেন এবং এইসব ব্রহ্মচারিনীর দল পরবর্তী কালে শিক্ষায়ত্নী এবং ধর্ম প্রচারক হবেন। এইসব ধর্ম প্রচারিকারা বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে যাবেন। বিভিন্ন জায়গায় নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হবেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি স্বামীবিবেকানন্দ নারীদের দৈনন্দিন কাজে লাগাবে এমন ব্যবহারিক শিক্ষার কথা স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাদর্শনে আলোচনা করেন। বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন। যার ফলে নারীদের কারোর উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না যে তার নিজের বন্দোবস্ত নিজেই করতে পারবে। তাতে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে ভেদাভেদ অনেক তাই কমবে বলে স্বামীজি মনে করতেন। নারীশিক্ষার প্রসারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বাগবাজার থেকে কিছুটা দূরে একজন সন্ন্যাসিনী মাতাজি একটি স্কুল শুরু করেছিলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি একদিন সেটি পরিদর্শন করতে যান। সেখানকার পঠন-পাঠন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি দেখে স্বামীজি সন্তোষ প্রকাশ করেন। Visitor's Book-এ মন্তব্য লেখেন: 'The movement is in the right direction.' কেবলমাত্র পুরুষ শিক্ষকদের সম্বন্ধে বলেন যে, যত তাড়াতাড়ি তাঁদের বদলে শিক্ষিকা তৈরি করে নিয়োগকরা যায় ততই মঙ্গল।^{১৪} চাকরি দিয়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবে এর পরেও আমাদের দেশে নারী শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে নানান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তবে বর্তমানে আমাদের দেশেও 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' নামে নানান প্রকল্প চালু হয়েছে এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে নানান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল - কন্যাশ্রী প্রকল্প, ঐক্যশ্রী প্রকল্প, রূপশ্রী প্রকল্প। এছাড়াও স্বামীজি বলেন মানুষ গড়ার শিক্ষার সাথে সাথে যে যে বিষয় গুলির ওপর জোর দিতে হবে সেগুলি হল - স্বাধীনতা, আবিষ্কার, আত্মপ্রত্যয়। স্বামীজি মনে করতেন এই ৩টি বিষয়এর ওপর যদি সঠিক ভাবে জোর দেওয়া হয় তাহলে জীবনে চলার পথ অনেক সুগম হবে। সমাজের সর্বস্তরের নারীমানসের মুক্তির আকৃতিতে অপারিসীম গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে গৈরিকবসনের সঙ্গে নারীজীবনের যে চিরকালীন দ্বন্দ্ব ছিল, সেটিকে আত্মত্বের অভেদ স্তরে উন্নীত করে স্বামী বিবেকানন্দ যে নতুন যুগের এক অভিনব প্রেক্ষার উন্মোচন ঘটালেন, তাতে তাঁকে চিরদিন জগতের নারীসমাজ নারীস্বাধীনতা, নারীমুক্তি ও নারীজাগরণের অগ্রদূত চিহ্নিত করবে— এ কথা বলাই বাহুল্য।^{১৫}

ইংরেজ সরকারের স্বার্থপরতা ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষার অঙ্গন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল ততকালীন সমাজে নারী ছিল অন্তর্বিবৃত ও চিত্তধর্মে সংকুচিত। স্বাধীন ভারতের শাসকবর্গ এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই তারা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা বুঝেছিলেন যে নারী সমাজকে জাগ্রত করতে পারলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতবাসীর বহু স্বপ্ন সফল হবে, এই কারণে নারী শিক্ষা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীশিক্ষার জন্য অগ্রসর হন কারণ তিনি নারী জাতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বেলেড় মঠের বিপরীতে একটি নারী মঠের পরিকল্পনা করেন, যেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেন। মঠের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব শুধুমাত্র মহিলাদের ওপর ন্যস্ত হবে। পুরুষ মঠে যেমন কেন্দ্রস্থলে থাকবেন শ্রীমাসারদা দেবী। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মচারিনীরা ওই মঠে জীবনযাপন করবেন ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করতে পারবে। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ অন্য সমস্ত শিক্ষাই গৌণ। ধর্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন, পালন প্রভৃতির দিকে জোর দিতে হবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর কেউ যদি মনে করেন যে তারা মঠের থেকে কাজ করবেন তাহলে তারা করতে পারবেন। তারা মঠের থেকে কি কি কাজ করবেন সেই রূপরেখা স্বামীজি করেন। তাঁরা মঠে থাকার সিদ্ধান্ত নেবেন এবং এইসব ব্রহ্মচারিনীরা দল পরবর্তী কালে শিক্ষায়ত্নী এবং ধর্ম প্রচারক হবেন। এইসব ধর্ম প্রচারিকারা বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে যাবেন। বিভিন্ন জায়গায় নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হবেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি স্বামীবিবেকানন্দ নারীদের দৈনন্দিন কাজে লাগাবে এমন ব্যবহারিক শিক্ষার কথা স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাদর্শনে আলোচনা করেন। বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন। যার ফলে নারীদের কারো উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না যে তার নিজের বন্দোবস্ত নিজেই করতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করা কালীন তিনি পাশ্চাত্যে দেশ গুলিতে নারী শিক্ষার উন্নতির ফলে নারীদের প্রগতি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি নিজের দেশে নারীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি ঘটিয়ে স্বামীজি নারী ও পুরুষকে একই মর্যাদা সম্পন্ন করার কথা বলেন। বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, নারীকে সুশিক্ষিত না করলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। যেহেতু একজন শিশুর শিক্ষা তার মায়ের সান্নিধ্যেই সম্পন্ন হয়, তাই তার মা যদি শিক্ষিত না হয়, তাহলে শিশু শিক্ষিত হবে কি করে।

উনবিংশ শতকে বাংলার যে সমস্ত মহাপুরুষ নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন, তারা ভেবেছিলেন নারী শিক্ষালাভের পর সমাজ অনেক উন্নতির পথে এগোবে। তিনি মনে করতেন একটি সুগঠিত সমাজ গঠন করতে হলে নারী শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যিক। তাঁর মতে, “একজন মা একশো জন শিক্ষকের সমান”। তাঁর দূরদর্শী চিন্তাগুলি যে শুধু তাঁর সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল তা নয়, একবিংশ শতাব্দীর জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আজও তা এক শক্তিশালী দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেছিলেন “সব শক্তি তাদের ভিতরে রহিয়াছে। তোমরা সব করিতে পার, ইহা বিশ্বাস কর, মনে করিও না তোমরা দুর্বল। দেহের চেয়ে মনের শক্তি বেশি, কেবল ইচ্ছা শক্তিতেই সব হবে। দুঃখ বেদনা থাকবেই এবং দুঃখ হতে সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়। যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটু কম্পিত হয় না।”^{১৬} তিনি নারীকে কেবলমাত্র

পুরুষের সহযোগী বা অনুগামী হিসেবে দেখেননি, বরং ‘শক্তির প্রতীক’, ‘মাতৃত্বের আদর্শ’ এবং সমাজের এক অপরিহার্য স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর দর্শন নারীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার এবং তাকে আত্ম-সচেতন, শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ওপর জোর দেয়। বর্তমান সময়ে যখন নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, তখন বিবেকানন্দের ভাবনাগুলি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁর দেখানো পথে হেঁটে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে, প্রতিটি নারী যেন উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়।

সর্বোপরি, বিবেকানন্দের মূল বার্তা ছিল আত্ম-সচেতনতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। আজকের যুগে যখন নারীরা নানা সামাজিক ও মানসিক চাপে ভুগছেন, তখন নিজের ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে চিনতে পারা এবং আত্ম-সচেতনতার মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করা—এই শিক্ষা আজও অমূল্য। যদি আমরা বিবেকানন্দের এই কালজয়ী নারী ভাবনাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি, তবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, শক্তিশালী এবং উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এমন এক সমাজে নারী তার স্বকীয়তা, আত্মবিশ্বাস এবং শক্তির পূর্ণ বিকাশে সক্ষম হবে, যা কেবল নারীর ব্যক্তিগত কল্যাণই নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি সাধনেও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র:

- ১। পাল, দেবশিস, (২০২০-২১), সমকালীন ভারত ও শিক্ষা, কলকাতা : রীতা পাবলিকেশন, পৃ.-৪০৮।
- ২। মুখোপাধ্যায়, সোমা, (২০০৮), অধিকার থেকে ক্ষমতায়ন, কলকাতা : মিত্রম্ প্রকাশক, পৃ.-১১।
- ৩। স্বামী, অভেদানন্দ, (২০১০), ভারত ও তাহার সংস্কৃতি, কলকাতা : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, পৃ.-১৬৫।
- ৪। ইন্দু, কমল, (২০১৮), ভারতীয় সমাজ, কলকাতাঃ বাণী প্রকাশন, পৃ.- ২৮২।
- ৫। তদেব, পৃ.- ২৮২।
- ৬। স্বামী, বিবেকানন্দ, (২০১৯), আমার ভারত অমর ভারত, কলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, পৃ.- ৫৮।
- ৭। সেনগুপ্ত, পল্লব, (২০১৮), লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, পৃ.-৩৯৩।
- ৮। সেন, সন্দীপন, (২০১৮), স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনাঃ একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.-১১৮।
- ৯। তদেব, পৃ.- ১২৭।
- ১০। রায়চৌধুরী, অরুণিমা, (২০১৫), আধ্যাত্মিকতা ও নারী-ক্ষমতায়ন, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক, পৃ.- ৭৮।
- ১১। মন্ডল, রমা (সম্পা.), ২০২১, যোজনা ধনধান্যে উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা, কলকাতা : মনিদীপা মুখার্জি কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ.- ৯।
- ১২। তদেব, পৃ.- ৬৪।
- ১৩। সরকার, পবিত্র, (২০০৯), শিক্ষা ও চেতনা, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক, পৃ.- ২৯।
- ১৪। <https://sanibararchithi.com/womens-emancipation-and-swamivivekananda/...>, Assessed on July 13, 2025।
- ১৫। তদেব।
- ১৬। স্বামী, বিবেকানন্দ, (২০১৭), শিক্ষা প্রসঙ্গ, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.- ৮৭-৮৮।

‘ছেঁড়া তার’ (১৯৫০) : কৃষকের যন্ত্রণাময় জীবন

দীননাথ সরদার

সহকারী শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির (উচ্চমাধ্যমিক)

সারসংক্ষেপ: আমাদের সমাজে চিরকাল, চিরদিন অসহায় মানুষগুলোর উপর প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, বিভ্রান্ত, ক্ষমতাবান মানুষদের অত্যাচার, অবিচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মাৎস্যন্যায় আমাদের সমাজের বুকে এক অভিশাপ। বিভ্রান্ত ক্ষমতাসালী মানুষ তাদের ক্ষমতা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোর উপর যে শোষণ শাসন চালিয়ে আসছেন তুলসী লাহিড়ী ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটি তার এক জীবন্ত উদাহরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণ খেলায় যখন সারা বিশ্ব অস্থির, তখনই বাংলার বুকে নেমে আসে মন্বন্তর। আর এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত মন্বন্তরে গ্রামের অসহায় কৃষকদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটিতে উত্তরবঙ্গের এক অসহায় মুসলিম পরিবারের অসহায় তার চিত্র ফুটে উঠেছে। চাষীদের জন্য দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও তাদের জীবনে এসে উপস্থিত হয়। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে যেমন একদিকে সারাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক শোচনীয় পরিণামের চিত্র তুলে ধরেছেন ঠিক অনুরূপভাবে সুকৌশলে রহিম ও ফুলজনের সংসার জীবনের যন্ত্রণাময় আত্মসম্মানের করুণ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ: চাষা, দুর্ভিক্ষ, লঙ্গড়খানা, দিলরুবা, তালুক।

মূল আলোচনা: তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ (১৯৫০) নাটকটি উত্তরবঙ্গের কৃষকদের যন্ত্রণাময় জীবন আলোককে উপজীব্য করে কাহিনী নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট মন্বন্তরে গ্রামের অসহায় কৃষকদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। আলোচ্য নাটকটিতে গ্রামের এক অসহায় মুসলিম কৃষক রহিমের এবং তার পরিবারের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জীবন এই ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী সূচারুভাবে অত্যন্ত সুকৌশলে একদিকে যেমন সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক অপচয় এর শোচনীয় পরিণাম তুলে ধরেছেন, অপরদিকে ঠিক তেমন ভাবে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে রহিম-ফুলজনের সংসার জীবনের যন্ত্রণাময় আত্মসম্মানের করুণ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।^১

তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটি কৃষকদের যন্ত্রণাময় জীবনের এক চরম এবং যন্ত্রণাদায়ক মর্মস্পর্শী চিত্র বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির প্রধান চরিত্র রহিমুদ্দিন একজন খাঁটি চাষার ছেলে, তার বাবা বলে...‘মুই চাষা, মোরয় বাপ, দাদা,পর দাদা চাষা, হামার ব্যাটা চাষাই হইবে।’ যে চাষিরা সারা দেশের মুখে অন্ন তুলে দেয় তাদের নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে কুণ্ঠিত হতে হয়। রহিমের একজন বন্ধু মহিম সেও চাষির ছেলে কিন্তু তার শিক্ষা ও যোগ্যতা বলে আজকে কৃষি অধিকর্তা। তিনি রহিমকে সাহায্য দিয়ে, নিজের অন্তরের চাষীর বেটাকে বাইরে প্রকাশিত করে বলেন —

‘কুচ পরোয়া নেই রহিম। নিজের মেহনতে পয়দা করে নিজে খাচ্ছিস,

আর দশ জনকে খাওয়াচ্ছিস তুই। দুনিয়ার অন্নদাতা তোরা।

তোরা কি ছোট রে।^২

গ্রামের চাষী রহিমের বাবা হাকিম এর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল। হাকিম ঋণ দিয়েছিল চড়া সুদে টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য নয়। তার আসল লক্ষ্য ছিল রহিমের বাবার জমি জমা গুলোকে আত্মসাৎ করার জন্য। রহিমের বাবা যখন টাকাগুলো পরিশোধ করতে গেল তখন, সুচতুর হাকিম দেখল জমিজমাগুলো এইবার তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই চতুরতার সাথে মহিম রহিমের বাবাকে বলল টাকা শোধ করে দেওয়ার এখন কি দারকার আছে। যাও ওই টাকা নিয়ে হজ করে এসো। চাষী যদি ধর্ম তো কোন কাজ না করে তাহলে সে না-পাক হয়, দোজকে যায়। কিন্তু মুসলমান হয়ে চতুর্বুদ্ধি হারে মানুষের কাছ থেকে সুদে টাকা নেয়, শয়তানি করে মানুষকে ফাঁকি দেয় তারা হয়ে ওঠে ধার্মিক মানুষ। এখানে যেন ক্ষমতা আর টাকা ধার্মিক আর অধার্মিক মানুষ সৃষ্টি করার জন্য প্রবল দাবিদার হয়ে ওঠে। হাকিমুদ্দিন চালাকি করে সুদের টাকা বাড়ানো আর জমি দখলের লোভ রহিমুদ্দিন মত মেধাবী সং ছাত্রের পড়াশোনার ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। প্রবল সম্ভাবনা এবং মেধা থাকা সত্ত্বেও রহিম পড়াশোনা ছেড়ে চাষা হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। রহিম অসহায় মুসলমান চাষী হলেও সে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ করে না। হিন্দুদের কালীপূজায় গিয়ে কালি নাচনের সং দলের নাচ দেখে আসে কিন্তু হাকিমুদ্দিন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে কখনোই উঠতে পারে না। তাই এই নাটকে হাকিমুদ্দিন টাইপ চরিত্র হয়ে ওঠে আর রহিম নায়ক চরিত্র হয়ে ওঠে। রহিমের সংসারে, রহিম তার স্ত্রী ফুলজান এবং এক সন্তান বহির। ছোট্ট সংসার রহিমের এই সংসারে সুখ দুঃখ কাটে তার জীবন। কিন্তু গ্রামের মাতব্বর হাকিমুদ্দিন কুদৃষ্টি থেকে রেহাই পায়না, রহিমের এই দুঃখের সংসারটিও। রহিমকে চোর প্রতিপন্ন করে জেলে পাঠানোর জঘন্য ষড়যন্ত্র করলেও, বুদ্ধি সততার জোরে হাকিমুদ্দিন পাতা ফাঁদ থেকে রহিম সসম্মানে মুক্ত হয়ে যায়। রহিমের জীবনের আনন্দের সঙ্গে ফুলজান এবং রহিমের দিলরুবা যন্ত্রটা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গরিবের জীবনে শখ থাকলে তা বড়লোকদের চোখে বেঁধে। রহিম গ্রামের শিক্ষিত বুদ্ধিমান কৃষক। বৃকে অকুষ্ঠ সাহস নিয়ে দারোগার ভয় না পেয়ে হাকিমুদ্দিন অবৈধভাবে গোলাতে ধান মজুদ করে রাখা আকালের সময় তার চড়া দামে বিক্রি করা, চড়াদরে সুদ দিয়ে মানুষকে ঠকানোর কথা সততার সঙ্গে প্রতিবাদ বলতে পারে। হাকিমুদ্দিন চাকর কুকরাকে দিয়ে হাকিমুদ্দিন জঘন্য ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করার জন্য, রহিমের স্ত্রী সাহসিকতার সঙ্গে দারোগার সামনে বলে, ‘কুকরার হাতে আমি কাগজের পোলা দেখছি। মুই পুইছতে কইছে গোলা থাকি মিছরি আনছি’।^৩

রহিম স্পষ্ট করেই দাবি তোলে ধান যখন সরকারের কাছে, খাবারের দাবী তখন সরকারের কাছেই তাদের করতে হবে। তারা সরকারকে ট্যাক্স দেয় খাজনা দেয়, যুদ্ধের সময় যুদ্ধের চাঁদাও দেয়। আজকে সব ধান যখন সরকারের গোলায় তখন সেই ধান থেকে চাষীদের জন্য ধানের ব্যবস্থা করে দিলে, তিন মাস পর নতুন ধান উঠলে ধান কেটে সুদসহ শোধ তারা দিতে পারবে। গ্রামের অসহায় চাষী রহিম, গোবিন্দ, মাহমুদ, তমিজ, শ্রীমন্তরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, গ্রামে যদি একটা লঙ্গড়খানা ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তাদের সারা বছরের খোরাকিরা চিন্তা করতে হবে না। অসহায় চাষীদের নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে লঙ্গড়খানার যে উদ্যোগ তারা নিয়েছিল, সেই লঙ্গড়খানার খোলার দাবি থেকে মুনাফা ফায়দা তোলার জন্য, গ্রামের মাতব্বর হাকিমুদ্দিন আর প্রেসিডেন্ট নিজেদের আখের গোছানোর কাজে লাগাতে চায়। একদিকে অসহায় মানুষগুলোর প্রয়োজন অন্যদিকে সুবিধাবাদী মানুষগুলোর

উপার্জন। গ্রামের লঙ্গড়খানা খোলার বুদ্ধি বাস্তবায়িত হলে প্রেসিডেন্টের হাতে চাল,ডাল সবকিছু থাকবে আর হাকিমুদ্দিনও সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে মুনাফা লাভের চেষ্টাও চালাবে। খাবার পেলে অসহায় অভুক্ত চাষিরা গোলমাল করবে না, এই লাভজনক রহিমের বুদ্ধিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, এই শলাপরামর্শ করার সময়, প্রেসিডেন্টের কথার উত্তরে চতুর হাকিমুদ্দিন প্রেসিডেন্টকে বলে-

‘সে ত’ এক নম্বর কথা। দুই নম্বর হইল লঙ্গড়খানা হইলে তোমার হাতে চাউল-টাউল থাকিবে, সঙ্গে মুইও আছে। সবারে কিছু কিছু হইবে। তিন নম্বর, তুমি কইবেন হাকিমুদ্দিন বহুত কাঁদাকাটি করি দরবার করিয়া গাণের মানুষ বাঁচাইতে লঙ্গড়খানা করাইলে- আর আমি কমো আসলে হামার প্রেসিডেন সাহেবের কথা ঠেলার সাধ্য হাকিমেরও নাই।^৪

ক্ষমতাবান মানুষের লাভের উপার্জনের রাস্তা যদি একবার সামনে আসে তাহলে যে কোনো ভাবেই তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমস্ত চতুরতাকে আশ্রয় করে কাজটা হাতিয়ে নিতে পারে। গ্রামের লঙ্গড়খানা খোলার বুদ্ধি রহিমের হলেও রহিমদের আগে শহরে গিয়ে হাকিমুদ্দিনরা পদস্থ কর্মচারীদের চাটুকারিতা করে। নিজের গোলার থেকে এক মন করে প্রতিদিন চাল দেওয়ার অঙ্গীকার করে হাকিমুদ্দিন তার নিজের বাড়িতে নোঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করে আসে। আর লঙ্গড়খানার সমস্ত চাল ডাল মালপত্র তার বাড়িতেই মজুত হতে থাকে। রহিম বলে শ্রীমন্তকে এরকম মানুষগুলো মান নেই কিন্তু লাভের হুঁশ ষোল আনায়ে আছে। কোথাও লাভের একটুখানি গন্ধ পেলেই সেটার সুবিধা নিতে তারা ঠিক হাজির হবে। সমস্ত দুনিয়ার আগুন লাগিয়ে দিয়েও হলেও তাদের লাভ আদায় করেই তবে স্থানচ্যুত হবে। ভালো মানুষরা সাধারণ মানুষের জন্য ভালো ভালো কাজগুলো করার সময় এবং সুযোগ এই সমস্ত ফন্দিবাজ মানুষগুলো নষ্ট করে দেয় শুধুমাত্র তাদের আখের গোছানোর জন্য।^৫

গ্রামের মধ্যে লঙ্গড়খানা হল কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না, আত্মসম্মানবোধ ওয়ালা অসহায় গরিব চাষি গুলোর। গ্রামের মাতব্বরের বাড়িতে লঙ্গড়খানা হলেও রহিম তার পরিবার এবং রহিমের সাথে একই পথের প্রতীক আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন চাষী পরিবাররা তাদের আত্মসম্মান নষ্ট করে কিছুতেই হাকিমুদ্দিনর বাড়িতে ভিখারির মতো খেতে যেতে রাজি হয় না। তাদের কাছে জানের থেকেও আত্ম সম্মান অনেক বড় হয়ে ওঠে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা কোন কোন চাষি, সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে রাতের অন্ধকারে চোরের মত লঙ্গড়খানার খাবার লাইনে বসে গেলেও শেষ রক্ষা হয় না, তারা ধরা পড়ে যায় সুযোগ সন্ধানী চোখের চাউনিতে। মানুষের পেটে যখন ক্ষুধার জ্বালা তখন কানা ফকিরের মত পিচাশ মানুষেরা গভীর রাতে আন্তাকুড়ে নোংরা ময়লা আবর্জনা দিঘির জলে আর কুয়োতে ফেলে দিয়ে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবকে ধ্বংসাত্মক আকারে পর্যবশিত করে। কলেরায় মানুষ মরলে ফকিরের বাহাদুরি বাড়ে তারও দুটো পয়সা লাভ হয়। মানুষকে ভালো করার, মানুষকে ভালবাসবার মানুষ আমাদের দেশে নেই কিন্তু মানুষকে সর্বনাশ করে নিজের ফায়দা তোলার মানুষ অসংখ্য পাওয়া যায়। কথায় আছে অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। প্রচন্ড অলসকষ্টেও রহিম ফুলজানকে আর বহিরকে, ফুলজনের ফুফার বাড়িতে পাঠায় কিন্তু এই কষ্টের দিনে সেখানেও তাদের ঠাই হয়নি। তাদের বিশ্বাস ছিল আকাশ থেকে কোন ফরিস্তা এসে তাদের সন্দেশ মিটাই খাইয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। রহিম ছোটবেলায় দুগ্ধে কষ্টের মাধ্যমে মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছে কিন্তু এমন অতি মারি দুর্ভিক্ষের দিন সে কখনো দেখেনি। রহিমের বাবা

হাকিমের দেনার টাকা শোধ করে দিতে পারলে, তাদের জমি তারা ফিরে পেতো। পাট ধান চাষ করে ফসল ফলিয়ে তারা কিছু উপার্জনও করে নিত কিন্তু হাকিমুদ্দিন চক্রান্তে হজ করার পরামর্শে তার বাবার জমি হাকিমুদ্দিন হস্তগত হয়ে যায়। বিপদের দিনে গরিব মানুষগুলোকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ঈশ্বর-খোদা মানুষগুলোর পরীক্ষা নেয়। তার বাপজান সর্বশ্রু বিনিময়ে হজ করে মুশকিল আসান করেছিল। কিন্তু রহিম কি করবে, তার সামনেও আজকে পরীক্ষা। ওই সামনে হাকিমুদ্দিন বাড়িতে লঙ্গড়খানার দেখা যায়। মাথা নিচু করে গেলে সবাই সেখানে খাবার পায়। কিন্তু বুকের মধ্যে কলিজাটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অসম্মানের অন্নমুখে তোলার কথা ভাবলে, তখন রহিমের মনে হয় এর থেকে আত্মহত্যা করাই অনেক সম্মানের। ঈশ্বর মেহেরবান তিনি সবার জীবনও দিয়েছেন মানও দিয়েছেন। মানুষের জীবনটা তো একদিন শেষ হয়ে যাবেই। কিন্তু মানুষের মান চিরদিন থেকে যায়।^৬

তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে কৃষকের যন্ত্রণাময় জীবনের অন্যতম আদর্শ মাতৃ প্রতিরূপ ফুলজান। ফুলজান রহিমের যথার্থই ধর্মিনী। ফুলজান রহিমের মান মর্যাদাকে সম্মান করে। কিন্তু রহিমের স্ত্রীর আগে ফুলজানা বছরের মা। তাই তার বাচ্চা অল্পকষ্টে কাতর হলে, মা ফুলজান বলে ‘বাচ্চা পয়দা হওয়ার আগে আল্লা মায়ের বুকে দুধ আনি রাখি দ্যায়। বাপের বুকে ত’ দ্যায় না। বাচ্চাক বাঁচানোর দায় বাপের চায়া মায়ের বেশি।’ এক মা যখন তার সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্যতিব্যস্ত তখন অন্য এক মা হাকিমুদ্দিন মিয়াবর মা, নদীর ঘাটে ফুলজানের পিছনে জোঁকের মতো ঈঁটে থাকে। ফুলজানকে হাকিমুদ্দিন বাঁদি করার জন্য। ফুলজানের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে হাকিমুদ্দিন মা বলে ‘ফুলজান তোর শাশুড়ি না খায়া মইল তুই কি মরবু বাচ্চাটাক নিয়া-’। ফুলদানের যে ফুফা তাকে ছোট থেকে নিজের মেয়ের মতো করে আদরের সোহাগে লালন পালন করে বড় করে তুলেছে, আজকে এমন চরম দুর্দিনে সেই ফুফার কাছে সাহায্যর জন্য দাঁড়ালে ফুফা তাকে অসম্মান করে বলে, ‘মানুষটা বাচ্চা পয়দা করবার পারে, আর খোয়াবার পারে না। পাঠায়া দিলে হইল?’ প্রিয়জনের কাছ থেকে এমন দুর্দিনে এমন চরম অপমান রহিমুদ্দিনকে স্তব্ধ করে দেয়। তার প্রিয় যন্ত্র দিলরুবাটা কে বেচে দিয়ে যে টাকা পাবে তা দিয়ে শহরে গিয়ে তার বন্ধু মহিমকে অনুরোধ করে একটা যে কোন কাজ, আরদানি হোক, পিয়ন হোক, খানসামা হোক, যা কিছু করে সে ফুলজানার কাছে টাকা পাঠাতে চায়। কিন্তু ফুলজানের মত অত্যন্ত সহজ সরল বধুর পক্ষে একা ঘরে থাকা সম্ভব নয়। ফুফার বাড়িতে আবার গেলে যদি তারা তাড়িয়ে দেয়, তাহলে দেওয়ানির বাড়িতে তাকে বাঁদি হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু ফুলদানের বাঁদি হওয়া রহিমের আত্মসম্মানকে মৃত্যু সম আঘাত করবে। সেই কথা ফুলজানকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে যে, আমার সম্মান যাবে সে কথাটা তুই একবার ভাবিস না। কিন্তু ফুলজানের স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু মা হিসেবে ফুলজানের একটা দায়িত্ব কর্তব্য আছে। মা হিসেবে নিজের সন্তানকে বাঁচানোর দায়িত্ব তার আছে। তাই মানসম্মানকে তুচ্ছ করে মাতব্বরের মার কাছে যাওয়ার জন্য ফুলজান রাজি হয়। শুধুমাত্র সন্তানের জীবন বাঁচানোর জন্য। তারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ঈশ্বরী পাটনির কাতর আবেদন আমরা শুনতে পাই, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।’ সমস্ত বাবা-মার এই ইচ্ছে থাকে। শঙ্খ ঘোষের ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতায় এক পিতার কাতর আবেদন ‘এই তো জানু পেতে বসেছি,.....আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।’ সন্তানের ভালো থাকার জন্য বুকে কষ্ট চেপে রহিম তার স্ত্রী পুত্রকে শত্রুর কাছে মাথা নত করে নঙ্গড়খানায় যাওয়ার আদেশ দিল।^৭

স্ত্রী পুত্রকে লঙ্গড়খানায় পাঠিয়ে অসহায় রহিম যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শ্রীমন্তকে বলে, হাকিমুদ্দির মনের স্বাদ মিটলো। আমার জমি জমা খেয়েছিল আজ তার বাড়িতেই আমার ছেলে বউ ভিখারী হয়ে খেতে গেল। যদিও শ্রীমন্ত ও রহিম দুজনেই জানে লঙ্গড়খানা মাতব্বর দেওয়ানির কোনো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। সরকার থেকে অসহায় মানুষগুলো দুটো অন্ন সংস্থানের জন্য এটা করে দিয়েছে। হাকিমের উঠানটা অনেক বড় তাই শেখানে হচ্ছে। শ্রীমন্তর মুখে এই অসহায় দিনগুলোয় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির একটা বার্তা শোনা যায়। শ্রীমন্তর বলে গিয়ে দেখো কত হিন্দু মুসলিম বাবাজি ফকির সব এসে এক জায়গায় মিলিত হয়েছে এ দারুন আকালের সময় সবাই এক হয়ে গেল। অসহায় গরীব মানুষের কোন জাত হয় না কোন ধর্ম হয় না। তার জ্বলন্ত উদাহরণই এই দুর্ভিক্ষের দিনগুলি। মানুষের পেটে যখন অন্ন থাকেনা, তখন মানুষ জাত পাত হানাহানি নিয়ে বেঁচে থাকার সময় পায় না। রহিম চুপি চুপি ফুলজান আর বছিরকে মাতব্বরের বাড়িতে মাথা নত করে এই বিশ্বাসে পাঠিয়েছিল যে, সেখানে তারা এক মুঠো ভাত হলেও থাকবে। কিন্তু চতুর ধুরন্ধর মাতব্বর হাকিম তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য বছিরকে আর তার মাকে খেতে না দিয়ে বলে, ‘বছির তোর মায়েক কও মোর অন্দরে যায়া খাউক। এইঠে আমাক খাবার দিবার হুকুম নাই।’ রহিমের প্রতি কটাক্ষ করে হাকিম ফুলজানকে বলে যারা জমিদারী ট্যাক্স দেয় চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় তাদের তো এখানে খাওয়ার পাওয়ার কথা নয়। সরকার থেকে এই মত হুকুম দিয়েছে। রহিমের প্রতি মাতব্বরের অপমানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রহিম বলে আমি চৌকিদারী ট্যাক্স দিই, তাতে তোরা খাবার পাবি না কেন। অসহায় স্বামী, অসহায় বাবা রহিম যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে ফুলজানকে কাগজে তালুক লিখে দিল, একসঙ্গে তিন তালুক আর বলল আজ থেকে তুই আর আমার বিবি না তোকে তালুক দিচ্ছি। এখন শয়তানটা তোকে খাবার দিতে বাধ্য। চলে যাও দেরি না করে। রহিম বলল, আমি তোদের পেট ভোরে খেতে দিতে পারি না কিন্তু আমার জন্য তোদের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না। শয়তান হাকিমুদ্দি কায়দা করে তোদেরকে মারতে চায় আমি বুদ্ধি করে তোদেরকে বাঁচাতে চাই। এখন তুই আর আমার স্ত্রী না লঙ্গড়খানায় যা, যেখানে যা, দুমাস নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখ। বছিরকে নিয়ে আমি শহরে চলে যাব। বছির এখানে রহিমুদ্দির ছেলে ওর মান গেলে আমারও মান যায়। আমি তাকে কথা দিচ্ছি ফুলজান তোর ছেলেকে আমি আবার তোর কাছে ফিরিয়ে দেব। অসহায় স্ত্রী, অসহায় মা, ফুলজান স্বামীর কথায় বিশ্বাস করে বছিরকে ছেড়ে দিয়ে অপমানের ভাত খাওয়ার জন্য লঙ্গড়খানায় গেলো। রহিমের ঘর তো আর ফুলজানের ঘর নয়, প্রাণের প্রিয় দিলরুবাটা আজ অসহায় হয়ে দুটো ভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে থাকলো। মানুষ কতটা অসহায় না হলে নিজের প্রাণের প্রিয় মানুষকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। যাকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে হাত ধরে একদিন বাড়ি তুলেছিল, রহিম সেই ফুলজানকে এই দারুন দুর্ভিক্ষের দিনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে তার হাত ছেড়ে দিল, যাতে রহিমের স্ত্রী এই পরিচয় তার খাবার কেউ আটকাতে না পারে। অসহায় যন্ত্রণা দগ্ধ কৃষকের কাছে মানের থেকে জীবনটা বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু বছির সন্তান তাই তাকে অপমানের অন্ন খেতে দিতে চায় না রহিম।^৮

সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দেশের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছিল তাতে অনেক মানুষের ঘর ভেঙেছে, বাপ মা সন্তান বেঁচেছে, স্বামী স্ত্রীকে বেঁচেছে কিন্তু অসহায় রহিম স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য তাকে তালুক দিয়েছে। ফুলজান হাকিমের কামনা মত তার বাড়িতে বাঁদি হয়ে



আছে। ইচ্ছে থাকলেও আর বছিরের কান্না তার মায়ের জন্য, কান্না সন্তানের কাছে মাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। রহিমের কাছে কোন উপায় ছিল না, হাদিজ মতে, কেউ যদি আবার ফুলজানকে বিয়ে করে তালাক দেয়, তার তিন মাস দশ দিন পরে আবার রহিম তাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু মুসলমান তো বিনা কারণে তালাক দিতে পারে না। তাই ভালোবাসা থাকলেও রহিম ফুলজানকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে পারছে না। যেখানে দুমাস পরে ছেলে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রহিম আজ সে জায়গায় চার মাস হয়ে গেল। সুচতুর হাকিমুদ্দিন রহিম আর ফুলজানকে আলাদা করে রাখার জন্য তার মাকে দিয়ে ফুলজানকে বলেছে, তার ছেলে এখানে আসলে তাকে দেখতে হাদিজের খেলাপ হবে। দিলরুবার তার জোড়ার জন্য রহিম মনের মধ্যে একটু আশা পাচ্ছিল কিন্তু যন্ত্রটা বাঁদি ফুলজানের মত আজ অসহায় পড়ে আছে। সরেমামুদ রা ফুলজানের সঙ্গে রহিমের পুনঃরায় মিলন ঘটানোর জন্য কুৎসিত মানসিকতার এক কান্না ফকিরকে ফুলজানের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পুনঃরায় তালাক দিয়ে রহিমের সাথে বিয়ে দেবে এই আশায় বুক বাঁধতে থাকে। মা ফুলজান ছেলের জন্য অস্থির হয়ে গোপনে ঘরের পিছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বছিরকে দেখতে আছে। বছির তার মাকে দেখার পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কান্না ফকিরের সঙ্গে গ্রামের সমস্ত হিন্দু মুসলমান চাষীরা মিলে ফুলজানের বিয়ে দিয়ে তালাক করিয়ে দেবে এ বিষয়টা, দেওয়ানি হাকিমের কানে যেতে সে তার শয়তানি বুদ্ধি চালাতে শুরু করে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত প্রজার প্রতিবাদে হাকিমুদ্দিন পিছু হটে। সেই সময় কান্না ফকির ব্যঙ্গ করে দেওয়ানিকে বলে, দেওয়ানি তোমার মুখের গ্রাস আমার হলো যে, হোক না কেন সে একটা রাতের জন্য। কান্না ফকিরের কথায় রহিমের অন্তরআত্মা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সে ভাবে একদিনের জন্য হলেও এমন ইতর পশুর সজ্জাসঙ্গীনি হওয়া যে কি বেদনার কি লাঞ্ছনার তা অনুভব করে চিৎকার করে ধাক্কা দিয়ে ফকিরকে তাড়িয়ে দিল। মায়ের জন্য উদ্বিগ্ন ছেলেকে মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ফুলজানকে হাত ধরে টানতে টানতে রহিমুদ্দিন নিয়ে আসলো, ফুলজানকে বলল, কোন ভয় নেই ফুলজান। যা হবার তা আমার হবে। তুই ছেলেটাকে কোলে নিয়ে তাকে বাঁচা। অসহায় স্বামী রহিম এর মুখের দিকে তাকিয়ে ফুলজান বলে, ঘরে যাওয়া যায় না যে। রহিম বলে ঘরে যাওয়া যাইবে, এটা বছিরের ঘর হইবে। তুই তার মা তুই এইটে থাকবু। রহিম যে ভুল করেছিল অসহায় অবস্থায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সেই ভুলের মাশুল দিয়ে আজ তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় রহিম। নিয়ম-কানুন হাদিজ কোরান গুনাহ সবকিছুকে তোয়াক্কা না করে ফুলজানকে নিয়ে অনেক দূরে নতুন কোন গ্রামে গিয়ে, তাদের জীবনকে নতুন করে শুরু করতে চায় কিন্তু ফুলজান হাদিজের লেখাকে ভয় পায়। তাই ফুলজান রহিমের সাথে যেতে রাজি হয় না। অসহায় রহিম বলে নিকার নামে বেইজ্জত হইলে হাদিজ খেলাপ হয় না। ছেলেটাকে বাঁদির ছেলে বানালে হাদিজের খেলাপ হয় না। যে মানুষ একটা মুখের কথায় বাঁচে তার জিভটা দুপায়ে ঠেলে দিলে হাদিজের খেলাপ হয় না। উত্তেজনা রহিম তার প্রিয় যন্ত্র দিলরুবারটার কান মুচড়ে দিল, সেটা ছিঁড়ে গেল রহিম। যন্ত্রের মত তার প্রিয় সংসার তারগুলো ছিঁড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রহিম ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। গলায় দড়ি দিয়ে দিলবার যন্ত্রের মত নিজের জীবনটা শেষ করে দিল রহিম। প্রদীপ যেমন নিজেকে পুড়িয়ে অন্যের জীবনে আলো এনে দেয়। রহিম ও তেমনি নিজের জীবন শেষ করে দিয়ে ফুলজান বছিরের জীবনে এক নতুন সূর্যকে হাজির করে দিল। যেখানে কোন নিয়ম কোন হাদিজ মা ও ছেলেকে পরস্পর থেকে আলাদা করতে পারবে না।^১

তুলসী লাহিড়ী ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটি প্রাথমিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ দুর্ভিক্ষের কাহিনীকে বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত নাটকটি হয়ে উঠেছে কৃষকের যন্ত্রণাময় জীবন করণ কাহিনী। যেখানে অসহায় কৃষককে স্ত্রী পুত্রের মুখে একমুঠো অল্প তুলে দিতে গিয়ে বারবার অসহায় হয়ে উঠতে হয়ে উঠতে হয়েছে। ক্ষমতা লোভী কুচক্রী স্বার্থপর মানুষগুলোর হাতে নিজেদের জমি জমা খুইয়েও শুধুমাত্রমান সম্মান কে বাঁচিয়ে রেখে ভিক্ষুর মত জীবন না কাটিয়ে শ্রমের মাধ্যমে তাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু মানুষের অসহায়তা চরমভাবে প্রকাশ পেয়েছে স্ত্রী পুত্রকে পেটপুরে দূরন্ত দুমুঠো ভাত তুলে না দিতে পারার মধ্য দিয়ে। স্ত্রীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা থাকলেও শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে খেয়ে পরে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে তালুক দেয়। অসহায় চাষী জানতো তার স্ত্রী, তার ফুফার বাড়িতে আশ্রয় না পেলেও দেওয়ানি মাতব্বরের বাড়িতে বাঁদি হয়ে দু’মুঠো ভাত খাওয়ার জন্য আশ্রয় পাবে। স্বামীর কাছে তার স্ত্রী তার কলিজা। সে কলিজা কে রহিমের মত কৃষকেরা অসহায় ভাবে জান থেকে আলাদা করে দেয়। যে কলিজা কোনদিন আর তা জানের মধ্যে ফিরে আসতে পারে না। তাই তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটি শেষ পর্যন্ত এক অসহায় কৃষকের যন্ত্রণাময় জীবনের বাস্তব রূপায়ণ হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়।^{১০}

তথ্যসূত্র:

- ১) গোস্বামী সনাতন, সম্পাদনায়, তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৬, পৃষ্ঠা.১৫
- ২) তদেব, পৃষ্ঠা.৩৪-৩৫
- ৩) তদেব, পৃষ্ঠা.৬০
- ৪) ভোজ মনোজ, শাস্ত্রে প্রেমে যন্ত্রণায় ‘ছেঁড়া তার’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইমেলা, ২০১২, পৃষ্ঠা.২৯
- ৫) গোস্বামী সনাতন, সম্পাদনায়, তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৬, পৃষ্ঠা.২১
- ৬) তদেব, পৃষ্ঠা.২২
- ৭) তদেব, পৃষ্ঠা.৮৯-৯০
- ৮) তদেব, পৃষ্ঠা.৯৪-৯৫
- ৯) ভৌমিক নির্মলেন্দু, ভূমিকা, তুলসী লাহিড়ী : ‘ছেঁড়া তার’, ভারতী বুক স্টল, ৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৬, পৃষ্ঠা.২৬-২৭
- ১০) মিন্দে সুরঞ্জন, ‘বাংলা নাট্যচর্চা’, রূপালী (প্রকাশক সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য) ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা ৬, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা.১১৮-১৯

গ্রন্থ ও পত্রিকাঞ্জি:

- ১। ঘোষ জগন্নাথ, তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’, সম্পাদক, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, ২০০৫।
- ২। ভট্টাচার্য বিজন, ‘নবান্ন’, দে’জ পাবলিশিং, (প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে ও সুভাষচন্দ্র দে) ১৩ বঙ্কিমচ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭৩, আগস্ট ২০১৯।



- ৩। গায়েন মহীতোষ, 'গন-দর্পণে বাংলা নাটক ও নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস', ঘোষ পাবলিশিং কনসারন, (প্রকাশক শ্যামল ঘোষ) ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
- ৪। ঘোষ অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, (প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে ও সুভাষচন্দ্র দে) ১৩ বঙ্কিমচ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১৮।
- ৫। মিন্দে সুরঞ্জন, কৃষক লড়াই : 'নবান্ন থেকে দেবীগর্জন', জন্মশতবর্ষে বিজন ভট্টাচার্য : সম্পাদনা - নকুল চন্দ্র বাইন, পত্রকথা: প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬।
- ৬। শীল শ্রী বৈদ্যনাথ, 'বাংলা সাহিত্যের নাটকের ধারা'- এ কে সরকার অ্যান্ড কোং- বুদ্ধ পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭।
- ৭। চৌধুরী দর্শন, 'গণনাট্য আন্দোলন', অনুষ্ঠাপ : কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯।
- ৮। চক্রবর্তী বিশ্বরূপ, বিজন ভট্টাচার্য নট, নাট্যকার- নির্দেশক, পারুল : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০১৬।
- ৯। ভট্টাচার্য শমীক (সম্পাদিত), 'নবান্ন'-বিজন ভট্টাচার্য, প্রমা প্রকাশনী- ষষ্ঠ প্রমা সংস্করণ- জানুয়ারি, ১৯৯৮।
- ১০। প্রধান সুধী, 'নবান্ন' : প্রযোজনা ও প্রভাব, পুস্তক বিপণি - প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।
- ১১। চ্যাটার্জি সৌমিত্রকুমার (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ বিজন, নাট্যকথা, আত্মপ্রকাশ ১৯৯৬ মার্চ।
- ১২। হক সিরাজুল খান্দকার, সম্পাদক, 'দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ', প্রকাশক, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, কলকাতা, ১৯৭৫।
- ১৩। বন্দ্যোপাধ্যায় শমিক, 'নতুন থিয়েটারের ইতিহাস লেখা হবে না?', পরম্পরা প্রকাশন, (প্রকাশক গৌতম দাস), ২০এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩।
- ১৪। চন্দ্র দীপক, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২।
- ১৫। সান্যাল, কমলকুমার, 'বাংলা নাটক সমীক্ষা', বর্ণালী প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬।

বৈদিকযুগে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ : একটি সমীক্ষা

কৌশিক সরকার

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়

ইটাচুনা, ভুগলী

সারসংক্ষেপ: যে কোনও যুগের ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবেই নারীর অবস্থানের প্রশ্ন চলে আসে। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতে ধর্মগ্রন্থকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী, শ্রুতি। ভারতবর্ষের মূল ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এই ধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ রচনা ও সংকলনে নারীদের বারংবার সামাজিক অবদানের পরিচয় মেলে। কারণ যেকোন চলমান সমাজে নারী হল সেই সমাজের অর্দ্ধাংশ। সাধারণত পুরুষগণের শিক্ষা ও বিবিধ কর্মের কথা বেদে সুস্পষ্ট ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বেদে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় না এবং সেযুগে নারীদের জন্য কোন শিক্ষালয় ছিল কিনা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও অতিসহজেই স্ত্রী শিক্ষার মান অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বৈদিক যুগের নারীরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ললিতকলাচর্চা, সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পূর্ণ অধিকার ছিল এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে তারা জীবনধারণও করতেন। সেইবিষয়ে বৈদিক যুগে নারীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রামাণ্যচিত্র আলোচ্য সন্দর্ভে তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

সূচক শব্দ: বৈদিকযুগ, নারী, কর্মকাণ্ড, ব্রহ্মচারিণী রমণী, ললিতকলাচর্চা, সামরিক প্রশিক্ষণ।

মূল আলোচনা:

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।

অনড়বান ব্রহ্মচর্যেণাশ্রো ঘাসং জিগীষতি।^১

পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই বৈদিক যুগে নারীদেবতাগণ খানিকটা নিষ্প্রভ। বেদশব্দের দ্বারা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ- এই চারটি সাহিত্য যুগকে বোঝায়। দেবতাদের জননী, জায়া, কন্যা, ভগিনী ও প্রিয়দর্শিনী রূপেই দেবতাগণ সমধিক পরিচিত ছিলেন। অনন্ত শ্রী, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁরাও দেবত্বের অধিকারিণী ছিলেন। স্বল্প সংখ্যক সূক্তে তাঁদের আর্বিভাব ক্ষণিকের হলেও তাঁদের প্রভাব ছিল শাস্ত্রত কালের। ঋগ্বেদের সূচনাতাই তিনজন প্রধান দেবীর উল্লেখ্য পাওয়া যায়; তাঁরা হলেন- “ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীময়োভুবঃ”^২। মহীধরভাষ্যে উক্ত তিন দেবীর স্থান বিষয়ে বলা হয়েছে- “সরস্বতী মধ্যস্থানীয়, ভারতী দ্যুস্থানীয় এবং ইড়া পৃথিবীস্থানীয়”^৩। এছাড়া রাকা, অনুমতি, কুহ, সিনীবালা, শ্রদ্ধা, রাত্রী, আয়তী, নিবৃতি, ঈষা, অদিতি, অম্বুং কন্যা বাক্, উর্বশী প্রভৃতি নারীত্বের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন।

বর্তমান সভ্যতার শীর্ষস্থানে আরুহ সুশিক্ষিত মাতা-পিতারাও কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানকেই অধিকতর কাম্য বলে মনে করেন। বৈদিক সংহিতার যুগেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুত্রকেই কাম্য বলে মনে করা হলেও, কন্যা সন্তানের অবহেলিত হওয়ার কোন নজির নেই। মেয়েরা ছেলেদের মতোই সমাজে শিক্ষা-দীক্ষার সমান অংশীদার ছিল। ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য- এই তিনটি উচ্চ বর্ণের নারীর বেদ অধ্যয়নের পূর্ণ অধিকার ছিল এবং তাঁরা অধ্যাপনার কাজও করতেন। বৈদিক সাহিত্য সংহিতা মন্ত্রসমূহে দ্রষ্টা বহু নারী ঋষি, অন্যান্য সাহিত্যে বহু রমণী আধ্যাত্মিক শিষ্যা, তপস্বিনী, ব্রহ্মচারিণী এবং ব্রহ্মবাদিনীর নাম পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে অনেক নারী মন্ত্রদ্রষ্টার নাম লিপিবদ্ধ আছে। যেমন- বিশ্ববারা (১/১২৬), রোমশা, লোপামুদ্রা (১/১৭৯), অম্বলী কন্যা বাক (১০/১২৫), জুহু, পৌলোমী, কাশীবতী, ঘোষা, জরিতা, শ্রদ্ধা কামায়নী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বৃহদ্বেদেও ২৭ জন নারী ঋষির উল্লেখযোগ্য। সামবেদে নোধা, গোপায়না, শিকতা নিবাবরী প্রভৃতি কয়েকজন নারী ঋষি অমর হয়ে রয়েছে। বিবাহপূর্ববর্তী সময়ে মেয়েরাও ছেলেদের মতোই শিক্ষা গ্রহণ করত। ঋগ্বেদ সংহিতার যুগ থেকে সূত্র সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য নারীরা পবিত্র সূত্রের দ্বারা দীক্ষিত হতেন অর্থাৎ তাঁদের উপনয়ন সংস্কার হত। তারা ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করত, পবিত্র অগ্নি আধান করত; বেদ ও অন্যান্যগ্রন্থসমূহ পাঠ করত। এবিষয়ে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে—

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে ।

অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ।।^৪

বৈদিকযুগে নারীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড—

১. বৈদিকযুগে বহু নারী অধ্যাপিকাও ছিলেন। বিশাল বৈদিক সাহিত্যে, সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে অনেক বিদুষী নারীর নাম পরিদৃষ্ট হয়। গার্গী নামে একজন জ্ঞানী, বিদুষী ও তপস্বিনী নারী বৈদিক সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। বৃহদারণ্যক গ্রন্থে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী^৫ ও যাজ্ঞবল্ক্যের^৬ মধ্যে অনুষ্ঠিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিতর্কে কারও জয় পরাজয় নির্ণীত হয় নাই; কিন্তু তাদের দার্শনিক বিবাদে উভয়েই সমান পারদর্শী ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়াও গন্ধর্ব প্রভাহিত এক বিদুষী নারীর কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে^৭ উল্লিখিত আছে। অগ্নিহোত্র নামে প্রাত্যহিক হোমটি দুইদিন অথবা একদিনে সম্পাদিত হবে এই নিয়ে পুরোহিতদের মধ্যে মতবিরোধ হয়; সেইসময় নাম গোত্রহীন এবং কেবলমাত্র ‘কুমারী’ নামে উল্লিখিত এই বিদুষী নারীর নিকট এই বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ উপস্থিত হন।

বৈদিক যুগের নারী ঋষিরা যে সুপণ্ডিত ছিলেন সেই বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে নারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য এই আদর্শ তপস্বী জীবনযাপন এবং ব্রহ্মবাদিনীদের পরস্পরগত প্রচলন বৈদিক যুগের পরও লোপ পায়নি। ৪০০ খৃ.পূ. ভারত ভ্রমণকালে মেগাস্থেনিস চিরকৌমার্য পালনরতা অনেক সুপণ্ডিত তপস্বিনীকে দেখেছেন। তারা সুগভীর তত্ত্বমূলক বিতর্কে ও আলোচনায় সর্বদায় যোগদান করতেন। তিনি লিখেছেন- ‘বহু নারী বিদ্বান্ চিরকুমার পুরুষ ঋষিদের মত চিরকৌমার্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রচর্চা করতেন এবং ঋষিদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হতেন’^৮।

২. পিতামাতা যে কেবল বিদ্বান্ পুত্রের কামনা করতেন তা নয়, বিদুষী কন্যার জন্মের জন্যও তাদের অতুগ্ৰ আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিদুষী কন্যার জন্মের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে উক্ত হয়েছে— ‘অথ য ইচ্ছেদুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পারছিড়া সর্পিমন্তমশ্বানীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ’^৯।

পুনরায় বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে- ‘যদি কেহ দীর্ঘায়ুযুক্তা বিদুষী কন্যা লাভ করিতে ইচ্ছুক হন (অথ য ইচ্ছৎ মে পন্ডিতা জায়তে), তাহলে তিনি তাঁর পত্নীকে আজ্য মিশ্রিত তিল তণ্ডুল রন্ধন করে সেবন করাবেন’^{১০}।

৩. বৈদিকযুগে রমণীদের নৃত্যবিদ্যা, কণ্ঠ্যসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হত। সেবিষয়ে উক্ত হয়েছে- ‘নৃত্যং গীতং স্ত্রীণাং কর্ম’। অর্থাৎ গান করা ও নৃত্য করা স্ত্রীলোকের কার্য। সীবন, বয়ন, পশমের কাজ, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি নারীগণ অভ্যাস করতেন যা স্ত্রীলোকের কলাবিদ্যা নামে সর্বত্র উল্লিখিত হত। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে— “তৎ বা এতৎ স্ত্রীণাং কর্ম যৎ উর্গাসূত্রং কর্ম”^{১১}। উর্গা শব্দের অর্থ হল পশম এবং বয়ন কার্যের জন্য তা আবশ্যিক। সেইযুগে অলঙ্কার শিল্প ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি বা খ্যাতিলাভ করে। বৈদিকসাহিত্যে অলংকরণ কর্মকে বলা হত ‘পেশসংস্করণ’। ‘পেশ’ শব্দটির অর্থ অলঙ্করণ অর্থাৎ কাপড়ে ফুল প্রভৃতি চিত্রাঙ্কন জাতীয় কাজ। ‘রজয়িত্রী’ নামে অভিহিত নারী রঞ্জক সূতা এবং বস্ত্রাদি রং করত। মঞ্জুষা (কুড়ি) নির্মাণ, রজ্জু তৈয়ারী, তুলা হতে সূতা প্রস্তুত প্রভৃতি কুটিরশিল্পগুলি মহিলাদের দারায় যে সম্পাদনা করা হত সেবিষয়ে শুক্লযজুর্বেদে ত্রিংশতম অধ্যায়ে ৭০ টি পেশার বা জীবিকার উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে বস্ত্রধৌতি, কুড়িপ্রস্তুত, সুগন্ধি দ্রব্য নির্মাণ, বস্ত্রাদি রং করা, অলংকরণ বা পেশসংস্করণ প্রভৃতি আটপ্রকার কর্ম বা বৃত্তি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

৪. সামরিক শিক্ষা দান করার প্রথা নারীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; তা ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, রাজা নমুচির আদেশে তাঁর মহিষী অতি ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।^{১২} অশ্বিনসূক্তে বর্ণিত হয়েছে রানী বিশ্বপালের বীরত্ব ব্যঞ্জক কার্যাবলী^{১৩}। মুদালানি নামে অপর একজন ভয়লেশশূন্য রূপপণ্ডিত বীরঙ্গনা সামরিক প্রশিক্ষণ ও রণ চাতুর্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ। ঋগ্বেদের বিবিধ মন্ত্র হতে জানতে পারি দাসবর্ণের অনার্যদের সেনাবাহিনীতে অনেক স্ত্রীসৈন্য থাকত। দাসবর্ণের সক্ষম রমণীগণ প্রচুরসংখ্যক সামরিকবাহিনীতে যোগ দিত এবং যুদ্ধ করত। তাই বলা হয়েছে- “স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং ম করন্নবালা অস্য সেনা?”^{১৪} অর্থাৎ দাসজাতি তাদের স্ত্রীলোকদের অস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধে সৈন্যদলে নিযুক্ত করে। ইন্দ্রদেবতার বহু সূক্তে কথিত আছে যে অসুর বৃন্তের মাতা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করেছিল এবং ইন্দ্রের হাতে নিহত হন^{১৫}।

বৈদিকোত্তর যুগেও রমণীসমাজে সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। খ্রী. পূ. দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে ‘শান্তিকী’ নামে বর্শা বা বল্লম নিক্ষেপকারিণী নারীদের উল্লেখ্য করেছেন। বস্তুতঃ বৈদিকোত্তরযুগ অপেক্ষা বৈদিকযুগেই সর্বতোমুখী স্ত্রীশিক্ষার প্রমাণ ও সমধিক উন্নতি দৃষ্ট হয়। সুতরাং সমাজের বহুমুখী ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের নারীর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন বেদের মন্ত্রের মাধ্যমে—

ক. ‘পিতার সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে’।^{১৬}

খ. ‘গর্ভের সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সে যেন ভাল থাকে’।^{১৭}

গ. ‘নারী হল মঙ্গলময় লক্ষ্মী’।^{১৮}

ঘ. ‘নারী হল জ্ঞানের ধারক’।^{১৯}

ঙ. ‘নারী হল শিশুর প্রথম জ্ঞানদাতা’।^{২০}

চ. ‘নারীকে উপহার হিসাবে জ্ঞান উপহার দাও’।^{২১}

ছ. 'হে নারী! মৃতপতির শ্লোকে অচল হয়ে লাভ কী? বাস্তব জীবনে ফিরে এসো। পুনরায় পতি গ্রহণ করো'।^{২২}

সুতরাং সর্বশেষে বলতে পারি যে বুদ্ধিনিষ্ঠ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ললিতকলাবিষয়ক, যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষা বৈদিকযুগে রমণীগণ লাভ করত। বস্তুতঃ বৈদিকোত্তর যুগ অপেক্ষা বৈদিকযুগেই সর্বতোমুখী স্ত্রীশিক্ষার প্রমাণ ও সমধিক উন্নতি দৃষ্ট হয়। পরবর্তী ইতিহাসের কালে বিশেষ করে আধুনিক ইতিহাসের সময় বহু ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতের ইতিহাস খুঁজে দেখার প্রক্রিয়ায় ভারতীয় নারীর নানা চমৎকৃত কর্মকাণ্ডের খোঁজ পেলেও সেগুলি সতি ঘটেছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিবেচনা করার জায়গা তৈরি হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। অথর্ববেদ, ১১।৫।১৮।
- ২। ঋগ্বেদ, ১।১৩।৯।
- ৩। তৈব্রব।
- ৪। যমসূক্ত, ১০।১।
- ৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩।৬।, পৃ. ৭৫৯-৭৬০।
- ৬। তদেব, ৩।৮।, পৃ. ৭৬৭-৭৭১।
- ৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪।২৫।২৪।
- ৮। বেদের পরিচয়, পৃ. ২০২।
- ৯। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬।৪।১৭, পৃ. ৮৭৫।
- ১০। তৈব্রব।
- ১১। শতপথব্রাহ্মণ, ১২।৭।২।১।
- ১২। ঋগ্বেদ, ১০।১০২।২।
- ১৩। অশ্বিনসূক্ত, ১।১১৬।
- ১৪। ঋগ্বেদ, ৫।৬১।
- ১৫। তদেব, ৭।৭৮।৫।
- ১৬। তদেব, ৩।৩১।১।
- ১৭। অথর্ববেদ, ২।২৩।২৩।
- ১৮। তদেব, ৭।১।৬৪।
- ১৯। তদেব, ৭।৪৭।১।
- ২০। তদেব, ৭।৪৭।২।
- ২১। তদেব, ১৪।১।৬
- ২২। ঋগ্বেদ, ১০।১৮।৭।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

- উপনিষদ। সম্পা. অতুল চন্দ্র সেন ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র, কলকাতা- হরফ প্রকাশনী, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- গোপ, যুধিষ্ঠির। বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা - সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৩ (তৃতীয় সংস্করণ)।

- বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়*। কলকাতা- ফার্মা কে. এল. এম, প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (একাদশ মুদ্রণ)।
- *বেদ (১-৫)*। সম্পা. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা- হরফ প্রকাশনী, ১৩৫৮ (প্রথম প্রকাশ)।
- *বেদগ্রন্থমালা*। সম্পা. নীলাঞ্জনা সিকদারদত্ত ও পরশুরাম চক্রবর্তী। কলকাতা- রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ১৪২৩ (প্রথম প্রকাশ)।
- ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ*। কলকাতা- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৭ (চতুর্থ প্রকাশ)।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*। কলকাতা- আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯৪ (দ্বিতীয় প্রকাশ)।
-। *প্রাচীন অপ্রাচীন*। কলকাতা- কিশলয় প্রকাশন, ২০০৮ (তৃতীয় প্রকাশ)।
-। *প্রবন্ধসংগ্রহ-১*। কলকাতা- গাঙচিল, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ)।
-। *বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য*। কলকাতা- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ২০১১ (দ্বিতীয় প্রকাশ)।
-। *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*। কলকাতা- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫ (দ্বিতীয় প্রকাশ)।
- *Satapatha-Brāhmaṇa*. Ed. F. Max Muller. London : At The Clarendon Press, 1885 (First Edition)।

নানা অভিমুখে : কাজী নজরুল ইসলাম

দেবাশিস ঘোষ

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: বর্ধমানের চুরুলিয়ার অজ গ্রামে যে ধুমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল (১৮৯৯), পরবর্তীকালে তিনিই তো বিদ্রোহী কবি হয়ে উঠলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আমাদের চির চেনা মহাযুদ্ধের মুখ সৈনিক ; সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে এক মানবিক মুখ। মুজফ্ফর আহমেদের সাহচর্যে সাম্যবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন নজরুল। পরাধীনতার গ্লানি মোচনে ব্রিটিশ শাসকের কোপে দীর্ঘ সময় কারাবরণ করেন। কাজী নজরুল ইসলাম যেমন ছিলেন সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী সেই সঙ্গে ছিলেন বহু বর্ণময় এক মানুষ। বাংলা কবিতা, সঙ্গীতের জগতে যেমন তাঁর উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য অবস্থান তেমনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সূচক শব্দ: সম্প্রদায়, উত্তরাধিকার, ভেদাভেদ, স্বাধীনতা, সংকীর্ণতা, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, মানবিকতা।

মূল আলোচনা: হিন্দু, মুসলিম এবং পাশ্চাত্যের যেসব ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার বিভিন্ন সূত্রে আমাদের উপর বর্তেছে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিসম্ভারে তার সব কিছুই প্রতিফলন, লক্ষ করা যায়। শুধুই প্রতিফলন নয়, এই উত্তরাধিকারকে ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যমুখীনতা। স্বদেশের স্বাধীনতাই শুধু নজরুলের কাম্য ছিল না। তিনি যাবতীয় অন্ধতা, কুসংস্কার ও যুক্তিহীনতা থেকে ব্যক্তির বিবেক ও বিচারবুদ্ধির মুক্তি চেয়েছিলেন। সম্প্রদায় ইত্যাদির ভেদাভেদ সংকীর্ণতা থেকে মানুষের মুক্তি ছিল তাঁর কাম্য। আর তিনি চেয়েছিলেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নাগপাশ থেকে নারীর মুক্তি। সর্বোপরি তিনি স্বপ্ন দেখতেন শোষণ-নিপীড়নহীন, সুখী, সমৃদ্ধ এক মানবসমাজের। নজরুল বুঝেছিলেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে মানুষের মধ্যে পালাবদলের আকাঙ্ক্ষাটা জাগিয়ে তোলা জরুরী। ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন এই পালাবদলের আকাঙ্ক্ষাটা উজ্জীবিত করে তোলার জন্যেই।^১

নজরুলের জন্ম (২৪ মে, ১৮৯৯) বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামের এক অজপাড়াগাঁয়ে। যে পরিবারে তিনি জনগ্রহণ করেছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় রক্ষণশীলতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মভীরু এক মুসলিম পরিবারে প্রতিকূলতার কশাঘাত পদে পদে প্রতিভা বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল না।

২

কিংবদন্তী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন - “কাল বৈশাখীর ঝড় আসে, কিন্তু এক-একটা ঝড় আসে তার চিহ্ন পৃথিবী বহন করে শত বৎসর পর্যন্ত। আড়াইশো - তিনশো বছরের চিহ্ন আমি চোখে দেখেছি। স্বীকৃতি অস্বীকৃতির কোন প্রতীক্ষা না করেই ঝড় আসে এবং যেখানে আসন নেবার সেখানে পাঞ্জার ছাপ তা ঐকে দিয়ে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম সেই কালবৈশাখীর ঝড়। শুধু সাহিত্য - সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালীর সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে।”^২

নজরুল ইসলামের সমকাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্থিরতার যুগ। ব্রিটিশ শাসনকে মুখ বুঝে সহ্য না করে, মাথা তুলে প্রতিবাদ করার যুগ। তাই, নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের সঙ্গে যুগের একটা ঘনিষ্ঠ অঙ্গরূপ রয়েছে। যাকে বুঝতে গেলে খুব ছোট্ট করে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে এক ঝলক দেখে নিতে হবে। নজরুলের জন্মের (২৪ মে, ১৮৯৯) আগেই দেশের মাটিতে বিদ্রোহের ফুলকি দেখা দিয়েছিলো। সাঁততাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩), মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৫) - এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অন্যদিকে সর্বভারতীয় স্তরে ভারত সভা (Indian Association, 1873) ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ হওয়াতে জাতির অবদমিত স্বাধীনতার স্বর, একটি ক্ষণের সম্ভাবনা নিয়ে স্পন্দিত হতে শুরু করেছিল।^৭

৩

নজরুলের জন্মের পর থেকেই ইতিহাসের আবর্ত শ্রোত ক্রমশই উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে ক্ষিপ্ত হয়েছিলো দেশ। বঙ্গভঙ্গের অনুবর্তনেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদী আদর্শ। গড়ে ওঠে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল।

পরবর্তীকালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪), রাশিয়ার উত্থান (১৯১৭), জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯), খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) পর পর ঘটে। এহেন অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল নজরুল - মানস। মনে রাখতে হবে ১৯১৭-১৯২০ এই সময়টুকু তিনি কাটিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে। সৈনিক জীবন থেকে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন অপ্রতিগম্য সংগ্রামী মনোভাব, আত্মত্যাগের প্রেরণা এবং এক উদার বিশ্ববীক্ষা। ১৯২০ তে কলকাতায় ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় কমরেড মুজফফর আহমেদের। ওই সময় থেকেই পুরোমাত্রায় চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য চর্চা। কবির ব্যক্তিজীবন ও সমকালের রাজনৈতিক জীবন, এই দুই জীবনধারার মিথস্ক্রিয়তার ফসল হিসেবে আমরা নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাদর্শকে তুলে ধরতে পারি। নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ সম্পর্কে সবার আগে বলে নেওয়া দরকার, কোন বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ যেমন গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদিকে প্রথাগতভাবে সমর্থন করেননি নজরুল। যদিও তৎকালীন কংগ্রেস ও নবগঠিত কমিউনিস্ট দল উভয়ের সঙ্গেই তাঁর যোগসূত্র ছিল। নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের ভিতর নানা পরিবর্তন দেখা গেছে সুস্পষ্টভাবে তাঁর সাহিত্যে তা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।^৮

৪

নজরুলের মানসগঠন ছিল উচ্ছ্বাস প্রবণ, আবেগপ্রবণ, নির্ভীক; সর্বক্ষেত্রে যা অন্যায় বলে মনে করেন তার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত বিদ্রোহীর ভূমিকায় যোদ্ধার মতো তেজস্বী। এ জন্য সর্বদাই তিনি শাসিত ও শোষিতের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন সেখানে শোষক এবং শোষিত কোনো পক্ষেরই মতাদর্শগত নীতি এবং কর্মের নৈতিকতা তাঁকে খুব বেশি চিহ্নিত করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে তাঁর সু-চিন্তিত ভাবনার কিছুটা অভাব ছিল। তবে, কোন রকম ফাঁক ছিল না তাঁর বিদ্রোহীর মানসিকতায়। সেই বিদ্রোহ একদিকে যেমন সশস্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবকে সমর্থন না করে পারেনি; অন্যদিকে কখনও কখনও গান্ধীজির অস্ত্রহীন বিপ্লবের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছেন। সংস্কারের বিরুদ্ধে, যে কোন প্রকার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী - যদি সেই সংস্কার ও প্রথা সাধারণ মানুষের বিপক্ষে যায়। এই দিকে থেকে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রতিষ্ঠিত তাঁর

‘বিদ্রোহী’ অভিধা অ-যৌক্তিক মনে হয় না। তাঁর বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতা যেটি প্রথমে বিজলী (৬ জানুয়ারি ১৯২২), মোসলেম ভারত (কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) সেটিকে তাঁর হৃদয়ের বাণী বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে; পুঁজিবাদী শোষকের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত হতে হবে; শাস্ত্রীয় প্রথানুসারী প্রগতি বিরোধী-র বিরুদ্ধে ও সচেতন থাকতে হবে - এই ছিল তাঁর অন্তরের রাজনীতি।^৫

৫

“অগ্নিবীণা” কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ (১৯২২), এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা “বিদ্রোহী” - মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা, মানুষের আত্মার অসম্মানজনিত তীব্র ক্ষোভ কবির মনের একটি ভঙ্গিমাত্র নয়। মনুষ্যত্বের উন্মেষ না হলে দেশাত্মবোধ অর্থহীন এ কথা তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন। যখন তিনি বলেন -

“বল বীর
চির উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নতশির এ
শিখর হিমাদ্রির।”^৬

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্য গগনে স্বভাব - কবি নজরুলের স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত নানা অভিমুখে। নজরুল গীতি যেমন তাঁকে বরণ্য করে রেখেছে তেমনি নাটকে লেটো গানের দল গঠন, পত্রিকার সম্পাদক (লাঙল, ধুমকেতু), প্যান-ইসলামের সাধনা : ‘কামাল পাশা’, কামাল পত্নী ভাবনা চিন্তা, বিদ্রোহের স্বরূপ, আত্ম জাগরণের অগ্নিবীণী, রাজনৈতিক দর্শন - দেশাত্মবোধ, নবীন-পূজারী, প্রবর্তকের ঘুর চাকায় যৌবন - বন্দনা, নজরুলের প্রভাব ও উত্তরাধিকার : “নজরুলের কবিতার যে প্রচণ্ড জীবনাবেগের ও যৌবন ধর্মের পরিচয় মেলে তা পাশ্চাত্যের কবি জন ডান, রসেটি, সুইনবার্নের অনুসারী। আরবী ফারসী কবিদের প্রেমভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। শব্দ ব্যবহারে তিনি সর্বপ্রকার গুচিবায়ু বর্জন করেছিলেন এবং শব্দ প্রয়োগের মাদকতা পরবর্তীকালের কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল।”^৭

তথ্যসূত্র:

- ১। (সম্পাদনা) নাহার মীরাতুন, রক্তলেখায় নিমগ্ন নজরুল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ আবদুর রাউফ লিখিত (নজরুল : আধুনিক ‘ভারত তীর্থে’-র স্বপ্নদ্রষ্টা) থেকে গৃহীত। জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা - ৭০০০৭৩, আগস্ট ২০১৮, পৃ: ৭৪।
- ২। (সম্পাদক) : মন্ডল দয়াময়, ‘কাজী নজরুল ইসলাম ও সঞ্চিত্তা’, বামা পুস্তকালয়, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ: - ১।
- ৩। ইমলাম শেখ মকবুল, ‘নজরুল নানা মাত্রা’। উদার আকাশ প্রকাশনী, ঘটকপুকুর, ভাঙুর, দ. ২৪ পরগণা, বি - গোবিন্দপুর - ৭৪৩৫০২, পৃ: - ৯৯।
- ৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৯ - ১০০।
- ৫। সম্পাদনা : নাহার মীরাতুন, রক্ত লেখায় নিমগ্ন নজরুল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ কাজী নজরুল ইসলাম : রাজনৈতিক ভাবনা - সুমিতা চক্রবর্তীর লেখা থেকে গৃহীত। জিজ্ঞাসা, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৮, পৃ: - ৪৮।

১৯০। এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O) 

- ৬। (সম্পাদক) মন্ডল দয়াময়, কাজী নজরুল ইসলাম ও সন্ধিতা গ্রন্থে পরিমল গোস্বামী লিখিত দেশাত্মবোধ ও কবি নজরুল প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। বামা পুস্তকালয়, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, ২য় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৯, পৃঃ - ১৪।
- ৭। ড. মিশ্র অশোককুমার, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা’ (১৯০১-২০০৮)।’ দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রকাশ - ৪র্থ সং, এপ্রিল ২০১৭, পৃঃ - ৫৩।

ঔপনিবেশিক বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুত্থান ও প্রভু জগদবন্ধু

সোমাত্রী শীল

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক সময়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের সমালোচনার প্রত্যুত্তর ও প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু ধর্মের ভেতর থেকে বিভিন্ন ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল। যে সমালোচনায় হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাবাদ, বহুদেবতার অর্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের নৈতিকতা, গুরুবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হত এবং এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঔপনিবেশিক বঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন বা নব্য-বৈষ্ণব আন্দোলন বা নব্য-বেদান্ত আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে অন্যতম একটি ছিল ঔপনিবেশিক বঙ্গে নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন বা বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুত্থান। গবেষকরা দেখাচ্ছেন ঔপনিবেশিক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর নেতৃত্বে এই পুনরুত্থান ঘটেছিল। এই শিক্ষিত বর্গের আন্দোলনে ধর্মের অতিরিক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সময়কার বৈষ্ণব আন্দোলনকে আমরা সামগ্রিক ভাবেই কি পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে পর্যবেক্ষিত করতে পারি? কারণ এই কলকাতাকেন্দ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই মফঃস্বলে আরও অনেক বৈষ্ণব ধারা সক্রিয় ও প্রবাহমান ছিল, যে ধারায় ধর্মের অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক বিষয় উপস্থিত এবং তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত ছিল না। এসময়ের এরকমই একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব ব্যক্তিত্ব ছিলেন ফরিদপুরের (অধুনা বাংলাদেশ) প্রভু জগদবন্ধু (১৮৭১-১৯২১)। ততকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর বৈষ্ণব আন্দোলনকে কি কেবলমাত্র পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে পর্যবেক্ষিত করা যায়? নাকি ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও একজন বৈষ্ণব হিসাবে জগদবন্ধুর জীবন তথা বৈষ্ণব আন্দোলন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পারম্পরিক পথে পরিচালিত হয়েছে? ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে জগদবন্ধুর (১৮৭১-১৯২১) এই যে স্বতন্ত্র অবস্থান সেটাই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: ঔপনিবেশিক বঙ্গ, পাশ্চাত্য শিক্ষা, বৈষ্ণব পুনরুত্থান (neo-Vaishnavism)।

মূল আলোচনা: পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব বাংলায় ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলে। এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত নামে বেশী পরিচিত। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বাংলায় ছোট ছোট বৈষ্ণব সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায়ের ও নানা স্বতন্ত্র গৌণ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যেমন কর্তাভজা, বাউল, সাহেবদানী, খুশীবিশ্বাসী প্রভৃতি। এই উদ্ভবের অন্যতম কারণ চৈতন্যের তিরোধানের পর মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গবেষকদের মতে বঙ্গদেশে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল বৈষ্ণবদের জন্য অতি বিরূপ সময়। ঊনবিংশ শতকের ভদ্রলোকদের যুক্তিবাদী ধর্ম ও সংস্কারের যে মানদণ্ড তাঁর নিরীখে এসময় বৈষ্ণবধর্ম পুরোহিততন্ত্র, মূর্তিপূজা, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি নানা দিক থেকে পতনোন্মুখ অবস্থায় ছিল। গবেষক Varuni Bhatia র মতে এসময় বিভিন্ন তীর্থস্থান, মেলা মহোৎসব সাহিত্যগুলোর ক্ষেত্রেও একটা বিস্মৃতি ঘটেছিল বলে মনে করা হয় (Bhatia 2017)^১। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর শিশির কুমার ঘোষ, কেদারনাথ দত্ত

ভক্তিবিনোদ, দীনেশচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র পাল এঁদের হাত ধরে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। Bhatia র মতে এই বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিত্বদের হাত ধরে (Bhatia 2017)^২। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাচ্ছে, এই পুনরুত্থানের দুটো ধারা ছিল। একটা ধারা পাশ্চাত্য শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোক শ্রেণী কেন্দ্রিক আর একটি ধারা পরম্পরাগত যা মফস্বল গুলোতে বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রভু জগদবন্ধুর ক্ষেত্রে এই মফস্বলকেন্দ্রিক ধারাটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রভু জগদবন্ধু ১২৭৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের সীতানবমী তিথির (১৮৭১) ব্রহ্মমুহুর্তে মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন ও মাতা বামা দেবী। তাঁর পূর্বপুরুষদের বাস ছিল ফরিদপুরে। পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন চাকরীসূত্রে গঙ্গা তীরবর্তী মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়াতে বাস করতেন। সেখানেই প্রভু জগদবন্ধু জন্ম গ্রহণ করেন। দীননাথ ন্যায়রত্ন ন্যায় দর্শনের পন্ডিত ছিলেন এবং একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুনসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে জগদবন্ধু ডাহাপাড়া চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হন। মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর পিতার দেহবসান হলে জগদবন্ধু একটানা ৪ ঘন্টা ধরে একটি স্থির আসনে বসে অত্যন্ত সঠিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করেন (MacDaniel 1989: 70)^৩। ছোটবেলা থেকেই লাজুক প্রকৃতির ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিলেন, একাকী থাকতে ও একাকী হরিনাম করতে খুব পছন্দ করতেন। সমবয়সীদের নিয়ে ছোট কীর্তনের দলও তৈরী করেন সেখানে। খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী জগদবন্ধুর হাসি মুখ সবাইকে আকৃষ্ট করত। পরবর্তীকালে পদ্মা ভাঙনে তাঁর পরিবার ফরিদপুর শহর থেকে ৩ মাইল দূরে ব্রাহ্মনকন্দ গ্রামে বসতি স্থাপন করলে তিনিও সেখানে বাস করতে শুরু করেন সেখানে তাঁর বারো বছর বয়সে উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয় এবং এসময় থেকেই তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করতে থাকেন। একটা মাত্র চাদরে তাঁর শরীর আবৃত থাকত এবং স্বল্পভাষী স্বভাবের ছিলেন (MacDaniel 1989: 70)^৪। পরবর্তীতে পাবনাতে অবস্থানকালেই তিনি প্রথাগত লেখাপড়া ও বিদ্যালয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। তাঁর মতে পাঠ্যপুস্তক অবিদ্যায় পরিপূর্ণ। জীবনীকার নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন “অবিকল শ্রীগৌড়াস্বের মত জগদবন্ধুও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হরিকীর্তনে সমর্পন করেন। মহাসমুদ্রে চেউয়ের মত তাঁর মধ্যে ভাব ও মহাভাবের তরঙ্গ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হতে থাকে। কীর্তন দ্বারা তিনি এতটাই প্রভাবিত হতে থাকেন যে কোন বাড়ি বা রাস্তা বা অন্যকোন স্থান থেকে কীর্তনের শব্দ তাঁর কানে পৌঁছালেই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। সেসময় তিনি এক মুহূর্তও কীর্তন ছাড়া থাকতে পারতেন না” (Ghosh 1965: 8-9)^৫।

ঘোলা বছর বয়সে পাবনা স্কুলে পড়ার সময় সেখানকার ছাত্রদের তিনি ধর্মপথে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। নাম সংকীর্তন, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মপথে চালিত হন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কুঞ্জলাল দত্ত লিখেছেন “Prabhu did realise that owing to the influence of western education, the minds of our youth had become perverted and the study of western novels etc. was throwing them off the line of our sublime religion or Arya dharma which was in essence the Dharma or Rule of Devotion of love, as preached and practised by Lord Gouranga.” (Dutta 1999: 22)^৬। পাবনা ও ফরিদপুরের একটা খুব বড় সংখ্যক মানুষ বিশেষত ছাত্র সম্প্রদায় তাঁর অনুগামী হয়ে পড়েন। ফরিদপুরের বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী,

সুধন্য মিত্র, রাধিকা গুপ্ত তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সব জাতির ধনী-দরিদ্র, সৎ-অসৎ, বা হিন্দু-মুসলিম সবাই তাঁর ভক্ত ছিলেন। বেশ কিছু মুসলিম যেমন বাদাই ফকির, কুশল ফকির, মুসি আহমেদ তাঁর মুসলীম অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সাজ পোশাক কখনোই একজন গোঁড়া বৈষ্ণবের মত ছিল না। জীবনীকার ও ভক্ত পরিমল বন্ধু দাস লিখছেন “সাধারণ আউল, বাউলাদির মত বৈষ্ণব বেশভূষার পারিপাট্য বা ফটোতিলক প্রভৃতিও তিনি অঙ্গীকার করেন নাই। তবে কি তিনি বৈষ্ণব নন? আমাদের ধারণা ভক্ত বৈষ্ণবভাবই প্রভু জগদবন্ধুরূপে মূর্ত হইয়াছেন” (দাস ১৩৪৭: ৫৭)^৭। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য পাশ্চাত্য গবেষক Wilhem Halbfass এর *India and Europe* (1990) শীর্ষক গ্রন্থে Paul Hacker Traditionalism বা Neo- Hinduism প্রভৃতি পরিভাষাগুলির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সময়ের বিভিন্ন ধর্মান্দোলন গুলোকে পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে তুলে ধরার যে চেষ্টা করেছেন তা বিতর্কসাপেক্ষ। এই ধরনের বিশ্লেষণ এই আন্দোলন গুলোর প্রকৃত স্বরূপকে সীমাবদ্ধ করা হয়। জগদবন্ধুর আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তার চরিত্র সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বতন্ত্র।

বৃন্দাবনলীলা ও অন্তরীণ অবস্থা

১২৯৭ বঙ্গাব্দে তিনি বৃন্দাবন যান। সেখানে সংঘটিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা তাঁর ভক্তদের মধ্যে বৃন্দাবন লীলা নামে পরিচিত। এসময় তিনি বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি অর্থাৎ সেসমস্ত স্থান কৃষ্ণ লীলার প্রত্যক্ষভূমি সে সব স্থান পরিভ্রমণ করছেন (Dutta 1999: 24)^৮। বৈষ্ণব ঐতিহ্যে এই তীর্থ ভ্রমণের ইতিহাস আমরা দেখি চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকেই বিদ্যমান। ফরিদপুরের পথে পথে নগর কীর্তন সংঘটিত করা ৫০০ বছর আগেকার গৌরোঙ্গের কীর্তন আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্যমান। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে তিনি টানা প্রায় ১৭ বছর (১৯০২-১৯১৮) একটি ছোট্ট কুটারে নিজেই অন্তরীণ করে রাখেন ও মৌন অবস্থা গ্রহণ করেন। এই সময়কালে একবার টানা বারো দিন তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করেননি। এতে ভক্তরা অতি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের বারংবার অনুরোধে বারো দিন পর সামান্য মাত্র খাবার খেয়েছিলেন। প্রথমদিকে কাগজ লিখে কিছু কথোপকথন করতেন কিন্তু ধীরে ধীরে সে সমস্তও বন্ধ হয়ে যায়। ভক্তদের মতে এই অন্তরীণকালীন সময়েই জগদবন্ধুর দৈব ক্ষমতা তাঁর ভক্তদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে (Ghosh 1965: 65)^৯। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর জগদবন্ধুর জীবনাবসান ঘটে।

ধর্মতত্ত্ব

জগদবন্ধুর মতে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার দুই অবস্থাতেই সত্য এবং এটা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। তিনি স্বইচ্ছায় যোগমায়ার সাহায্যে তাঁরই সৃষ্ট ধরায় গৌরবময় লীলা সম্পাদন করতে অবতীর্ণ হন। শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই গুলোর যে কোন একটির মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে। সৃষ্টির সবচেয়ে উচ্চস্থানে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে কখনোই জাগতিক বিষয়বস্তু ও জাগতিক মন দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আন্তরিক প্রেম, স্বার্থবিহীন ইচ্ছা কখনোই কৃষ্ণাভের বাধা হয় না। তাঁকে বৈষয়িক জগতে নামিয়ে আনা যায় না কিন্তু আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তীতা, গভীর ভক্তি, এবং অবশ্যই তাঁর নামগানের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। তিনি মায়াতীত ও এই জাগতিক বিষয়ের উর্দ্ধে। জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই জগত থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কেবলমাত্র এই জগতে তাঁর পবিত্র নামের মধ্যে তিনি বিরাজ করেন। তাঁর নাম গানের মাধ্যমে আমরা এই মায়ার শিকল ছিন্ন করে তাঁর

ধামে পৌঁছতে পারি। সময়, স্থান, কার্য দ্বারা তাঁকে বাঁধা যায় না। তিনি চিরস্থায়ী কৃপা ও প্রেমের অন্তহীন সমৃদ্ধ। তিনি নিজেকে কেবল কীর্তনের মধ্যেই দর্শন করতে পারেন (Ghosh ১৯২২:৮৪-৮৫)^{১০}। জগদবন্ধুর ধর্মদর্শন বা তত্ত্বের মূল বিষয় চৈতন্যমহাপ্রভুর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সেসময়ের প্রখ্যাত বৈষ্ণব শিশির কুমার ঘোষকে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন ‘এটা প্রলয়ের সময়। এখন প্রয়োজন হরিনামের। হরিনাম গান ও টহল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নির্দেশমত শিশির কুমার খোল করতাল সহযোগে টহল বা নগর কীর্তন শুরু করেছিলেন’ (Dutta 1999: 41)^{১১}।

জগদবন্ধু দীক্ষা প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে দীক্ষা দানের মাধ্যমে তা বংশানুক্রমিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তদের তিনি ধর্মবিষয়ক জ্ঞান দান করেছেন। একটি প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে—“এই সময় প্রভুবন্ধু শিতিকঠকে রাগানুরাগী সাধন ভজন প্রণালী ও জপতত্ত্ব একটি খাতায় লিখিয়া দিয়া যান” (রাহা ২০২২: ৯৯)^{১২}। কলিযুগে জগতকে রক্ষার ও জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায় হরিনাম। তাঁর অনুগামীদের মতে তিনি রাধাভাবের সমস্ত স্তর অনুভব করেছেন। পরবর্তীতে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রাধাভাব অতিক্রম করে শিশুভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জগদবন্ধুর ধর্মতত্ত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এক ব্রহ্মচর্য পালন দুই হরিনাম। তাঁর সম্প্রদায়ের (মহানাম সম্প্রদায়) ভক্তরা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন গৃহী ভক্ত আর আর একপ্রকার যাঁরা ব্রহ্মচারী হিসাবে জীবন যাপন করতেন। আর একটা প্রচার মাধ্যম ছিল ত্যাগী সন্ন্যাসীরা মহানাম প্রচারের জন্য দূর-দূরান্তে কীর্তন ও বক্তৃতা করতে বের হতেন কয়েক বছরের জন্য। নবদ্বীপের হরিসভা মন্দির ও ফরিদপুর আশ্রম দুই স্থানই জগদবন্ধুর লীলাক্ষেত্র ছিল।

প্রচারমাধ্যম

ঔপনিবেশিক কলকাতার বৈষ্ণবরা বৈষ্ণব মত প্রচারের জন্য বিভিন্ন মাসিক, সাপ্তাহিক পাক্ষিক প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত প্রচার শুরু করেছিলেন। ঔপনিবেশিক সময়ে এগুলোর মাধ্যমে বৈষ্ণবরা একটি সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়ের একটি সুসংগঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে তোলার যে প্রবণতা তা কিন্তু প্রভু জগদবন্ধুর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মহানাম সম্প্রদায় নামক প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে প্রভুজগদবন্ধুর জনৈক শিষ্য মহেন্দ্রনাথজী স্থাপন করেন। প্রভু জগদবন্ধুর প্রচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল কীর্তন। আর একটা প্রচার মাধ্যম ছিল তাঁর ত্যাগী সন্ন্যাসীগণ। এঁরা কয়েক বছরের জন্য মহানাম প্রচারের জন্য দূর-দূরান্তে কীর্তন ও বক্তৃতা করতে বের হতেন। রাজর্ষি বনমালী রায় নামে জনৈক ভক্ত (তৎকালীন পাবনা জেলার একজন বড় জমিদার ছিলেন) জগদবন্ধুর উৎসাহে কলকাতায় দেবকীনন্দন প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন, যেখান থেকে বিভিন্ন অপ্রকাশিত বৈষ্ণব সাহিত্যকে ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় (Dutta 1999: 22)^{১৩}। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সময়কার মূদ্রন প্রযুক্তিকে ব্যবহারের একটি চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যদিও এই প্রচার মাধ্যমটি ছিল ঔপনিবেশিক কিন্তু ব্যবহারের পশ্চাতে মূখ্যত ধর্মীয় উদ্দেশ্য কার্যকারী ছিল। এর সঙ্গে কোন জাতীয়তাবাদী বা রাজনৈতিক ভাবধারা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফরিদপুর আশ্রম থেকে আঙ্গিনা নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রতিকা প্রকাশিত হত। যার বিষয়বস্তু ছিল প্রভু জগদবন্ধু সম্পর্কিত। জগদবন্ধু নিজে নাম সংকীর্তন, পদাবলী কীর্তন, শ্রীমতী সংকীর্তন, বিবিধ সংগীত, হরি কথা প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট মানের কীর্তন রচনা করেন যেগুলো পরবর্তী কালে পুস্তকাকারে মূদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দাস লিখছেন জগদবন্ধু অতি সহজ

সরল ভাষায় ও ছন্দে নিতাই, গৌড়ান্দ ও রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা পূর্বক যে কীর্তন গানগুলি রচনা করেছিলেন এবং সেগুলো যাতে গ্রামে গ্রামে সংকীর্তিত হয় সে ব্যবস্থাও করেছিলেন (দাস ১৩৪৭;৬০,৬১)^{১৪}। পারম্পরিক কীর্তন তাঁর ধর্মপ্রচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। এবং সাধারণ হতদরিদ্র মানুষদের বৈষ্ণব ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় দান করতে তিনি বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন।

জাতিভেদ ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে মানবিক অবস্থান

প্রভু জগদবন্ধুকে একজন পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত বৈষ্ণব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁর প্রথাগত শিক্ষা খুব সামান্যই এবং তিনি কখনোই সেভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসেননি। অথচ তাঁর ধর্ম আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই মানবতাবাদ ও জাত পাত বিরোধিতা। এবং তিনি একজন স্মার্ত ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের জীবনে এই জাতপাত বিরোধিতার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। পাবনায় অবস্থানকালে হারান ক্ষাপা নামক এক দরবেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরী হয়। পাবনা শহরের মানুষের কাছে তিনি একজন সাধু বা বাউল রূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বেশভূষা অতি হতদরিদ্র ছিল। তিনি নিজের জাত অস্বীকার করতেন এবং নিজেকে একসঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয় পরিচয়ে পরিচিত করতেন। জগদবন্ধু প্রকাশ্যে এই ব্যক্তিকে স্পর্শ করতেন। জগদবন্ধুর মতে এই ক্ষাপা বাউল আসলে ‘বুড়ো শিব’ যে নিত্য সিদ্ধ ও প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যলীলার অদ্বৈতাচার্য (Mac Daniel 1989: 71)^{১৫}।

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের স্বভূঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বা প্রবনতা অনুযায়ী মানুষের বর্ণ নির্ণয়ের যে মানদণ্ড জগদবন্ধু সম্ভবত সেই পথেরই অনুসারী ছিলেন। স্মার্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি সমস্ত রকম বাহ্যিক সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে প্রভু তাঁর এক পরিকর গোপাল মিত্র কে বলছেন “হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা একটা জঞ্জালবিশেষ। পৃথিবীতে জাতি একটাই, সে জাতির নাম মানবজাতি। এর দুই ভাগ। যাহারা হরিভক্তিপরায়ন তাহারা মহাজাতি যাহারা হরিভক্তিবহীন তাহারা অপজাতিভূক্ত” (রাহা ২০২২: ৫৯)^{১৬}। সেকারনেই তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কোন জাতিপ্রথা নেই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ডোম যাই হোক না কেন তাঁদের যে কেউ ইষ্টের জন্য ভোগ রান্না করতে পারেন এবং সেই প্রসাদ সকল বর্ণের মানুষ এক পংক্তিতে বসে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণকান্দার চক্রবর্তী বাড়ি শ্রীক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল। প্রফেসর কুঞ্জলাল দত্ত লিখছেন “Prabhu thought of a new plan for village reconstruction through the help of these followers. He began to preach Kirtan and thus brought all of them on a common platform in order to ameliorate their distress and elevate their moral and spiritual state. ...Thus, he inspired them and also others, to live up to his ideal leading a pious and happy life.” (Dutta 1999: 28)^{১৭}।

মোহান্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি

প্রখ্যাত গবেষক রমাকান্ত চক্রবর্তী ঔপনিবেশিক সময়কার বৈষ্ণব ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য সমাজকল্যানমূলক কার্যাবলী চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কিছু বৈষ্ণব; এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রভু জগদবন্ধু। এসময় ভারতীয়দের মধ্যে নিজের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে এক বিস্মৃতি আবার অন্যদিকে সমাজের তথা কথিত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা যথেষ্ট

ধর্মাস্তকরণ প্রচেষ্টা তাঁকে সচেতন করে তোলে। সেসময় ফরিদপুরে শহরের উপকণ্ঠে কয়েকশত বাগদী বাস করত যাদের কোল ভিল সাঁওতাল অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল নীল চাষের জন্য। কৃত্রিম উপায়ে নীলচাষ শুরু হলে এঁরা কর্মহীন হয়ে পড়ে ও সমাজে অপাত্কেয়ে হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে। তাদের দারিদ্রতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খৃষ্টান পাদ্রীরা তাদের ধর্মাস্তরিত করার চেষ্টা করে। প্রভু জগদবন্ধুর কৃপাদৃষ্টি এদের উপর পড়ে তিনি এদের কণ্ঠে তুলসীর মালা দিয়ে ‘বাগদী’ পদবী স্থলে ‘মোহান্ত’ সম্প্রদায় উপাধিতে ভূষিত করেন। যোগ্যতা অনুসারে অনেককে মৃদঙ্গ-করতালাদি প্রদান করেন (Chakravarty 1985: 398-99, রাহা ২০২২: xxiv)^{১৮}।

সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত মানুষ ও প্রভু জগদবন্ধু

ফরিদপুর আশ্রমে তিনি একটি কুটীরে বাস করতেন ও খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন কারণ যাতে তাঁর দরিদ্র ভক্তরা তাঁর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। জগদবন্ধু তাঁদের প্রকৃতই বন্ধু এই আত্মবিশ্বাস যেন তাঁদের গড়ে ওঠে। তিনি ভালমত জানতেন যে এই সমস্ত দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষদেরই তাঁদের অসহায় অবস্থায় সবচেয়ে বেশী দৈব সহায়তা প্রয়োজন ও এঁদের মধ্যেই ভক্তিভাব জাগরণ সম্ভব। এঁরাই তারা যারা জগদবন্ধুর একবার মাত্র আহ্বানে আনন্দের সঙ্গে হরিনাম করবে ও একটি ভক্তিভাব আবিষ্ট জীবন যাপন করবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল দরিদ্রকে আধ্যাত্মিক সম্পদে ধনী করে তোলা ও বঞ্চিতকে সম্মানের তকমা দান করা। যারা সামাজিক অবস্থানে ঘৃণিত কিন্তু তাঁর নিয়মে সুসংগতিপূর্ণ তাঁরা জগদবন্ধুর প্রিয় ছিল। ধনীর বিলাসিতাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। ভক্তদের মতে তাঁর আবির্ভাবের কারণ সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বরের কৃপা ব্যাপ্ত করতে এবং জগতের সমস্যার সমাধান করতে তিনি অন্তরীণ অবস্থা গ্রহণ করেন (Ghosh 1965: 63)^{১৯}।

উপসংহার:

ঔপনিবেশিক সময়কার বৈষ্ণব আন্দোলন তথা বৈষ্ণব ব্যক্তিত্বদের আমরা কোন একটিমাত্র সীমাবদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। বৈষ্ণব আন্দোলন তথা বৈষ্ণব ব্যক্তিত্বগণ উভয়ক্ষেত্রেই বহুমুখী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এরকমই একজন বৈষ্ণব ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রভু জগদবন্ধু। তাঁর বেড়ে ওঠা, ধর্মজীবন ইত্যাদি বিষয়গুলো একেবারেই কলকাতাকেন্দ্রিক নয়। তাঁর আন্দোলনও ছিল মফঃস্বল কেন্দ্রিক বৈষ্ণব আন্দোলন। সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী পথে তাঁর ধর্মীয় জীবন ও কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছিল। জগদবন্ধুর এই সমস্ত ধর্মীয় কার্যাবলী তাঁকে একজন প্রকৃত বৈষ্ণব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মীয় সত্য লাভই যেখানে মূল উদ্দেশ্য। তাঁর যে ধর্ম আন্দোলন, ধর্মপ্রচার ও ধর্মতত্ত্ব তা কিন্তু প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি যে তথাকথিত ঔপনিবেশিক সমালোচনা তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে গড়ে ওঠেনি। প্রভু জগদবন্ধুর অবস্থান কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল। তাঁর ধর্মীয় জীবন বা আন্দোলন কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত বা পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চালিত হয়নি। বরং চৈতন্য আন্দোলনের মূল উপাদানগুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে বৈষ্ণব ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় দান, কীর্তনের উপর গুরুত্বপ্রদান বিশেষত তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উদ্ধারে যত্নশীল হওয়া। ঈশ্বরলাভের আড়ম্বরবিহীন সরল পদ্ধতি। তাঁর দ্বারা গৃহীত ধর্মীয় ও সামাজিক উদারতার বাতবরণ মূলত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

- ১। Bhatia, B. 2017. *Unforgetting Chaitanya*. United State Of America. Oxford University Press.
- ২। Bhatia, 2017
- ৩। MacDaniel, J. 1989. *The Madness of The Saints*. Chicago and London: The University of Chicago Press. Pp 70
- ৪। MacDaniel, 1989: 70
- ৫। Ghosh. N. C. 1965. *Life and Teachings of Sri Sri Prabhu Jagadbandhu*. Calcutta. Mahauddharan Granthalaya. pp 8-9
- ৬। Dutta, K. L. 1999. *Prabhu Jagadbandhu*. Sri Mahanambrata cultural and welfare trust Mahanam Angan. Pp 22
- ৭। দাস, প.ব. ১৩৪৭. প্রভু জগদবন্ধু. কলকাতা. শ্রী শ্রী জগদবন্ধু হরি লীলামৃত কার্যালয়. পৃ. ৫৭
- ৮। Dutta, 1999:24
- ৯। Ghosh 1965:65
- ১০। Ghosh 1965:84-85
- ১১। Dutta, 1999:41
- ১২। রাহা, অ.২০২২. শ্রী শ্রী প্রভুজগদবন্ধু পরিকর. কলকাতা. মহাউদ্ধারন মঠ. পৃ ৯৯.
- ১৩। Dutta, 1999:22
- ১৪। দাস ১৩৪৭: ৬০,৬১
- ১৫। MacDaniel, 1989:71
- ১৬। রাহা ২০২২:৫৯
- ১৭। Dutta 1999:28
- ১৮। Chakravarty 1985:398-99, রাহা ১৪২৯:xxiv
- ১৯। Ghosh 1965:63।

গান্ধীজির অহিংস নীতি : একটি পর্যালোচনা

অঞ্জু রাহা
ম্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অহিংসা যেকোনো প্রকার সদগুণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সদগুণ বিশেষ। অহিংসা নামক গুণটির নৈতিক ভিত্তি হলো সহনশক্তি ও ভালোবাসা। ভারতীয় দার্শনিক প্রেক্ষাপটে ‘অহিংসা তত্ত্ব’-টি একাধারে বৌদ্ধ, জৈন, যোগ প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায় দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ভাগবত গীতার বিষয়বস্তু অধ্যয়নের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যায় একজন নিক্রাম কর্মমার্গী তথা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির জীবনে অহিংসা ব্রত পালন অবশ্যইভাবে প্রয়োজনীয়। সমকালীন সময়ে বিবিধ দার্শনিক চিন্তাবলম্বি ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। যিনি তথা কথিত প্রথাসিদ্ধ ‘অহিংসা’ ধারণাটির কোনরূপ পরিবর্তন সাধন না করে, তাকে স্বীকার করেন এবং তার একটি বর্ধিত রূপরেখা চিত্রিত করেন। জীবনের চরম লক্ষ্য সত্যতে পৌঁছানোর পন্থা অহিংসা নীতিতত্ত্বে আশ্রিত। অহিংসা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট আলোচনাটিতে আমরা প্রথমেই অহিংসা বলতে সাধারণত কি বুঝি ও পরবর্তীতে একে একে বৌদ্ধ, জৈন, যোগ, গীতার প্রভৃতি আলোচনায় অহিংসা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাই নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এবং পরবর্তীতে গান্ধীজি বর্ণিত অহিংসা তত্ত্বের সংবর্ধিত অংশে আলোকপাত করব যা আমাদের বিষয় গুলির মধ্যে তুলনা মূলক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানলাভে সহায়তা করবে। সর্বশেষে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ‘গান্ধীজির অহিংসানীতি’-র প্রয়োগিকতার দিকটিতে আলোকপাত করে লেখাটি সমাপ্ত করব।

সূচক শব্দ: গান্ধীজি, অহিংসা, সত্য, ঈশ্বর, বৌদ্ধ দর্শন: অহিংসা, জৈন দর্শন: অহিংসা, যোগ দর্শন: অহিংসা, সদর্থক অহিংসা, নেতিবাচক অহিংসা, ভালোবাসা।

মূল আলোচনা: ‘অহিংসা’ শব্দটির অর্থ হিংসা না করা। অর্থাৎ হিংসা নামক গুণটির বিপরীত অবস্থা। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় পরম্পরায় অহিংসা মানবতার উচ্চতম আদর্শ হিসেবে প্রকাশমান। তাই অহিংসাকে নৈতিক তথা মহৎ আদর্শ বললে ভুল হয় না। অহিংস পথমার্গী বহু ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম চির-অবিস্মরণীয় ব্যক্তি হলেন মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীজি অহিংসাকে কেবল মানবীয় গুণাবলীতে সীমাবদ্ধ না করে বরং নৈতিক নিয়মে রূপায়িত করে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন স্তরে। আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ভিত্তি হলো অহিংস জীবন যাপন।

গান্ধীজির মতে অহিংসা বলতে সাধারণত বোঝায় হিংসা না করা; অসতর্ক বা অমনোযোগী হয়েও যেকোনো প্রকার হিংসাত্মক কর্ম করা থেকে বিরত থাকা। তবে প্রশ্ন হলো আমার অহিংস আচরণ কেনো করব? অহিংসা কেবল মানব ধর্ম বলে? এর উত্তর স্বরূপ বলা যায়, গান্ধীজির তাঁর সমগ্র জীবন ‘সত্য’ তে সমর্পিত করেছেন। তাঁর কাছে সত্য হলো ঈশ্বর আর ঈশ্বরই হলো সত্য। মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি, সত্য প্রাপ্তি। ‘সত্যই হলো ঈশ্বর’ উক্তির মাধ্যমে তিনি আন্তিক ও নাস্তিক উভয় ব্যক্তিকেই আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। পরম উদ্দেশ্য সত্যকে পাওয়ার মার্গই হলো অহিংস জীবনযাপন, একমাত্র অহিংসা নীতি



মানুষকে জীবনে সত্যানুসন্ধানী করে তোলে। গান্ধীজির মতে সত্য যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে অহিংসা হলো সেই উদ্দেশ্য লাভের পন্থা। সত্য ও অহিংসা হলো একই কয়েনের এপিঠ ওপিঠ, একে অপরের পরিপূরক যাদের আলাদা করা অসম্ভব। অহিংসা নীতি পালন আমাদের জীবনের চরম নৈতিক কতব্য।

গান্ধীজির অহিংসা নীতি তত্ত্বটি জৈন দর্শন, বৌদ্ধদর্শন, যোগ দর্শন, ভগবদগীতা দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। আলোচ্য দর্শন সম্প্রদায় গুলিতে অহিংসা নীতি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে সংক্ষেপাকারে জেনে নেওয়া যাক, -

জৈনমতে অহিংসা: মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ জৈন দর্শনে 'ত্রিরত্ন' এর অর্থ সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যক চরিত্রের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আত্মার বন্ধনের কারণকে সমূলে উচ্ছেদ করার হেতু ব্যক্তি যে ধরনের কর্মের অনুশীলন করে; ইন্দ্রিয় ভোগ নিবৃত্তি, কামনা বাসনা পরিত্যাগ, বাক্যের সংযতকরণ যেকোনো প্রকার গর্হিত কর্ম থেকে নিবৃত্তি হলো সম্যক চরিত্র। এই সম্যক চরিত্র লাভের হেতু জৈন দর্শনে পঞ্চমহাব্রত (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ) পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্রতই হলো অহিংসা। জৈন মতে অহিংসা কেবল প্রাণ হত্যা থেকে বিরত থাকা নয় বরং কায়-মন-বাক্যে যেকোনো প্রকার হিংসাত্মক কর্ম হতে বিরত থাকা। কায় অর্থাৎ শারীরিক ভাবে হিংসা না করা, কাউকে দৈহিক ভাবে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা। মন অর্থাৎ মানসিক ভাবে চিন্তনে মননে কারোর প্রতি হিংসাত্মক ভাবনা থেকে বিরত থাকা এবং যেকোনো প্রকার কুচিন্তা থেকে দূরে থাকাকে বোঝায়। বাক্যে অর্থাৎ কথপোকথনের দ্বারাও কটু বাক্য উচ্চারণ না করা ও মিথ্যা ভাষণ তথা অপ্রিয় সত্যকথা বলা থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়।

বৌদ্ধ মতে অহিংসা: বৌদ্ধ মতে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হলো নির্বাণ লাভ; দুঃখের হাত থেকে আত্মস্তিক নিবৃত্তি লাভ। এবং এর পাশাপাশি মানব জীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘটানো। জীবনকে শান্ত ও সমৃদ্ধ বানানোর হেতু বৌদ্ধ ধর্মে চারটি গুণের অবতারণা করা হয়েছে যাদের একত্রে বলা হয় ব্রহ্মবিহার। গুণগুলি হলো -

মৈত্রী: কোনো রকম ভেদাভেদ ছাড়াই সকল জীবের প্রতি দয়া মায়া প্রেম ভালোবাসা পোষণ করা।

করুণা: দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করা।

মুদিতা: ঈর্ষা ও বিদ্বেষকে ত্যাগ করে সফল ব্যক্তির আনন্দে আনন্দিত হওয়া।

উপেক্ষা: রাগ বিদ্বেষ পরিহার পূর্বক প্রত্যেকের প্রতি সমতার মনোভাব বজায় রাখা।

মানসিক শান্তির হেতু উল্লেখিত ব্রহ্মবিহারের ধারণাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে অহিংসা নীতি পালন ব্যতিরেকে উক্ত গুণ চতুষ্টয়ের ধারণ বা পালন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মে অহিংসা নীতির উল্লেখ সরাসরি না পেলেও এটা বলা ভুল হবে না তার ভিত্তি অহিংসা ব্রত পালনের উপর নির্ভরশীল।

যোগদর্শনে অহিংসা: যোগদর্শনে বলা হয় মানব জীবনের পরম লক্ষ্য কৈবল্যপ্রাপ্তি। এই কৈবল্যপ্রাপ্তির হেতু নির্দেশিত অষ্ট যোগগঙ্গের প্রথম অঙ্গ হলো 'যম'। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ- এই পাঁচটি কর্মের অনুশীলনকে একত্রে বলা হয় যম। যোগ মতে অহিংসা বলতে বোঝায় কায়িক বাচিক মানসিক যেকোনো প্রকার হিংসা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। এর ফলে চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল হয় এবং জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও গান্ধীজির অহিংস নীতিটি গীতায় বর্ণিত অনাসক্ত ও নিষ্কামকর্ম দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। এবং বলা যায় গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার প্রাপ্তি জীবনে অহিংস নীতির অনুশীলন কেই নির্দেশ করে।

বিবিধ দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন গান্ধীজির অহিংস নীতি তত্ত্বে পরিস্ফুট হলেও, অহিংসা সম্পর্কিত জৈনদের দার্শনিক চিন্তাধারা দ্বারা গান্ধীজি সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত হন। গান্ধীজি বর্ণিত অহিংসা নীতিটি চলে আসা প্রথা সিদ্ধ অহিংসার ধারনার বহির্ভূত নয়, তথাপি গান্ধীজির অহিংস নীতির বিশেষ কিছু দৃষ্টিকোণ তাকে অন্যান্য অহিংসনীতির ধারণা থেকে যেমন পৃথক করে তেমনি আমাদের পাঠকদের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করে। তাঁর দর্শনে অহিংস নীতিটি সদর্থক ও নেতিবাচক দুই অর্থই বহন করে। সদর্থক অর্থে অহিংস তত্ত্বটি তাঁর দর্শনে অত্যন্ত মৌলিক যা আবশ্যিকভাবে পালনীয়। অপরদিকে অহিংসনীতির অন্তঃসারকে তুলে ধরেছে অহিংস নীতির নেতিবাচক বর্ণনা। আমরা প্রথমে অহিংসার নেতিবাচক ও পরবর্তীতে ইতিবাচক দিকটিতে আলোকপাত করব।

নেতিবাচক অর্থে অহিংসা: নেতিবাচক অর্থে অহিংসা বলতে বোঝায় হিংসাত্মক কর্ম হতে বিরতি। যেমন হত্যা না করা অথবা অপরকে আঘাত না করা। গান্ধীজির মতানুসারে অহিংসা কেবল হত্যাহীনতাই নয়; ক্রোধবশত বা স্বার্থযুক্ত হয়ে কায়-মন-বাক্যে অপরকে যেকোনো প্রকার আঘাত করা থেকে বিরত থাকা। জৈন অহিংসনীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরও গান্ধীজি এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে দৈনন্দিন জীবনে সম্পূর্ণ কঠোর ভাবে অহিংসনীতি পালন করা অসম্ভব। আমাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অহিংসা-কে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। যেমন রোজকার খাদ্য গ্রহণের সময়, হাঁটাচলা, কথাবলা এমনকি শ্বাসক্রিয়ার সময়ও আমরা অজান্তেই অথবা জেনে বুঝেই বহু প্রাণ হত্যার কারণ হয়ে যাই। তাই গান্ধীজি পরিস্থিতি বিশেষে হত্যাকে কখন কখন প্রাসঙ্গিক বলে মতপ্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর একটি উক্তি এই মতকে দৃঢ়ভাবে সম্মতি জানায়; - “Taking life may be a duty. We do destroy as much life as we think necessary for sustaining our body. Thus for food we take life, vegetables and other for health we destroy mosquitoes and the like by the use of disinfectants etc. and we do not think that we are guilty of irreligion in doing so.....for that benefit of the species we kill carnivorous beasts even man- slaughter may be necessary in certain cases.”^১

বিষয়টি আরো ভালো ভাবে পরিষ্কার হয় গান্ধীজির দেওয়া উদাহরণটি যদি বোঝা যায়; -

ধরায়াক কোনো এক উন্মাদ ব্যক্তি হাতে একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছুটে চলেছে এবং তার সামনে যেই আসুক না কেন তাকে সেই ব্যক্তি হত্যা করছে। কোনোভাবেই ব্যক্তিটিকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি যদি ঐ উন্মাদ ব্যক্তিটিকে হত্যা করতে সমর্থ হয়, তবে এক্ষেত্রে হত্যা নামক কর্মের জন্য সমাজ ব্যক্তিটিকে তিরস্কার করার বদলে তাকে একজন সাহসী ব্যক্তি রূপে সংজ্ঞায়িত করবে, ও প্রশংসনীয় কর্মের জন্য তাকে পুরস্কৃত করবে। সুতরাং লক্ষ্য করার বিষয় হলো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যদি কোনো প্রকার প্রতিকার সম্ভব না হয়, তবে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাণবধ কে গান্ধীজি সদগুণের আওতা ভুক্ত করেছেন। অতএব হত্যা করা বা আঘাত করা তখনই হিংসামূলক



আচরণ বলে গণ্য হবে যদি তা কেবল এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, রাগ, ঘৃণা, অহং ইত্যাদি মন্দগুণাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এইভাবেই গান্ধীজি নেতিবাচক অহিংসা বলতে যেকোনো প্রকার হত্যা ও আঘাত করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝিয়েছেন যা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য পালনীয়। প্রসঙ্গত মনে হতে পারে গান্ধীজির অহিংসনীতিটি পুরোটাই নেতিবাচক। তবে গান্ধীজির চিন্তায় অহিংসার সদর্থক দিকটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় যা অত্যন্ত মৌলিক এবং প্রাসঙ্গিক বটে।

সদর্থক অর্থে অহিংসা: অহিংসা সম্পর্কিত ইতিবাচক দৃষ্টি তাঁর দর্শনে অনন্য মাত্র যোগ করেছে। তাঁর দর্শনে সদর্থক অর্থে অহিংসা হলো প্রেম ও ভালোবাসা নামক সদগুণ। ভালোবাসা যা একত্বের বোধকে জন্ম দেয়। ভালোবাসার অনুভূতিতে ক্রোধ ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষাপরায়ণতা প্রভৃতির কোনো জায়গা নেই এগুলো প্রেমের পথে অন্তরায়। অহিংসা ভালোবাসার একটি সদর্থক গুণ। সদর্থক অর্থে অহিংসা ব্রত কেবল ভালো ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করে এমন নয় বরং আমঙ্গলকারী ব্যক্তিরও মঙ্গল কামনা করে। সহজ ভাষায় আমি যদি অহিংস পথমমার্গী ব্যক্তি হই তবে হিংসাত্মক কর্মহতে বিরত হলেই হবে না আমায় আমার শত্রুকেও ভালবাসতে হবে। তাঁর মতে ধৈর্য্য পূর্বক যখন আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা হবে, তার প্রতি অহিংস আচরণ করা হবে, হয়তো কোনো এক সময় উক্ত ব্যক্তি নিজ অন্যায সম্পর্কে অবগত হবে এবং অন্যায করা থেকে বিরত হবে।

অহিংসা সম্পর্কিত এরূপ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হতে মনে হতে পারে, এই নীতি অন্যাযকে প্রশয় দেয়, কাপুরুষতা ও ভীৰুতাকে সমর্থন করে। তবে এই ভাবনা ঠিক নয়, গান্ধীজি হিংসাকে কখনোই প্রশয় দেননি। তিনি অন্যাযকারীর অন্যাযকে প্রতিরোধ এবং প্রয়োজনে অন্যাযকারীকে আঘাত করেও তাকে অন্যায করা থেকে বিরত করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যাযকারীর এরূপ মঙ্গল সাধন তখনই সম্ভব যখন আমি নিজেই ভালোবাসার সদগুণের আওতায় আনতে সক্ষম হবো। এর জন্য প্রয়োজন অতিমাত্রায় ধৈর্যের অনুশীলন এবং অপরের প্রতি প্রেম, দয়ায়, মায়া প্রভৃতির মনোভাব পোষণ। সুতরাং বলা যায় গান্ধীজির দর্শনে সদর্থক অর্থে অহিংসার বৈশিষ্ট্য হলো সক্রিয়তা। সক্রিয়ভাবে অন্যের প্রতি বিশেষ করে অন্যাযকারীর ব্যক্তির প্রতি সদভাব পোষণ করা। তাঁর মতে অহিংসা হলো চারিত্রিক দৃঢ়তা, যার দ্বারা যেকোনো প্রকার বাহ্যিক তথা দৈহিক হিংসার ওপর জয়লাভ করা সম্ভব। সুতরাং সদর্থক অর্থে অহিংসাকে কখনোই ভীৰুতা বলা ঠিক হবে না। অহিংসা ব্রত পালন দুর্বল ব্যক্তির কর্ম নয়, এ হলো সবল, সাহসী ও ধৈর্য্যবান ব্যক্তির সাধ্যকর্ম। গান্ধীর মতে একজন হিংসাত্মক ব্যক্তির পক্ষে অহিংস হয়ে ওঠা সম্ভব হলেও কখনোই একজন কাপুরুষের দ্বারা অহিংস ব্রত পালন সম্ভব নয়। অহিংসা হলো নির্ভয়তা। সুতরাং গান্ধীজির কাছে সদর্থক অহিংসা হলো প্রেম, ভীতিশূন্যতা, করুণা, আত্মত্যাগ, ক্লিষ্টসাধন।

গান্ধীজির মতে অহিংসা নীতি পালনের জন্য কোনো প্রকার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়না, এর জন্য দরকার আন্তরিক শুদ্ধতা ও সঠিক অভিপ্রায়। এই অহিংসনীতি সার্বিকভাবে পালনীয় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এমনকি রাষ্ট্র তথা সামাজিকভাবে পালনীয় নীতি হলো অহিংসা। একমাত্র ঈশ্বর বা সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই ব্যক্তিকে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমব্যথী করে তোলে এবং অহিংসনীতি অনুশীলনে আগ্রহী করে তোলে। মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য সত্য প্রাপ্তি আর এর জন্য প্রয়োজন অহিংস জীবন যাপন। তাই বলা যায় সত্য যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তাকে লাভ করার উপায় হলো অহিংসা। গান্ধীজি বর্ণিত ইতিবাচক

অহিংসা মানুষকে মানবিকতার গুণে গুণান্বিত করে। ‘সকল মানুষ সমান’- এরূপ নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে, যা জীবনকে সহজ করে তোলে ও চेतনাকে সাহসিকতা, নির্ভিকতায়, মানবাদর্শে পূর্ণ করে।

মূল্যায়ন: অনেকেই সমালোচনা পূর্বক গান্ধীজির আহিংসনীতিটিকে নেহাতই একটি ভ্রান্ত ধারণা বলে উল্লেখ করতে পারে দৈনন্দিন জীবনে যার উপযোগিতা নেহাতই নগণ্য। উপরন্তু অনেকেই নীতিটিকে সরাসরি ভীৰুতা, কাপুরুষতা সাথে যুক্ত করে ফেলে। তবে এই ধারণা অত্যন্তই মূল্যহীন। অহিংসনীতির সঠিক মূল্যায়ন হতে জানা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রভৃতি প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ভারতীয়রা যে সময় ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসী, দুর্বল, অভুক্ত, দরিদ্র, অসহায় সেই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার পরিবর্তে ব্রিটিশ বিরোধী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পন্থা ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গান্ধীজির ‘অহিংসা’ নীতিতত্ত্ব, এ কথা নিঃসন্দ্বিগ্ন ভাবে বলা যায়।

দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে বলা চলে দৈনন্দিন জীবনে অহিংস নীতির প্রয়োগ অত্যন্ত উচ্চমানের নৈতিক অনুশীলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তিগত জীবনে অহিংস ব্রতের উপাসনা আমাদের মধ্যে সততা, ভালোবাসা, স্বথহীনতা, আত্মত্যাগ, ধৈর্য প্রভৃতি সদগুণাবলির উত্তরণ ঘটায়। জৈবিকতা থেকে মানবিকতার পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণাদায়ী ও সাহায্যকারী মার্গ হলো অহিংসার অনুশীলন। এই নীতি কেবল সঠিক উদ্দেশ্যকে বেছে নেওয়াই নয় বরং ঐ উদ্দেশ্য পৌঁছানোর জন্য সঠিক পথ ‘অহিংসা’ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরামর্শ দেয়। যা একটি সুস্থ স্বাভাবিক, দুর্নীতিহীন জীবনযাপনে সহায়তা করে।

সমাজে ঘটে যাওয়া চরম অপরাধমূলক ঘটনা গুলিও গান্ধীজির অহিংসনীতি অনুশীলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে অসমর্থ। কারণ তাঁর এই নীতি সুস্পষ্ট ধারণা দেয় যে- অপরাধীর অপরাধকে সহ্য করার পরিবর্তে তাকে আঘাত করেও সেই অপরাধ মূলক কাজ থেকে তাকে বিরত রাখাই হলো আসল অহিংসা ব্রত পালন। অহিংসা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করে প্রতিকার ও উপায়ের উপর। এবং যেকোনো সঠিক কর্ম এবং ওই কর্মের জন্য সঠিক উপায় বেছে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন সঠিক উপায় যা কেবল সত্যের সাধনা ও অহিংসার উপাসনার দ্বারাই লব্ধ।

আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের তাগিদে প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত জনগণ। সমাজ তথা রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি একে অপরের পরিপূরক। একজন ব্যক্তি ও তাদের প্রয়োজন, সুরক্ষা, অভিপ্রায় ইত্যাদি সকল কিছু নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ ও একাধিক সমাজ নিয়ে তৈরি হয় রাষ্ট্র। অহিংসা নীতির অনুশীলন ব্যক্তিকে আদর্শবান ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী করে তোলে। এরূপ একাধিক আদর্শবান ব্যক্তি একটি আদর্শ নৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি ভূমি প্রস্তুত করে দেয়।

বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তা ধারা এবং চরম বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগেও আজও মানুষ শান্তি ও মুক্তির খোঁজে আধ্যাত্মিক পথমগ্ন। এই আধ্যাত্মিক পথকে সুগম করে তোলে অহিংস জীবনযাপন। বালোকাবস্থা থেকে অহিংস নীতির সঠিক অনুশীলন ব্যক্তিকে নৈতিক দায়িত্ববান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে।

বর্তমানে গান্ধীজির ‘অহিংসনীতি’ কেবল মাত্র পাঠ্য পুস্তকে তত্ত্ব হিসাবই সর্বাধিক স্থান পেয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগিকতার অভাবই মানুষের হতাশা ও সমাজের চরম অবনতির অন্যতম কারণ। গান্ধীজি বর্ণিত এই অহিংসনীতির ব্যবহারিকতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক

ও মৌলিক। আমাদের ক্ষুদ্র মনসংকীর্ণতা ও যথার্থ বোধের অভাব ‘অহিংসনীতির’ বৃহত্তর অভিপ্রায় অনুসন্ধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। তাই গান্ধীজির অহিংসা ব্রতকে কোনো কাল্পনিক বা অপ্রাসঙ্গিক তত্ত্বের তকমা না দিয়ে ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগিকতাকে প্রাধান্য দেওয়াই বুদ্ধিমানতার পরিচয়কে বহন করে। একশো শতাংশ নাহলেও এই নীতির সর্বোচ্চ প্রয়োগ জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করতে ও প্রেমপূর্ণ, হতাশামুক্ত জীবনানুসন্ধানে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।

তথ্যসূত্র:

১। Lal, Basant Kumar, 2017, Contemporary Indian Philosophy, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Privet Limited, p.109.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, জানুয়ারি ২০১২, ভারতীয় দর্শন প্রমাণ ও প্রমেয়, কলকাতা, বিজয় পাবলিকেশন হাউস।
২. Lal, Basant Kumar, 2017, Contemporary Indian Philosophy, Delhi, Motilal Banarsidass publishers private limited.
৩. ঘোষ, পীযুষকান্তি, ২০১৭-১৮, সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন, কলকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স।
৪. ঘোষ, গোবিন্দ চরণ, ২০২০, সমকালীন ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

অনালোকিত নারীসত্তার ব্যতিক্রমী উদ্ভাসন প্রসঙ্গ ‘কবির বউঠান’

উপন্যাস

রেজাউল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ

সারসংক্ষেপ: বহু চর্চিত ঠাকুরবাড়ির কাদম্বরী দেবীকে ঘিরে কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত রহস্যের মোড়কে পরিবেশিত ঘটনাক্রমকে সামনে রেখে মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘কবির বউঠান’ উপন্যাস আদতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকেই আলোকিত করে। বই-মালিনীর ছদ্মবেশে মল্লিকা ঠাকুরবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে খুঁজে পেয়েছেন তৎকালীন সমাজের কিছু অমূল্য রতনকে। অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যে চলা ঠাকুর পরিবারের নারীরা নারীচেতনা জাগরণের ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করে সেই সঙ্কেতবিন্দুটিই যেন এই উপন্যাসের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়। মানবীচেতনার নবনির্মাণের কালে জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কাদম্বরী দেবীর পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির সারদা দেবী ও অন্যান্য নারীদের মনন-মানসিকতাকে অপূর্ব শৈল্পিক কায়দায় পরিবেশিত হতে দেখি। সমকালীন কলকাতার জনজীবনে পুরুষতান্ত্রিক বাতাবরণের পাশাপাশি পুরুষ আধিপত্যবাদী লেখক-কবিদের পাশাপাশি বটতলার আড্ডায় প্রতিফলিত প্রবাহমান জীবনের যাপন রহস্যের সন্ধান মেলে এই উপন্যাসে। সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ আগত দর্শনার্থীদের প্রভাবিত করতে না পারলেও তীর কিন্তু প্রতিটি ঢেউয়ের অভিঘাত স্মরণে রাখে। ঠিক সেরকমই ‘কবির বউঠান’ উপন্যাস—ঠাকুরবাড়ির নামী-বেনামী নারী-মহলের ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনাকেও মর্যাদার সঙ্গে মল্লিকা তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই সব অনালোচিত নারীদের মৌলিক চিন্তা-চেতনাকে নারীচেতনার আলোকে উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: মানবীচেতনা, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, জোড়াসাঁকো, অন্দরমহল, নারীপ্রগতি, নবজাগরণ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, মক্ষীরানী, লিঙ্গবৈষম্য।

মূল আলোচনা: মল্লিকা সেনগুপ্তের তৃতীয় এবং শেষ উপন্যাস ‘কবির বউঠান’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। ২৯২ পাতার বিশালাকার গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেন সৌরীশ মিত্র। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে ‘রোগশয্যার বন্ধুদের’। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ঠাকুর বাড়ির বহু চর্চিত কাদম্বরীর রহস্যমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে অনালোকিত নারীদের মনন মানসিকতার নিখুঁত চিত্র গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। সারদা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী, মৃণালিনী, স্বর্ণকুমারী দেবীসহ ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে অখ্যাত অনেক মহিলা চরিত্রের কথপোকথান, মানসিকতাকে মল্লিকা সুচারুভাবে গবেষণালব্ধ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সমকালীন যুগ-মানসের প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছ দর্পনের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। সময়ের প্রবাহমানতায় ক্রমশ বদলে যাওয়া ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অন্দরমহলের সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে সম্ভ্রান্ত বাঙালী নারীর জাগরণের প্রাথমিক ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যাবে। জ্ঞানদানন্দিনী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর নারীচেতনাবাদী মননবিশ্বের পাশাপাশি বই-মালিনী ও রূপকুমারীর স্বতন্ত্র ভাবনাবিশ্বের নিখুঁত ভেদরেখাও এই উপন্যাসে আমরা

দেখি। পৃথক পৃথক উনিশটি শিরোনাম (১. জ্ঞানদানন্দিনী, ২. সারদা সুন্দরীর সংসার, ৩. কাদম্বরীর প্রবেশ, ৪. বিরহিণী পত্রলেখা, ৫. স্বর্ণকুমারীর বোম্বাইবাস, ৬. সারদার মৃত্যু, ৭. হেকেটি ঠাকুরন, ৮. বটতলা বনাম ভারতী পত্রিকা, ৯. দীপনির্বাণ, ১০. আনাবাই নলিনী, ১১. বসন্ত বিলাপ, ১২. জ্ঞানদানন্দিনীর বিলেতবাস, ১৩. বই-মালনী, ১৪. লুসি ও বিনোদিনী, ১৫. শ্রীমতী হে, ১৬. বিনোদিনী, ১৭. মৃণালিনী, ১৮. তারকার আত্মহত্যা এবং ১৯. বিজয়িনী)-এ বিন্যস্ত কাহিনীর ধারাবাহিক অগগতিতে আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারি নারীচেতনার বিভিন্ন স্তরকে। সমকালীন নারীর সমাজতাত্ত্বিক অবস্থান প্রসঙ্গে মল্লিকা উপন্যাসের সূচনাতেই চমকে দিয়েছেন। মূলবিষয়ের নান্দীমুখ হিসেবে সূচনাংশটি এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—

“সন ১৮৬৬। ঠাকুরবাড়ীর দেউড়ির সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে নেমে এল বিলিতি জুতো, মোজা পরা সুললিত একটি পা, পরে আর-একটি। ...প্রকাশ্য আঙিনায় চাকর-বেহারাদের চোখের সামনে মেজোবউ জ্ঞানদানন্দিনীর এই অকুণ্ঠ অলঙ্কারবিভাবে জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলে সেদিন যেন ভূমিকম্প ঘটে গেল।”^৮

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জোড়াসাঁকোর রক্ষণশীল ঠাকুর পরিবারের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনীর এরূপ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রেক্ষাপটে নারীচেতনা জাগরণের প্রাথমিক পর্বের সূচনা করে। নারীপ্রগতি বিষয়ে অতিসক্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্বামী হিসেবে পেয়ে জ্ঞানদানন্দিনী সমস্ত পারিবারিক প্রতিকূলতাকে অনায়াসে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপন্যাসের নিবিড়পাঠে জানতে পারি ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলে সদা সতর্ক পুরুষতান্ত্রিক প্রহরী ছিলেন সারদা দেবী। নারীকে ‘আদর্শ-নারী’ করে গড়ে তোলা (‘শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি তৈরী’)-র সুদক্ষ কারিগর সারদা দেবী পরম মমতা ও সেবার দ্বারা গোটা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেও অন্তঃপুরের নারীদের অবাধ বিচরণে (শারীরিক কিংবা মানসিক) তার অবস্থান ছিল কঠোর। যশোরের পাড়াগাঁয়ের মাত্র ছ’বছর বয়সী সারদা আমৃত্যু স্বামীর দেখানো আদর্শেই নিজেকে নির্মাণ করেছেন। অসূর্যম্পশ্যা সারদা দেবীর স্বামীসোহাগিনির নমুনাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—

“১৮৪০ থেকে পরবর্তী তেইশ বছরে নয় ছেলে ও ছয় মেয়ের জন্ম দিয়েছেন সারদা, তাঁদের মধ্যে বেঁচে আছেন মাত্র দশজন। দ্বিজেন্দ্রের জন্ম দু’বছর পরে সত্যেন এল, তার দু’বছর পরে হেমেন, একবছর দশমাসের মাথায় বীরেন, আরও দু’বছর পরে কন্যা সৌদামিনী, স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। সৌমেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরেও জন্মেছিল বুধেন্দ্র, কিন্তু সেও শৈশবে মারা যায়।”^৯

স্বামীর সেবায় উৎসর্গীকৃত এবং স্বামীর গর্বে গরবিনী সারদা দেবী প্রকারান্তরে সম্ভাবন উৎপাদনের যন্ত্রের সমতুল্য। হঠাৎ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌত্তলিকতা ছেড়ে ব্রহ্মধর্মে চলে গেলে সারদা তাঁর চিরাচরিত বিশ্বাস-সংস্কারকে যেমন নির্বিধায় জলাঞ্জলি দিতে পারেননি তেমনি স্বামীর ধর্মকেও অস্বীকার করতে পারেননি। আত্মিক সংকটের দোলাচলতায় সারদা দেবীকে স্বীকার করতে দেখি—

“...আমি বোম্বো উপাসনার বেদিতে বসেও নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করি আবার কন্টার ধর্মোক্তাও শুনি। আকবরের হারেমে বসে যোধাবাই যেমন শিবপূজা করতেন।”^{১০}

আমরা জানি ঐতিহ্য-সংস্কারের অসীম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেই প্রথাভাঙার প্রথম গান শোনা যায়—জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই প্রথম ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলের নারীদের কাছে বহির্বিশ্বের দুয়ার উন্মুক্ত করেছিলেন। বই-মালিনীর স্পষ্ট উক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

“ওঃ মেজোবউঠান তুমি আজ যে কাণ্ড করে দেখালে, ইতিহাস হয়ে গেল গো।

বাঙালি মেয়েরা একশো বছর পরেও তোমায় ধন্য ধন্য করবে।”^৪

সত্যিই তাই, আজ দেড়শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বাঙালি মেয়েরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

ইউরোপের নবজাগরণের ছোঁয়ায় তথা পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার অভিঘাতে এদেশে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিষয়ে বঙ্গদেশের বিদ্বদজনেরা যখন দ্বিধা বিভক্ত তখন ঠাকুরবাড়ির এহেন উত্তাল চিত্র সমকালীন পুরুষতান্ত্রিক মননে বিষফোঁড়া হিসেবে দেখা দেয়। বটতলার সাহিত্যরসিকের পাতে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যঙ্গনের পাশাপাশি নারী-সমাজেও প্রকট হয়ে ওঠে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। ‘সরমা ও সুশীলার কথোপকথন’ শিরোনামাঙ্কিত বামাবোধিনীর লেখায় ফুটে ওঠে নারী-মানসিকতার দ্বৈত মননবিশ্ব। সমকালীন প্রেক্ষাপটে নারীচেতনা জাগরণে আসন্ন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রতিনিধি স্বরূপ মল্লিকা জ্ঞানদানন্দিনীকে অতিক্রম করে আরো বেশি ফোকাস করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী-ব্যক্তিত্বের ওপরে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা উপন্যাসিকের দাবীদার তিনি। তাঁর স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আসন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আমরা দেখি যখন বই-মালিনীকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হয় তাঁর দৃঢ় কণ্ঠস্বর—

“...আবার তুই বামাবোধিনীর গা জ্বালানো লেখাগুলো এনেছিস! বলেছি না ও-সব স্বামীর প্রতি উপদেশমার্কা লেখা আনবি না, হাজার বছর ধরে ও-সব শুনে শুনে কান পচে গেছে। যেন মনে হয় মেয়েদের শিক্ষা দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য সুমাতা, সুভার্যা, সুগৃহিনী তৈরি করা। ও-সব আর শুনে চাই না।”^৫

ঠাকুরবাড়ির ব্যতিক্রমী কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে চালিত অন্তঃপুরিকাদের সুগৃহিনীপনার পাঠশালায় কখনও উপস্থিত থাকতেন না। বরং তিনি নিরলস সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে স্বপ্ন দেখতেন আসন্ন ভবিষ্যতে নারী জাগরণের সূর্যোদয়। পারিবারিক পরম্পরাকে তোয়াক্কা না করেই পনের বছর বয়সী স্বর্ণকুমারী তাঁর জ্যোতিদাদার সাথে পুরুষদের কবিতাপাঠের আসরে একমাত্র নারী হয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। সেই সময়ে কলকাতার তরুণ কাব্যপ্রেমী মহলে হইচই পড়ে যায়। পাশ্চাত্যে নারী মারি উলস্টোনক্রাফট যখন ‘ভিত্তিকেশন অফ দি রাইটস অফ উইমেন’-এর মতো আলোড়নকারী গ্রন্থ লিখছেন তখন এদেশে চিরাচরিত একপেশে পুরুষতান্ত্রিক বাতেলাবাজীর বিরুদ্ধে স্বর্ণকুমারী দেবীর অভিব্যক্তি বাংলার নারী জাগরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মননে ও সৃজনে জ্ঞানদানন্দিনী থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। মাতৃত্ব বিষয়ে বাঙালী নারীর দ্বিমুখী ভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

“স্বর্ণের মতে মাতৃত্ব একটি অনিবার্য জৈবিক ঘটনা, তা নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে মেয়েদের লেখাপড়া করা সম্ভব না। জ্ঞানদা কিন্তু মনে করেন মেয়েদের প্রগতির পথে মাতৃত্ব কোনও বাঁধা হবে না, বরং যে সন্তানদের তিনি স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে এনেছেন, অগ্রগতির পথে তাঁদের পেছনে ফেলে নয়, বরং সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে।”^৬

আধুনিক বাংলাদেশের নারীচেতনা জাগরণের ইতিহাসে ১৯৭৬ খ্রী. ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস ‘দীপনির্বাণ’ প্রকাশিত হয় এবং সেই বছরই নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী লিখেন দীর্ঘ প্রণয়কাব্য এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী রাসসুন্দরী দেবীর ‘আমার জীবন’। সমকালীন বহুকৌণিক বিরূপ সমালোচনাকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য-আঙ্গিকের এই ত্রিবেণী সঙ্গম বাঙালি নারীর বন্দীদশার মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতী পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা সম্পাদকের শিরোপা অর্জন করেন। নারী-প্রগতি বিষয়ে তাঁর মনশীলতার পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যখন বলেন—

“আমি মনে করি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নয়, আমাদের স্ত্রীস্বাধীনতা আসবে সম্মতির পথে। হঠাৎ করে ঘোমটা খুলে সমাজকে আঘাত দিলেই স্ত্রীস্বাধীনতা স্বর্গ থেকে খসে পড়বে না।”^৭

সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর অমত থাকা সত্ত্বেও সময়ের অগ্রগতিতে ২৩ আষাঢ়ের শুভলগ্নে ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলে জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউ হয়ে আসেন কাদম্বরী দেবী মাত্র ন’বছর বয়সে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল মাতঙ্গিনী। ঠাকুরবাড়ির সামান্য কর্মীচারী শ্যাম গাঙ্গুলীর সেজোমেয়ে কাদম্বরী আদতে শহর কলকাতার মেয়ে। মেধা ও অসাধারণ নারী-ব্যক্তিত্বের অধিকারী কাদম্বরী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুর বাড়ির সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেও নিজস্ব মননশীল পরিসর নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলে তিনি পাকাপাকিভাবে নারীচেতনার উপযুক্ত বীজতলা তৈরির সুপরিকল্পিত বন্দোবস্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে কাদম্বরীর অনুকরণকারী শিষ্যা রূপা ওরফে রূপকুমারী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের খেলার সাথী প্রায় সমবয়সী নতুন বউঠান একাধারে বালক কবির কাব্যলক্ষ্মী এবং প্রথম সৃজনশীল পাঠক। ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যচর্চাক্ষেত্রে অন্দরমহলের মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে কাদম্বরীর অবদান সর্বাত্মে উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে কাদম্বরীদেবীর অবস্থান প্রসঙ্গে মল্লিকার বলেছেন—

“মেজবউঠান বোম্বাই থাকায় জ্যোতিও এখন স্ত্রীর প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী ও নির্ভরশীল। দুই তেজি নারীর অনুপস্থিতিতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরে নতুন তারকার মতো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন কাদম্বরী। আর রবি সেই ঘরে সর্বক্ষণের অতিথি। জ্যোতি আর কাদম্বরীর উৎসাহে এখন বাড়িতে অন্দরমহলের পর্দা যেন উঠে গেছে।”^৮

শুধু তাই নয় বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা ‘ভারতী’কে কেন্দ্র করে সেই সময়ের বিখ্যাত কবি বিহারীলাল, কবি অক্ষয়চন্দ্রদের প্রায়ই দেখা যেত সন্ধ্যায় জ্যোতিদের ছাদের উপরের ঘরে এবং সেই সাহিত্যবাসরের আড্ডায় কাদম্বরী দেবী ছিলেন মক্ষীরানী। অপছন্দের কেউ যখন এসে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়ে বসে তখনই গুরু হয় ব্যক্তি-অস্তিত্বের সংকট। কাদম্বরীর উত্থানে জ্ঞানদানন্দিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মিক-সংকট প্রকট রূপ ধারণ করে। মল্লিকা তাঁর মননশীল বয়ানে জ্ঞানদার মনের আঁতের কথাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন—

“সেদিন সবাই জড়ো হলেন বিহারীলালের কবিতা শুনতে। এত নামী কবি, এত লালিত্যময় কবিতা, সত্যেন আর জ্ঞানদার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা প্রবাসে অনেকদিন উপোসি থাকার পর কবিকণ্ঠে কবিতা শোনার এমন সুযোগ পেয়েছেন।

কিন্তু জ্ঞানদা লক্ষ করছেন কবি বিহারীলাল যেন নির্দিষ্ট একজনের উদ্দেশ্যেই সব কবিতা পড়ছেন, পড়তে পড়তে বারে বারে শুধু কাদম্বরীর মনোযোগ চাইছেন। আর কাদম্বরীও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কবিতা শুনছেন। ...জ্ঞানদা কিছুদিন ছিলেন না, তার মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অন্তঃপুরের পর্দা উঠে গেছে। কাদম্বরী ঘোমটা খুলে ফেলে হয়ে উঠেছে সাহিত্যবাসরের মক্ষীরানি। ...কাদম্বরী বুঝতে পারেন মেজোজা প্রখর দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করছেন। মনে মনে মজা পান তিনি। ...জ্ঞানদা ভাবেন, দাঁড়াও নতুনবউ, দুটো কাব্য পড়তে শিখেছ বলে মুড়িমিছরি এক করে পাল্লা দিতে চাইছ আমার সঙ্গে।”^{১০}

এখানে উপন্যাসিকের দুটো বার্তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট—এক, কাদম্বরীর অসাধারণ নারী-বক্তিত্ব এবং দুই, জ্ঞানদার ঔদ্ধত্যপূর্ণ মিথ্যে অহমিকাবোধ। তবে মল্লিকা সেনগুপ্ত ‘কবির বউঠান’ উপন্যাসে প্রধানভাবে উন্মোচন করতে চেয়েছেন ঠাকুরবাড়ির সেই ব্যক্তিত্বময়ী কাদম্বরীর অকাল মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন। ঠাকুরবাড়ির প্রধান প্রধান চরিত্র ও অন্দরমহলের অনেক অনেক মহিলা চরিত্রের কথাবার্তা, আচার-আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাদম্বরী দেবীর একটু একটু করে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক কাহিনীর মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে নারীর প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিক অবস্থান।

একজন পঁচিশ বছরের মেধাবী, সুন্দরী, সাহিত্যের সমঝদার এবং সর্বোপরি বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণাদাত্রী এবং ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাবান-রূপবান যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। মল্লিকার ‘কবির বউঠান’ প্রকাশের ঠিক একবছর পড়ে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট’ (প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১২ এবং ৬১তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬) প্রকাশিত হয়। রঞ্জন বাবু যেখানে কাদম্বরীর জবানবন্দি স্বরূপ একটি বিশালাকার চিঠিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর সম্পর্কে লোক-মুখে প্রচলিত গোপন এবং তথাকথিত সামাজিকতার বিচারে আশোভন সম্পর্কের রসায়নে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন সেখানে মল্লিকা ঠাকুরবাড়ির রুচিশীল সাংস্কৃতিক বাতাবরণে কাদম্বরীর নারী-মনস্তত্ত্ব ও নারী-মননের সংকটের যোগসূত্রকে চিহ্নিত করার বিশ্বাসযোগ্য কাহিনীসূত্র নির্মাণ করেছেন। ‘রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী দেবীর প্রেম : কতটা জল্পনা আর কতটা সত্যি?’ শিরোনামে প্রকাশিত অতীক ভট্টাচার্য যাবতীয় কুৎসার যোগ্য জবাব দিয়েছেন—

“রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর বউদির প্রতি আসক্ত হওয়া অসম্ভব মোটেই নয়, কিন্তু সম্ভব এবং সম্ভাবিতের পার্থক্যটুকু মনে রাখা জরুরি। উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সেই পার্থক্য যতদিন না ঘুচছে, ততদিন কল্পনাকে জল্পনার স্তরে অবনমিত করে রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্ক নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়, কিন্তু এটাও ভাবা জরুরি যে, রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি যুবকের চিরন্তন বউদি-প্রীতির এপিটোম বানিয়ে, তাঁকে স্ক্যান্ডালের নায়ক সাজিয়ে একালের বাঙালি বই-পড়ুয়াদের কাছে কোন রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিচ্ছেন এই স্ক্যান্ডাল রচয়িতারা? রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এখনও এতটা মৃত নন যে, স্ক্যান্ডালের যঞ্জে ঘি ঢেলে তাঁর জীবনের পাবলিকভোগ্য এডিশন প্রকাশ করতে হবে।”^{১১}

কিন্তু মল্লিকা ঠাকুরবাড়ির ব্যক্তিত্বময়ী নারী কাদম্বরীর সমাজতাত্ত্বিক অবস্থান নির্ণয়ের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিসংকটের মর্মমূলে প্রবেশ করে অনুসন্ধান করেছেন জীবন-জটিলতার বহুকৌণিক সংকেতবিন্দু। দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রের নির্ভরযোগ্য সহচরী কাদম্বরীকে

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দেওয়া যায়। ‘ভারতী’র চূড়ান্ত উত্থানে কাদম্বরীর নাম স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে আজও। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জনের লালসায় অন্ধ জ্ঞানদানন্দিনীর মিথ্যে অহমিকাবোধ কীভাবে প্রতিমুহুর্তে নিঃসন্তান কাদম্বরীকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল তাঁরই জটিল নারীমনস্তত্ত্ব মল্লিকা তাঁর ‘কবির বউঠান’ উপন্যাসে উন্মোচন করেছেন। ছলে বলে কৌশলে জ্ঞানদা তাঁর প্রিয় জ্যোতিকে কাদম্বরীর কাছ থেকে আলাদা করতে সক্রিয় থেকেছেন। উপন্যাসিকের নিখুঁত বয়ানে ফুটে উঠেছে জ্ঞানদার আত্মিক সংকট ও প্রতিশোধ-পরায়ণ জালিকা বিন্যাস—

“জ্ঞানদার বাড়িই হয়ে উঠল রবি-জ্যোতির ঘরোয়া আড্ডার নতুন ঠিকানা। ভারতীর মিটিং থেকে পিয়ানো বাজিয়ে গান রচনার আসর—সবকিছুই এখন এই বাড়িতে। এখানেই জরো হন অক্ষয়, প্রিয়নাথ, বিহারীলালের মতো বন্ধুজন। এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ। ...কখনও কখনও সৌদামিনী বা বর্ণকুমারীও এসে হাজির হন। বাদ শুধু একজন, সদর স্ট্রিটের বাড়ির নতুনবউ। জ্ঞানদার বাড়িতে তাঁর আমন্ত্রণ থেকে না। জ্ঞানদা নিজেই এ-সব গানবাজনা কবিতার আসরের মধ্যমণি হয়ে থাকতে ভালোবাসেন, সেখানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীনীকে তিনি ডেকে আনতে চান না।”^{১১}

জ্ঞানদানন্দিনী বিলক্ষণ জানতেন ‘রবির প্রেরণা কাদম্বরী, কাদম্বরী জ্যোতির জন্য উতলা, জ্যোতি বিনোদিনীর জন্য’। জ্ঞানদা তাঁর নিজস্ব পরিসর পুনরুদ্ধারে বারে বারে কাদম্বরীকে নিষ্ক্ষেপ করেছেন একাকীত্বের অন্ধকারে। জ্ঞানদার পরোক্ষ ইচ্ছনে জ্যোতির বিনোদিনীমুখি হওয়া, নিঃসন্তান কাদম্বরীর হেফাজতে থেকেও অসাবধানতার জন্য উর্মিলার মৃত্যু এবং জ্ঞানদার ব্যক্তি-ইগোর ত্রিবেণী সমন্বয় কাদম্বরীর আত্মহননের পথ প্রশস্ত করে। একদিকে জ্যোতি যখন বিনোদিনী নামক নিষিদ্ধ-উন্মোচক ফলের মদিরায় মাতোয়ারা অন্যদিকে তখন কাদম্বরীর মানসিক অবস্থার নিখুঁত চিত্র মল্লিকার কলমে এভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—

“কাদম্বরী তখন এ ঘর-ও ঘর ছটফট করছেন নিঃসঙ্গ যৌবনের ভারে। তাঁর এই অতুল রূপরাশি আর কোনও পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টির প্রশংসা কুড়োবে না। পোষা হরিণশিশুর মতো পায়ে পায়ে ঘোরে না কোনও রবি, কাব্যপাঠ করতে করতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন না কোনও বিহারীলাল, কোনও অক্ষয় চৌধুরী তাঁর চোখে চোখ রেখে গান গেয়ে ওঠেন না, তাঁর আসঙ্গকামনায় থরথর করে ওঠেন না কোনও প্রেমাতুর স্বামী। কোনও শিশু তাঁর স্তন্যসুধার জন্য মুখ বাড়ায় না। কী করবেন তিনি এই ভরায়ৌবন নিয়ে?”^{১২}

বিরাট পৃথিবীর সার্বিকক্ষেত্রে বেঁচে থাকার অর্থহীনতা, স্বামীর বিরাট কর্মযজ্ঞে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হওয়া এবং সর্বোপরি স্বামীর জোকার পকেট থেকে ‘সরোজিনী’ নামাঙ্কিত বিনোদিনীর চিঠি কাদম্বরীর মাথায় বজ্রাঘাত হানে। বিনোদিনীর গর্ভে জ্যোতির সন্তান আসার সংবাদ কাদম্বরীর সন্তানহীনতার যাবতীয় দায় নিজের কাঁধে বর্তায়। তবুও আত্মসচেতন কাদম্বরী অস্তিত্ব রক্ষার চরম সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন –

“শেষ বাজিটা তাঁকে জিততেই হবে, ডাকিনী যোগিনীদের হাত থেকে জ্যোতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে নিজের হৃদয়ে। বাঁজা তো কী হয়েছে, নারীত্বের আকর্ষণ তো শেষ হয়ে যায়নি!”^{১৩}

১৯ এপ্রিল, ১৮৮৪ জাহাজ উদ্ধোধনের দিন জ্যোতি কাদম্বরীকে কথা দিয়েও আনতে আসেনি বরং রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভগ্নহৃদয়ে কাদম্বরী যখন শুনলেন জাহাজের নাম সরোজিনী রাখা হয়েছে তখন বেঁচে থাকার ক্ষীণ আশাটুকুও নিভে যায়। পক্ষপাতদুষ্ট পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে অসাম্য ও বঞ্চনার কারণে মেধাবী-ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তাকে আত্মহননে সামিল হতে হয় সেই সামাজিক অসংগতি আজকের নারীকে বিদ্রোহী করে তোলে। এক্ষেত্রে লেখিকা রূপকুমারীর স্পষ্ট ও জোরালো প্রতিবাদী বয়ানে জ্ঞানদানন্দিনীর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন—

“সবাই তো তোমার মতো শক্ত নয়, মেজেবউঠান...তুমি ভরা সংসার নিয়ে বসবাস করো, রবিদাদা জ্যোতিদাদাকেও তার কাছ থেকে টেনে নিয়েছ, তার দুঃখ তুমি কী বুঝবে? ...তুমিই ওকে মেরেছ, তুমি আর জ্যোতিদাদা। তোমার ঈর্ষার বিষে তিল তিল করে মরতে মরতে আফিম খেয়ে নিল নতুনবউঠান।”^{১৪}

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নারীচেতনার অন্য একটি সমান্তরাল ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন বই-মালিনী ও রূপকুমারী চরিত্র দুটি। গল্প আর ইতিহাসের দ্বিবেণি স্রোতে বহির্বিশ্বের মননশীল চর্চা যার হাত ধরে ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহলে প্রবেশ করে তিনি হলেন বই-মালিনী। চরিত্রটি উপন্যাসিকের মানস সরোবরে নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত। উপন্যাসের নিবিড়পাঠে আমরা বই-মালিনীর মাধ্যমে মল্লিকার মানসলোক অবলোকন করতে পারি। কিংবা বিষয়টা এভাবেও বলা যেতে পারে উপন্যাসিক মল্লিকা সেনগুপ্ত যেন বই-মালিনীর ছদ্মবেশে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাঁদের অন্তঃপুরের গোপন রহস্য উন্মোচন করার পাশাপাশি মহাজ্ঞানী কর্তামশাইদের ‘অজান্তে ও অবহেলায় ঘরের কোণে কোণে মেয়ে মহলে বিতর্কের আলো জ্বালিয়ে আসেন। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সাধারণ নারী-অবদানের প্রক্ষে বই-মালিনী লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারা (ঝুমুর, কবিগান, খেউর, ঢপ)-য় অনামী লোককবি (‘বোধহয় বাংলার পয়লা মেয়ে কবি’) রামী ধোপানীর কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। জ্ঞানদানন্দিনী-স্বর্ণকুমারী দেবীর আভিজাত্যপূর্ণ মানসিকতার অসাড়তা প্রমাণ ও জোরালো প্রতিবাদের পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত নারীচেতনার সার্বজনীন অতীত ঐতিহ্যের গোপন স্রোতের ধারা মল্লিকা উন্মোচন করেছেন বই-মালিনীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিব্যক্তিতে—

“তোমাদের ঘরের শিক্ষিত মেয়েদের অনেক আগে থেকেই কিন্তু এ-সব হাটঘাটের মেয়েরা ছেলেরদের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে ছড়া লিখছে, ঢপ-খেউড়-ঝুমুর গাইছে, কবির লড়াই করছে। একসময় হরু ঠাকুরের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর কবিগানের তরঙ্গ কত লোক টেনেছে। বছর কুড়ি আগে বিখ্যাত জগন্মোহিনী তো এই ঠাকুরবাড়িতে ঢপকীর্তন গেয়ে গেছেন। ...হেটো মেয়েরা পুরুষের অবিসংবাদিত কর্তৃতির প্রতি যে উদ্ধত উপহাস ছুঁড়ে দিতে পেরেছে শিক্ষিত স্বাধীন মেয়েদের সে সাধ্য বা সাহস হয়নি।”^{১৫}

মালিনী নিম্নবর্ণীয় প্রান্তিক নারী রামী-যজ্ঞেশ্বরী-জগন্মোহিনীদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের মননশীল ভাবনাবিশ্ব পরিশীলিত সংস্কৃতির আঙিনায় তুলে ধরার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছেন। তথাকথিত আদিরসাত্মক এই পালাগুলি থেকে নারীদের বঞ্চন্য করে একছত্রভাবে পুরুষের আধিকার কায়ম করার সপক্ষে ‘সোমপ্রকাশ’ের সম্পাদকীয় কলম আমাদের সমাজে লিঙ্গবৈষম্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—‘পুরুষ যেন জন্মেছে নারীর ওপর খবরদারি করতেই, আর নারীরা তাদের খেলার পুতুল’। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশ্বাস স্ত্রীশিক্ষা-স্ত্রীস্বাধীনতা

সার্বিক ও অনিবার্য করার বিষয়ে জ্ঞানদা-স্বর্ণের মতো উচ্চবর্ণীয় বাঙালি শিক্ষিত নারীরা আদতে পুরুষতান্ত্রিক বলয়বৃত্তের মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছেন। তাঁরা মূলত স্বামী নামক মিথের সঙ্গে নিজেকে যোগ্যভাবে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতায় বিভোর এবং এই নারীরা সামগ্রিক অর্থে নারীমুক্তি ও নারীর নিজস্ব পরিসর নির্মাণে ব্যর্থ। উচ্চবর্ণীয় তথাকথিত স্বাধীন নারীর প্রকৃত অবস্থান প্রসঙ্গে উপন্যাসে দেখি—

“বাঙালি হিন্দুবাবুরা ঘরের মেয়েদের অশিক্ষিত করে ঘরে আটকে রেখেছে তাই ইংরেজরা তাদের অনগ্রসর বলে উপহাস করে, আর বাবুদের তত রোখ চেপে যায়। নিজেদের উদারতা প্রমাণ করতেই এক-এক করে স্ত্রীশিক্ষার অনুমতি দিচ্ছিলেন তাঁরা। তবে শিক্ষা দিলেও স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নন বেশিরভাগ ভদ্রজন। পাছে নিম্নবর্ণের স্বাধীন মহিলাদের দেখে ভদ্রমহিলারাও গৃহবিপ্লব করে বসেন, সেই দুশ্চিন্তায় তাঁরা খুব কাতর।”^{১৬}

উপন্যাসিকের মননশীল বয়ানে বই-মালিনী ঠাকুরবাড়ির অবতেচন সত্তা হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। আন্দরমহলের প্রতিটি নারীচরিত্রের মনন ও মানসিকতা যেন তাঁর নখদর্পনে। তিনি চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পান প্রতিদিনের সমাজে নারী-বঞ্চনার করুন ছবি। ঠাকুরবাড়িতে কাদম্বরীর সমাজতাত্ত্বিক অবস্থান প্রসঙ্গে ‘গিরিবালা’র গল্প সৃজনে মালিনীর সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসা যোগ্য। কথক মালিনী আর স্রোতা কাদম্বরী, মালিনীর অবতেচন মনে রচিত হয়ে চলে কাদম্বরীর দোসর গিরিবালা। গিরিবালায় দর্পণে কাদাম্বরী নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন। অব্যক্ত অনুভবের ভাষাহীন কান্না বই-মালিনী কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ শৈল্পিক বাতাবরণে সহজাত উপস্থাপন নারীচেতনার আসন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। সমাজের নিম্নবর্ণ থেকে উঠে আসা কাল-প্রবাহের সচেতন নারী সমকালের জীবনচিত্র-কোলাজে খুঁজে নিতে চায় তাঁর বিকল্প বয়ান—কাদম্বরীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মালিনীর অভিযুক্তি যেন তারই পূর্বাভাস—

“আমি চোখ বুজলে অনেক অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে, না-লেখা অক্ষরগুলো নেচে বেড়ায়, আমি পড়তে পারি। আজ তোমার সামনে বসতেই আমার মাথায় হুড়মুড় করে এ-সব লাইনগুলো আসছে। এ গল্প আমি লিখিনি, বিশ্বাস করো, এ ভাষায় আমি ভাবতেই পারি না। কে লিখবে কখন লিখবে আমি জানি না। কিন্তু জানি এ লেখা সত্যি।”^{১৭}

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে একমাত্র ব্যতিক্রমী নারী-ব্যক্তিত্ব হলেন রূপা ওরফে রূপকুমারী। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই বই-মালিনী মেয়েমহলের অবচেতনসত্তা তাহলে রূপকুমারী হলেন কাদম্বরীর অবচেতনসত্তা। কাদম্বরী যেখানে মুখফুটে কিছু প্রকাশ করতে পারে না সেখানে স্পষ্টবাদী রূপা অনায়াসেই প্রকাশ করে মনের লালিত ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা। সারদা দেবীর আশ্রিতা কন্যা রূপা ঠাকুরবাড়ির কঠোর অনুশাসনের মধ্যেও বলগাহীন হরিণের মতো অবাধ স্বাধীনতায় বিচরণ করেছেন। পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক সংস্কারের উদ্ভেদে উঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন কাদম্বরীর ইচ্ছে (ঘোড়ার পিঠে চেপে ময়দানে হাওয়া খাওয়া)-কে পূরণ করতে অপারগ তখন দেখি ‘সেজদাদার ঘোড়ায় চড়ে রূপকুমারী উধাও হয়ে গেছে’। রূপার এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে প্রতিক্রিয়া ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছেন তা আদতে সময়ের গভীর অসুখকে তুলে ধরে। যেমন—

“কেউ বলছে, ঘোড়ার ওপর ডবকা মাগির খেল দেখা যা আয়। আবার কেউ বলছে দেবীর কি এবার অশ্বে আগমন? ইনি দেবী না মানবী? গায়ে তো গয়না গাটিও

বেশ। ভদ্রলোকের বেটি তো খোলামেলা রাস্তায় নামে না, এ নিশ্চয় কোনও বেশ্যামাগিরি বাবু ধরার ছলাকলা।”^{১৮}

বাইরের এই নোংরা জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই রূপাকে আরো বেশি প্রতিবাদী করে তোলে। যেখানেই অনাচার আর অসংগতি সেখানেই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর নারী-ব্যক্তিত্বের দৃঢ়-বলিষ্ঠ উচ্চারণ। রূপার কাছে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, সামাজিক অবস্থানভেদে একই কর্মে ভিন্ন ফল পাওয়া যায়। যেমন, কাদম্বরী দেবী কবি বিহারীলালকে রঙ মাখালে কোনও দোশ নেই অথচ রূপা তাঁর ভালোবাসার মানুষ হ্যারিকে রঙ মাখালে অন্যায় কিংবা কেশব সেনের কন্যা সুনীতি প্রেম করে বিয়ে করলে প্রশংসা পায় কিন্তু রূপা নিজের পছন্দের মানুষটিকে বিয়ে করতে চাইলে অন্যায়। কোনও কিছুকে তোয়াক্কা না করেই রূপা বলতে পেরেছে—‘আমিও করব, নিজের পছন্দমতো বিয়ে’ কিংবা ‘আমি মুক্তি চাই, বিরাট পৃথিবীতে আমি পাখির মতো উড়ে বেড়াতে চাই’। এক্ষেত্রে রূপার সাহসী পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত নারীচেতনাবাদের দৃঢ় কণ্ঠস্বরকে কালে কালে প্রসঙ্গিক করে তোলে যখন আমরা দেখি—

“যে ক’দিন ঠাকুর পরিবার যশোরের কুটুমবাড়িতে রইলেন, রূপা আর হ্যারির গোপন অভিসার ততদিনই চলতে লাগল। প্রেমের ঘোড়া যত ছুটল ততই বেগবান হয়ে উঠল ওদের বিপ্লবের স্বপ্ন। হ্যারির ঝুলি থেকে বেরনো লালশালুতে মোড়ানো গীতার ওপর হাত রেখে, অজানা ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করে, পোড়োমন্দিরের ভাঙা সিঁড়িতে বসে ওরা আজীবন পাশে থাকার শপথ নিল।”^{১৯}

উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণে চিত্রিত অন্দরমহলের আলোচ্য প্রধান নারীরা ছাড়াও স্বল্প পরিসরে উজ্জ্বল হয়ে আছে সৌদামিনী, নীপময়ী, বিনোদিনী, আনা এবং আরো অনেক অনামী মহিলারা। তাদের সম্মিলিত সহাবস্থান নারী-পরিসরের গভীরে পূর্ণতা দিতে সক্ষম হয়েছে। ‘বিজয়িনী’ শিরোনামাঙ্কিত শেষ পরিচ্ছেদে পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না প্রকৃত বিজয়িনীকে। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে সারদা দেবীর প্রয়াণে একটি যুগের অবসান ঘটে এবং কাদম্বরীর নেতৃত্ব একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। কাদম্বরীর অকাল প্রয়াণে নারীচেতনার বহুমাত্রিক কণ্ঠস্বর রূপাদের হাতে একদিকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে অনন্যমাত্রা লাভ করে অন্যদিকে সত্যেন-জ্যোতি-রবি—ত্রয়ীর মননে সৃজনে পরোক্ষভাবে জায়গা করে নেয় অনালোকিত নারীসত্তার ব্যতিক্রমী উদ্ভাসন।

তথ্যসূত্র:

- ১। সেনগুপ্ত, মল্লিকা, গদ্যসমগ্র, সম্পাদক- সুবোধ সরকার, কবির বউঠান, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, আগস্ট, ২০১২, পৃ. ২১৩।
- ২। তদেব, পৃ. ২২৮।
- ৩। তদেব, পৃ. ২২৭।
- ৪। তদেব, পৃ. ২১৬।
- ৫। তদেব, পৃ. ২৩২।
- ৬। তদেব, পৃ. ২৯৭।
- ৭। তদেব, পৃ. ৩২৭।
- ৮। তদেব, পৃ. ২৭৫।
- ৯। তদেব, পৃ. ২৮৪।

- ১০। ভট্টাচার্য, অভীক্ রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী দেবীর প্রেম : কতটা জল্পনা আর কতটা সত্যি?,
পর্ব - ৩, এবেলা ডট ইন, ৬ আগস্ট, ২০১৬।
- ১১। সেনগুপ্ত, মল্লিকা, গদ্যসমগ্র, সম্পাদক- সুবোধ সরকার, কবির বউঠান, আনন্দ
পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, আগস্ট, ২০১২, পৃ. ৩৭৬।
- ১২। তদেব, পৃ. ৩৯৯।
- ১৩। তদেব, পৃ. ৪০৪।
- ১৪। তদেব, পৃ. ৪০৬।
- ১৫। তদেব, পৃ. ২৮৮।
- ১৬। তদেব, পৃ. ২৮৯।
- ১৭। তদেব, পৃ. ৩৪৯।
- ১৮। তদেব, পৃ. ২৬৫।
- ১৯। তদেব, পৃ. ৩৯০।

ওয়াহাবি প্রতিরোধ আন্দোলন : প্রসঙ্গ মালদা জেলা

আব্দুল বাসির

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় চুরুলিয়া

পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: অষ্টাদশ শতকে আরব দেশে এই আন্দোলন শুরু হয়। আরব দেশে এই আন্দোলন শুরু করেন আব্দুল ওয়াহাব। এই আন্দোলনের প্রকৃত নাম হল তারিখ-ই-মহম্মদীয়া বা মহম্মদ প্রদর্শিত পথ। মূলত এই আন্দোলন ধর্মীয় হিসেবে শুরু হয়। এই আন্দোলন ভারতেও বিস্তার লাভ করে। ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত সূচনাকারি ছিলেন রায়বেরিলির বাসিন্দা সৈয়দ আহমেদ। তার নেতৃত্বে এই আন্দোলন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মালদা জেলাতেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। মালদা জেলা ছিল অবিভক্ত বাংলার এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বলা যেতে পারে উত্তরপূর্ব ভারতে পাটনা কেন্দ্রের পরে মালদা জেলা ছিল এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মূলত শেরশাহ বাদিয়া প্রভাবিত অঞ্চলে এই আন্দোলন গতিশীলতা লাভ করে। তবে ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত কঠোর দমননীতির আন্দোলন কারীরা পরাজিত হন।

সূচক শব্দ: আরব, আব্দুল ওয়াহাব, ধর্মীয়, মহম্মদ, তারিখ-ই-মহম্মদীয়া, সৈয়দ আহমেদ, পাটনা, মালদা, শেরশাহ বাদিয়া, ব্রিটিশ।

মূল আলোচনা: আব্দুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে আষ্টাদশ শতকে এই আন্দোলন আরব দেশে শুরু হয়। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত নাম হল তারিখ-ই-মুহম্মদীয়া বা মহম্মদ প্রদর্শিত পথ এবং তার প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় ওয়াহাবি ও তার প্রবর্তিত মতবাদ ওয়াহাবিবাদ নামে পরিচিত। এবং ওয়াহাবি কথার অর্থ হল-নবজাগরণ। আরব দেশের অনেক পরে ভারতেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ইসলাম ধর্মের আভ্যন্তরে বেশকিছু অনৈক্যমূলক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ হয়েছে সেগুলো বর্জন ও শরিয়ত অনুযায়ী ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও অচিরেই তা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতে এই আন্দোলনের সূচনা করেন দিল্লির সূফি সন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার পুত্র আজিজ।^১ এই আন্দোলন ছিল মূলত পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। তবে ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত সূচনাকারি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির বাসিন্দা সৈয়দ আহমেদ।^২ সৈয়দ আহমেদ মক্কায় হজ্জে যান সেখানে গিয়ে তিনি ওয়াহাবি আদর্শের সঙ্গে পরিচিত লাভ করেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি ভারতে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের ছিলেন প্রধান নেতা ও সংগঠক। এই আন্দোলন ছিল ধর্মীয় আবরণে পুরোপুরি কৃষক আন্দোলন। সৈয়দ আহমেদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থানকালে ভারতের আভ্যন্তরে আন্দোলনকে সচল রাখার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। তারা হলেন-বিলায়েত আলি ও ইনায়েত আলি- পাটনা কেন্দ্র, মুহাম্মাদ আলি-রামপুর, মুহাম্মাদ



কাশিম- বোম্বে, হাফিজ কুতুবুদ্দিন ও সাইদ আওলাদ হোসেন-কৌনজ।^৭ তবে বাংলায় এই আন্দোলনের সূচনা করেন চব্বিশ পরগণার জেলার হায়দারপুর গ্রামের মীর নিশার আলি বা তিতুমীর। ১৮৩১ খ্রীঃ বালাকোটের যুদ্ধে ওয়াহাবি নেতা সৈয়দ আহমদ শিখদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। এবং প্রায় একই সময়ে বাংলার ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম নেতা তিতুমীর বা মীর নিশার আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে নিহত হন।^৮ তবে তিতুমীর এর আন্দোলন ছিল একেবারে স্থানীয়। এই দুই নেতার মৃত্যুর পর ভারত তথা বাংলায় এই আন্দোলন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে আন্দোলনকে ভারতে সচল রাখার জন্য মৃত্যুর পূর্বে সৈয়দ আহমদ পাটনা কেন্দ্রে খলিফা ও তার উপদেষ্টা মন্ডলী নিযুক্ত করেন। তার একটি তালিকা পাওয়া যায় Q. Ahmad লিখিত 'The Wahabi Movement in India' গ্রন্থ থেকে। সেটি হল-

১। মুহাম্মদ হোসেন এবং সহযোগীরা হলেন-আকবর আলি, ফাইয়াজ আলি, ইয়াহিয়া আলি, ওয়াইজুল আলি এবং মাকসুদ আলি।

২। বিলায়েত আলি -আমির, এনায়েত আলি-যুদ্ধমন্ত্রী, ফারহাত হুসেন-অর্থমন্ত্রী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগকর্তা।

৩। ফারহাত হুসেন-বিলায়েত আলির খলিফা ও আমির, ইয়াহিয়া আলি, আহমাদুল্লাহ এবং আব্দুল রহিম, পরামর্শদাতা।

৪। ইয়াহিয়া আলি-ফারহাত হুসেনের খলিফা ও আমির, আব্দুল রহিম-অর্থমন্ত্রী, আলি আহমাদুল্লাহ এবং অন্যান্যরা হলেন পরামর্শদাতা।

৫। আহমাদুল্লাহ-আমির, মুবরক আলি-অর্থমন্ত্রী, ইরাদাত হুসেন - পরামর্শদাতা।

৬। মুবরক আলি-আমির, মুহাম্মদ হাসান-অর্থদপ্তর।

৭। মুহাম্মদ হাসান-আমির। (অন্যান্য সদস্যদের নাম জানা যায়নি)।

৮। আব্দুল্লাহ রহিম-(সম্ভবত আন্দামান থেকে ফিরে আসার পর তিনি আমির হন) মুহাম্মদ ইব্রাহিম, গাজীপুরের আব্দুল্লাহ ও আব্দুল আজিজ রহিমাবাদি, পরামর্শদাতা।^৯

ঐতিহাসিক কেয়ামুদ্দিন আহমদের মতে, এই কমিটিগুলো ছিল ভারতবর্ষে আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক কমিটি। এই কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে সারা ভারতে আন্দোলন পরিচালিত হত। কেন্দ্রীয় কমিটির মত বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক সমিতিও ছিল। এইসব আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি পাটনা কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকত এবং এই কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে চলত। অবিভক্ত বাংলার এমন সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হল-

চট্টগ্রাম অঞ্চল-মৌলবি বখশি আলি, হায়দার আলি ও আসাদ আলি প্রমুখ।

সিলেট অঞ্চল-মৌলবি মহম্মদ তাহের ও মৌলবি হাসান আলি প্রমুখ।

ঢাকা অঞ্চল-মৌলবি নাসিরুদ্দিন, মহঃআব্দুল্লাহ ও আব্দুল গফর প্রমুখ।

দিনাজপুর অঞ্চল-মৌলবি আব্দুল কুদ্দুস।^{১০}

এছাড়াও মালদা জেলার নারায়ণপুর কেন্দ্র পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন রফিক মন্ডল। মালদা-রাজশাহী অঞ্চলে তবলিগী সফরের কোন এক পর্যায়ে (১৮৩৩-৪৩) এনায়েত আলি তাকে খলিফা পদে নিযুক্ত করেছিলেন।^{১১} ওয়াহাবি আন্দোলনে যুক্ত থাকার

অপরূপে ব্রিটিশ সরকার রফিক মন্ডলকে গ্রেপ্তার করলে উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলন সচল রাখার জন্য চারজন খলিফা নিযুক্ত হন। তারা হলেন-

- ১। মৌলবি আমিরুদ্দিন মোল্লা-মালদা ও নারায়ণপুর কেন্দ্র।
- ২। আব্দুল করিম বাসুদেবপুরী- মুর্শিদাবাদ।
- ৩। মৌলবি আব্দুল কুদ্দুস-মোল্লাটুলি ও দিনাজপুর।
- ৪। ইব্রাহিম মন্ডল-বিহারের দিলালপুর কেন্দ্র।^৮

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর পাটনা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির উপর, তাদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন উত্তর-পূর্ব ভারত তথা বাংলায় নতুন প্রাণ পায়। পাটনা ছিল ওয়াহাবি আন্দোলনের উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান ও বৃহত্তম কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। Dr, Q. Ahmad এর তথ্য থেকে জানতে পারা যে, মালদায় এই আন্দোলনের সূচনা হয় ১৮৪১ খ্রিঃ নাগাদ। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় কেন্দ্র ছিল মালদা। উত্তরপ্রদেশ নিবাসী মৌলভী আব্দুল রহমান মালদায় এসে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি ওয়াহাবিদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি আরবি, ফার্সি ভাষা, ভূগোল, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের সাথে সাথে তাদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র চালানো, লাঠি চালনা, ডন, কুস্তি, তরবারি চালনা ইত্যাদি শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা দিতেন।^৯ তিনি এত গোপনীয়ভাবে মালদাতে ওয়াহাবি আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালনা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ঘূণাক্ষরে কোন কিছু টের পায়নি। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ওয়াহাবি আন্দোলন দমনে এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত মালদা জেলার ওয়াহাবি আন্দোলনের বাড়-বাড়ন্ত তারা একেবারেই বুঝতে পারেনি। তার দক্ষ নেতৃত্ব ও অন্যান্য ওয়াহাবি নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতায় মালদা হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্ব ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। পরবর্তীতে মালদা জেলায় আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব পান রফিক মন্ডল। তিনি শুধুমাত্র একজন দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, সঙ্গে-সঙ্গে একজন দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপকও ছিলেন। তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ আদায়ের জন্য মালদাকে কয়েকটি এককে বিভক্ত করে ভ্রাম্যমান প্রচারক নিয়োগ করেন। তারা জনগনের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের পাশাপাশি জনগনের মধ্যে ওয়াহাবি আদর্শ প্রচার করতেন। রফিক মন্ডল মুসলমানদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে কর আদায় করতেন। সেগুলি হল - যাকাত, উম্মর, মূঠি, ভিক্ষা ইত্যাদি। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীতে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এসব অঞ্চলগুলি থেকে তিনি বছরে প্রায় ২০০০০ হাজারেরও বেশি কর হিসেবে আদায় করতেন এবং তা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে পাঠিয়ে দিতেন।^{১০} ওয়াহাবিদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ছিল অনেকবেশি সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। তারা একথা সত্যই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ব্রিটিশ বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম পরিচালনা করতে হলে অর্থ একান্ত জরুরি। তাই তারা আর্থিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আর কোন কৃষক আন্দোলনে এরকম সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রগতিশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেখা যায় না। সেই জন্য তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার পিছনে যেমন ওয়াহাবি নেতাদের অবদান ছিল, তেমনি অবদান ছিল সাধারণ মুসলিমদের, যারা অকাতরে ওয়াহাবি তহবিলে অর্থ সাহায্য করতেন।

মালদা জেলায় ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল মূলত শেরশাহ বাদিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের। দ্বারা তারা স্বভাবগত দিক থেকে ছিল অত্যন্ত রুক্ষ, বদরাগী ও গোঁয়ার প্রকৃতির। তারা কিন্তু মালদহের আদি অধিবাসি নন। শেরশাহ বাদিয়াদের মালদাতে আগমন সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত আছে। তার মধ্যে অধিক প্রচলিত দুটি মত হল- প্রথম মত হল- তারা শেরশাহের গোঁড় আক্রমণের সময় সৈন্যবাহিনীর অঙ্গ হিসেবে মালদায় আসেন এবং দিহ্বীয় মত হল তারা শেরশাহবাদ থেকে অভিধাসিত হয়ে মালদায় আসেন।^{১১} পরবর্তীতে তারা মালদাতেই থেকে যান। পরবর্তীতে তারা শেরশাহ বাদিয়া নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে। মূলত তারা নদী তীরবর্তি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে শুরু করে। এদের মূল জীবিকা ছিল চাষ বাস, পশুপালন ও কায়িক শ্রম নির্ভর কাজ। এছাড়াও তারা অবসর সময়ে মাছ শিকার করত।

তারা যেসব গ্রামগুলিতে বসতি স্থাপন করেন সেগুলি হল -তালশুর, বেলশুর, কুমদপুর, সুজাপুর, খরবা, আদিনা, রশিলাদহ, মানিকচক।^{১২} বর্তমান হরিশ্চন্দ্রপুর, পুখুরিয়া, কালিয়াচক ও রতুয়া থানাতে আদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তারপর তারা মালদা জেলার বিস্তীর্ণ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট গবেষক অরুণকান্তি ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যে, মালদা জেলার যেসব স্থানে ওয়াহাবি আন্দোলনের গুপ্ত ঘাঁটি গুলি গড়ে ওঠেছিল সেগুলি হল -

থানা	গুপ্ত ঘাঁটি
হরিশ্চন্দ্রপুর	তালগ্রাম, কুমদপুর, তালশুর, বেলশুড়, মালিওর, টালবানংরুয়া, দৌলতপুর ও ইসলামপুর।
খরবা (চাঁচল)	গোয়ালপাড়া, চন্দ্রাপাড়া, খরবা, হোসেনপুর ও রাইখানদাঘি।
অবিভক্ত রতুয়া	সামসী, কাভারণ, সম্বলপুর, বাটনা, মহারাজপুর ও গোবিন্দপুর ইত্যাদি।
কালিয়াচক	সুজাপুর, মোথাবাড়ি, কমলাপুর (বাবলা), শেরশাহি, হোসেনাবাদ, বাকারাবাদ ও ঝাউবোনা।
গাজোল	দেওতলা, বাবুপুর, একলাখি ও রাজদাঘি।
মানিকচক	মথুরাপুর, কামালপুর ও ভূতনীদিয়ারা।
বামনগোলা	মাছুয়া কান্দর, চাদপুর, মালদাপাড়া, রাখালপুর, হাঁসপুকুর, খুটাদাহ, কূপাদহ, পারহরি নগর, পাথার জগদলা।
হবিবপুর	দাঙ্গা, মহেন্দ্রপুর, আইহো, বুলবুলচন্ডি ও ঋষিপুর।
পুরাতন মালদা	ভাবুক, পাভুয়া, আদিনা ও মহিষবাথানী।

মালদা জেলাতে ওয়াহাবিদের এইসব কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার পিছনে ওয়াহাবি নেতা রফিক মন্ডল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রফিক মন্ডল যুক্ত ছিলেন।^{১৩}

এই বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল অবিভক্ত মালদা জেলার নারায়ণপুর। রফিক মন্ডল ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তার সম্পর্কে বলা যায়, “Under him the Malda centre grew in

importance and became favourite rendezvous of the district heads in Bengal and served as a convenient halting place for many of the Patna Leaders during their tours of Bengal".³⁸ রফিক মন্ডল, ইব্রাহিম মন্ডল প্রমুখের উদ্যোগে এই আন্দোলন মালদা জেলাতে গতিশীলতা ও বিস্তার লাভ করে। রফিক মন্ডল ছাড়াও এই আন্দোলনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতারা হলেন ইব্রাহিম মন্ডল, মৌলভী আব্দুল রহমান, মৌলবি আমিরুদ্দিন মোল্লা প্রমুখ। রফিক মন্ডললের গ্রেপ্তারের পর তার পুত্র মৌলবি আমিরুদ্দিন মোল্লার ওপর মালদা ও নারায়নপুর কেন্দ্র পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। তার যোগ্য নেতৃত্বে মালদা হয়ে ওঠে ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। মালদাতে ওয়াহাবি আন্দোলনের বিস্তার সম্পর্কে দুজন নেতা সম্পর্কে আলোচনা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তারা হলেন হাঁসপোখর গ্রামের আমানত মন্ডল ও অপরজন হলেন কালিয়াচকের নাজির সর্দার। আমানত মন্ডল এর নেতৃত্বে হাঁসপোখর গ্রাম ওয়াহাবি পন্থী পরিণত হয়। এই গ্রামের অনেক যুবক যোদ্ধা হিসেবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই গ্রামের মসজিদ থেকে “জীহাদ” এর আদর্শ প্রচার করা হত। নাজির সর্দারের নেতৃত্বে কালিয়াচক হয়ে ওঠে মালদা জেলার ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলার মাদ্রাসাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। W.W Hunter-এর একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, বাংলার প্রায় ৬০টি মাদ্রাসা এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। তার মধ্যে ১২টি মাদ্রাসা মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে অবস্থিত ছিল। শুধুমাত্র মুসলিমরা নন হিন্দুরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রকার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজন হিন্দুর নেতার নাম জানা যায়, যারা এই আন্দোলনে আংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন -হীরামন ঘোষ, হাকিমণ ঘোষ, ফটিক ঘোষ ও তফি ঘোষ প্রমুখ। এই থেকে বলা যেতে পারে মালদা জেলাতে ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মালদা জেলাতে এই আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার রেলি, নামক পুলিশের উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারীকে ব্রিটিশ সরকার নিয়োগ করে। এবং তার সহযোগী নিয়োগ করা হয় নবকৃষ্ণ ঘোষ নামক একজন পুলিশকে। ব্রিটিশ সরকার রফিক মন্ডল কে গ্রেপ্তার করলেও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তিতে ব্রিটিশ সরকার তাকে আবার গ্রেপ্তার করে। মিঃ রেলি মালদা জেলার একজন প্রাক্তন ওয়াহাবির সহযোগিতায় এই আন্দোলন সম্পর্কিত অনেক তথ্য জানতে পারেন। তার দেওয়া তথ্য এই আন্দোলন দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে। কাজিগ্রামের নাজির সর্দারকে গ্রেপ্তার করার জন্য নবকৃষ্ণ ঘোষ কালিয়াচকে বেশ কিছুদিন একজন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে অবস্থান করেন। উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের পর তিনি নাজির সর্দার সহ আটজনকে গ্রেপ্তারের জন্য তৎকালীন মালদার জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানান। মালদার জেলা শাসক তার আবেদন মঞ্জুর করলে নবকৃষ্ণ ঘোষ নাজির সর্দার সহ মোট আটজন ওয়াহাবিকে তিনি গ্রেপ্তার করেন এবং তারা হলেন- কাজিগ্রামের নাজির সর্দার, লখিপুরের আব্দুল ওয়াহিদ, মৌজাপুরের ঘুরান খান, লাখোপুরের জামুরান শেখ, মৌজামপুরের বুর্নো গাজী, আগা মিন্ধীর সুরখান মোল্লা, মৌজামপুরের নাওয়াজি মোল্লা ও আগা মিন্ধীর ধোকান মোল্লা।³⁹ এরপর নবকৃষ্ণ ঘোষ পাকুড়ের ইসলামপুর থেকে ইব্রাহিম মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেন। তাকে গ্রেপ্তারের পর তিনি মালদার বিখ্যাত ওয়াহাবি নেতা আমিরুদ্দিন মোল্লা সম্পর্কে জানতে পারেন। তাকেও ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে ১৮৬৯ খ্রীঃ

এবং এদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার বিখ্যাত মালদহ ও রাজমহল ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। বিচারে তারা দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। Q. Ahmad লিখিত “The Wahabi Movement in India” গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় যে, আমিরুদ্দিন মোল্লাকে আন্দামানে দ্বীপান্তর করা হলেও ইব্রাহিম মন্ডল সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মালদার শীর্ষ স্থানীয় ওয়াহাবি নেতাদের গ্রেপ্তার ও ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত কঠোর দমননীতির ফলে উনবিংশ শতকের শেষদিকে এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে এই আন্দোলন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র:

১. জীবন মূখ্যোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১২৫।
২. ঐ, পৃ-১২৫।
৩. Q. Ahmad, The Wahabi Movement in India, New Delhi, 1966, P.No-83.
৪. জীবন মূখ্যোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ- ১২৭ & ১২৮।
৫. Q. Ahmad, The Wahabi Movement in India, New Delhi, 1966, P.no-132.
৬. মহঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব-আহলে হাদিস আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ, ৪৩৩-৪৩৬।
৭. ঐ, পৃ-৪৩৬।
৮. ঐ, পৃ-৪১১।
৯. শচীন্দ্রনাথ বাল্য ও ঋতব্রত গোস্বামী সম্পাদিত, মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১৩২।
১০. R.C Majumder, British Paramountancy and Indian Renaissance, P, No, 899.
১১. সুস্মিতা সোম, মালদা জেলার ইতিহাস চর্চা, দীপালী পাবলিশার্স, পৃ, ১১৯।
১২. শচীন্দ্রনাথ বাল্য ও ঋতব্রত গোস্বামী সম্পাদিত, মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১৩৪।
১৩. অরুণকান্তি ভট্টাচার্য, মালদহে ওয়াহাবি আন্দোলন, প্রকাশিত মালদার খবর পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, সংখ্যা, ২৬, ২৮ ফেব্রুয়ারি-২রা মার্চ, ২০০৭।
১৪. Q. Ahmad, The Wahabi Movement in India, New Delhi, 1966, P. No-137.
১৫. ঐ, পৃ-২৬৮।

শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ

সাহাবুদ্দিন আহমেদ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ঐতিহাসিক বিচারে বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব উভয়েই যুগপুরুষ। সাহিত্যের বিচারের আমরা বুদ্ধকে আশ্রয় করে যেমন বহু সাহিত্য রচিত হতে দেখেছি, একইভাবে চৈতন্যদেবকে উপজীব্য করে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে চৈতন্যজীবনী সাহিত্য। মূলতঃ বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দদাসের কড়চা, কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, এছাড়াও চৈতন্য লীলা আশ্রিত অন্যান্য সাহিত্যে চৈতন্যচরিতের রূপকারগণ চৈতন্যদেবের প্রেমসৌন্দর্যে সদাসমুজ্জল চিত্রটি যেমন অতি নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন, সেই সঙ্গে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনেও তাঁরা যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এই দিক থেকে শ্রীচৈতন্যজীবনী সাহিত্যকে মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের পরিণতি ও পরিণামের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের উপাদান-রূপেও ব্যবহার করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে তাঁর গ্রন্থে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। চৈতন্যজীবনী সাহিত্য থেকে যেমন জানা যায় যে মহাপ্রভু বৌদ্ধ নির্বাণ, শুদ্ধবাদ, ক্ষণিকবাদ ও নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করেছিলেন, তেমন এটাও জানা যায় যে তাঁর বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধদিগের জাতিভেদ বিরোধিতাকেও সাস্তীভূত করে নিয়েছিল। বুদ্ধদেবকে শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করেছেন এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বৌদ্ধমত খণ্ডন করলেও শ্রীচৈতন্য বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

সূচক শব্দ: শ্রীচৈতন্য, চৈতন্য, চৈতন্যদেব, বুদ্ধ, বুদ্ধদেব, চৈতন্যজীবনী সাহিত্য, বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম।

ভূমিকা: একদা জগজ্যোতি বুদ্ধের জীবনাচরণের প্রেরণাকে উপজীব্য করে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। মহাবগগ, জাতক, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে আমরা সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের অনন্ততুল্য ব্যক্তিত্ব এবং সেই নরশ্রেষ্ঠকে উপলক্ষ্য করে উদ্ভূত যুগ-পূজার আয়োজন প্রত্যক্ষ করি। এই গ্রন্থসমূহে আমরা কেবল গৌতম বুদ্ধকেই পাই না, যুগভক্তির আবেগে তাঁর জীবনের ঘটনায় সঙ্গে বহু লোকোত্তর ইতিবৃত্ত, বহু অলৌকিক কাহিনীও লাভ করি। সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে দেবতা করা। বুদ্ধদেব সে যুগের একক ও অনন্যতুল্য ব্যক্তিত্ব। যুগ-পূজার মহিমায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে ভক্তির অশ্রুণীয়ে চরিতার্থ দৈব পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-মহাত্ম্যকে উপজীব্য করে জীবনী সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং বহু অলৌকিক ঘটনার আবর্তে তাঁর জীবনী নরদেবতার দৈব লীলায় পর্যবসিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ। চৈতন্যলীলাকে উপজীব্য করে কেবল বাংলা জীবনী সাহিত্যই সৃষ্টি হয়নি, চৈতন্যদেব ছিলেন মধ্যযুগের নবোদ্ভূত জাতীয় চেতনা ও জীবনবোধের ভাবমূর্তি। বুদ্ধদেব মানবচিহ্নে এক নূতন সম্বোধির উদ্বোধকরূপে বৌদ্ধসাহিত্যের অধিদেবতা। শ্রীচৈতন্যও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে সাহিত্য ঐতিহাসিকের চিরনম্য।

মূল আলোচনা: ইসলামী শাসন যখন বাংলার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে সেই সময়ে এই প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব। তাঁর চরিত্রে একাধারে ত্যাগ ও তপস্যা, দুঃখবরণ ও সহিষ্ণুতা, সংযম ও শুচিতা, ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশ হয়েছিল। চৈতন্যচরিতের রূপকারগণ তাঁদের কাব্যে এই প্রেমসৌন্দর্যে সদাসমুজ্জল চিত্রটি অতি নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনেও তাঁরা কম দক্ষতা প্রদর্শন করেননি। এই দিক থেকে শ্রীচৈতন্যজীবনী সাহিত্যকে মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের পরিণতি ও পরিণামের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের উপাদান-রূপেও ব্যবহার করা যায়।

বাংলা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রথম শিল্পী বৃন্দাবন দাস। প্রভু নিত্যানন্দের বাল্যলীলা ও তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

“তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ॥
জিঙাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥”^১

শ্রীচৈতন্যজীবনের শ্রেষ্ঠতম রূপকার কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরো বিস্তৃতভাবে তাঁর গ্রন্থে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। ভক্তিমার্গ বিমুখ পাষণ্ডিদিগের পাণ্ডিত্যশ্রয়ী আত্মশ্লাঘা যেখানে তাঁর পথযাত্রার বাধা সৃষ্টি করেছে, সেখানে তিনি খরবহুরি মশাল জ্বলিয়া শঙ্কাবিহীন অভিযাত্রার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়েছেন। এই যাত্রাপথে তार्কিক মীমাংসক, মায়াবাদীদিগকে পরাস্ত করে তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে দীক্ষা দিয়েছিলেন। অবশেষে দক্ষিণদেশীয় এক মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য সশিষ্য উপস্থিত হলেন। নববিধ প্রস্থানে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর উদ্ধৃত আশ্রানে-

“যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে॥”^২

তর্ক দ্বারাই মহাপ্রভু নবপ্রস্থান খণ্ডন করলেন। দার্শনিক পণ্ডিত বৌদ্ধগণ পরাজিত হলেন। তাঁদের পরাজয়ে-

“লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা ভয়।”^৩

তর্কে পরাস্ত বৌদ্ধগণ কুমন্ত্রণা করে বিষ্ণুপ্রসাদের নামে অপবিত্র অন্ন পরিবেশন করলেন। এই সময় এক মহাকাব্য পক্ষী ঐ থালা তুলে নিয়ে বৌদ্ধাচার্যের মাথায় এমনভাবে ফেলে দিল, মাথা ফেটে আচার্য মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ভীত সন্ত্রস্ত শিষ্যগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শরণ নিলেন-

“তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।

জীয়াহ আমার গুরু- করহ প্রসাদ॥”^৪

শ্রীচৈতন্য তখন উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম গুরুকরতে বললে বৌদ্ধকণ্ঠে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম গীত হল, বৌদ্ধাচার্যও উঠে ‘হরি’ বললেন। অতঃপর বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধাচার্যও-

“কৃষ্ণ বলি আচার্য প্রভুকে করয়ে বিনয়

দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥”^৫

গোবিন্দদাসের কড়া পাঠেও জানা যায় দক্ষিণাত্যে ত্রিমন্দ নগরে বহু বৌদ্ধের বাস ছিল। সত্যপ্রচারের অভিযাত্রী শ্রীচৈতন্য এইখানে বৌদ্ধদিগের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নগরের রাজা বিচারে মধ্যস্থতা করেন। বিচারে বৌদ্ধগণ পরাজিত হয়েছিলেন-

“বহু বৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দ নগরে।
এসে মিলিল সব গৌরঙ্গ সুন্দরে॥
বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিলা।
ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইল॥
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল।
পণ্ডিত দর্শক সব হাসিতে লাগিল॥”^৬

স্থিতধী কবি কৃষ্ণদাসের মতে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিমে ত্রিপতির পর্বতে এবং বেঙ্কটগিরিতে বৌদ্ধদের দেখেছিলেন। কবি বৌদ্ধদের পাষণ্ডী বলে উল্লেখ করেছেন এবং স্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর জাতির সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে তুলনা করে বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৌদ্ধদের স্বরূপ উল্লেখ করলেও কবির রচনার মধ্য দিয়ে সেযুগের অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। চূড়ামণি দাস, গোবিন্দাস প্রমুখ বৈষ্ণব চরিতাখ্যায়িকা রচয়িতাগণও বৌদ্ধদিগের প্রতি কটুক্তি করেছেন। কবিকর্ণপুরের ‘শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটক এই ব্যাপারে পথ প্রদর্শক। এই গ্রন্থের ৭২ অঙ্কে বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে বলা হয়েছে দক্ষিণাত্যে- ‘প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিণা’^৭

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চূড়ামণিদাসের ‘চৈতন্যজীবনী’ নামক গ্রন্থে নবদ্বীপধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিলে বৌদ্ধদিগেরও আনন্দিত হবার বিষয় বিবৃত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় পাওয়া যায় তীর্থভ্রমণরত শ্রীচৈতন্যের অভিযাত্রার পথে তার্কিক মীমাংসক বৌদ্ধ প্রভৃতি তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধরাজ রামগিরি এবং তার্কিক চণ্ডীরাম তীর্থ শ্রীচৈতন্যের অমায়িক চরিত্রমহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যজীবনী সাহিত্যে বেদবাহ্য অর্থে ‘পাষণ্ডী’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই পাষণ্ডী কারা? বেদবাহ্য বৌদ্ধ, জৈন এবং তার্কিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে পাষণ্ডী বলে জীবনীসাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং চৈতন্য-জীবনীকারগণ পাষণ্ডী বলে যাদের অভিহিত করেছেন তার মধ্যে কোনো কোনো স্থলে বৌদ্ধগণও রয়েছেন। বৌদ্ধদিগকে ‘পাষণ্ডী’ নামে অভিহিত করা ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে তা নিরূপণ করা কঠিন হলেও অনুমান করা যায় পালোত্তর যুগেই ব্যাপকভাবে সাহিত্যে বৌদ্ধদিগকে পাষণ্ডী অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে। কবি বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য একাধারে কোমলে ও কঠোরে, পৌরুষে ও নমনীয়তায় ভাস্বর। তিনি পতিতপাবন, পাষণ্ডী উদ্ধারকারী। নবদ্বীপবাদী পাষণ্ডীরা শ্রীচৈতন্যের নৃত্য, কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ইত্যাদির বিরূপ ব্যাখ্যা প্রচার করত। এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের উপর পাষণ্ডীদের উৎপাত ও অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। একদিকে স্মার্ত সংস্কার, নব্য ন্যায় ও জ্ঞানানুশীলন, অন্যদিকে গোপন তন্ত্রের অনুষ্ঠানে ভক্তধর্মের উৎস শুষ্ক হয়ে এসেছিল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভাববিস্ময় পরিকরদের সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস-

“রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সব সঙ্গে বিবিধ রমণ॥”^৮

আবার কারো মতে-

“আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।

ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন॥”^১

-এই অভিযোগসমূহের মধ্যে গুহা ও দেহসম্পৃক্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এবং সহজিয়া আচার্যদের কায়নির্ভর সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেকালের কোনো কোনো তান্ত্রিক সাধক মদিরা পান করে সাধনা করতেন।

নিত্যানন্দ বিরোধী ও তাঁর নিন্দুকদের মধ্যে পাষণ্ডীরা সংখ্যাধিক ছিল। আজানুলম্বিত বাহু লাভাণ্যসুন্দর দেহ শ্রীচৈতন্যকেও ‘পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান।’ দক্ষিণ দেশেও পাষণ্ডীদিগের সংখ্যাধিক্য ছিল। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে আগমন করেন তখন উৎকলসমাজে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য বিরোধ এবং রেষারেষি প্রবলতর ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্রের এক রাণী বৌদ্ধদিগের অনুরাগিণী ছিলেন। রাজাও প্রথমতঃ বৌদ্ধদিগের পক্ষ গ্রহণ করিলেও পরে বৌদ্ধদিগকে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহও রাজাদেশে দগ্ধ করা হয়। একদিকে ব্রাহ্মণ্য, অন্যদিকে বৌদ্ধ এই দুই ধর্মদ্বন্দ্বের যুগ-সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে পদার্পণ করেন। ত্রিমন্দ নগরে, দক্ষিণাত্যের পথে মহাপ্রভু কয়েকবার বৌদ্ধদিগের সহিত ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় রত হয়েছিলেন এবং তাদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় চৈতন্যজীবনীকারগণ কেবল এই ঘটনাটির উল্লেখমাত্রই করেছেন। মহাপ্রভু এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল-তার বিস্তৃত বিবরণ তাঁরা প্রদান করেননি। বৌদ্ধগণ তর্কে পরাজিত হয়েছেন এবং মহাপ্রভু তাঁদের স্বমতে আনয়ন করেছিলেন। কিন্তু এই বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মের কোন যানের ধারক, তাঁদের জীবনচর্যা ও আচার-ব্যবহার এবং ধর্মতত্ত্ব কি ছিল তা জানা যায়নি। মহাপ্রভু কোন বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনাও পাওয়া যায় না। কেবল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন বৌদ্ধাচার্য কর্তৃক উত্থাপিত ‘নবপ্রস্থান’ বা নয়টি মত মহাপ্রভু দৃঢ়যুক্তিবলে খণ্ডন করেছিলেন।

চৈতন্যজীবনী সাহিত্য অনুযায়ী চৈতন্যদেব ১৩/১৪টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কৈশোরে গদাধর পণ্ডিতের টোলে তিনি সংস্কৃত ছাড়াও পালি, প্রাকৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন বলে গৌড়পদ তরঙ্গিনীতে উল্লেখিত হয়েছে। দক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি যে ভাবে বৌদ্ধপণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করেছেন তাতেও মনে হয় মহাপ্রভু স্বয়ং বৌদ্ধসাহিত্য ও দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দকে ‘অবধূত’ বলে অভিহিত করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ যোগমার্গ অবলম্বনকারী সাধক। মহাপ্রভুর উক্তি থেকেও জানা যায় অদ্বৈত ‘তরজাতে সমর্থ’ অর্থাৎ হেয়ালী ধাঁধা রচনায় পারদর্শী। ইহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনাকৌশল অনুসরণের পরিণতি বলে মনে হয়।

চৈতন্যজীবনী সাহিত্য পাঠে জানা যায় বাঙলায়, উড়িষ্যা ও দক্ষিণাত্যে তখনও অল্পসংখ্যক খাঁটি বৌদ্ধ বাস করতেন। মহাপ্রভু বৌদ্ধ নির্বাণ, শুক্তবাদ, ক্ষণিকবাদ, ও নিরাশ্রয়বাদ প্রভৃতি খণ্ডন করেছিলেন। আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধ শূন্যবাদ খণ্ডন করে মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মায়াবাদ খণ্ডন করে ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচার করেন। এইভাবে ভারতীয় চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন চেতনার নবজাগরণরূপে পরিগণিত হয়েছে। অবশ্য বিশুদ্ধভক্তি শ্রীচৈতন্য আবিস্কারের পূর্বেও মহাযান সাধনায় পাওয়া যায়। শরণাগতির বিষয় বৌদ্ধধর্মেই প্রথম গৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ‘ত্রিশরণ’ মন্ত্রেই ভারতীয় ধর্মে প্রথম আত্মসমর্পণের বাণী ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধদেবের পূর্বে ভারতবর্ষের আর কোন

চিন্তা-নায়কের কণ্ঠে শরণাগতির অনুরূপ পথ প্রদর্শিত হয়নি। বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী হয়েও কালক্রমে ভক্তদের মনোমন্দিরে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ‘সদ্ধর্মপুণ্ডরীক’ গ্রন্থে বুদ্ধদেবই স্বয়ম্ভু, শ্রষ্টা, অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বর। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মে ‘মহাসুখবাদ’ অর্থাৎ বুদ্ধই আনন্দস্বরূপ -এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেই প্রথম ভক্তধর্মের বীজ উগ্ঠ হয়েছিল। পরবর্তীযুগে বৈষ্ণবধর্মের অনুকূল পরিবেশে তা পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়েছে।

বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধদিগের জাতিভেদ বিরোধিতাকেও সাঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় বৈষ্ণবধর্মেও সকল জাতি ও ধর্মের লোকের প্রবেশাধিকার ছিল। বুদ্ধদেব নাপিত উপালি, কর্মকারপুত্র চন্দ্র এবং সুনীত প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যক্তিকেও জীবনসাধনায় মাস্তুলিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও অনুরূপ সর্বাঙ্গিক জীবনবোধের মহিমায় প্রকাশ ঘটেছিল। চৈতন্যভক্ত হরিদাস মুসলমান ছিলেন, রূপসনাতন জাতিচ্যুত ছিলেন। জাতিভেদের কালিমা ও গ্লানি বিদূরিত করে মহাপ্রভু নবজীবনমন্ত্রে জাতিকে উজ্জীবিত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে-

“কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥”^{১০}

কৃষ্ণ ভজনে সর্বজাতির সর্বমানবের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে শ্রীচৈতন্য জাতীয় প্রাণবত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। জাতির কর্ণে তিনি নবজীবনমন্ত্র প্রদান করেছিলেন। কেবল নবমন্ত্রে উদ্বোধিত করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁর পরিকরদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক স্লেচ্ছ জাতির কুণ্ঠাকে তিনি বরদাস্ত করেননি। যবন হরিদাসকেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মৃত্যু ঘটলে হরিদ পবিত্র পাদোদক শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণও পান করেছিলেন। অকুণ্ঠ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন-

“মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।

সকল জানিলা তুমি রহি’ এই ঠাঞি ॥”^{১১}

উপসংহার:

ঐতিহাসিক বুদ্ধ যে পথে মহাযান তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনায় পরম তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছেন সেই পথেই শ্রীচৈতন্যদেবও নরদেহধারী দিব্যসত্তারূপে পরিগণিত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যপরিকর এবং জীবনীকারদের অলৌকিক বিশ্বাসপ্রবণতার এবং ভক্তির প্রাবল্যে শ্রীচৈতন্যের মানব পরিচয় মুছে গেছে, তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত এক দেহে রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার। এই জন্যই তাঁর অন্তর কৃষ্ণময়, কিন্তু দেহকান্তি শ্রীরাধার। সম্ভবতঃ এইভাবে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার অস্বয় মূর্তি কল্পনার চরম ও পরম প্রকাশ ঘটেছে। বুদ্ধদেবকে শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করেছেন এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। চৈতন্য জীবনীকার লিখেছেন-

“রঘু-সিংহ বৌদ্ধ কঙ্কি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥

এই যত যত অবতার সে সকল ॥”^{১২}

অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য বুদ্ধাবতার-মূর্তিও পরিগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং অবনমিত বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়ার যুগে আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধমত খণ্ডন করলেও শ্রীচৈতন্য বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধকে রামচন্দ্র, নৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণ এবং কঙ্কি প্রভৃতি বিষ্ণু অবতারের সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়েছেন।

সেইযুগের ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত স্মার্ত পৌরাণিক সমাজের দুর্বল জড়তার মর্মমূলে কঠিন কুঠারাঘাত করে শ্রীচৈতন্যকেও বুদ্ধদেবের ন্যায় বহু সমালোচনা ও বাধার সম্মুখীন থেকে হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যসমাজে যা অনাচার, তাই মহাপ্রভুর আচারনিষ্ঠায় পরিণত হয়েছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত গতানুগতিক জীবনে ভগবান বুদ্ধ বৈপ্লবিক দাহ সঞ্চার করেছিলেন। এই অগ্নিদাহে সেইদিনও সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদাভেদ তিরোহিত হয়েছিল। যুগসঞ্চিত কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে সজীব প্রাণবত্তায় সিদ্ধকাম ভারতবর্ষ নবজন্ম লাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও যোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণাবয়ব পরিণতি লাভ করেছিল।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, বৃন্দাবনদাস। (১৯২৮)। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পৃষ্ঠা- ১৮৬
- ২। কবিরাজ, কৃষ্ণদাস। (১৯৭৬)। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা- ৪০৩
- ৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০৪
- ৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০৫
- ৫। পূর্বোক্ত
- ৬। সেন, দীনেশচন্দ্র, গোস্বামী, বানোয়ারীলাল। (১৯২৬)। গোবিন্দ দাসের করচা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা- ২৩
- ৭। কবিকর্ণপুর। (১৭৭৫)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, কলিকাতা কমলাসন যন্ত্র, পৃষ্ঠা- ২৩৬
- ৮। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, পৃষ্ঠা- ৫৬৪
- ৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৬৫
- ১০। পূর্বোক্ত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পৃষ্ঠা- ৩০৪
- ১১। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, পৃষ্ঠা- ১০৯১
- ১২। পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবৎ, পৃষ্ঠা- ৮৩২।

‘কে কবি—কবে কে মোরে?’ জিজ্ঞাসু মধুসূদন ও প্রশ্নোত্তরের

সমাপ্তন

আকাশ বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, হুগলী

সারসংক্ষেপ: মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁর ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ রচনাকালে একাধিকবার মগ্ন হতে দেখা গেছে— কবি এবং কবিতার সংজ্ঞা নির্ণায়ক রূপরেখা নির্মাণে। কোনও কবিতায় প্রশ্নে আকুল হয়ে বলছেন – ‘কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,/কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,/ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে/ এ বৃথা সংশয় কেন?’; কখনও জিজ্ঞাসু হয়ে উপর্যুপরি জানতে চাইছেন ‘অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে/নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,/লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?’ কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন ও প্রতর্ক তুলেছেন ‘কবি’ শিরোনামের চতুর্দশপদীটিতে। আলোচ্য ‘কবি’ সনেটটিতে ইতিহাসের টুকরো খণ্ডের মতো মধুকবির এই কবি ও কবিতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও অভিমত জানতে পারা যায় অনেকখানি। প্রথমই প্রতর্কের উপস্থাপনার মতো কবি প্রশ্ন তুলেছেন ‘কে কবি-- কবে কে মোরে?’ মূল প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়েছে প্রথম চতুষ্টকে, দ্বিতীয়াংশে সংযোজিত হয়েছে তারই উত্তর। ষটকে তাই ব্যাখ্যাত হয়েছে অধিক বিস্তারে – ইতিপূর্বে অষ্টকে উপস্থাপিত হয়েছিল যে বক্তব্য। বাংলা কাব্যজগতে এই সনেটটি নিঃসন্দেহে অনন্য এক সংযোজন।

সূচক শব্দ: কাব্য, কবি, কবিতা, সনেট, চতুর্দশপদীকবিতা, গীতিকবিতা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ।

মূল আলোচনা: কবি শব্দটি ‘কু’ ক্রিয়ামূল প্রসূত একটি শব্দ। যে ‘কু’-র অর্থ হলো অ-সাধারণ (নবরূপে উল্লীর্ণ)। এ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে-- কবি সেই মানুষ; যিনি সাধারণ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি অথবা প্রচলিত শব্দকে নতুন রূপে উল্লীর্ণ করতে সক্ষম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ‘কবি’ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘পয়েট’ (poet); সংকলিত হয়েছে ল্যাটিন ভাষার প্রথম শব্দরূপ বিশেষ্যবাচক পুংলিঙ্গ ‘পয়েটা, পয়েটে’ (‘poeta, poetae’) –থেকে।

আভিধান মতে ‘কবি’ শব্দের অর্থ কাব্য লেখক। তাছাড়াও পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞ এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে গায়কও। যেমন ছিলেন কবি-গানের কবিওয়ালারা। মোদ্দা কথা কবি সেই ব্যক্তি বা সাহিত্যিক, কবিত্ব শক্তির অধিকারী, কাব্য রচনা করেন। অর্থাৎ কার্যত যিনি কবিতা লেখেন, তিনিই কবি। কিন্তু একথা সকলে মানেন তা নয়। বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি স্পষ্ট বলছেন, ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি’।^১ অর্থাৎ ‘কবিতা’ লিখলেই বা প্রয়াসী হলেই কেউ যেমন কবি হয়ে যান না, তেমন ‘কবিতা’-কেও কবিতা হয়ে উঠতে হয়। ‘কবিতার কথা’-র গ্রন্থটির প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই জীবনানন্দ দাশ বারংবার করে জানিয়েছেন এই উপলব্ধির কথা।

আর ‘সাহিত্য-সন্দর্শন’-এ কবিতার সংজ্ঞা নির্মাণ করতে বসে শ্রীশচন্দ্র দাশ বলেছিলেন: ‘বাহিরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-কল্পনাকে যে-লেখক অনুভূতি-মিষ্ট ছন্দোবদ্ধ ও শিল্প-সঙ্গত তনু-শ্রী দান করিতে পারেন, তাহাকেই আমরা

কবি নামে বিশেষিত করি।^৭ কিন্তু এদের অনেক আগে এক অর্থে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম সার্থক শিল্পী অথবা বাংলা গীতিকবিতার প্রকৃতপ্রস্তুবে প্রথম ঋত্বিক মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও বস্তুত তাঁর সর্বশেষ মৌলিক সৃষ্টি অর্থাৎ ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ রচনাকালে একাধিকবার মগ্ন হতে দেখা গেছে - কবি এবং কবিতার সংজ্ঞা নির্ণায়ক রূপরেখা নির্মাণে।

১৮-৬৫ সালে ফ্রান্সের ভার্সাইতে বসে পাশ্চাত্য আদর্শে বাংলা সনেট রচনার সময় থেকে একাধিক সনেটে এই অন্বেষণে অস্থির মধুসূদন।

কোনও কবিতায় প্রশ্নে আবুল হয়ে বলছেন- ‘কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,/কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,/ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে/এ বৃথা সংশয় কেন?’^৮, কখনও ‘কবিতা’ শিরোনামের সনেটে জিজ্ঞাসু হয়ে উপর্যুপরি জানতে চাইছেন ‘অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষু ধরে/নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,/লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?’^৯ আবার কখনও স্বীয় ‘কল্পনা’হীনতার জন্য আক্ষেপ করে পড়ছে তাঁর কণ্ঠে: ‘লও দাসে সঙ্গে সঙ্গে, হেমঙ্গি কল্পনে,/বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখি, ভিক্ষা করি;/হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,--/নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি!’^{১০}

এছাড়াও ‘কৃতিবাস’, ‘কাশীরাম দাস’, ‘জয়দেব’, ‘কালিদাস’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত’, ‘কবিগুরু দান্তে’, ‘কবির আলফ্রেড টেনিসন’, ‘কবির ভিক্টর হুগো’, ‘বাঙ্গালীকি’ প্রমুখদের নিয়ে অথবা ‘মিত্রাক্ষর’, ‘রামায়ণ’, ‘নন্দন-কানন’, ‘বঙ্গভাষা’ ইত্যাদি সনেটেও মহাকবিদের পাশাপাশি অবিরল এসেছে কবিতা রচনা সম্পর্কিত একাধিক প্রশ্নাবলি, নিবেদনপ্রবণ প্রশঙ্গ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন ও প্রতর্ক তুলেছেন ‘কবি’ শিরোনামের চতুর্দশপদীটিতে।

কিন্তু তুলেছেন কেন; সম্ভবত এই প্রণোদনার উত্তর পাওয়া সম্ভব তাঁর সময়কালের দিকে তাকালে। ভারতচন্দ্র-উত্তর অর্ধ শতকেরও বেশি সময় পর কুয়াশাচ্ছাদিত বাংলা কবিতার আকাশে যখনও দেখা নেই কোনও পরিবর্তনের ক্ষীণ সম্ভাবনার, মধুসূদনের আগমনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে-- অলংকার বহুল শব্দ রাশি এবং যেন-তেন-প্রকারেণ অন্তর্মিল করে দেওয়ার যোগ্যতাই তখনও পর্যন্ত কবিতা রচনায় সাফল্যের মাপকাঠি। কবিওয়ালাদের করতলে আমলকির মতো বন্দী বাংলা কাব্য-প্রতিমার মুক্তি সুদূরপর্যন্ত। সেই সময় অনেক অপচয়ের পর মাতৃভাষায় কাব্য রচনার জন্য কালীর দোয়াতে কলম ডোবাতে মনস্থ করা মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিন্তু দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বা প্রায় সমসাময়িক-পূর্বজ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র পায়ে পায়ে তৈরি পথ চলার রাস্তা ধরে এগোতে নিমরাজিও হতে পারেননি। দেশি-বিদেশি ধ্রুপদী কাব্য-নাটক-মহাকাব্যের নিবিড় পাঠক মধুসূদন ভাব বা রসের দিক দিয়ে প্রায় কোনও অনুচিকীর্ষার উপকরণই ইংরেজের হাতে সাম্রাজ্যের বেটন চলে যাওয়ার পর রচিত সে-যুগের জনবহুল বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাননি। তাঁর রুচি এবং বেড়ে ওঠার মধ্যেই ছিল এই কার্য ও কারণ। আসলে বাংলায় লিখতে শুরু করবার পর বা আগে থেকেই কবিতা কী এবং কবি কে - এই প্রশ্নে তিনি যে তীব্রভাবে আলোড়িত ছিলেন, এর জন্য কোনও সাক্ষী-সবুৎ, পাথুরে প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ নিজস্ব পথ নির্মাণের প্রচেষ্টায় নিরন্তর তাড়িত, পীড়িত, দগ্ধ না হলে তাঁর পক্ষে নিদর্শনের মতো অনন্য নিজস্ব ছন্দ এবং ভাষাশৈলী নির্মাণ সম্ভব হতো না। জীবনী বা তাঁর কাব্য, নাটক, মহাকাব্য পাঠের বিবরণ এবং সেই সম্পর্কিত মন্তব্য সম্বলিত তীক্ষ্ণ চিঠিপত্রগুলি পড়তে বসলে বোঝা যায়; একজন অতি উন্নত রুচির সাহিত্যবোদ্ধা ও অকুতোভয় সমালোচক তাঁর মধ্যে জেগে থেকেছে অতন্দ্র। বস্তুত কবিতা কী এবং কাকে বলা যাবে কবি; এই ভাবনা তাঁকে

যেমন আলোড়িত করেছে, তেমনই যথোপযুক্ত নিদর্শন নির্মাণে করে তুলেছে অনুসন্ধানী ও অভিযাত্রী এবং বঙ্গভাষার বিবিধ রতনের মাঝে সর্বাত্মে যাঁর স্থান; উপহার দিয়েছে সেই কবিশ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কে।

আলোচ্য ‘কবি’ সনেটিটিতে ইতিহাসের টুকরো খণ্ডের মতো মধুকবির কবি ও কবিতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও অভিমত জানতে পারা যায় অনেকখানি। প্রথমেই প্রত্যেকের উপস্থাপনার মতো কবি প্রশ্ন তুলেছেন ‘কে কবি - কবে কে মোরে?’^৬ এ-কথা অনস্বীকার্য যে, এ জিজ্ঞাসা যুগ যুগান্তরের এবং এই জিজ্ঞাসার জবাবে, নানা কিসিমের উত্তরও জমা হয়ে আছে বৈশ্বিক জ্ঞানবিশ্বে। কিন্তু সেই উত্তরনিচয় নিঃসন্দেহে যথেষ্ট মনে হয়নি কবির কাছে। তুণ্ড করতে পারেনি তাঁর আত্মজিজ্ঞাসাকে। ঐতিহাসিক ভাবেও সম্ভবত একটা সময় পর্যন্ত নিঃসন্দেহে অলংকৃত বাক্য নির্মাণে সক্ষম হলেই কেউ ‘কবি’-স্বীকৃতির যোগ্য কি না - এই উত্তর সন্ধানী ব্যক্তি মধুসূদন পৌঁছতে পারেননি কোনও স্থির সিদ্ধান্তের ব-দ্বীপে। তিনি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন-- চটকদারি মোহিনী বাক্ বৈভবের অতিরিক্ত যে আশ্চর্য মায়ার জগৎ, অলৌকিক এক ভিন্নতর বিশ্ব, স্বভাব নৈপুণ্যে অবলীলায় তৈরি করেছেন, করেন, করতে পারেন প্রকৃত লেখক বা কবির, তা সম্ভব হয় কীভাবে!

পাঠক জানেন, সনেটিটির প্রথম অষ্টক রচিত হয়েছে শেক্সপীয়রিয় এবং ষটক অংশটি পেত্রাকীয় রীতিতে। মিল বিন্যাস: কথ কথ কথকথ, গঘগ, ঘগঘ। এবং কবিতা রচনার অবিকল্প উপাদান যেহেতু ‘শব্দ’, তাই যেন মধুসূদনও তাঁর যৌক্তিক উপস্থাপনার সূচনা করেছেন সেই শব্দ সংযোজনার সূত্র ধরেই।

নিজের তোলা প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেছেন: ‘ঘটকালি করি,/শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,/সেই কি সে যম দমী?’^৭ আসলে কবিশয়ঃপ্রার্থীর সকলেরই তো একমাত্র আশুখ অথবা অবলম্বন বলতে অনাদি কাল ধরে গড়ে ওঠা শব্দের ভান্ডার। সেখান থেকে বেছে নেওয়া শব্দ গোঁথে গোঁথেই তো নির্মাণ করতে হয়-- কবিতার শরীর।

মনে হতেই পারে, কী এমন নতুন কথা জিজ্ঞাসা করছেন মধু কবি! এখানে আসলে শব্দ চয়নের মধ্যেই নিহিত হয়ে থাকে কাক্ষিত প্রত্যুত্তরটিও। ইঁটের পরে ইঁট গাঁথার মতো শব্দের পরে শব্দ সাজালেই আসলে যে কবিতা হয় না, দক্ষ ঘটকের মতো প্রচলিত শব্দভান্ডার অথবা অভিধানের অনেক দিনের না উল্টানো পৃষ্ঠা থেকে চয়ন করে এনে হলেও রাজঘোটকের মতো শব্দের পাশে শব্দ বসিয়ে যিনি বেঁধে দিতে পারেন আদর্শ দম্পতির মতো, যিনি আপাত নিষ্প্রাণ শব্দ-বন্ধেই নির্মাণ করতে পারেন অগ্নির সাক্ষী রেখে সাত পাকের বাঁধনের মতো অচ্ছেদ্য সাত জন্মের বন্ধন, যার ব্যবহারিক গুণে পরপর বসানো শব্দগুলি শুধু অতলান্তিক গভীরতাই পায় না তৎসহ অবধারিত হয়ে ওঠে চিরকালীন অবস্থানে; মধুসূদনের মতে তিনিই একমাত্র কবি শিরোপার যোগ্য। তাকেই ‘যম দমী’ বলে আখ্যায়িত করেন তিনি। কেননা কবি হয়ে উঠতে পারার কৃতিত্ব একবার অর্জন করতে পারেন যে জন, সেই কীর্তিমান সেই মুহূর্তেই অতিক্রম করে যান মৃত্যুকে। তার অমরত্বকে গ্রাস করবার ক্ষমতা মৃত্যুর দেবতা স্বয়ং যমরাজেরও আর থাকে না। যেন সেই জন্যেই এরপরেই মধুসূদন আবার প্রশ্নচিহ্নের অনুষঙ্গে নির্মাণ করেন উত্তরবোধক আর-একটি বাক্য! ‘তার শিরোপরি/শোভে কি অক্ষম শোভা যশের রতন?’^৮

বৈয়াকরণিক হয়তো বলবেন ‘শিরোপরি’ অর্থাৎ মাথার উপর শব্দটি অশুদ্ধ। শিরঃ+উপরি = শিরউপরি হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে বাংলা কবিতার স্বয়ং কবিস্বরূপ মধুসূদন

তাঁর একাধিক পূর্ব কীর্তি মতোই ছন্দের প্রয়োজনে উপেক্ষা করেছেন ব্যাকরণের বিধানকে। অব্যাকরণসম্মত শব্দই ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। এখানে অলংকার শাস্ত্র জানা পাঠককে বলা বাহুল্য যে ‘যশের রতন’ মানে যশ যেন রত্নের মতো শোভা বর্ধন করছে অর্থাৎ রূপক অলংকার আর সেই অলংকারের আতিথেয় যেন মধুসূদন বুঝিয়ে দিচ্ছেন কী ভাবে অমর হয়ে যান-- একজন কবি। একজন প্রকৃত স্রষ্টা। সুনাম; প্রজ্বলিত রত্নের মতো অহর্নিশ শোভা বর্ধন করে যাঁর মাথার মুকুটে, মৃত্যুকে সে অতিক্রম করে যাবে না তো; পারবে কোন্ অপর জনে! এরপরে বস্তুত প্রশ্নের ঘেরাটোপে নিজস্ব মত ব্যক্ত করার অভিপ্রায়টুকুও বেড়ে ফেলেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। স্পষ্ট করে বলেন: ‘সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী/যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,/অন্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি/ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।’*

কবিত্বের মূল শক্তি যে কল্পনা প্রতিভা তাকেই এখানে দেবীরূপে আখ্যায়িত করছেন কবি। আর বলছেন কমলের উপরে যেমন হিন্দু দেব-দেবীর অধিষ্ঠান, ঠিক তেমনই মন অর্থাৎ মানুষের চেতনা চেতন্য হচ্ছে এই কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাধের আসন। সূর্য যেমন চির মনোহর কোমল কিরণ প্রভা বিতরণ ক’রে-- যাওয়ার বেলায় আবার খেলায় রাঙিয়ে দিয়ে যায় আকাশটাকে, ঠিক তেমন করেই আসলে কল্পনার দেবী কবি-প্রতিভা অর্জনের আশীর্বাদে ধন্য করে দেন সার্থক কবির ভাবনার জগতকে। দেখার চোখকে। অভিব্যক্তির অধিকারকে। তখন ভাবের সংসারে অর্থাৎ প্রকৃত ভাবময় কাব্যজগতে প্রবেশের অধিকার অর্জনে সক্ষম হন সেই মানুষ। সাধারণ কবির যশঃপ্রার্থীর বদলে তিনি হয়ে ওঠেন প্রকৃত অর্থে কবি। যথার্থ স্রষ্টা। মধুসূদন বলতে চান, তিনিই প্রকৃত কবি - যাঁর মনরূপী কমলে কল্পনা দেবী বিরাজমান থাকেন। অধিষ্ঠান করেন। দিনশেষের সূর্যালোকের মতো ভাবের সংসারে যিনি কল্পনার সোনার কিরণ ছড়িয়ে দিতে পারেন, তৈরি করতে পারেন অলৌকিক রসের জগৎ।

এখানেই শেষ হয়ে যায় কবিতার প্রথম ভাগ অর্থাৎ ‘অষ্টক’। যেখানে মধুসূদন প্রতিষ্ঠা করেন এই সত্যকে যে, মহৎকাব্য রচয়িতা অর্থাৎ প্রকৃত কবি যিনি, তিনি অমরত্বের আশীর্বাদে চিরকালীন হয়ে থাকেন, থাকবেন-- মৃত্যুর শাসনকে পরাস্ত করে। যমও পরাভূত তাঁর কাছে। শুধু শব্দ যোজনার অধিকারেই এই অমরত্বের প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব হয় না। শব্দে শব্দে বিয়ে দেওয়ার দায়সারা ঘটকালিতেও নয়। শব্দে শব্দে বিয়ে দিতে হয় এবং তাদেরকে করে তুলতে হয়—রাজযোটক। তবে হয়। তখন তিনি আর কবিও থাকেন না কেবল। হয়ে ওঠেন যমদমী মৃত্যুঞ্জয়। সাক্ষাৎ নচিকেতা। ছন্দ জিজ্ঞাসাগুলিকে একের পর এক ছুঁড়ে দিতে দিতে, আদতে যা মধুসূদনের প্রিয় রীতিও বটে; নিজেই জিজ্ঞাসাগুলির উত্তরও দিয়ে চলেন তিনি। প্রকৃত কবিকে চিনে নেওয়া, শনাক্ত করতে পারা—এই বিষয়টি সম্পর্কেই তো আসলে তিনি অবগত করতে চান পাঠককে। বলতে চান—প্রকৃত কবি হয়ে উঠতে পারা সহজসাধ্য কর্ম নয় কোনও। প্রকৃত যিনি কবি তাঁর মাথায় থাকে যশ-রতনের অক্ষয় মুকুট, তিনি অমর। শুধু কবিসুলভ শব্দে-শব্দে বিয়ের অভ্যাসবশত ঘটকালিতেই পাওয়া যায় না সেই অক্ষয় যশ। বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়োজনে মধুসূদনকে যেতে হয় আরও গভীরে। ভাবময় জগতের অলৌকিক উপস্থাপনার কথা বলেই বিরত থাকতে চান না তিনি।

শেষ ছটি চরনে মধুসূদন প্রসঙ্গ পাড়েন মানুষের আবেগ ও অনুভূতিগুলির। কারণ এই অনুভূতিগুলি যেমন কবিকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয়, তেমনই সেই আবেগময় পরিবেশনার আলিঙ্গনে ধরা দিতে পাঠককে, শ্রোতাকে উৎসাহিতও করে।

মধুকবি বলেন : আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে;
 অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে;
 নন্দন-কানন হতে যে সৃজন আনে
 পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;
 মরুভূমে-- তুষ্ট হয়ে যাহার ধ্যানে
 বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !^{১০}

তিনি বলতে চান, যাঁর লেখনীর শাসনে আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতিগুলি বশীভূত, যাঁর আজ্ঞায় এরা সংযত কিন্তু বিকশিত, তিনিই হলেন যথার্থ কবি। তাঁর ইচ্ছাতেই যেন অরণ্যে কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে! সেই সৃজনই স্বর্গের নন্দনকানন থেকে পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমল বয়ে এনে বিতরণ করে দেন ধূলোময় পৃথিবীর ধরিত্রীপুত্র সহৃদয় হৃদয় সংবাদী পাঠকদের অনুভূতি প্রদেশে। ভুলে গেলে চলে না প্রাচীন ভারতীয় রসশাস্ত্রও কাব্যপাঠের আনন্দকে তুলনা করেছে ব্রহ্মস্বাদলাভের সঙ্গেই।

মধুসূদন যেন বলতে চাইছেন যথার্থ কবি হয়ে ওঠবার জন্য চাই দিব্যদৃষ্টি লাভের সাধনা। চাই ধ্যানস্থ হওয়ার শক্তি। বিশ্বস্রষ্টা সেই ধ্যানে, আততিতে, অধ্যাবসয়ে সম্ভুষ্ট হলে-
 - যেন মরুভূমির বৃকেও কঙ্কালিত তটিনী প্রবাহিত করার সামর্থ্য দেন! আসলে কবিই তো পারেন পাথরেও ফোটাতে ফুল। আসলে কবিই তো কেবল ঝড়ে ভাঙা তরীকেও পৌঁছে দিতে পারেন কুলের কাছাকাছি।

সম্ভবত মধুসূদন সমূহ প্রস্তাবনার শেষ লগ্নে এসে প্রতিষ্ঠিত করতে চান একটিই সত্য যে, কল্পনাশক্তিই কবি বা কবিত্বের আদত এবং প্রধানতম উপাদান। ছন্দের চাকচিক্য ও অলঙ্কারের আড়ম্বর দেখে কবির বিচার অনৈতিক ও ভ্রান্তিময়। কবিতার মতো অন্তরঙ্গ গৌরবে গরীয়সী শিল্পকলার বিচার; বাহিরাগ্নিক প্রসাধনকলার তুলায়ন্ত্রে অসম্ভব। কল্পনাশক্তির সাহায্যে যিনি ভাব-রস-সৌন্দর্যের অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই আসলে কবি। আর যিনি কবি তিনি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো। মরণ নামক এক প্রবল মাধ্যাকর্ষণেরও অনেক উপরে।

এই সনেটে মধুসূদন যে ভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কবিত্বের সংজ্ঞা, যেভাবে বিবৃতির মধ্যে দিয়ে ধরতে চেয়েছেন কাব্যনির্মাতার প্রকৃত স্বরূপ; তাতে মহাকবির পাশাপাশি প্রবল ভাবে উঠে এসেছে তাঁর পরিশীলিত সমালোচক সত্তার পরিচয়টিও।

তাঁর সমসময়ে যে সমস্ত গতানুগতিক রচনা কবিতা নামে আখ্যায়িত হ'ত, যেগুলিকে তাঁর মহাকাব্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে কাব্য বলেই স্বীকার করা সম্ভব ছিল না এবং সেই সুবাদে রচয়িতাদেরও গ্রহণ করতে পারা সম্ভব ছিল না 'কবি' বলে। পাশাপাশি তাঁর কবিপ্রাণ বিভোর হয়ে ছিল যে আদর্শ কবিতা রচনার স্বপ্নে, তাঁর মনে স্বপ্নের মিনারের মতো জেগে ছিল-- কবিত্বের যে সমুদ্রত আদর্শ; এই সনেটটির অনন্য অভিব্যক্তিতে একত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই সমস্ত অনুভূতিগুলিও। কৌশলের সঙ্গে উপস্থাপন ভঙ্গির চমৎকার সঙ্গতি এই সনেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অষ্টকের মধ্যে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ চতুষ্টকের উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়। মূল প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়েছে প্রথম চতুষ্টকে, দ্বিতীয়াংশে সংযোজিত হয়েছে তারই উত্তর। ষট্কে তাই ব্যাখ্যাত হয়েছে অধিক বিস্তারে - ইতিপূর্বে অষ্টকে উপস্থাপিত হয়েছিল যে বক্তব্য। বাংলা কাব্যজগতে এই সনেটটি নিঃসন্দেহে অনন্য এক সংযোজন।

সনেটটি পড়লে বোঝা যায় কেন সমালোচকরা মনে করেন মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি শুধু বাংলা গীতিকবিতার প্রথম উদ্ভাস নয়, আদতে প্রথম সার্থক বাংলা গীতি কবিতাই। সনেট হওয়া সত্ত্বেও, সুনির্দিষ্ট বর্ণ ও পঙ্ক্তির শাসন মেনেও এবং একাধিক সনেট ফরমায়েসে লিখতে হলেও যেভাবে এই সনেটগুলি ধারণ করে থাকে কবির ব্যক্তিক এবং একান্ত নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতির মণিমুক্তগুলিকে, বুকের রক্ত এবং চোখের জলকে; এই সনেটটিতেও সেইভাবেই মূর্ত হয়ে আছে - তাঁর নিজস্ব বোঝাপড়া, এক অর্থে তাঁর মনের কথা। যা প্রকাশিত হয়েছে একান্ত মধুসূদনীয় আত্মবিশ্বাসী অক্ষরমালার সুনিপুণ বয়ানে। যা বোধে ও বিশ্বাসে ব্যক্তিগত। উচ্চারণ ও অভিপ্রায়ে দৃঢ় এবং অচঞ্চল।

যে অনুভবের সূত্রে অবলীলায় জুড়ে যায় আধুনিক যুগের বাংলা কবিতার প্রথম শিল্পী মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর জন্মের পাঁচাত্তর বছর পর ভূমিষ্ঠ হওয়া বাংলা কবিতার চিরকালীন যুবরাজ জীবনানন্দ দাশের বোধের প্রাচীর। সকলেই যে কবি নন; এ কথা তাঁর প্রবন্ধে জীবনানন্দ স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন। সেই একই কথা তাঁর অনেক আগে এক অর্থে বাংলা গীতিকবিতার প্রথম আদর্শ নিদর্শন ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ রচনা করতে বসে আলোচ্য ‘কবি’ নামের সনেটটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তও কম স্পষ্ট করে বলেননি। বড়ো মানুষরা বোধ হয় সর্বকালে সর্বযুগে এ-রকম ভাবেই একই রকম ভাবেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। জীবনানন্দ দাশ, ‘কবিতার কথা’, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, দশম সংস্করণ: মাঘ ১৪১৩ (প্রথম সংস্করণ : ৬ই ফাল্গুন), পৃ. ৭।
- ২। শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন, দি এলিট প্রেস, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৬০, পৃ.৩০।
- ৩। মধুসূদন দত্ত, ‘পরিচয় (১৪)’, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ : জুন ১৯৯৯ (প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬৫), পৃ.১৬২।
- ৪। ঐ, ‘কবিতা’, পৃ.১৬৩।
- ৫। ঐ, ‘কল্পনা’, পৃ.১৬৭।
- ৬। ঐ, ‘কবি’, পৃ.১৬২।
- ৭। ঐ।
- ৮। ঐ।
- ৯। ঐ।
- ১০। ঐ।

‘রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবির ছবি’-

একটি বিশ্লেষণমূলক পাঠ

সাধন বিশ্বাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জাপান, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশগুলিতে ভ্রমণ করে এলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ঠিক সেই ধারাতেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও একই পথে হাঁটতে শুরু করেছে এবং মানুষ যেন যন্ত্রমুখী হতে শুরু করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনই বুঝতে পেরেছিলেন এই যন্ত্রসভ্যতা কখনোই আমাদের ভারতীয় সভ্যতাকে অগ্রগতি এনে দিতে পারবে না। তখন মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে বিভিন্ন শিল্প বা কলকারখানাতে কাজ করতে লাগলেন। ফলে তারা যেন নিজেদের মানবিকতাকে শেষ করে দিয়ে স্বার্থস্বার্থীতে পরিণত হলো। তাই এই চিন্তাধারাকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি, কারণ তিনি ভেবেছেন কৃষি সভ্যতাই আমাদের সমাজ তথা দেশকে শান্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ভাবনাকে তিনি তাঁর ‘রক্তকরবী’ নাটকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। ‘রক্তকরবী’র রাজা অসীম শক্তির অধিকারী সেই শক্তির বলে জগতের সমস্ত ভোগকে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু নন্দিনীর উপস্থিতিতে রাজা যেন খানিকটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন, সে তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আর বজায় রাখতে পারছিলেন না। একদিকে তার সহজাত প্রবৃত্তি অপরদিকে তার ক্রমশ পিছিয়ে পড়া আবহ এই উভয় সমস্যা যেন তাকে পাগল করে তুলেছে। একদিকে রাজার হিংসা, কুটিল শোষণ, অত্যাচারী মন অপরদিকে করুণা, শান্তি, মৈত্রীভাব সম্পন্ন মন এই দুই দ্বন্দ্ব ক্রমাগত রাজার অন্তরকে ভেঙে চুরমার করেছে। তাই সে নন্দিনীকে বলছে, ‘আমি তোমায় উল্টেপাল্টিয়ে দেখতে চাই না, পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই’। আবার সেই রাজাই পরক্ষণেই বলছে, ‘আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি- ‘আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত’। এখানে নাট্যকার একই রাজার দুরকম ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন, তা মূলত ধ্বংস আর সৃষ্টিরই পরিপূরক। এখানে রাজার দুই সভা, সেই দুই সভার মধ্যে এক সভা অপরসভ্যাকে নিভৃত করে তার নিজের স্থানকে আরও উর্ধ্ব স্থাপন করেছেন। তাইতো আমরা নাটকের সমাপ্তিতে দেখতে পাই রাজার হিংসাত্মক মনোবৃত্তি পরাজিত হয়ে সরল বন্ধনের বাণী লাভ করেছে। আর এই জয়ের পশ্চাতে ঈশ্বরের দান হয়ে কাজ করেছে ‘নন্দিনী’ নামক চরিত্রটি।

সূচক শব্দ: শিল্পবিপ্লব, যন্ত্রসভ্যতা, কৃষিসভ্যতা, দ্বন্দ্ব, যক্ষপুরী, অবক্ষয়, কর্ষণজীবী, আকর্ষণজীবী।

মূল আলোচনা: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাই তাঁর সৃষ্টি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে- ছোটগল্প, উপন্যাস, কাব্য-কবিতা, গান, নাটক বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে কৃতিত্বের শিরোপা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত কবি হলেও নাট্যকার হিসাবেও তার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। অতি সাধারণ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে মানুষের

বাইরের সমস্যা থেকে শুরু করে অন্তরের যেসব চিন্তন রয়েছে সেসব বিষয়কে তিনি তাঁর নাটকে দারুন ভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে রূপক সাংকেতিক নাটকের ধারায় তার কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তিনি ছোট থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে বড় হয়েছেন এবং তার চারিপাশকে তিনি যেভাবে দেখেছেন ঠিক অনুরূপভাবেই তাঁর লেখনীতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কবিপ্রতিভা ও নাট্যপ্রতিভা দারুনভাবে তাকে নাড়া দেয় তাই বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তার অবদান কিছু কম নয়। তাঁর নাট্য প্রতিভাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, সেগুলি হল - কাব্য নাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রঙ্গনাট্য, সামাজিক নাটক, রূপক সাংকেতিক নাটক ইত্যাদি। তবে আমার এই প্রবন্ধের মূল আলোচনার বিষয় হল তাঁর অন্যতম ‘রক্তকরবী’ নাটক।

রক্তকরবী নাটককে আমরা রূপক সাংকেতিক নাটকের ধারায় রাখতে পারি। তাঁর প্রথম নাটক ‘রাজা ও রানী’ (১৮৮৯) যেটি পাঁচটি অঙ্কে লেখা এবং এই নাটকে তিনি নিজেও অভিনয় করেছিলেন। তবে তাঁর এই ‘রক্তকরবী’ নাটক নিয়ে বহু সমালোচনা রয়েছে, কারণ নাট্যকার এই নাটকের নামকরণ নিয়ে পরিবর্তন করেছেন আবার চরিত্রের নামকরণেও পরিবর্তন করেছেন। আমরা জানি রক্তকরবী নাটকের প্রথম নাম ছিল ‘যক্ষপুত্রী’, পরে পরিবর্তন করে নাম করেছেন ‘রক্তকরবী’। জানা যায় তিনি শিলং পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে তিনি একখানি নাটক লেখেন যেটি পরবর্তীকালে ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় ‘রক্তকরবী’ (১৯২৩) নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপান, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশগুলিতে ভ্রমণ করে এলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন শিল্পবিপ্লবের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। ঠিক সেই ধারাতেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও একই পথে হাঁটতে শুরু করেছে এবং মানুষ যেন যন্ত্রমুখী হতে শুরু করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনই বুঝতে পেরেছিলেন এই যন্ত্রসভ্যতা কখনোই আমাদের ভারতীয় সভ্যতাকে অগ্রগতি এনে দিতে পারবে না। তখন মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে বিভিন্ন শিল্প বা কলকারখানাতে কাজ করতে লাগলেন। ফলে তারা যেন নিজেদের মানবিকতাকে শেষ করে দিয়ে ক্রমশ স্বার্থান্বেষীতে পরিণত হতে থাকল। তাই তিনি এইসব চিন্তাধারাকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি, কারণ তিনি ভেবেছেন কৃষি সভ্যতাই আমাদের সমাজ তথা দেশকে শান্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এইসব সামাজিক ভাবনাকে তিনি তাঁর ‘রক্তকরবী’ নাটকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘এই নাটকটি সত্যমূলক’। একটি নির্দিষ্টকালের বা সময়ের ঘটে যাওয়া কোন বাস্তব ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন তাই তিনি একে সত্যমূলক নাটক বলেছেন। এই নাটকের মূল প্রেক্ষাপট হল কর্ষণজীবীর সাথে আকর্ষণজীবীর দ্বন্দ্ব। একদিকে রয়েছে কৃষিভিত্তিক অর্থাৎ গ্রাম জীবনের কথা আর অপরদিকে রয়েছে যন্ত্র কেন্দ্রিক সভ্যতা অর্থাৎ শিল্পকেন্দ্রিক নগর সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন শিল্প বিপ্লব ফলে সভ্যতার অগ্রগতি যেমন হচ্ছে তেমনিভাবে মানুষের মানবিকতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এই মানবিকতার অবক্ষয়কে বিশেষ করে পল্লী প্রকৃতির কৃষিনির্ভর সভ্যতা থেকে মানুষ যেন দূরে চলে যাচ্ছে আর তাই ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ তথা সমাজ, এইসব বিষয়কে তিনি কখনোই ভালো চোখে দেখেননি। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয় যন্ত্রসভ্যতার সূচনা। সেখান থেকে ভারতবর্ষ বাদ যায়নি, যার ফলে মানুষ কৃষি সভ্যতাকে

ছেড়ে দিয়ে শিল্প বা বিভিন্ন যন্ত্রসভ্যতার কাজ করেন ফলে দেখা যায় সমাজ অবক্ষয়ের পথে চলে যাচ্ছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই দেশের যন্ত্র সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনোই একমত ছিলেন না। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে নষ্ট করে দেয়, সম্পর্কে গভীর আপত্তি সৃষ্টি করে দেয়। শিল্পায়নের ফলে এই উন্নতি সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির দিকে সমাজকে ধাবিত করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, “এই বাণিজ্য বাধাটাও হাঁসফাঁস করতে করতে এক এক পিণ্ড মুখে যা পুড়ছে, সে দেখে ভয় হয়। তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কি। লোহার হাত দিয়ে মুছে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানালে হজম করছে এবং লোহার শিরা ও উপশিরার ভেতর দিয়ে তার জগৎ জোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।”^১

এই নাটকটির মূল বিষয়বস্তু ছিল কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ কৃষি নির্ভর সভ্যতার সাথে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার একটি সুক্ষ লড়াই এই নাটকের মূল পটভূমি। এখানে কর্ষণজীবীর সভ্যতার অন্যতম প্রতিনিধি হলেন নন্দিনী চরিত্র। তার সাথে রয়েছে অধ্যাপক, বিশু, ফাগুলাল, কিশোর, চন্দ্রা সহ অন্যান্য কৃষক সম্প্রদায়। আকর্ষণজীবীর পক্ষে রয়েছে মকররাজ অর্থাৎ রাজা যিনি বেড়ার আড়ালে থাকেন আর রয়েছে তার সর্দারেরা যাদের আদেশেই সৈন্যরা অত্যাচার করেন সাধারণ মানুষের উপর। এখানে মকররাজের কাজ মাটির তল থেকে তালতাল সোনা উৎপাদন তাই তার মধ্যে সবসময় স্বার্থান্বেষী শক্তি কাজ করে। আর এই শক্তিকেই নিবারণ করেন নন্দিনী চরিত্র। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বলেছেন, “এমন সময়ে সেখানে নারী এলো, নন্দিনী এলো; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর। প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগলো লব্ধ দুঃচেষ্টার বন্ধন জালকে। তখন সেই নারী শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কি করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধা মুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।”^২ রক্তকরবী নাটকের নন্দিনী চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্যকে সামনে রেখে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে নন্দিনী কতটা মানবিক আর কতটাই বা তার সাথে মানবিক রূপের সংমিশ্রণ ঘটেছে। নন্দিনী চরিত্রের প্রেমের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিশ্বের সকল শক্তিকে পরাস্ত করতে চেয়েছেন, তাকে তিনি সেই ভাবেই তৈরি করেছেন তাই সে খুব সহজ, সরল, উদার, প্রাজ্ঞ। আমরা দেখেছি যে নন্দিনীর প্রেমের টানেই রাজাও শেষপর্যন্ত তার নিজের বেড়া জালকে নিজেই ভেঙে ফেলেন। তাই রাজা নন্দিনীকে বলেছে, “আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মত একটি ছোট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।”^৩

নন্দিনীর যক্ষপুরীতে আগমনের পূর্বে ও পরবর্তীকালে নাটকে আমরা দুটি ত্রিভুজ প্রেমের ছক দেখতে পায়। যক্ষপুরীতে আসার পূর্বে বিশু - রঞ্জন - নন্দিনীর ত্রিভুজ প্রেমের দৃশ্য দেখা যায়। এখানে বিশু নন্দিনীকে চেয়েছে কিন্তু পাইনি সে ব্যর্থ হয়েছে। মানবীয় জীবনের এক চরম সত্য, যাকে চাই তাকে পাই না আর যাকে পাই তা ভুল করে পায়, এখানেও যেন তাই হয়েছে। এটি আমরা বিশুর মধ্যে দেখতে পাই, কারণ সে নন্দিনীকে চেয়েছে কিন্তু নন্দিনী চেয়েছে রঞ্জনকে। তাই বিশু নন্দিনীকে পাইনি, সে ব্যর্থ প্রেমিক হয়েছে। আবার যক্ষপুরীতে আসার পরে দেখা যায়, রাজা - রঞ্জন - নন্দিনী ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র। এখানে মকররাজ চেয়েছে নন্দিনীকে কিন্তু নন্দিনী আবার চেয়েছে রঞ্জনকে। তাই শেষ পর্যন্ত

রাজা নন্দিনীকে পাবার জন্য রঞ্জনকে হত্যা করেছে। রঞ্জনের মৃত্যু নন্দিনীকে পার্থিব মানবীর মতোই পাগল করেছে এমনকি শোকে মৃত্যুমান হয়েছে, সে বলেছে রাজাকে, “আমি সইতে পারছি না এমন সর্বনাশ করলে?” নন্দিনীর এই শোকাচ্ছাদিত রঞ্জনকেও বাঁচিয়ে তোলার প্রয়াস এবং সবশেষে প্রতিশোধ স্পৃহার বসবর্তী হয়ে অন্তরে ঘৃণা অগ্রজের বসবর্তী হয়ে রাজাকে আক্রমণের জন্য তার প্রতি কিছুটা প্রেমের অভিনয় করেন। ফলে ত্রিভুজ প্রেমের এই ট্রাফিক পরিসমাপ্তি নায়কের অকাল মৃত্যুতে নায়িকার যে ভাবগত পরিবর্তন তা একেবারেই মানবিকতাসম্পন্ন নয়।

আমরা জানি রক্তকরবী নাটকের মূল পটভূমি যন্ত্র সভ্যতার সাথে কৃষি সভ্যতার একটা লড়াই। অর্থাৎ আধুনিকতার জন্য সমাজ ব্যবস্থা উন্নত হলেও কোথাও গিয়ে দেখা যায় মূলত ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে দেশ তথা গোটা সমাজকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের দেখা যায় যন্ত্র শক্তির প্রভাবে সমাজের ক্ষুদ্র শিল্প তথা কৃষি নির্ভরশিল্প যেন ধ্বংসের মুখে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দিকগুলোকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি তার প্রতিরোধ হিসাবে ‘রক্তকরবী’ নাটকের মধ্য দিয়ে দেখালেন গোটা সমাজকে। তিনি রাজার মতো স্বার্থাশ্রয়ী মানুষের মুখোমুখি করার জন্য নন্দিনীর মতো একজন চরিত্রকে তৈরি করলেন। যাকে দিয়ে তিনি সমস্ত অশুভ শক্তিকে প্রেমের মধ্য দিয়ে শান্তির মধ্য দিয়ে পরাস্ত করালেন। যদিও এই চরিত্রটির মধ্যে রহস্যময়তা লুকিয়ে রয়েছে সে কখন কার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তা খুব সহজেই বোঝা যায় না। তাই আমরা দেখেছি নন্দিনীর প্রেমিক পুরুষ রঞ্জন, আবার বিশ্বের প্রতিও তার একটা টান রয়েছে, আবার আমরা দেখেছি রাজার প্রতিও তার কিছুটা হলেও ভালো সম্পর্ক রয়েছে। যাকে দেখে রাজাও তার বেড়া জাল থেকে নিজেকে নিজেই বের করে এনেছে, রাজা তার সমস্ত শক্তিকে নিজেই শেষ করেছে, শুধুমাত্র নন্দিনীকে পাবার জন্য। কবি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন যে, “নারী চিরকালই তার অপার প্রেম-প্রীতি, অন্তরের সৌন্দর্যের দ্বারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।”^৪ এই তথ্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার নন্দিনীকে বাহন হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এখানে নন্দিনী আনন্দের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক। নাটকের অন্যতম চরিত্র অধ্যাপক এর বক্তব্য থেকেও আমরা নন্দিনীর এই তাত্ত্বিক রূপটিকে দেখতে পাই। অধ্যাপক বলেছেন, “সকালের ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।”^৫

রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরিতে নন্দিনীর তাত্ত্বিক রূপের কথা বলেছিলেন, অধ্যাপকের বক্তব্যে তারই প্রতিফলন পেয়েছি আমরা এই নাটকে। আর রাজার কার্যকলাপে অর্থাৎ পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহ বাধা মুক্ত করে এটা তারই প্রমাণ। রঞ্জনের প্রতি ঈর্ষা রাজাকে এক নবজন্ম দিয়েছে, তার ভোগ-ত্যাগ উত্তোলিত হয়েছে, মূলত এসবই হয়েছে নন্দিনীর প্রভাবে, তার ব্যবহারে। নন্দিনী একটি আদর্শের প্রতীক তাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন, “Nandini is a real woman who knows that wealth and power are Maya and that the highlight expression of life is in love..”(RED OLEANDERS'S: AUTHOR'S INTERPRETATION)^৬

এই নাটকের প্রাণকেন্দ্র নন্দিনী চরিত্র। নন্দিনী পরিচয় জানতে গিয়ে আমরা দেখি সে একজন সাধারণ মেয়ে, পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানি যেন সে নিজের সর্বান্তে টেনে নিয়েছে। নন্দিনী পল্লীবালিকা, ঈশানি পাড়ার সবাই তাকে আদর করে ‘নন্দিন’ বলে ডাকে। সকলের

সাথেই তার সহজ আত্মীয়তার মধুর সম্পর্ক তাই সবাই যেন নন্দিনীর আশায় থাকে তাকে পেতে চায়। আমরা এই যক্ষপুরীতে যখন তার আবির্ভাব হয় তখন দেখতে পাই তার কথাতে একটা আলাদা অনুভূতি, নতুন প্রাণের সঞ্চারণ যেন তার সর্বক্ষেপে থাকে। মকররাজ মাটির তল থেকে তালতাল সোনা উত্তোলন করছেন নির্মমভাবে শ্রমিকদের দিয়ে। তাই শ্রমিকদের জীবন যেন দুর্বিষহ হয়েছে, তারা জেলবন্দি অবস্থায় রয়েছে। এসব দেখে নন্দিনী যেন থাকতে পারছে না তার ইচ্ছা সবাইকে সে মুক্তি দেবে। নন্দিনী এই মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন সেইটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই সে রাজা সম্পর্কে অধ্যাপককে বলেছে তার মনের ইচ্ছা, “তোমাদের ওই সুরঙ্গের অঙ্ককারের ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছা করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।”^৭ নন্দিনী তার মায়ায় প্রবাহিত করেছে স্বয়ং মকররাজকে, দুর্দান্ত প্রতাপ অমৃত শক্তিদারী রাজাও হাত বাড়িয়ে নন্দিনীকে স্পর্শ করতে চায়। নন্দিনীর রূপে এক অপার প্রশান্তি আছে যেখানে সে বিশ্রাম খুঁজে পায়। নন্দিনীর মুখে চোখে প্রাণের লীলা, তার পিছনে চুলের মধ্যে মৃত্যুর ঝরনা রয়েছে।

যক্ষপুরীতে সকলেই কাজ করে কিন্তু নন্দিনী একমাত্র ব্যতিক্রম। সে যেন কাউকেই ভয় পায় না বরং প্রত্যেকের সাথে সে কথা বলে তাদেরকে মুক্তি করার জন্য চেষ্টা করেন এই পাতাল থেকে। কিন্তু তার কথাতেও যেন রহস্য রয়েছে তাই অনেক সময় চন্দ্রা, বিশু, গোকুল, ফাঙলালসহ অনেকেই তাকে বিশ্বাস করতে চায় না, কারণ সে তো রাজার সাথেও কথা বলে। আবার যখন বিশুকে ধরে নিয়ে যায় তার জন্য সকলেই এই নন্দিনীকেই দায়ী করে। অবশ্য এতে নন্দিনী ক্ষিপ্ত হন তাই সর্দারের লোককে বলেন, “আমি নারী বলে আমাকে ভয় করো না? বিদ্যুৎ শিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তার বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দাতির সোনার চূড়া।”^৮ সে কাউকেই ভয় পায় না, তখন থেকেই যক্ষপুরীর প্রধান সেনাপতি সঙ্গে শুরু হয় তার দ্বন্দ্ব, তবুও সে কখনোই পিছুপা হয় না। এরপর কিশোর ও রঞ্জনের মৃত্যুর পর রাজাকে সরাসরি আহ্বান করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজাকে প্রতিমুহূর্তে মারবে সে এবং তার কৌশলে শেষপর্যন্ত ধৈর্যের অবসান হয় এবং একদিন সে বেড়া জাল থেকে রাজাকে বের করে আনে এবং নিজের হাতে নিজের শক্তিকে ধ্বংস করে রাজা। নন্দিনী সেদিন সকলকে জয় করে এবং সৌন্দর্যের হাত ধরে মুক্তির পথে বেরিয়ে পড়তে রাজাকেও শেষপর্যন্ত বাধ্য করে।

আমরা রাজার সাথে নন্দিনীর প্রথম আলাপেই দেখতে পাই রাজা যেন নিজের জালেই নিজেকে জড়িয়ে নেন। নন্দিনী যখন বলেন জালের আবরণ সরিয়ে সে তার সুরঙ্গে যেতে চাই, কিন্তু রাজা তাকে যেতে দেন না। রাজা নিজেকে মনে করেন, “পর্বতের চূড়ার মতো শূন্যতাই তার শোভা।” কিন্তু নন্দিনীও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পাহাড়ের চূড়ার বুকেইতো ঝরনা ঝরে। নন্দিনীর কথাতে এই প্রথম রাজা নিজেকে ভাবেন যে সেও তো প্রাণ খোলা হাসতে চাই, মুক্ত মনে বাঁচতে চাই। প্রথমে সে নন্দিনীকে মানতে না চাইলেও পরক্ষণে তাকে জানতে চাই তার সাথে কথা বলতে চাই। তাই রাজা বলেন, “তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে, আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাউটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।”^৯ রাজা বুঝতে পারেন সে যেন ক্লান্ত, তার দেহে যেন তৃষ্ণা রয়েছে এবং সেই তৃষ্ণার মেটাতে একমাত্র নন্দিনী যেন পারবেন। তাই সে নন্দিনীর হাতখানা তার হাতের উপর রাখতে চাই সবকিছু দিয়ে নন্দিনীকে ধরতে চায়, তার মনে এক নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগে। সে যেন নন্দিনীর হাত থেকে রক্তকরবীর গুচ্ছ চাই, তাহলে সহজ

ভাবে মরতে পারবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, “রাজা যেখানে যক্ষপুরীর অধীশ্বর, অর্থাৎ যক্ষপুরীর যন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহত্তম যন্ত্র, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার বিকর্ষণ। রাজা অজ্ঞাতসারে বুঝিয়েছে যে, এই মেয়েটি তাহার যন্ত্রধর্মকে বিকল করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু রাজা যেখানে মানুষ, যক্ষপুরীর জটিল জালের আড়ালে থাকিয়া যেমন তাহার মানবহৃদয় অপর হৃদয়ের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তার আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ।”^{১০} নন্দিনী রক্ত মাংসের বাস্তব নারী চরিত্র। নন্দিনী যক্ষপুরীতে আচমকা আলো, সে সুরঙ্গের অন্ধকারে ডালাটা খুলে তার মধ্যে আলোর সঞ্চয় করাইতে চান। বলা যায় তার উপস্থিতিতেই যক্ষপুরীতে শুরু হয়েছিল আনন্দের প্রেরণা। যন্ত্রে পরিণত যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা নিজেদের ভেতরের কুশ্রীতাকে প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে পড়েছিল আর এই নন্দিনী সে সময় হয়ে উঠেছিল তাদের ধ্যানমূর্তি। বিশু তাকে বলেছিল, ‘স্বপন তরীর নেয়ে, অগমপারের দূত’।

রক্তকরবীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে মনে হবে রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীকে একটি বিচিত্র তত্ত্ব রূপে উপস্থিত করেছেন এই নাটকে। প্রাণ, প্রেম ও আনন্দ শক্তি এই তিন শক্তির উৎস স্থল নন্দিনী যা তার দেহের মধ্য দিয়ে কর্মের সাথে মিলিয়ে দেয়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশে বলেছিলেন, ‘রক্তকরবীর সমগ্র পালাটি নন্দিনী নামে একটি মানবির ছবি’। অবশ্যই পাঠকমহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায় আপাতদৃষ্টিতে নন্দিনী চরিত্রটিতে মানবির সাধারণ লক্ষণ নেই। কারণ সে কন্যা নয়, জননী নয়, বধুও নয়, সে যেন এক চিরন্তনী প্রেয়সীরূপে আবির্ভূত। সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক সহজ-সরল এবং প্রেমময়। প্রকৃতির মধ্যকার সৌন্দর্য ও আনন্দের চিরন্তনী শক্তির প্রতীক মনে হয় নন্দিনীকে, কারণ সে সকলকেই যেন তার প্রেমের মধ্য দিয়ে মুক্ত করতে চায়। তাইতো এই নাটকের অন্যান্য চরিত্ররা নন্দিনীকে দেখেছেন, ‘রাসা আলর মশাল’, ‘ফাঁকা আকাশের সন্ধাতারা’, ‘দুখ জাগানিয়া’, ‘ঘুম ভাঙানিয়া’, ‘প্রলয় পথের দীপশিখা’, বিভিন্ন রূপে। বলা যায় নন্দিনীর উপস্থিতিতে যক্ষপুরীতে শুরু হয়েছিল আত্মঅনুসন্ধান তথা মুক্তির দিশা। যন্ত্রবদ্ধ যক্ষপুরীর মানুষেরা নিজেদের ভেতরের কুশ্রীতাকে প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে পড়েছিল। তাই অনেকের কাছে তখন নন্দিনী হয়ে উঠেছিল তাদের রক্ষার ধ্যানমূর্তি তাই বিশু তাকে বলেছে, ‘স্বপন তরী নেয়ে, ‘আগম পারের দূত’,। নন্দিনী যক্ষপুরের সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে যন্ত্রপাত্য জীবনের প্রাণহীন নিরানন্দ অস্তিত্ব পতনের অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নন্দিনীকে দেখে অধ্যাপকের অনুভূতি যে, সে তার মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যটুকু নিয়ে যক্ষপুরীতে বিরাজ করেছে যক্ষপুরীতে নন্দিনী এক সর্বরূপী শক্তির অভিমূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। সে রাজাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আনন্দের সত্যকে বুঝিয়েছেন এবং মকররাজের রিক্ত ক্লান্ত অবসন্ন মনে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে।

রক্তকরবী রাজা অসীম শক্তির অধিকারী সেই শক্তির বলে জগতের সমস্ত ভোগকে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু নন্দিনীর উপস্থিতিতে রাজা যেন খানিকটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন, সে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে কোথাও গিয়ে বজায় রাখতে পারছে না। মকররাজ ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্বের জ্বালার মধ্য দিয়ে নিজেই পুড়েছে। একদিকে তার সহজাত প্রবৃত্তি অপরদিকে তার ক্রমশ পিছিয়ে পড়া আবহ, হারিয়ে যাওয়া মন, এই উভয় সমস্যা যেন তাকে পাগল করে তুলেছে। একদিকে রাজার হিংসা, কুটিল শোষণ, অত্যাচারী মন অপরদিকে করুণা, শান্তি, মৈত্রীভাব সম্পন্ন মন এই দুই দ্বন্দ্ব ক্রমাগত রাজার অন্তরকে ভেঙে চুরমার করেছে। তাই সে একবার নন্দিনীকে বলছে, ‘আমি তোমায় উল্টাপাল্টিয়ে দেখতে চাই না, পারি তো ভেঙে চুরে

ফেলতে চাই’। আবার সেই রাজাই বলছে, ‘আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মত একটি ছোট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি- আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত’। এখানে নাট্যকার একই রাজার দুরকম ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন, তা মূলত ধ্বংস আর সৃষ্টি এরই পরিপূরক। এখানে রাজার দুই সত্তা, সেই দুই সত্তার মধ্যে এক সত্তা অপরসত্তাকে নিভৃত করে তার নিজের স্থান আরও উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। তাইতো আমরা নাটকের সমাপ্তিতে দেখতে পাই রাজার হিংসাত্মক মনোবৃত্তি পরাজিত হয়ে সরল বন্ধনের বাণী লাভ করেছে। আর এই জয়ের পশ্চাতে ঈশ্বরের দান হয়ে কাজ করেছে নন্দিনী চরিত্রটি। সে অক্ষপুুরীতে আলোর বন্যা এনেছেন। যক্ষপুুরীতে সে যে কেন এসেছে কেউ তা জানে না এমনকি সে নিজেও জানে না কিন্তু এই রাজ্যের স্বার্থান্বেষী পরিবেশ যেন তাকে বাধ্য করেছে একাজ করতে। নাট্যকার এক্ষেত্রে দারুন এক পন্থা অবলম্বন করেই রাজ্যের শক্তিকে নস্যাত্ন করেছেন এবং সাথে সাথে তাকেও মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন।

রক্তকরবী নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ বার বার কৃষিসভ্যতার প্রতি তার মানসিক দুর্বলতার দিকটিকে তুলে ধরেছেন। গণতান্ত্রিক সভ্যতার প্রাচুর্য ও সম্বলয়ের নেশায় আকুল মানুষ কখনোই সঠিকভাবে চলতে পারে না। এই নাটকের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, এখানকার রাজা পাতালের সুরঙ্গ খোদাই করে, সে ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা ‘যক্ষপুরী’ বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভান্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভান্ডার পাতালে। কৃষি সভ্যতার প্রতি কবির দুর্বলতা রয়েছে তাই সমগ্র নাটকে কৃষকদেরকে তিনি প্রতিস্থাপন করছেন। এই নাটকে ঘুরেফিরে বার বার এসেছে পৌষের ডাকের গান,

“পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে - আয়রে চলে,
আয় আয় আয়
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।”^{১১}

এই নাটকের প্রাণকেন্দ্র নন্দিনী এই পৌষের গান শুনিয়ছে রাজাকে। পৌষের গান শুনিয় সে রাজাকে পথে বেরিয়ে আসতে বলেছে, তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যায়। কিন্তু রাজা তখনো তার জাল থেকে ছিন্ন করে নিজেকে বের করতে পারেনি। তাই রাজা নন্দিনীকে বলেছে, ‘আমি মাঠে যাব? কোন কাজে লাগবে। উত্তরে নন্দিনী বলেছে, ‘মাঠের কাজ তোমার দক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ’।^{১২} কৃষি সভ্যতার সাথে নন্দিনীর গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে তাই নন্দিনী পুনরায় রাজাকে বলেছে, ‘আলোতে বেরিয়ে এসো মাটির উপর পা দাও পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক’। অর্থাৎ নন্দিনী যেন তার যে গুরুদায়িত্ব অর্থাৎ সবাইকে মুক্তির পথে নিয়ে আসেন সেজন্য রাজাকে বারবার আহ্বান করেছে। শুধু রাজা নয় অন্যান্য চরিত্রদের কেউ আমরা বলতে দেখছি এই যক্ষপুরীতে তারা যেন হাপিয়ে উঠছে, প্রায় সবাই বলতে শুরু করেছে আমরা আর থাকতে পারছি না এবার তো ঘরে ফিরে চলো। তাই শেষ পর্যন্ত সকলেই যেন এই যক্ষপুরীর মত বদ্ধ অভ্যন্তরীণ শক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন আর তার কাভারী নন্দিনী এ কথা বলতেই হয়।

নাটকে রক্তকরবী ফুলের কথা রয়েছে যাকে নন্দিনী পরে থাকে যার সর্বাঙ্গে। এখানে নন্দিনী যৌবনের প্রতীক, সে মন খুলে প্রাণ খুলে গান গায়। সে রক্তকরবীর মালা পরে থাকে একেবারে মুক্ত মনের মানুষ। যেখানে সবাই যেন বন্দী হয়ে আছে আর রাজা যেন

সবাইকে বদ্ধ করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত এই নন্দিনী সবাইকে তার প্রেমের মধ্য দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন। নাট্যকার শম্ভু মিত্র রক্তকরবী নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “রক্তকরবীর মানুষগুলো বিমূর্ত নয়। ওগুলো খুব জ্যাক্ত জীবন্ত মানুষ।”^{১৩} এখানে প্রায় প্রত্যেকটা চরিত্রই যেন জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে, সবাই যেন ‘মাস মুভমেন্ট’ জাগিয়ে তুলে ‘একলা মহাযাত্রার’ গান গেয়েছেন। রক্তকরবীর থিম সং ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’ অথবা Red Oleanders এর ‘Hark, 'tis Autumn calling,- come, O come away!’ গানটি জনগণকে ফেরাতে চেয়েছে নিজেদের জীবনের দিকে, নবান্নের নতুন ধানের স্বপ্ন মাখা কোন নতুন সকালের দিকে। তাই এই নাটকে বিদ্রোহের পরে বন্দিশালা ভেঙে মানুষের ধনতন্ত্রকে ভেঙে দিয়ে সবুজ ধানের ক্ষেতের দিকে ফেরাতে চেয়েছেন। সেই দিক থেকে ‘রক্তকরবী’ যেন রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের নাটক সেই সাথে আমাদেরও জীবনের স্বপ্নের নাটক একথা বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ ১৯৭৬, জাপান যাত্রী, রবীন্দ্র রচনাবলী (উনবিংশ খন্ড), কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা- ৩২৭।
- ২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি, হারুনা-মারু জাহাজ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা- ২৪-২৫।
- ৩। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪, রক্তকরবী Red Oleanders (দ্বিভাষিক সংস্করণ), পারুল লাইব্রেরি, কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৫৯।
- ৪। বসাক, সুজয়, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: বহুমাত্রিক পাঠ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা- ৫৬।
- ৫। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪, রক্তকরবী Red Oleanders (দ্বিভাষিক সংস্করণ), পারুল লাইব্রেরি, কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ২৯।
- ৬। বসাক, সুজয়, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: বহুমাত্রিক পাঠ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা- ১৬৩।
- ৭। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪, রক্তকরবী Red Oleanders (দ্বিভাষিক সংস্করণ), পারুল লাইব্রেরি, কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৩১।
- ৮। বসু, সৌমিত্র, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা- ১৬৩।
- ৯। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪, রক্তকরবী Red Oleanders (দ্বিভাষিক সংস্করণ), পারুল লাইব্রেরি, কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৫১।
- ১০। বসাক, সুজয়, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: বহুমাত্রিক পাঠ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা- ১৬৩।
- ১১। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪,

২৪০। এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O) 

রক্তকরবী Red Oleanders (দ্বিভাষিক সংস্করণ), পারুল লাইব্রেরি, কলকাতা- ৭৩,
পৃষ্ঠা- ৫১।

১২। বসু, সৌমিত্র, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: অন্য ভাবনায়,
রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা- ১৩১।

১৩। মিত্র, শম্ভু, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, কাকে বলে নাট্যশালা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-
০৯, পৃষ্ঠা-৪৫।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষাশৈলীতে তার প্রতিফলন

বর্ষা পণ্ডা
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সাহিত্যই অনেকাংশ মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামেরই বাস্তবচিত্র। এ সংগ্রাম শুধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের নয়, সমাজে শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের, ক্ষমতাবাদের বিরুদ্ধে দুর্বলের, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, সব রকম অবক্ষয়, অনাচার, অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের পর প্রায় ৫০ বছরের বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়কালে আমাদের যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার সাপেক্ষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্যের একটি টার্নিং পয়েন্ট। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। লেখক দৃষ্টি দেন দেশ-জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির গোড়ায়। তিনি বাঙালি সমাজের অনস্বীকার্য বাস্তবকে এমনভাবে তাঁর গল্পে স্থান দেন যে, পাঠক অস্বস্তিতে পড়ে যায়। স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী প্রয়োগে সংকটকে এতটাই খুলে দেখান যে, বিষয়ের অন্তর্মূলে প্রবেশের জন্য পাঠকের প্রস্তুতির দরকার হয়।

সূচক শব্দ: মুক্তিযুদ্ধ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ছোটগল্প, ভাষাশৈলী।

মূল আলোচনা: মুক্তিযুদ্ধের পর প্রায় ৫০ বছরের বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়কালে আমাদের যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের সাহিত্যও পিছিয়ে নেই। প্রতিটি দশকে সংঘটিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপঞ্জি আমাদের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে বলা যায়। বাঙালি জাতির যেমন রয়েছে দীর্ঘকাল রক্তক্ষয়ী এক সংগ্রামের ইতিহাস, তেমনি আমাদের সাহিত্যেরও বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে আন্দোলন-সংগ্রাম। বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার সাহিত্যে স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রাম স্থান করে নিয়েছে, এ ধারা লক্ষ্য করা যায় মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালের সাহিত্যেও। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সাহিত্যই অনেকাংশ মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামেরই বাস্তবচিত্র। এ সংগ্রাম শুধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের নয়, সমাজে শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের, ক্ষমতাবাদের বিরুদ্ধে দুর্বলের, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, সব রকম অবক্ষয়, অনাচার, অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এবং প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক বৈরী আচরণের বিরুদ্ধে মানুষের টিকে থাকার সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ অব্যবহিত বা সত্তরের দশকের উষালগ্নে বাংলা সাহিত্য অন্য কোনো দিকে হয়তো টার্ন নিতে পারত। কারণ তখন বিশ্বের মানচিত্রে একটি সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আত্মপ্রকাশ করেছে মানুষের জীবন, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা নবউদ্যমে বিনির্মাণের সুযোগ ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালে মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, দীর্ঘদিনের লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা মানুষকে নিয়ে যায় দুঃস্বপ্নের অতলগহ্বরে। সামাজিক অবক্ষয়, ব্যক্তি-মানুষের নৈতিক অধঃপতন, লোভ, রিরংসা, নব্য ধনিক শ্রেণির উদ্ভব, চূয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ,

পঁচাত্তরে মানবতাবিরোধী, নিকৃষ্ট দুষ্কৃতকারীদের ঘৃণ্য চক্রান্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর ঘন ঘন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, রাজাকারদের উত্থানসহ নানাবিধ বৈরী ঘটনাপুঞ্জ সংস্কুদ্ধ হয়ে ওঠে দেশের জনগণ। এসব বিষয় এ দেশের সাহিত্যে উঠে এসেছে বারবার। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ একটি বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে আমাদের সাহিত্যে। বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্যের একটি টার্নিং পয়েন্ট। এ নিয়ে অনেক উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, ছড়া, গান রচিত হয়েছে। আজও হচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সমগ্রচেতনাকে ধারণ করে কোনো কালজয়ী সাহিত্য কী সৃষ্টি হয়েছে? কিংবা বঙ্গবন্ধুর জীবন-সংগ্রাম নিয়েই হতে পারে একটি অসাধারণ উপন্যাস কিংবা নাটক, তা কি আদৌ হয়েছে? মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও এর সঠিক ইতিহাস নিয়ে আমরা আজ দ্বিধাভিত্তক। এর মূল কারণ স্বাধীনতা-উত্তর কলুষিত রাজনীতি বিশেষ করে পঁচাত্তর পটপরিবর্তনের ফলে যে কলুষতা, নোংরামি, ভণ্ডামি, ক্ষমতার প্রতি তীব্র মোহ আমাদের যেভাবে আবিষ্ট করে রেখেছে, তা থেকে আজও বেরিয়ে আসতে না পারা। পঁচাত্তর পটপরিবর্তিত রাষ্ট্রনায়করা এবং তাদের দোসররা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বা সত্য ধামাচাপা দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করার জন্য জনগণের সামনে তুলে ধরেছে, মুক্তিযুদ্ধের অসত্য, বিকৃত তথ্য। ফলে জনগণ দ্বিধাস্থিত, বিভক্ত। তারা প্রকৃত সত্যের নাগাল হাতের কাছে পেয়েও যেন পাচ্ছে না। গণতন্ত্রের দাবিতে আশির দশকেই শুরু হয় তুমুল আন্দোলন-সংগ্রাম। আত্মত্যাগ ও আত্মহুতি চলতেই থাকে। আমাদের শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই তিক্ত অভিজ্ঞতার। এ সময় পর্বকে বিচিত্ররূপে ধারণ করেছে। ভালো মানের কিছু ছড়া, কবিতা রচিত হয়েছে- যা সমকালে আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদের সময়পর্ব নিয়ে অসাধারণ কোনো গল্প, উপন্যাস, নাটক আমাদের নজরে পড়ে না। অথচ সেই সময়পর্বে আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্বৈরশাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটলে আমাদের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার পুরানো সেই স্বপ্ন নতুন করে জেগে উঠেছিল। কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখতে যতখানি ভালোবাসি, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তারও চেয়ে ঢের পিছিয়ে থাকি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহের কাছে গণতন্ত্র প্রথমেই হোঁচট খেয়েছে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের একটি খোলস পড়ে আছে মাত্র। ধনী-গরিবের ভেদরেখা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। নব্বইয়ের দশক থেকে নগরায়ন-গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজ নগরায়নের থাবা গ্রামকেও টেনে আনছে তার লালসার কাছে। কিংবা ছড়িয়ে দিচ্ছে তার লালসার লাল। ফলে নগর ও গ্রামের মানুষের মধ্যে আজ চাহিদার প্রভেদরেখা দ্রুতই সঙ্কুচিত হচ্ছে। গ্রামনির্ভর অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি ভেঙে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে রূপ নিচ্ছে। চারপাশের মানুষগুলো বদলে যাচ্ছে দ্রুত। মানুষের মনোজগৎ এখন জটিল, দ্বন্দ্ব সংঘাতময়, লোভ ও বিরংসাতাড়িত। এ কারণে নব্বই দশকের সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট যতটা স্থান করে নিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা করে নিয়েছে ব্যক্তিক সংকট, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, দ্বন্দ্বময় জটিল মনোজগৎ - যা কেবলই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নৈঃসঙ্গ্য যাতনায় ভারাক্রান্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরস্পরের কাছে এসেও আমরা বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক। নিতান্ত অসহায় ও অসুখী মানুষ। নব্বইয়ের দশকে উত্তরাধুনিক চেতনা বাংলাদেশের সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যদিও তা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা। তারপরও এ ধারণাকে মাথায় রেখে অনেকে সাহিত্যচর্চা চালিয়েছেন। বাঁক বদল ঘটাতে চেয়েছেন নিজেদের সৃষ্টির গতিপথ। কতটা সফল

হয়েছেন তারা, তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও সময় থেকে পিছিয়ে যে পড়েননি, সামনের দিকেই হেঁটেছেন, তা নির্দিধায় বলা যায়। যাই হোক, সব সময় সমকালকে ধারণ করে আমাদের সাহিত্য এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। হয়তো বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টারও শেষ নেই আমাদের।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট গল্পকার হলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। “দেশের কি জাতির সংস্কৃতির গোড়ায় না গিয়ে যদি নিজের, বন্ধুদের আর আত্মীয়স্বজনের স্যাঁতসেঁতে দুঃখবেদনাকেই লালন করি, তো তাতে হয়তো মধ্যবিত্ত কি উচ্চবিত্তের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। কিন্তু তা থেকে তারা নিজেদের জীবনযাপনে যেমন কোনো অস্বস্তিও বোধ করবে না, তেমনি পাবে না কোনো প্রেরণাও।”^১ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাগুলো লিখেছেন তাঁর ‘লেখকের দায়’ প্রবন্ধে। এ দায় থেকেই লেখক দৃষ্টি দেন দেশ-জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির গোড়ায়। তিনি বাঙালি সমাজের অনস্বীকার্য বাস্তবকে এমনভাবে তাঁর গল্পে স্থান দেন যে, পাঠক অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সংকটকে এতটাই খুলে দেখান যে, বিষয়ের অন্তর্মূলে প্রবেশের জন্য পাঠকের প্রস্তুতির দরকার হয়। ইলিয়াস কেবল প্রতিভাবান কলাকুশলীদক্ষ কথাসাহিত্যিক নন। সাহিত্যিক জীবনে সমাজের মানুষের সঙ্গে তিনি রচনা করেছেন ‘Depth of intimacy’। তাঁর শিল্পীসত্তার মাহাত্ম্যও লুকিয়ে রয়েছে মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর বোঝাপড়া ও সমাজ পাঠের ওপর। সমাজ বিশ্লেষণে তিনি উপলব্ধি করেছেন- সমাজব্যবস্থার ঘোরতর শয়তানির ফলে বেশির ভাগ মানুষ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকে কেবল শ্রমের মাধ্যমে; এর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অন্য একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হাতে। এই অসঙ্গতি থেকে শ্রেণী ও শ্রেণী মানসিকতার উদ্ভব। সমাজের মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব ও দায়বোধ থেকে ইলিয়াস তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজকাঠামোতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণিচেতনাকে প্রদর্শন করেছেন। যাট ও সত্তরের দশকের বাঙালি সমাজে স্থানচ্যুতির অস্থিরতা বা বৈকল্য একটা সামাজিক রোগের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। যার উৎসে ছিল বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা কিছু মানুষকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুবিধা পাইয়ে দেয়। যা ব্যক্তির অর্জন ও প্রাপ্য নয়, তা-ই সে পেয়ে যায় সহজে। ফলে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও ক্ষমতা রাতারাতি কিছু মানুষকে ধনী করে তোলে। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয় হয় ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক শ্রেণি। একদিকে ছিল সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অন্যদিকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও আন্দোলন। সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আস্তে আস্তে উবে যায় এবং কেউ কেউ নিজের সমৃদ্ধির জন্য ভিড়ে যায় সামরিক সরকারের লেজুড়বৃত্তিতে। সমাজ- রাজনীতির এই গাঁজামিল ও ভণ্ডামি ইলিয়াসের লেখক জীবনের শুরুতে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ। কিন্তু এর আগে থেকেই সমাজগতিতে যে গাঁজামিল ও ভণ্ডামি, ক্ষমতার চর্চা ও সম্পদ লুণ্ঠনের মচ্ছব শুরু হয়েছিল, তা ১৯৭১ পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বাঙালির যে বিপুল স্বপ্ন, তা স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় রূপ নেয় যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশে। সেখানে লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি ও অরাজকতা প্রধান হয়ে ওঠে। সমকালীন সেই সমাজভাষ্য উঠে আসতে থাকে কথাসাহিত্যসহ অন্যান্য মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী সময়ে জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তারই ধারাবাহিকতায় দেশবাসীর ওপর নেমে আসে সামরিক শাসনের খড়গ। অতঃপর গোটা আশির দশকজুড়ে সামরিক

শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয় বাঙালি। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। স্বাধীনতারবিরোধী শক্তি। নব্বইয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সামরিক শাসনের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি চেপে থাকে স্বাধীন গণতন্ত্রের মাথায়। ১৯৯৭ সালে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ইলিয়াস গভীর মনোযোগে, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের এ সমাজগতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর গল্পে এ জীবন ও সমাজই চিত্রিত হয়েছে। এর বিপরীতে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি বিপন্ন হতে হতে কখনো কখনো ঘুরে দাঁড়িয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার্থে। সে বিষয়টিও যুক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। প্রথমদিকে শখের বসে কবিতা লিখলেও পরে কথাসাহিত্যে এসে প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকেই তিনি আলোচনায়। হাসান আজিজুল হক ইলিয়াসের ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ পড়ে বললেন- ‘এটি তীরের মতো ঝজু, ধানী লঙ্কার মতো বদমেজাজি, পরনারীর মতো আকর্ষণীয়। এই বইয়ের গদ্য শুকনো খটখটে, প্রায় সবটাই ডাঙা, ডাঙার ওপর কচি নরম সবুজ গাছপালা জমেছে এমনও মনে হয় না। কোথাও একটু দয়া নেই, জল দাঁড়ায় না- বাস্তব ঠিক যেমনি, তেমনি আঁকা, ক্যামেরাও এরচেয়ে নিখুঁত ছবি তুলতে পারে না।’^২ তাঁর গল্পে আমরা দেখতে পাই মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমাজ, গ্রামীণ জীবন, শহুরে কোলাহল, চিরন্তন জীবনে বহুমুখী শব্দের কাব্যময় প্রকাশ। তাই কবিতার রূপ দেখা মেলে তাঁর গদ্যেও।

ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ (১৯৭৬)-এর প্রথম গল্প ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’। এই গল্পের মতো আর কোন গল্পে ইলিয়াস এত পরিষ্কারভাবে গল্পের ভাব বোঝাননি। অন্য গল্পগুলোতে পাঠককে পড়ে বুঝে নিতে হয়েছে। এতখানি বর্ণনামূলক ইলিয়াস ছিলেন না। অনেকে বলেন এই গল্পটি ইলিয়াসের ঘাঁচের সঙ্গে যায়না। এত যত্নের সাথে ইলিয়াস বর্ণনা করছেন রঞ্জু নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর কথা-

“মৃত্যুমহুর এই রাত্রি কেবলি সময়হীন ছড়িয়ে পড়ে। রোগা হয়ে রঞ্জু একটু কাঙাল হাসলো। ফ্যাকাসে বলতে লাগলো, ‘ঠিক মনে করতে পারছি না আত্মা, একেবারে ভুলে গেলাম। কি জিনিস বারবার ভুলে যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলা, যখন চারদিক আঁধার করে এলো, - না তবে বোধ হয় অন্য কোনো সময়ে কি যেনো ফেলে গেলাম, আমি ঠিক কি যেনো।’”^৩

এখানে ভাবনাচিন্তা, ভবিষ্যৎ একে একে ইলিয়াস গড়ে দিচ্ছেন। একজন মানুষের ব্যাপ্তি, অবস্থান, নিরীক্ষণ, বেড়ে ওঠার সময়, চারপাশের পরিবেশ থেকে শুরু করে সব খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন। বিস্তারিতভাবে বলেছেন ছেলেটির বাবার রাজনীতি, নিজস্ব সংকট, মনজাগরনের ইতিবৃত্ত।

গল্পের শুরুতেই একটি বৃষ্টিস্নাত শহরের বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশেলে এক অন্য ধরনের ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন ও তার অনন্য শৈল্পিক আবহ অন্য মাত্রা দিয়েছে গল্পটিকে। যেমন- ‘মনোরম মনোটোনাস শহর’, ‘লোনলি লগ্ন’, ‘মেমরি মমরিত’। গোটা গল্পে প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন ইলিয়াস- ‘মিউজিক’, ‘ল্যাম্পোস্ট’, ‘ফক্সওয়াগন’, ‘ইলেকট্রিক’, ‘ওয়েদার’, ‘ইম্প্রুভ’, ‘অ্যাবসার্ড’, ‘এবডোমেন’, ‘টয়ার্ড’, ‘স্লিপার’, ‘সিগ্রেট’, ‘ইন্টারভ্যাল’, ‘ইলুশান’, ‘গামবুট’, ‘রেনকোট’, ‘হান্টার’ ইত্যাদি। একটি ইংরেজি বাক্যও ব্যবহার করেছেন- ‘ফর হুম দা বেল টলস?’ লক্ষ্যনীয় যে, ইলিয়াস তাঁর এই গল্পে একদিকে যেমন প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছেন, উল্টোদিকে আমরা মৌখিকভাবে যে ইংরেজি শব্দগুলি কথার মধ্যে ব্যবহার করি, যেমন- ‘প্লেট’, ‘ননস্টপ’, ‘বেল’ ইত্যাদি, সেখানে এই শব্দগুলির বাংলা তর্জমা ব্যবহার করছেন- ‘পেয়াল’, ‘বিরতিহীন’, ‘ঘন্টাদ্বনি’।



পুলিশের সাথে রঞ্জুর কথোপকথনে পুলিশের সংলাপে বাংলা ও হিন্দি শব্দের মিশেল ঘটিয়েছেন ইলিয়াস-

‘কে?’ উত্তর না পেয়ে লোকটা ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো, ‘আপনি? ইলিয়াস সায়েবের লড়কা না? কুথায় যাচ্ছেন?’

‘কোথাও না।’

‘এতো রাতে ডাড়িয়ে আছেন কেনো?’ পুলিশ জিগ্যেস করলো, ‘ঘরে চলে যান। এই মেঘলা রাতে বাহারে এসেছেন কেনো?’

রঞ্জু বললো, ‘এমনি। ঘুম আসছে না। বাদলা রাতে আমার ঘুম হয় না।’

‘নিদ আসছে না, না?’^৪

সারা গল্প জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসাধারণ কিছু চিত্রকল্পের সমাহার- ‘রোদন রূপসী’, ‘বিষাদবর্ণ দেওয়াল’, ‘ভিজে আলো’, ‘ঘুম ভাঙা জিভ’, ‘বৃষ্টি বুনোট’, ‘অচিন দীর্ঘশ্বাস’, ‘কাকলিশূন্য নীড়’, ‘বৃষ্টির শিশির’, ‘জন্মক্লান্ত লোক’, ‘নীল আলোর ফ্যাকাশে গন্ধ’, ‘সুন্দর তেতো গন্ধ’, ‘পুরানো পুরানো গন্ধ’, ‘হাজার ভিজে পাতা উদ্গুন আত্মহত্যা অতৃপ্ত ঝুলছে’, ‘গেরুয়া নিঃশ্বাস’, ‘মলিন নদী’, ‘দুঃখী চাঁদ’, ‘ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না’, ‘জলের অন্তর্দ্বীপ’ ইত্যাদি। গন্ধ সংক্রান্ত চিত্রকল্পগুলি জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনটির কথা মনে করিয়ে দেয়- ‘ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;’

‘সাদা’ রংটির অতিরিক্ত বা ধবধবে সাদা বোঝাতে ‘শাদা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন গল্পকার। গোটা গল্পে মোট চারবার ‘শাদা’ শব্দের ব্যবহার রয়েছে। গল্পে প্রচুর পরিমানে শব্দদ্বৈত বা অনুকার শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়- ‘ছমছম’, ‘ছলছল’, ‘চিনচিন’, ‘টলটল’, ‘ফিসফিস’, ‘ধীরে ধীরে’, ‘মিছামিছি’, ‘গোলগাল’, ‘নেই নেই’, ‘গুনগুন’, ‘ঢং ঢং’, ‘কলকল’ ইত্যাদি।

গল্পের স্থানে স্থানে চরিত্রের মুখে সরাসরি সংলাপের ব্যবহার পাঠককে ছোটগল্পের মধ্যেও নাটকের অনুভূতি প্রদান করে-

‘কে? কে যেন ডাকছে না?’ স্বপ্নের মধ্যে থেকে আত্মা ছিঁড়ে আসছে, বেচারি মা আমার।

‘রঞ্জু।’ একটু থেমে আবার ফের বললো, ‘রঞ্জু না?’ ‘রঞ্জু হুঁ। এখনো ঘুমোয়নি।’

‘দরজা খুলে দিতে বলছে না?’

‘হুঁ। ৭৮, ৭৮। ডাকার কাল বললো না ওয়েদার পাল্টালে একটু ইম্প্রুভ করতে পারে?’

‘এই যে শোনো, ফের ডাকছে। কি করি, এ্যা? দরজা খুলে দেবো?’

আম্মার ভীরা স্বর শুনে রঞ্জুরো একটু ভয় করলো। “দরজা? দাও, খুলেই দাও। নইলে আরো বাড়তে পারে।

‘যদি বেরিয়ে যেতে চায়?’

‘যাবে। এতো রাতে এসব ভাঙ্গাগে না। খুলে দাও।’

‘চলো, তুমিও চলো।’

‘একা যেতে ভয় করছে?’^৫

গল্পে সংগীতের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ইলিয়াস প্রসঙ্গক্রমে একটি রবীন্দ্র সংগীত- ‘তুই ফেলে এসেছিস কারে?’ ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘কাজলা দিদি’ গানটির একটি অংশ- ‘পুকুর ধারে নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে’, আর একবার ব্যবহার

করেছেন- ‘ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই, মা গো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই’ অংশটি।

গল্পের মধ্যে অসাধারণ কিছু উপমার ব্যবহার গল্পকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে- ‘স্বপ্নের মতো টলটল করে’, ‘সারি সারি কফিনের মতো’, ‘তুলার শাদা প্রজাপতি’, ‘বলকানো দুধের মতো’, ‘স্বগতের মতো মর্মর করতে লাগলো’, ‘ঢেউয়ের মতো শব্দ করে ভেঙে পড়লো’।

গল্পে বিখ্যাত দুজন লেখকের নাম উঠে এসেছে এবং গল্পকার তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বিশেষণ ব্যবহার করেছেন- ‘বেহায়া বার্নার্ড স’ ও ‘শোপেন হাওয়ারের অনন্ত সৌরভ’।

বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই গল্পে ইলিয়াস বহু ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে পাঠককে ভাবার মত জায়গা করে দিয়েছেন- ‘তবে অন্য কোথাও বোধ হয়’, ‘কোথায় যেন ফেলে এসেছি’, ‘আকাশ আজ ভারি বিশ্রী’, ‘নীল আলোর ফ্যাকাশে গন্ধ’, ‘বাইরের সোঁদা মাটির আভাস’ ইত্যাদি।

অনেকে বলে থাকেন ইলিয়াসের ‘দখল’ গল্পের আবহ অনেকটা একই ধাঁচের মনে হয়। নিরুদ্দেশ যাত্রায় প্রচুর কথোপকথন। গল্পটি হয়তো তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প বলেই এটি আলাদা, যা পরবর্তী গল্পগুলোর সঙ্গে ইলিয়াসের সৃষ্টির পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তাই বলে এই গল্পটি কেন এমন! আসলে গল্পের ভাব, ভঙ্গিমা এমন বলেই ইলিয়াস তেমন করেই ছাঁচে ফেলেছেন। রঞ্জুর খোঁজ উঠে এসেছে বারবার রঞ্জু নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। মৃত্যু এবং পরবাস্তবতার এক নিগুঢ় সত্যতা ইলিয়াস বর্ণনা করেছেন। তবে ইলিয়াস যেখানে অন্যদের চেয়ে আলাদা তা হল তাঁর বর্ণনায় মৃত্যু বারবার দেখিয়ে দিচ্ছে একটি জীবনের পতন কত দ্রুত হয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত, পরবর্তীকালে ‘জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল’ (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত সর্বশেষ গল্প হলো ‘রেইনকোট’। গল্পের সময়কাল মুক্তিযুদ্ধ। গল্পটি একজন গৃহবধু, ভীতু কলেজ শিক্ষক, এবং গৃহবধুর ভাই মুক্তিযোদ্ধার। প্রথম কয়েকটি লাইন খেয়াল করলে বৃষ্টিমুখর দিনের বর্ণনায় ভাষাশৈলীর স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়বে- “ভোর রাত হতে বৃষ্টি, আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিনদিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশনও আছে।”^৬

গোটা গল্পেই গল্পকার ইলিয়াস বাংলা শব্দের পাশাপাশি স্পেসিফিক, ক্লাসিফিকেশন, ম্যান প্রোপোজেস, প্রিন্সিপ্যাল, জিমনাসিয়াম, আনঅথরাইজ কনসট্রাকশন, সিচুয়েশন নর্মাল, ইনটারনাল অ্যাফেয়ার, ওয়েন্ডিং ওয়ার্কশপ, মিসক্রিয়েট, সাবভার্সিভ একটিভিটিজ, আদার ইনভলভড, অ্যাট্রিচুড ট্রান্সপারেন্ট, এক্সট্রা ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমন হিন্দি ও উর্দু শব্দেরও প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করেছেন-

“সব ভেস্তে দিল। মিলিটারি। মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুমা আস্তা সুবহানাকা ইম্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালেমিন, পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েকমাসে সে কতো সুরাই সে মুখস্ত করেছে। রাস্তায় বেরকলে পাঁচ কলেমা সবসময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিন থেকে মিলিটারি ধরে। তবুও একটা না একটা ভুল হয়ে যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই, কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে যায়।”^৭ কিংবা, “ইসহাক মিয়া বৈঠিয়ে। চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগো।”^৮

প্রেসিডেন্টের ভাষণে শোনা যায় সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষা-

“আওয়ার আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্য সেম দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ দ্য পিপল।”^{১০}

আবার কখনো গৌণ চরিত্রের সংলাপে সরাসরি হিন্দি কথা বসিয়েছেন- “স্যার নে সেলাম দিয়া”^{১০}

কখনো অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি, যে ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না, তার ভাষা যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তেমনটাই ইলিয়াস তার মুখে বসিয়েছেন-

“মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফর্মার তোড় দিয়া। অওর ওয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহেব কা কোঠি মে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় দিয়া।”^{১১}

গল্পের কিছু সংলাপে বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবও লক্ষ্যণীয়- “বাস আসবে কৈ থাইকা?”^{১২}

গল্পে দু’টি প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন ইলিয়াস- ‘শনিতে সাত, মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন’ ও ‘বাঁশ বনে ডোম কানা’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘ন্যায়দন্ড’ কবিতার ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে’ লাইনটি নীতিকথা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

সমগ্র গল্পটিকে বহু শব্দদ্বৈত বা অনুকার শব্দ দ্বারা সাজিয়েছেন ইলিয়াস- ‘ফালাফালা’, ‘ঘরঘর’, ‘গালাগালি’, ‘ছটফট’, ‘পিছে পিছে’, ‘হনহন’, ‘আলতু ফালতু’, ‘ফিসফিস’, ‘আইচাই’, ‘ছিপছিপে’, ‘টলতে টলতে’, ‘ধড়ফড়’, ‘সঙ্গে সঙ্গে’, ‘ঘেউ ঘেউ’, ‘গমগমে’, ‘ঝিরঝিরে’, ‘টিপটিপ’, ‘গুনে গুনে’, ‘দ্রাম দ্রাম’ ইত্যাদি।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ইলিয়াসের মধ্যে স্বাভাবিক কবিত্বগুণ ছিল। যার সূত্রে একটি হিন্দি কবিতার অসাধারণ সন্নিবেশ ঘটেছে এই গল্পে-

“গুজব জো থা ওহি সব আজ গজব হো চুকা হ্যায়।

আর্মি কে আরমান পুরে হো চুকে হ্যায়

আল্লা এক, রসুল এক, পাকিস্তান ভি এক

ইসে জিসকো ঈমান নেহি উও নালায়েক।

কুচল দো উস গান্দারকো জাঁহা ভি মিলে,

পাকিস্তানি ফওজ কভি পিছে না হিলে।”^{১৩}

ইলিয়াসের ভাষার এ বৈশিষ্ট্যটি মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, পুরানো ঢাকার ভাষায় জনজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যে ভঙ্গি সুরে-শব্দে-অলংকারে অক্ষুণ্ণ থেকেছে, ইলিয়াসের বাস্তববাদী লেখকদৃষ্টির সঙ্গে তার একটা আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়েছে। লেখক হিসাবে ইলিয়াস তাই চান, আর পুরানো ঢাকার জনভাষায় তা মজুত। মান্যভাষার পোশাকি বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়নি, এমন যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই যেগুলোকে আমরা আদরে বা অবহেলায় আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলে থাকি, সেগুলোর ক্ষেত্রে সম্ভবত একথা প্রযোজ্য। আমরা এখানে ইলিয়াসের কথা মাথায় রেখে পুরানো ঢাকার উপভাষার কথা বললাম। ইলিয়াস যে কেবল পুরানো ঢাকার জনজীবনের ছবি আঁকার কাজে এই ভাষাকে খাটিয়েছেন তা নয়। ঐ উপভাষাকে অবলম্বন করে তৈরি করা তাঁর এ ভাষাভঙ্গি আদতে তাঁর সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গিরই পরিচয় বহন করে। এমনকি হয়ত, খোদ বর্ণনাভঙ্গিটিই পুরানো ঢাকার ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন ইলিয়াসের জন্ম কিন্তু তেতাল্লিশে। তেতাল্লিশের মধ্যস্তর পরবর্তী বাস্তব জীবন ইলিয়াসের খুব কাছ থেকে দেখা। তাই হয়তো ইলিয়াসের লেখায় সংগ্রাম, ক্ষুধা,

দারিদ্র, নিপীড়ন উঠে এসেছে। তিনি বাস্তববাদী, নিরীক্ষণধর্মী। নিজের লেখার গুণগত ব্যাপ্তি দিয়েই নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পে ইলিয়াস লিখেছেন দৈনন্দিন মজুরদের চিত্র, পারিবারিক কলহ, মানবিক ও সামাজিক বৈষম্য, শেকড়ের অসীম টান, চলতি জীবনের দ্বন্দ্ব, মানুষের জৈবিক চাহিদার তৃপ্তি-অতৃপ্তি মিলে আমাদের এক অনবদ্য জীবনযাপন। গল্পের ভাষায় এক প্রচণ্ড রকম শক্তি আছে, যে শক্তিটি ইলিয়াস বিশ্বাস করিয়েছেন আপনি যা পড়ছেন তা সম্পূর্ণ চিরন্তন, কোথাও কোন ফাঁক নেই।

তথ্যসূত্র:

- ১। সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯ পৃ. ১৪৬।
- ২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃ.-৫১৫, দেবেশ কুমার আচার্য্য।
- ৩। গল্প- নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ.-১৬, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ৪। গল্প- নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ.-১৬, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ৫। গল্প- নিরুদ্দেশ যাত্রা, পৃ.-১৪, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ৬। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৩৯২, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ৭। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৩৯২, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ৮। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৩৯৩, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ৯। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৩৯৪, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ১০। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৩৯২, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ১১। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৩৯৩, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ১২। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৪০০, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।
- ১৩। গল্প- রেইনকোট, পৃ.-৩৯৮, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র-১।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ

- ১। ইলিয়াস আখতারুজ্জামান - রচনাসমগ্র ১, প্রকাশক- আহমেদ মাহমুদুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, সপ্তম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি ২০১২।

সহায়ক গ্রন্থ:

- ১। রায় অপূর্বকুমার - শৈলীবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৬।
- ২। মজুমদার ডঃ অভিজিৎ - শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০০৭।
- ৩। মজুমদার পরেশচন্দ্র, মজুমদার অভিজিৎ - বাংলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, প্রকাশক- দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১০, দ্বিতীয় সংস্করণ- আগস্ট ২০১৬।
- ৪। চট্টোপাধ্যায় গিরীন্দ্রনাথ - শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রকাশক- প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ- ২০১২।
- ৫। চক্রবর্তী বিপ্লব, শৈলী চিন্তা চর্চা (সম্পাদিত), প্রকাশক- রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩।

- ৬। বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ন্ত (সম্পাদনা) - বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০০৫।
- ৭। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার - কালের পুতুলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর / ১৮৯১-২০১০, প্রকাশক- দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০১২, পুনর্মুদ্রণ- অক্টোবর ২০১৬।
- ৮। চট্টোপাধ্যায় সত্যচরণ - বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, প্রকাশক- প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ- জানুয়ারী ২০০৭।
- ৯। আহমেদ মাওলা - মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশের সাহিত্য, মুক্তধারা, বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ- ২০১৫।
- ১০। ইলিয়াস আখতারজ্জামান - সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাদেশ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ- ২০১৭।

ইংরেজি গ্রন্থ:

1. Turner G.W. - A Pelican Book-Stylistics, Penguin Books, Reprinted- 1979
2. Jebb Richard Claverhouse - The Rhetoric of Aristotle, Cambridge University Press, Cambridge, First Edition- 1909
3. Lucas D.W. - Aristotle Poetics, Oxford University Press, Oxford, First Edition- 1968
4. Dasgupta Subhoranjan - Elegy and Dream: Akhtarujjaman Elias' Creative Commitment, Shipra Publication, Delhi, First Edition- 2000।

পরম্পরা ও নন্দনতত্ত্ব : সোহরাই লোকশিল্পের পুনর্মূল্যায়ন

অমিত ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, ফাইন আর্টস বিভাগ

দেব সংঘ ইনস্টিটিউট অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ অ্যান্ড এডুকেশনাল রিসার্চ

দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: সোহরাই হল ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় প্রচলিত দেয়াল চিত্র বা দেয়ালচিত্রের আদিবাসী পদ্ধতি। এই শিল্পটি সোহরাই উৎসবের সাথে সম্পর্কিত যা হিন্দু উৎসব দীপাবলির পর শরতের মাসগুলিতে পালিত হয়। খোয়ার চিত্রকর্মটি বিশেষভাবে এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত। এটি বর্ষার পরে এবং ধান কাটার মৌসুমের শুরুতে উদযাপন করা হয়। সোহরাই শিল্পের উৎপত্তি এই অঞ্চলের আদিবাসীদের দ্বারা মেসো-ক্যালকোলিথিক যুগে (৯০০০-৫০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) অথবা এমনকি প্রস্তর যুগের শেষের দিকের প্রাচীন শিলা শিল্প বলে মনে করা হয়। ঝাড়খণ্ডের ইসকো গুহায় পাওয়া ইসকো গুহা শিলা শিল্প তার প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্যের জন্য বিখ্যাত, যা মধ্য-প্রস্তর যুগের বলে মনে করা হয়। এটি প্রাচীন যুগের এই গুহাগুলির ভিতরে ম্যুরাল শিল্পের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, সোহরাই শিল্প তার বর্তমান রূপগুলিতে এই গুহা শিল্প থেকে বিকশিত হয়েছে, যা এটিকে সৃজনশীল অভিব্যক্তি, উদযাপন এবং উৎসবের একটি গৃহস্থালি অনুশীলনে পরিণত করেছে। সোহরাই চিত্রকলা হল একটি লোকশিল্প বা উপজাতি চিত্রকলার ঐতিহ্য যা বেশিরভাগই ঝাড়খণ্ডের হাজারীবাগ এলাকার গ্রামগুলিতে প্রচলিত। হাজারীবাগ হল উত্তর ছোটনাগপুর বিভাগের সদর দপ্তর যা একটি মালভূমিতে অবস্থিত - বন, পাহাড় এবং উপত্যকার মনোরম ভূদৃশ্য দ্বারা বেষ্টিত একটি শহর। ঐতিহ্যগতভাবে, হিন্দু দীপাবলি উদযাপনের ঠিক একদিন পরে সোহরাইয়ের ছুটির সময় বাড়ির মহিলারা তাদের বাড়ির মাটির দেয়ালে রঙ করেন। চিত্রকলাগুলিতে একটি মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্য চিত্রিত করা হয়েছে যেখানে শিল্পের রূপটি তাদের মায়েদের দ্বারা কন্যাদের কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে চলে আসে; একইভাবে, এই চিত্রকলার একটি মূল বিষয় হল মা-সন্তানের বন্ধন।

সূচক শব্দ: লোকশিল্প, সোহরাই, ঝাড়খণ্ড, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, খোভার, চিত্রকলা।

মূল আলোচনা:

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: এই শিল্পকর্মের উৎপত্তি ৭০০০ থেকে ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্যালিওলিথিক যুগে। এই অঞ্চলে আবিস্কৃত গুহাচিত্রগুলিতে এই অঞ্চলের দেয়ালচিত্রে দেখা যায় এমন প্রাণী এবং ফুলের নকশা রয়েছে। স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন যে এই চিত্রকর্মগুলি তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। পরিবেশকর্মী বুলু ইমামই প্রথম বাইরের বিশ্বের সাথে এই সংযোগটি দেখিয়েছিলেন। শ্রী বুলু ইমাম ১৯৯১ সালে হাজারীবাগ জেলার বরকাগাঁও ব্লকের ISKO গ্রামে একটি রক আর্ট সাইট আবিষ্কার করেন এবং এটিকে আলোকিত করেন। ASI অনুসারে, শিলা শিল্পগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-৭০০০ অব্দের এবং প্যালিওলিথিক যুগের। শিলা শিল্প স্থানের কাছাকাছি প্রচুর পরিমাণে পাথরের হাতিয়ার

আবিষ্কৃত হয়েছে। ইসকো শিলা শিল্প আবিষ্কারের পর, শিলা শিল্পের মোটিফ এবং স্থানীয় মানুষের বাসস্থানের দেয়ালে আঁকা চিত্রকর্মের মধ্যে একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। তারা দুটি অনুষ্ঠানে চিত্রকর্ম তৈরি করেছিলেন: একটি বর্ষাকালের পরে এবং ফসল কাটার আগে, এবং অন্যটি বিবাহের সময়। বর্ষাকালের পরে তৈরি চিত্রকর্মগুলি, বিশেষ করে হিন্দু উৎসব দীপাবলিকে ঘিরে, সোহরাই নামে পরিচিত ছিল, যখন বিবাহকে ঘিরে তৈরি চিত্রকর্মগুলি খোয়ার নামে পরিচিত ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে ইসকোর শিলা শিল্পগুলি সোহরাই এবং খোয়ার চিত্রকর্মগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, অথবা ইসকোর শিলা শিল্পগুলি ইসকোর বাসিন্দাদের কাছ থেকে স্থানীয়দের কাছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং তারপরে হাজারিবাগ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

‘সোহরাই’ চিত্রকলা কি?:

অতীতে ফিরে গেলে, সোহরাই শব্দটি এসেছে মুন্ডারি শব্দ সোরোই থেকে, যার অর্থ “লাঠি দিয়ে আঘাত করা”। সম্প্রদায়ের অর্থনীতি মূলত গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভর করে। তারা কৃষিকাজের পাশাপাশি দুধ ও মাংস সরবরাহেও সহায়তা করে। পূর্বে, একজন গ্রামবাসীর সম্পদ নির্ধারিত হত তার জীবন্ত পশুর সংখ্যা দ্বারা। গবাদি পশু হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গৃহপালিত পশু কারণ তারা দুধ সরবরাহ করে এবং কৃষিতে ক্ষেত চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়, পাশাপাশি তাদের গোবর সার হিসেবে এবং বাসস্থান প্লাস্টার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই হিন্দু পরিবারগুলিতে গরুরকে এত উচ্চ সম্মান দেওয়া হয় যে তাদের সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। আজকাল, সোহরাই এবং খোয়ার চিত্রকর্মগুলি কাগজ এবং কাপড়েও তৈরি করা হয় যাতে সেগুলি পৃষ্ঠপোষকদের কাছে বিক্রি করা যায়। ঝাড়খণ্ডের সোহরাই চিত্রকর্মগুলি সাঁওতাল উপজাতির সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। এই চিত্রকর্মগুলি অসংখ্য গল্প, ঐতিহাসিক আখ্যান এবং বিশ্বদৃষ্টি বহন করে, এই চিত্রকর্মগুলি উপজাতিদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, তাদের পৌরাণিক কাহিনী এবং তাদের উপজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকগুলিকে চিত্রিত করে। এই রীতি বংশ পরম্পরায় মানুষের মধ্যে চলে আসছে। সোহরাই পেইন্টিংসের শিল্পীরা প্রকৃতি, মাতৃতন্ত্র, সিদ্ধ উপত্যকার প্রতীক এবং বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যের সাধারণ থিমগুলি তুলে ধরার জন্য প্রাকৃতিক রঙ্গক এবং উল্লম্ব নকশা ব্যবহার করেন।

বৈশিষ্ট্য ও সোহরাই চিত্রকলার রূপ:

সোহরাই চিত্রকলার সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যে এগুলি গ্রাম থেকে গ্রাম এবং সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায়ে পৃথক। ইসকো গ্রামের সোহরাই চিত্রকলা ভেলওয়ারা গ্রামের সোহরাই চিত্রকলা থেকে পৃথক, অন্যদিকে সাহেদা গ্রামের সোহরাই চিত্রকলা অন্য দুটি থেকে পৃথক। রাজ্যের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। গ্রামের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান এবং গ্রামের মধ্যে চিত্রকলার ঐতিহ্যের মিশ্রণ এর কারণ। শিল্পীরা সাধারণত তাদের চারপাশে যা দেখেন তা আঁকেন, তাই আমরা সমভূমিতে আরও ফুল এবং পাখির মোটিফ দেখতে পাই। খাড়া ভূখণ্ডে আরও বন্য প্রাণী পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু এই চিত্রকর্মগুলি মায়ের কাছ থেকে মেয়ের কাছে চলে আসে, তাই যখন কোনও মেয়ে অন্য গ্রামে বিয়ে করে, তখন সে তার শিল্পকর্মটি সাথে করে নিয়ে যায় এবং মাঝেমধ্যে আমরা একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্ম দেখতে পাই।

সোহরাই চিত্রকলার সবচেয়ে সাধারণ বিষয় হলো প্রকৃতি, মাতৃতন্ত্র, সিদ্ধ উপত্যকার প্রতীক এবং কোনও নির্দিষ্ট তাৎপর্যহীন বিমূর্ত চিত্রকর্ম। ভেলওয়ারা গ্রাম তার সিদ্ধ উপত্যকার মোটিফের জন্য পরিচিত, সাহেদা গ্রাম তার পশুপাখির চিত্রকলার জন্য পরিচিত এবং ইসকো গ্রাম তার পদ্ম এবং উদ্ভিদের মূর্তির জন্য পরিচিত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে। সোহরাই চিত্রকলার ঐতিহ্যে মাতৃতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই চিত্রকর্মগুলি, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মায়ের কাছ থেকে মেয়ের কাছে চলে আসে এবং এগুলি মাতৃতন্ত্রকেও চিত্রিত করে। গর্ভবতী প্রাণী এবং পাখিদের প্রায়শই চিত্রকলায় দেখানো হয়। ছানা এবং মুরগি প্রায়শই একসাথে আঁকা হয়। সোহরাইয়ের চিত্রকলা মাতৃতন্ত্রের প্রতীকে পরিপূর্ণ। গ্রামের মহিলারা তাদের শিল্পকর্মে অসাধারণ তৃপ্তি পান, যা তাদের গৃহ মেরামত ও সাজসজ্জার একটি নিয়মিত উপাদান এবং একটি অনুপ্রেরণামূলক কর্মসংস্থান এবং পবিত্র আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্য যা শহরের মহিলাদের নেই।

সোহরাই চিত্রকলার শিল্প চিত্রায়নের পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কিত ঐতিহ্যের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্যভাবে মাতৃতান্ত্রিক। এই দক্ষতা মা থেকে কন্যার কাছে সঞ্চারিত হয়। বেশিরভাগ চিত্রায়নে গর্ভবতী মূর্তি এবং তাদের ছোট বাচ্চাদের সাথে প্রাণী দেখানো হয়। মুরগি এবং ছানা খুবই সাধারণ মোটিফ। চিত্রকর্মে চিত্রিত অন্যান্য প্রাণী হল ভারতীয় মহিষ, ভারতীয় গুগুর, বাঁপিয়ে পড়া গরু, বাঘ, বুনো শূকর এবং নীলগাই। সোহরাই চিত্রকর্মগুলি প্রাণীদের শাসক পশুপতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। চিত্রগুলিতে বিশিষ্ট লাল এবং কালো রেখা রয়েছে, লাল রেখাগুলি পূর্বপুরুষদের রক্তের প্রতিনিধিত্ব করে এবং কালো রেখাটি চিরন্তন মৃত্যু বা দেবতা শিবকে চিত্রিত করে। একইভাবে, খোভারের মাতৃতান্ত্রিক শিকড় রয়েছে এবং এটি মা থেকে কন্যাদের কাছে চলে আসে। খো মানে ঘর, এবং ভার মানে বর। এই চিত্রকর্মগুলি কনের ঘরে তার মা দ্বারা তৈরি করা হয় এবং বিবাহিত দম্পতি এই ঘরে তাদের প্রথম রাত কাটায়। তাদের থিমগুলি সাধারণত উর্বরতা এবং পুরুষ-মহিলা সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত, এবং তারা বাঁশ, হাতি, কচ্ছপ, ময়ূর, পদ্ম এবং অন্যান্য ফুলের মতো মোটিফের মাধ্যমে বিনোদনকে চিত্রিত করে।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য:

সোহরাই শিল্প কেবল একটি নান্দনিক প্রকাশ নয় বরং ঝাড়খণ্ডের সাংস্কৃতিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঐতিহ্যগতভাবে মহিলাদের দ্বারা অনুশীলন করা, এই চিত্রকর্মগুলি সোহরাই উৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ফসল কাটার ঋতুকে চিহ্নিত করে। শিল্প রূপটি প্রাকৃতিক রঙ্গক এবং জ্যামিতিক নিদর্শন ব্যবহার করে প্রকৃতির উপাদান, লোককাহিনী এবং



মাতৃতান্ত্রিক প্রতীকগুলিকে চিত্রিত করে। সোহরাই চিত্রকর্ম হল জল, বায়ু এবং পৃথিবীর উপাদানগুলির প্রতীকী প্রতিফলন, পাখি, প্রাণী, মাছ এবং প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত রঙে (লাল, সাদা এবং কালো) জ্যামিতিক এবং ছন্দময় নিদর্শন ব্যবহার করে। গঞ্জু এবং কুর্মি গ্রামের লোকেরা তাদের জীবন এবং মানুষের বিশ্বদৃষ্টি চিত্রিত করার জন্য এই শিল্প ব্যবহার করত। সোহরাই চিত্রকর্মগুলি মূলত মহিলারা তৈরি করেন, যারা

এই শিল্পকে মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্য হিসাবে অনুশীলন করা হয়। তারা তাদের ঘর এবং পোশাকের দেয়ালে বিভিন্ন আচার এবং ঐতিহাসিক আখ্যান চিত্রিত করতেন। এই চিত্রকর্মগুলি মূলত সোহরাই ফসল উৎসবকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল। সোহরাই চিত্রকলা, একটি ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী শিল্পকলা যা ভারতের ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারা অনুশীলন করেন। এই শিল্পীরা কুমি, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ, আগরিয়া, ঘাটওয়াল নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের ভূদৃশ্য অসংখ্য গ্রামীণ পল্লীতে বিস্তৃত যেখানে সোহরাই শিল্প চর্চা করা হয়। ফসল কাটার শিল্প নামেও পরিচিত সোহরাই শিল্প ঐতিহ্যগতভাবে গবাদি পশু পালন এবং কৃষিতে তাদের ব্যবহারের সাথে যুক্ত। ঐতিহ্যবাহী শব্দ ‘সোহ’ বা ‘সোরো’ অর্থ তাড়িয়ে দেওয়া এবং ‘রাই’ অর্থ লাঠি।

সোহরাই চিত্রকলা



সোহরাই উৎসব:

সোহরাইয়ের প্রস্তুতি এক মাস আগে থেকে শুরু হয় মাটির ঘর মেরামতের মাধ্যমে। ছাদের টাইলস সাধারণত প্রতিস্থাপন বা পুনঃস্থাপন করা হয় এবং দেয়ালগুলি পুনরায় প্লাস্টার করা হয়। তারপর সোহরাইয়ের চিত্রগুলি দেয়ালে আঁকা শুরু হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, চিত্রগুলি বাড়ির মহিলারা তৈরি করেন। সবচেয়ে দর্শনীয় সোহরাই উৎসব উদযাপন সম্ভবত ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলার ভেলওয়ারা গ্রামে দেখা যায়। ISCO রক শিল্পকর্মের অনুরূপ মোটিফ সহ সোহরাই চিত্রকর্ম এবং ফলস্বরূপ সিদ্ধ উপত্যকার সভ্যতার মতো করে মাটির ঘরগুলিকে সাজিয়ে তোলে। তার ঘাঁড়ের পিঠে, অথবা স্থানীয় ভাষায় সোহরাই ঘোড়া নামে পরিচিত, গবাদি পশুর দেবতা বা পশুপতি, যাকে হিন্দু দেবতা শিবের একটি সংস্করণ বলা হয়, চিত্রিত করা হয়েছে। গবাদি পশুদের ভোরে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গ্রামের পুকুরে পরিষ্কার করা হয়। তাদের মালা, মাথায় সিঁদুর এবং সারা শরীরে আনুষ্ঠানিক বৃত্ত দিয়ে সাজানো হয় যখন তারা ফিরে আসে। তাদের আরতি দেখানো হয় এবং ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তারা

চালের গুঁড়ো এবং জল দিয়ে তৈরি হাতে আঁকা বৃত্তের ধারাবাহিকতায় পা রাখে। খুটা বন্ধন অনুষ্ঠানটি পরের দিন অনুষ্ঠিত হয়। গবাদি পশুদের একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয় এবং হাস্যকরভাবে শুকনো চামড়ার চাদর দিয়ে তাদের তাড়িয়ে তাদের শক্তি পরীক্ষা করা হয়। মনে করা হয় যে গবাদি পশুরা যত জোরে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তত বেশী শক্তিশালী। কিছু জায়গায় এই অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতার আকার নিতে পারে। উৎসবটি প্রায় ২-৩ দিন স্থায়ী হয়।

সোহরাই শিল্প সোহরাই ফসল উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাজারিবাগে, এই উৎসবে গবাদি পশুদের ঘরে স্বাগত জানানোর জন্য মন্ডল বা আরিপান চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা হয়। গ্রামের মহিলারা তাদের আঙুল দিয়ে মাটিতে চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেন। বছরে দুবার এই উৎসব পালিত হয়। একবার এটি দীপাবলির সাথে মিলে যায় এবং ভারতীয় বর্ষার পর তিন দিন ধরে কার্তিক মাসের (অক্টোবর-নভেম্বর) অমাবস্যা পালিত হয়, যখন ধানক্ষেত কাটার জন্য প্রস্তুত থাকে। এটি জানুয়ারিতে পৌষ সংক্রান্তির সময়ও পালিত হয়, শীতকালে রবি ফসল কাটার সময় যেখানে সম্প্রদায়গুলি প্রধান ধান ফসল উদযাপন এবং তাদের পশুপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এমন বেশ কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। সোহরাই উৎসব উপজাতীয় সম্মিলিত চেতনার একটি প্রাণবন্ত উদযাপন যা প্রাণবন্ত নৃত্য এবং সাম্প্রদায়িক আনন্দের মাধ্যমে পশুপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং স্নেহ প্রদর্শন করে।

সোহরাই চিত্রকলার সৃষ্টি - শৈল্পিক কৌশল এবং উপকরণ:

সোহরাই চিত্রকলার শৈল্পিকতায় প্রাকৃতিক মাটির রঙ এবং সহজ সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। শিল্পীরা প্রাণবন্ত, দীর্ঘস্থায়ী রঙ তৈরি করতে কাদামাটি এবং কাদার মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেন। নকশাগুলি চিবানো লাঠি এবং কাপড়ের সোয়াবের মতো ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রয়োগ করা হয়, যা প্রতিটি চিত্রকলার অনন্য গঠন এবং চরিত্রকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পরে এবং ধান কাটার মরসুম শুরু হওয়ার পরে, গবাদি পশুদের ধন্যবাদ জানাতে সোহরাই উদযাপন করা হয়। এই উদযাপনটি কেবল ঝাড়খণ্ডেই নয়, প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও পালন করা হয়, মূলত আদিবাসীরা। হিন্দুদের দীপাবলি উদযাপনের ঠিক একদিন পরে সোহরাই দিবস পালিত হয়। এটিও লক্ষণীয় যে একই দিনে, হিন্দুরা গোবর্ধন পূজা উৎসব উদযাপন করে, যা গবাদি পশুদেরও সম্মান করে। এই উদযাপনের গুরুত্ব এতটাই যে এই উৎসবের জন্য মাটির বাসস্থানগুলি কেবল পুনর্নির্মাণ এবং বর্তমানে সোহরাই চিত্রকলা নামে পরিচিত যা দিয়ে রঙ করা হয়। কিছু উপজাতির কাছে, এগুলি কেবল সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অন্যদের কাছে, এগুলি পশুদের দেবতাদের সম্মান জানানোর একটি উপায়।

সোহরাই চিত্রকলার রঙ প্যালেট তাদের ইতিহাসের মতোই আকর্ষণীয়। চিত্রকলায় প্রাকৃতিক মাটির গেরুয়া ব্যবহার করা হয়, যা এলাকায় সহজেই পাওয়া যায়। শাল গাছের চিবানো ডালপালা রঙের ব্রাশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পটভূমি তৈরি করতে তুলোর ন্যাকড়া ব্যবহার করা হয়। লাল ঈচার বা গেরুয়া মাটি, হলুদ ঈচার বা পিলা মাটি, ম্যাঙ্গানিজ বা গুঁড়ো কয়লা বা কালী মাটি, এবং সাদা মাটি বা দুধি/চরক মাটি, মূলত এই চার ধরনের রঙ ব্যবহার করা হয়।

লাল এবং হলুদ উভয় ধরনের ঈচার স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা পাহাড় এবং পাহাড়ি নদীতে আহরণ করা যেতে পারে। সঠিক স্থানে খনন করলে হলুদ ঈচার পাওয়া যায়, অন্যদিকে পাহাড়ি নদীতে হেমাটাইট আকারে লাল ঈচার পাওয়া যায়। কয়লা

খনির আশেপাশে, কালো মাটি ম্যাঙ্গানিজ হিসাবে পাওয়া যায়, অথবা যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে এই উদ্দেশ্যে কয়লা গুঁড়ো করা হয়। চুনাপাথরের খনি থেকে সাদা মাটি বের করতে হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি বিপদজনক।

উভয় শিল্পের প্রক্রিয়া মাটি এবং গোবরের মিশ্রণ দিয়ে পৃষ্ঠের উপর প্রলেপ দিয়ে শুরু হয়। এর পরে, সাদা মাটির একটি স্তর প্রয়োগ করা হয়। আংশিক শুকনো মাটির উপর আঙুল এবং লাঠি দিয়ে নকশা তৈরি করা হয়।

সোহরাই শিল্পে, প্রথমে লাল রেখা আঁকা হয় পূর্বপুরুষ বা উর্বরতা চিত্রিত করে, তারপরে শিবের প্রতিনিধিত্বকারী একটি কালো রেখা আঁকা হয়। অবশেষে, সাদা রেখা আঁকা হয় খাদ্য চিত্রিত করতে, কারণ শিল্প রূপটি ফসল উৎসবের সাথে সম্পর্কিত। প্রাকৃতিক রূপ এবং প্রকৃতির সাথে ব্যক্তির সংযোগ থেকে সহজাতভাবে নকশাগুলি আঁকা হয়।

খোয়ার চিত্রকর্ম হল উর্বরতা চিত্রিত করার একটি পবিত্র শিল্প রূপ এবং সাধারণত একরঙা। প্রথমে, দেয়ালটি কালো মাটি দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়, যা গর্ভকে চিত্রিত করে। তারপর এটি সাদা কাদামাটি দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়, যা শুক্রাণুর প্রতীক। কাদামাটি অর্ধেক পথ স্থাপন করার পরে, একটি চিরুনি ব্যবহার করে উদীয়মান দেবী মাতার মতো নকশা আঁকা হয়। গর্ভবতী ময়ূরের মূর্তিকে বিবাহ ঘরের জন্য সবচেয়ে শুভ প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে শুভ উপলক্ষ উদযাপনের জন্য প্রাণী, পাখি, টিকটিকি এবং ফুল আঁকা হয়।

নতুন বছরের উৎসবের জন্য নতুন সোহরাই শিল্প তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয় তাজা চিত্রকর্মের জন্য কাদা দেয়াল প্রস্তুত করার মাধ্যমে। মহিলারা পৃষ্ঠ প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন মাটি, গোবর, ভূসি এবং জল ব্যবহার করেন যা একটি ক্লাস্তিকর প্রক্রিয়া। প্রতি বছর, ফসল কাটার সময় বার্ষিক সোহরাই উৎসব উদযাপন করার জন্য মহিলারা তাদের মাটির দেয়ালগুলিকে নতুন চিত্র দিয়ে সাজান। উৎসবের পরে, চিত্রকর্মগুলি স্বাভাবিকভাবেই বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য যেমন আছে তেমনই রেখে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলারা বিভিন্ন চিত্রকলার কৌশল ব্যবহার করেন যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন শৈলী তৈরি হয়। তাদের শিল্পকর্মের জটিলতা গ্লিপটিক শৈলী থেকে শুরু করে খোদাই করা চিরুনি কাটার কৌশল পর্যন্ত বিস্তৃত। চারটি প্রধান চিত্রকলার কৌশলের মধ্যে রয়েছে চারটি আঙুল দিয়ে আঁচড়ানো, ভাঙা চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো, কাপড়ের সোয়াব ব্যবহার এবং দাতওয়ান বা ডাল-ঝাড়ুর ব্যবহার।

সোহরাই চিত্রকলায় রঙ:

সোহরাই শিল্পের প্রচলিত রঙ হল লাল, কালো, সাদা এবং হলুদ যা প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তরল মাটির রঙে তৈরি করা হয়। এই ছবিতে ব্যবহৃত রঙগুলি (লাল, কালো, হলুদ এবং সাদা) হল প্রাকৃতিক মাটির রঙ যা বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। চিবানোর ডালপালা রঙের ব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যখন বেস কোট প্রয়োগ করার জন্য কাপড়ের ন্যাকড়া ব্যবহার করা হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে অনন্য লাল রঙটি আকরিক আকারে পাওয়া যায় যা পিষে বা বনের রাস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত মোরহাম নুড়ি থেকে তৈরি করা হয়। স্থানীয় নদী থেকে ক্রিমি সাদা রঙ বের করা হয়। এই গুঁড়োকে দুধি মাটি বা 'কাওলিন' বলা হয়। কালো রঙের জন্য ম্যাঙ্গানিজ গেরুয়া বা কালি মাটি ব্যবহার করা হয়। নদীর নুড়ি থেকে হলুদ তৈরি করা হয়।

সোহরাই শিল্পের থিম এবং মোটিফ:

সোহরাই চিত্রকলার সাধারণ বিষয়বস্তুতে প্রাণী, গাছপালা এবং বিমূর্ত প্রতীকের চিত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রায়শই আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। লাল, সাদা এবং কালো রঙের ব্যবহার গভীর প্রতীকী অর্থ বহন করে, যা জীবন এবং আধ্যাত্মিকতার উপাদানগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সোহরাই চিত্রকলায় প্রাণী, ফুল, গাছপালা, জ্যামিতিক চিত্র এবং পশুপতি (প্রাণীদের প্রভু) রূপে নৃতাত্ত্বিক এবং জুমরফিক আকারে চিত্রিত শিবের প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্ত। সোহরাই শিল্পে গাঞ্জু সম্প্রদায়ের চিত্রকলার রীতি একটি স্বতন্ত্র শৈলীকে প্রতিফলিত করে। গাঞ্জু সম্প্রদায়ের চিত্রকলাতে বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণী এবং পাখি - ময়ূর, হাতি, বাঘ, কুমির, সাপ, শৃগাল ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়।

সোহরাই শিল্পশৈলী এবং শিল্পকর্মগুলির অর্থ:

ভেলওয়ারা গ্রামের চিত্রগুলিতে একটি স্টেনসিল স্টাইল দেখানো হয় যা ভগবান শিবের বাহু সহ পাতার আকৃতির প্রতীক। এখানে দেখা শিল্পকর্মগুলি দাউজিনগর গ্রামের জিহুর আগরিয়া উপজাতি সম্প্রদায় দ্বারা তৈরি। এখানে, চিত্রকর্মগুলি আরও জটিলভাবে তৈরি করা হয়েছে ভেলওয়ারা গ্রামের কুর্মি সম্প্রদায়ের মহিলাদের দ্বারা কমলাবন বা 'জীবনের বৃক্ষ' চিত্রিত করে।

এগুলোর অর্থ বোঝার এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যা পরিশীলিত আখ্যানের পরিবর্তে মৌলিক মোটিফগুলিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পী চর্চা বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং আরও অনেকে তা করার পথে। মায়েরা তাদের মেয়েদের এই চিত্রকর্ম শেখানোর প্রথা ত্যাগ করছেন কারণ তারা এর মধ্যে কোনও মূল্য খুঁজে পান না। এই সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের টিকে থাকা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হল চাহিদা জাগানো। ব্যক্তি, কর্পোরেশন, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সকলেরই সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে মানুষের জীবন পরিবর্তিত হতে আমরা দেখছি। সোহরাইয়ের চিত্রকর্মগুলিকেও তাদের প্রাপ্য মনোযোগ দেওয়া উচিত। আশার কথা হল, এই চিত্রকর্মগুলি সম্প্রতি ভৌগোলিক গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু কেবল আশা ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখে না। এই শিল্প ঐতিহ্যটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সোহরাই শিল্পকলার বর্তমান পরিস্থিতি:

১৯৯২ সালে বুলু ইমাম সংস্কৃতি জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই শিল্পকলা জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ২০১৮ সালে, ঝাড়খণ্ড সরকার সোহরাই চিত্রকলা দিয়ে ট্রেন এবং সরকারি বাসস্থান সাজানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ২০২০ সালে সোহরাই-খোয়ার ভৌগোলিক নির্দেশক ট্যাগ পেয়েছে। একটি জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে সোহরাই-খোয়ার মুরাল চিত্র নারীদের সৃজনশীলতার আশ্চর্যজনক স্বতঃস্ফূর্ততা চিত্রিত করে, যা প্রতিটি মুরালকে বিশেষ করে তোলে। এখানে, জোড়কাঠ গ্রামের একজন কুর্মি মহিলা হাজারীবাগের সংস্কৃতি জাদুঘরে চিত্রকর্ম করছেন। পদ্মশ্রী বুলু ইমাম এবং তার পরিবারের দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সংস্কৃতি জাদুঘর এবং আর্ট গ্যালারি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও কারুশিল্পের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ধারণ করে। জাদুঘরটি বিশেষভাবে সোহরাই শিল্পের বিশাল সংগ্রহের জন্য পরিচিত।

উপসংহার:

যদিও এই সোহরাই শিল্পকর্মগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ, খুব কম লোকই এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত আছেন। শ্রী বুলু ইমামের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ফলে এই চিত্রকর্মগুলি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তবুও আমাদের নিজের দেশে অর্থাৎ ভারতে এগুলি অজানা থেকে গেছে। হাজারীবাগে নিযুক্ত সিআরপিএফ কর্মী মিঃ মুন্না সিং “পেইন্ট মাই সিটি” উদ্যোগ শুরু করেছিলেন, যা তাদের স্থানীয় জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়তা করেছিল। পরে, জেলা সরকার এই পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং এই শিল্পকর্মগুলি শহরের দেয়ালে আঁকা শুরু হয়। যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নবনির্মিত রেলওয়ে স্টেশন উদ্বোধন করতে হাজারীবাগ পরিদর্শন করেন, তখন এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি শহরের দেয়ালে এবং ট্রেন স্টেশনে এই দেয়ালচিত্রগুলি লক্ষ্য করেন। তার সাপ্তাহিক রেডিও অনুষ্ঠান, মন কি বাত-এ, তিনি এই চিত্রকর্মগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর থেকে, এই কাজগুলি জাতীয়ভাবে পরিচিতি পেয়েছে, কয়েকজন অনুশীলনকারী শিল্পীকে বেশ কয়েকটি শিল্প শিবিরে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর ফলে, “আমার শহর রঙ করুন” প্রচারণা রাজ্যের অন্যান্য শহরেও বিস্তৃত হয় এবং প্রতিটি জেলা তাদের দেয়ালে সোহরাইকে আঁকার জন্য এতটাই আগ্রহী ছিল যে এর স্বতন্ত্রতা হারিয়ে যায়। অপ্রচলিত সোহরাই শিল্পীরা তাদের বোধগম্যতা, স্থান, সময় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, তাদের অর্থ অনুসারে বেশিরভাগ অঞ্চলে নকশা এবং রঙের সংমিশ্রণকে বিকৃত করেছিলেন। আজও রাজ্যজুড়ে এই ধরনের শিল্পকর্ম পাওয়া যায়। খাঁটি সোহরাই চিত্রকর্মগুলি সম্পূর্ণরূপে দেখা যেতে পারে হাজারীবাগের গ্রামগুলিতে। সোহরাই উৎসব দেখতে, উপস্থিত হওয়ার সেরা সময় হল দীপাবলির পরে বা দীপাবলির পরের দিন। যদিও হাজারীবাগের প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায় আগে যা আঁকত তা এখন কেবল হাতে গোনা কয়েকটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক আবাসস্থলে এই শিল্পকর্মের টিকে থাকার পথে দুটি প্রধান বাধা রয়েছে। প্রথমটি হল “উল্লয়ন”, যেখানে মাটির কুঁড়েঘরগুলি আধুনিক কংক্রিটের ঘর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়টি হল কয়লা খনির কারণে গ্রাম স্থানচ্যুতি।

তথ্যসূত্র:

1. Sharan, Dr. Madhu; Patel, Dr. Sukriti; Mohan, Ms. Prachi, 2024, The Romance of Cave Painting-Sohrai Painting of Jharkhand, India, I I P Iterative International Publishers, pp.-53-64.
2. Rao, Kota Mrutyunjaya, 2023, Indian Art & Heritage, India, Pathak Publisher and Distributors, p. 72.
3. Jha, Alok S, 2022, Indian Culture Art and Heritage: An Illustrated Journey, Gurugram Haryana, OakBridge Publishing Pvt. Ltd., pp.- 112-223.
4. Kumar, Anup, 2020, Indian Folk and Tribal Art, India, B. R. Publisher, pp. 81-93.
5. Deshmukh, Ranjit , 2022, Folk and Tribal Art of India, India, Edukeen Publishers, pp.- 127-253.

6. Mallik, Prof. (Dr.) Ranjan Kumar, 2022, Folk and Minor Art Tradition of India, India, Bharati Prakashan, pp.- 243-306.
7. Gupta, Dr. Nisha, 2017, Folk and Tribal Art in India, India, IBP Books, pp.- 85-96.
8. Gupta, Charu Smita, 2008, Indian Folk and Tribal Paintings , India, Roli Books Pvt Ltd., pp.- 57-74.
9. Sidh, Dr. Umesh Kumar, 2021, Indian Folk and Traditional Fine Art, India, ABD Publishers, pp.- 52-77.
10. Kumar, Anup , 2020, Indian Folk and Tribal Art, India, B.R. Publisher, pp.- 44-63.

একমেরুতাবাদ থেকে বহুমেরুতাবাদে উত্তরণ : বর্তমান বিশ্বরাজনীতির চালচিত্রে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

চাঁদ অধিকারী

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: এই অধ্যয়নটিতে ঠান্ডাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে একমেরুত্ব থেকে বহুমেরুত্বের দিকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিবর্তন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নগুলির মধ্যে একটি। এই রূপান্তর কেবল বস্তুগত শক্তির পরিবর্তনই নয়, প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য এবং আদর্শিক প্রভাবের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ফলস্বরূপ বিশ্ব আরও জটিল এবং কম অনুমানযোগ্য, যেখানে শক্তি একক আধিপত্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হয়ে একাধিক কেন্দ্রে পুনর্বন্টন করা শুরু হয়েছে সে বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বরাজনীতিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির কিরূপ ভূমিকা তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরন্তু, অধ্যয়নটিতে বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার গতিশীলতার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যয়নে তাত্ত্বিক কাঠামোর এই ধারণাটি উপস্থাপন করেছি যে বিশ্ব একমেরু থেকে বহুমেরু বিশ্বে রূপান্তরের মাধ্যমে একটি বড় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এর উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে জটিল আন্তঃক্রিয়া সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে, এটি যে একপ্রকারের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি উপস্থাপন করে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে বহুমুখী মাত্রা বিশেষ ভূমিকা পালন করে তা আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: একমেরুত্ব, বহুমেরুতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতা।

মূল আলোচনা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে বিশ্বরাজনীতিতে গোটা বিশ্বব্যবস্থা দুটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকেন্দ্রীক চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। তথা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই কেন্দ্রে বিভাজিত হয়েছিল বিশ্বের বেশির ভাগ সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশগুলি, তা আমরা সবাই জানি। যে কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছিল গত শতাব্দীর ৯০এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের হাতধরে। ঠিক সেই সময় থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চরম প্রভাব বিস্তার করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। বেশিরভাগ দেশ আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় পরিবর্তন বা সংস্কারের মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছিল। যেখানে একমেরুতা একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু আজ আমরা সবাই লক্ষ্য করছি যে, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে একটা জটিল সমীকরণের খেলা চলছে প্রতিনিয়ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দ্বিমেরু বিশ্ব থেকে এক মেরু কেন্দ্রিক বিশ্বে বিশ্ব রাজনীতি পদার্পণ করার পর থেকে লড়াই এখন মতাদর্শগত ক্ষেত্রে আর সীমাবদ্ধ নেই বরং অর্থনৈতিকতার দিকে ঝুঁকছে। একদিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে ভারত ও চীনের উত্থান আর অন্যদিকে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন কিছু অর্থনৈতিক জোট গঠন চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে। এর মধ্যে BRICS গঠন ও এর উত্থান অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য। ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন, সাউথ আফ্রিকা ও ভারতের সমন্বয়ে এই অর্থনৈতিক সংস্থাটি গঠিত।

ব্রিকস এর নেতৃত্বে গঠিত হতে যাচ্ছে নতুন বিশ্ব ব্যাংক যা আধিপত্য খর্ব করবে পশ্চিমাদের। যেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে জোট ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করছে সেখানে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক জোট ইউরোপিয় ইউনিয়নের ভাঙ্গনের সুর বেজে উঠেছে। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে অবাধ্য দেশগুলির উপর এক তরফা অর্থনৈতিক অবরোধ আর কতদিন কার্যকরী থাকে তা এখন দেখার বিষয় (মিলন, ২১ শে ডিসেম্বর, ২০১৪)।

আজকের ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রগুলি বেশিরভাগই অ-পশ্চিমা উন্নয়নশীল দেশগুলির কাঠামোগত বর্ণনাকে অনেকটাই শক্তি দেয়। পুরানো লিবারেল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার পশ্চিমী আদলে নির্মিত হয়েছিল। ব্রাজিল, চীন, ভারত এবং অন্যান্য দ্রুত-উদীয়মান রাষ্ট্রগুলির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার একটি ভিন্ন ধারণা তৈরি করেছে এবং তারা তাদের সাম্রাজ্যবিরোধী এবং ঔপনিবেশিক বিরোধী অতীতের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে দেখে। এখনও উন্নয়নের মৌলিক সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করে, তারা পুঁজিবাদী সমাজের সাথে জড়িত নয়। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাও উদার আন্তর্জাতিক পতনের এই বর্ণনাকে শক্তিশালী করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু করা সংকট উদার পুঁজিবাদের আমেরিকান মডেলকে কলঙ্কিত করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নেতা হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন সন্দেহ উত্থাপন করেছে (Alex Esposto, 2025)। যে প্রেক্ষাপটে এই ধারণাটি উপস্থাপন করেছে যে বিশ্ব এক মেরুর থেকে বহুমেরু বিশ্বে রূপান্তরের মাধ্যমে একটি বড় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেরুতাবাদ বলতে কি বোঝায়:

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেরুতাবাদ বলতে বোঝায় যে বিশ্ব ব্যবস্থায় দেশগুলির মধ্যে কীভাবে ক্ষমতা এবং প্রভাব বন্টিত হয় তার ধারণা। এই ধারণাটি বিশ্ব মধ্যে দেশগুলি কীভাবে যোগাযোগ করে, জোট গঠন করে এবং তাদের স্বার্থ অনুসরণ করে তা বোঝার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। যেখানে শক্তি কেন্দ্রের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা, সহযোগিতা প্রক্রিয়া এবং সংঘাতের ধরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

মেরু ব্যবস্থার প্রকারভেদ:

দ্বিমেরুতাবাদ:

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বিমেরুতাবাদ বলতে এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই দুটি শিবিরের দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝায়। মতাদর্শগত দিক থেকেই এই দুটি শিবিরের উদ্ভব ঘটেছিল। সেসময় গোটা বিশ্ব মতাদর্শগত দিক থেকে পুঁজিবাদীদেশগুলির নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নেতৃত্বে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই দুই নেতৃত্ব এবং দুটি প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন ধারা দ্বিমেরুতাবাদ আন্তর্জাতিক রাজনীতি নামে পরিচিত (ঘোষ, ১৯৯৮)।

একমেরুতাবাদ:

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়, যে ঘটনাকে হবসবম ইতিহাসের সমাপ্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তার পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভের পর চার্লস ট্রাউথ্যামার মন্তব্য করেছিলেন যে, “আমরা এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে বসবাস করি যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হল একমাত্র কর্তা” (নন্দী, ২০২০)। যে ধারণার

অনুসারী হয়ে বলতেই পারি যে একমেরুতাবাদ বলতে এমন একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলে যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাটাই পরিচালিত হয় একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে, বা একটিমাত্র দেশের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়।

বহুমেরুতাবাদ:

গত দেড় দশকে বিশ্বে চীন, রাশিয়া ও ভারতের মতো শক্তির উত্থান বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন রূপরেখার সংকেত দিতে শুরু করেছে। যে প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক-কেন্দ্রিকতার প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং বহুকেন্দ্রিকতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। তাই বহুমেরুতাবাদ বলতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে বহু-মেরুপ্রবন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের নিজ নিজ জোটে থেকেও স্বাধীনভাবে নিজেদের লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করে (Raymond, 1973)। যেখানে শক্তি-সাম্যের এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে অনেকগুলি ক্ষমতার কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বহু-মেরুতায় ভারসাম্যের একটি নমনীয় অবস্থা বিরাজ করে (ঘোষ, ১৯৯৮)।

বহুমেরুতাবাদে উত্তরণের প্রেক্ষাপট:

বর্তমান বিশ্বে চীন ভারত-সহ নতুন শক্তি উঠে এসেছে, যে দেশ গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত নিয়ম মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আপন পথ বেছে নিতে চাইছে। এর নেপথ্যে তিনটি কারণ, যথা প্রথমত, পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাশিয়া খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ। এক সময়ের মহাশক্তি এখন ক্ষমতার দিক থেকে অনেক দুর্বল এবং সেই হতাশা থেকে তারা আক্রমণাত্মক পথে হাঁটছে। দ্বিতীয়ত, চীনকে এক সময় ধারণা করা হয়েছিল যে-ধনী ও ক্ষমতাবান হলে তারা মার্কিন ঝাঁচের অর্থনীতি ও রাজনীতি গ্রহণ করবে। বাস্তবে তারা নিজস্ব ধারা বজায় রেখেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অস্বস্তিকর। তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের সুফল থেকে ধনী দেশগুলির বহু নাগরিক বঞ্চিত অনুভব করেছেন, যা তাঁদের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা বাড়িয়েছে (দাস, ২০২৫)।

বর্তমানে আমরা একই সঙ্গে তিনটি বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি। প্রথমটি ‘গ্লোবাল সিকিউরিটি অর্ডার’ – যেখানে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে শীর্ষে। দ্বিতীয়টি, ‘গ্লোবাল ইকোনমিক অর্ডার’ – যেখানে ক্ষমতা ভাগাভাগি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্য এখনও সর্বোচ্চ স্তরে বিরাজমান। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের বৃহত্তম ‘অভিন্ন বাজার’ রূপে নিয়ম প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে ভারত ও জাপানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারফলে বৈশ্বিক কাঠামোয় অর্থনীতি এখন একটি প্রকৃত বহুমেরু কাঠামোয় পরিচালিত হচ্ছে। আর তৃতীয়টি হল ‘ডিজিটাল অর্ডার’ – যা বৃহদায়তন বেসরকারি প্রযুক্তি কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সাইবার প্রতিরক্ষা, রাজনৈতিক প্রচারণা, গণমাধ্যমের প্রবাহ এবং প্রভাব থেকে শুরু করে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় গঠনেও তাদের প্রভাব বিস্ময়কর (দাস, ২০২৫)। তাই ভবিষ্যতের বহুমেরু বিশ্বে আশা করা যেতেই পারে যে, বিশ্ব অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের সাথে স্থায়ী তো হবেই না বরং বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন একাধিক জাতির সাথে স্থায়ী হবে। তাদের দেশের সাথে সম্পর্কিত সীমিত ক্ষেত্রে, প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর নির্ণায়ক বক্তব্য থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, জাপান, চীন, ইউই এবং ভারত প্রযুক্তিতে অগ্রগতি, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং বৃহৎ জনসংখ্যার ভিত্তির কারণে অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।

যার প্রেক্ষাপটে বাস্তববাদী বিশেষজ্ঞ রবার্ট গিলপিন, বলেছেন যে ‘আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতার গতিশীলতার পরিবর্তনের একটি গতিশীল প্রতিফলন, যা পর্যায়ক্রমিক দ্বন্দ্ব এবং পুনর্গঠনের দ্বারা চিহ্নিত, ক্রমবর্ধমান শক্তি যুদ্ধোত্তর বসতি স্থাপন এবং নতুন শৃঙ্খলা গঠন করে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইঙ্গিত দেয় যে বিশ্ব এমন এক যুগে প্রবেশ করেছে যেখানে দুই বা ততোধিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (মার্কিন) আর্থিক ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রস্তুত’। তবে, এটি প্রত্যাশিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রতিরোধ্য থাকবে। তবে, উদীয়মান শক্তিগুলির উত্থান একটি প্রতি-ভারসাম্য তৈরির প্রতিশ্রুতি দেয়।

উদীয়মান বহুমেরুতাবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

বহুমেরুতাবাদী ব্যবস্থা যত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করছে বেশ কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য:

আন্তর্গনির্ভরতা:

ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, দ্বিমেরু ব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট বিভাজনের বিপরীতে, আজকের উদীয়মান ব্যবস্থায় জটিল সম্পর্কের জাল রয়েছে যেখানে জাতিগুলি একই সাথে কিছু ক্ষেত্রে অংশীদার এবং অন্য ক্ষেত্রে আবার প্রতিযোগীও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান কৌশলগত প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিকভাবে গভীরভাবে পরস্পর নির্ভরশীল (BANotes.Org, 2023)।

বিষয়-নির্দিষ্ট সারিবদ্ধতা:

অনমনীয় আদর্শিক ব্লকের পরিবর্তে, বহুমেরু বিশ্বে সহজসরল জোটের অবস্থান রয়েছে যা নির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে ঘিরে তৈরি হয়। দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে প্রতিযোগিতা করার সময় এবং মানবাধিকারের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার সময় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সহযোগিতা করতেই পারে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আরও জটিল কূটনৈতিক দৃশ্যপট তৈরি করে যেখানে সারিবদ্ধতার পূর্বাভাস দেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে (BANotes.Org, 2023)।

আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধি:

ক্ষমতা যত বেশি পুনর্বন্টন করা হচ্ছে, ততই আঞ্চলিক শক্তিগুলি তাদের আশেপাশের অঞ্চলে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। পূর্ব এশিয়ায় চীনের আধিপত্য, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার কিছু অংশে রাশিয়ার প্রভাব, দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহত্তম দেশ ভারতের প্রভাব এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের নেতৃত্বে আঞ্চলিক শক্তি কেন্দ্রগুলির প্রতি এই প্রবণতার উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (BANotes.Org, 2023)।

বিরোধপূর্ণ বৈশ্বিক ব্যবস্থা:

আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন এবং রীতিনীতিগুলি বৃহত্তর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি, বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার জন্য প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত হচ্ছে। পশ্চিমা উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং অ-হস্তক্ষেপের উপর চীনের জোরের মতো বিকল্প মডেলগুলির মুখোমুখি হয়, যা আরও খণ্ডিত আদর্শিক পরিবেশ তৈরি করে।

বৃহত্তর স্থিতিশীলতার জন্য যুক্তি:

ক্ষমতার বিস্তার: যখন ক্ষমতা বন্টন করা হয়, তখন কোনও একক জাতি অন্য শক্তির প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করে একতরফাভাবে কাজ করতে পারে না, সম্ভাব্যভাবে সংযমকে উৎসাহিত করে।

একাধিক ভারসাম্যের বিকল্প: সম্ভাব্য আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষাকারী জোট গঠনের জন্য দেশগুলির আরও নমনীয়তা রয়েছে।

স্বার্থ ভাগ করা: জলবায়ু পরিবর্তন এবং মহামারীর মতো বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধান শক্তিগুলির আগ্রহ ভাগ করে নেওয়া, সম্ভাব্যভাবে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা।

বিশ্ব রাজনীতিতে বৃহত্তর অস্থিরতা সৃষ্টির পক্ষে যুক্তি:

নিরাপত্তা দ্বিধা তীব্রতা: নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তির গৃহীত পদক্ষেপগুলি একাধিক অন্যান্য শক্তির দ্বারা হুমকিস্বরূপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, যা ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা তৈরি করে।

ঐতিহাসিক নজর: কিছু ঐতিহাসিক পূর্ববর্তী বহুমেরু সময়কাল, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ইউরোপকে বিপর্যয়কর সংঘাতের ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন।

উদীয়মান বহুমেরু ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা সম্ভবত নির্ভর করবে প্রধান শক্তিগুলি প্রতিযোগিতা পরিচালনা করার জন্য নিয়ম, প্রতিষ্ঠান এবং যোগাযোগের চ্যানেল তৈরি করতে পারে কিনা তার উপর যা ভাগ করা চ্যালেঞ্জগুলিতে সহযোগিতা সক্ষম করে। এখন লক্ষণীয় বিষয় হল যে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রত্যাশিত পতন সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দেয় না। উদীয়মান শক্তিগুলো থেকে আশা করা যায় না যে, তারা ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলবে অথবা সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তবুও, এটা অনস্বীকার্য যে তারা ভবিষ্যতের বিশ্ব ব্যবস্থার গতিশীলতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বৃহৎ শক্তি এবং তাদের অংশীদারদের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের জন্য এই বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপের কনসার্টের মতো সহযোগিতার একটি শক্তিশালী অনুভূতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। বহুমেরুত্বের দিকে এই পরিবর্তন বিশ্ব রাজনীতির গতিশীলতাকে সংঘাত-চালিত এজেন্ডার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার দিকে পুনর্গঠনের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং, উদীয়মান বহুমেরুত্বকে ভয় পাওয়া উচিত নয় এবং এটিকে আলিঙ্গন করা উচিত (Omeed, 2023)।

উপসংহার:

পরিশেষে বলতেই পারি যে, ঠান্ডাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে একমেরুতাবাদ থেকে বহুমেরুতাবাদের দিকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিবর্তন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নগুলির মধ্যে একটি। এই রূপান্তর কেবল বস্তুগত শক্তির পরিবর্তনই নয়, এর মধ্যে যুক্ত বিষয়গুলি প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য এবং মতাদর্শগত প্রভাবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়। ফলস্বরূপ বিশ্ব আরও জটিল এবং কম অনুমানযোগ্য হয়ে উঠেছে, যেখানে শক্তি একক আধিপত্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হয়ে একাধিক কেন্দ্রে পুনর্বন্টন করা শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে, বর্তমান ঘটনা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের পূর্বাভাসের জন্য এই বিকশিত ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যকে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও মহামারী প্রতিরোধ করার যে চ্যালেঞ্জ তা আজ যেভাবে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে তার প্রেক্ষাপটে, এমনকি ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিতে স্বাভাবিক প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে, আজকের উদীয়মান বহুমেরুত্ব অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা এবং প্রযুক্তিগত সংযোগ দ্বারা সৃষ্ট অভিনব

উপাদানগুলির সাথে পরিচিত গতিশীলতাকে একত্রিত করতে শুরু করেছে, সেই প্রেক্ষাপটে আমরা বলতেই পারি যে বহুমেরুতায় রূপান্তর আজ শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে এখন পর্যবেক্ষণের বিষয় হল যে, যেখানে একাধিক বৃহৎ শক্তি প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতা করে, সেখানে ছোট ছোট দেশগুলি কীভাবে তাদের প্রভাব বজায় রাখবে অথবা সেই পথে অগ্রসর হতে কতটা সক্ষম হবে? আর সেইসঙ্গে এটাও দেখার বিষয় যে, বহুমেরুত্বের দিকে উত্তরণ তা কি বৃহত্তর সংঘাতের দিকে নিয়ে যাবে নাকি বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে? তবে আজ যে আমরা বিশ্বরাজনীতির মাহেন্দ্রযুগ সূচিত হওয়ার অভিমুখে দাঁড়িয়ে আছি তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার একটি জটিল ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা আজ আমরা করতেই পারি। সেইসঙ্গে এইও স্বীকার করতে হবে যে, এইরকম একটি গতিশীল কাঠামোর মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন এবং এইরকম একটি ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা আরও কঠিন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এইরূপ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

1. Alex Esposto, J. F. (2025, February 14). From a Unipolar to a Multipolar World: What's in It For Australia. *Chinees Journal of International Review*. <https://doi.org/10.1142/S2630531324500082>
2. BANotes.Org. (2023, December 15). From Unipolar to Multipolar: The Evolving Global Power Structure.
3. Omeed, B. (2023, October 22). Emerging Multipolarity: Critical Analysis of a Shifting Global Order. *Center for Strategic and Conmtemporary Research*.
4. Raymond, W. J. (1973). *Dictionary of Politics*. United States of America: Brunswick Publishing Corporation.
5. ঘোষ, ন. ঘ. (১৯৯৮). *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*. কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি।
6. দাস, স. (২০২৫, আগস্ট ১৬). 'দ্বিতীয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ' অদূরে. *সংবাদ প্রতিদিন, সম্পাদকীয়*, 45.
8. Retrieved from <https://epaper.sangbadpratidin.in/epaper/m/970265/689f7c5974945>
7. নন্দী, ব. চ. (২০২০). *তত্ত্ব ধারণা ও বিষয়-বিতর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*. কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
8. মিলন, ম. র. (২১ শে ডিসেম্বর, ২০১৪ , ডিসেম্বর ২১). এক মেরু বিশ্ব আর নয় বহু মেরু বিশ্বের উত্থান সময়ের ব্যাপারমাত্র. Retrieved from <https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/Milon06/30000858>।

উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ভাবনা : গৈঁওখালির খ্রিস্টসঙ্গীতের প্রেক্ষিতে একটি আলোচনা

গুপ্পেন্দু রাউৎ

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

গোপ প্রাঙ্গণ, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: কীর্তন (সংস্কৃত: কীর্তন) সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ ধারণা বা গল্পের বর্ণনা করা, আবৃত্তি করা, বর্ণনা করা, বিশেষ করে ভারতীয় ধর্মে। কীর্তনকারী ব্যক্তি কীর্তনকার বা কীর্তনীয়া নামে পরিচিত। কীর্তন সম্পাদনের মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিকভাবে জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র, যেমন হারমোনিয়াম, বীণা বা একতারা (স্ট্রিং যন্ত্রের রূপ), তবলা (এক তরফা ড্রাম), মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ (দুই তরফা ড্রাম), বাঁশি (উডউইন্ড যন্ত্রের রূপ), এবং করতাল বা তালাস (সিম্বল)। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের পর্তুগিজ খ্রিস্ট সংগীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেদিনীপুরের গৈঁওখালির পর্তুগিজ খ্রিস্টানরা দীর্ঘদিন যাবত ওই এলাকায় বাস করেছেন। তারা বিখ্যাত তাদের সংগীত ও কীর্তনের জন্য, যা খ্রিস্টসংগীত নামে পরিচিত। এই পর্তুগিজ খ্রিস্ট সংগীতে পরিবেশ ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের নানান দিক এই পর্তুগিজদের সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আজও পেরেরা, তেসরা, ডিক্রুজ প্রমুখদের খ্রিস্টকীর্তনে পরিবেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সূচক শব্দ: পর্তুগিজ, খ্রিস্টসংগীত, গৈঁওখালি, মিরপুর, যীশুখ্রীষ্ট।

মূল আলোচনা: ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগর ধরে আফ্রিকার উত্তরমাশা (ঝাড়ের) অস্তরীপ ঘুরে ভাস্কো-ডা-গামা পৌঁছেছিলেন প্রথমে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে। কোঙ্কন উপকূল, গোয়া, বোম্বাই, দমন, নগর, হাভেলি, দাদরা এবং দিউ অধিকার করে প্রায় কুড়ি বছর পরে তারা বাংলাদেশে পৌঁছে ছিল ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে। পূর্ব উপকূলে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে ছিল ১৫৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে। হিংসা ও নিষ্ঠুরতায় পর্তুগিজরা পাল্লা দিয়েছিল মগদের সঙ্গে। এমতাবস্থায় মোগলরা এগিয়ে এল এদের প্রতিরোধে, ১৬৩২-এ শাহজাহানের নির্দেশে হুগলি থেকে এবং তারপর ১৬৩৬-এ হিজলী থেকে তাদের বিতাড়ন করা শুরু হল। যদিও ১৯৪৭-এর পরও পর্তুগিজ উপনিবেশ ভারতে রয়ে গিয়েছিল। ১৯৬১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর অপারেশন বিজয়ের ফলে গোয়া পর্তুগিজ মুক্ত হয়ে ভারতের সাথে যুক্ত হয়। পর্তুগিজদের এই অতি পরিচিত ছবির বাইরেও আরেকটি ছবির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার গৈঁওখালির ‘মিরপুর গ্রাম’ বা ‘ফিরিস্গিপাড়া’ যেখানে এখনো পর্তুগিজ বংশধররা বসবাস করছে।^১

কিন্তু মিরপুরে পর্তুগিজ কলোনি গড়ে ওঠার নেপথ্য ইতিহাসটা কী? বাংলায় তখন বর্গি হামলা চলছে। লুণ্ঠতরাজ, হামলা, খুনোখুনি চলছে বিভিন্ন এলাকায়। মারাঠা দস্যুদের আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে তখন হাহাকার। অনবরত হত্যালীলা বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে। সেসময় বাংলার কোনও জমিদার বা ছোট ছোট রাজাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না এই বর্গি আক্রমণ প্রতিহত করার। বর্গি আক্রমণে দিশাহারা অবস্থা ছিল মহিষাদলের রাজ পরিবারেও।

সেসময় মহিষাদলের রানি ছিলেন জানকী দেবী। ১৭৬৯ সালে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান আনন্দলাল উপাধ্যায়। ১৭৭০ সালে তখন মহিষাদলের রানি হন তাঁর বিধবা স্ত্রী জানকী দেবী। তিনি অত্যন্ত কর্মকুশলী এবং মহীয়সী নারী ছিলেন। ১৮০৪ সালে (১২১১ বঙ্গাব্দ) তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর এই রাজত্বকালে (১৭৭০-১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ) তিনি যে কয়টি কাজ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম বর্গিদমন। বর্গিদের হামলা থেকে জনগণকে বাঁচাতে রানি জানকী পতুর্গিজ সৈনিক নিযুক্ত করেছিলেন সেসময়। মিরপুর গ্রামটিতে তাঁদের বসবাসের জন্য এবং কৃষিকাজের জন্য নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। রাজবাড়ির প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত হলেন সিমসেম রথা-সহ আরও ১১ জন। তাঁদের সাথে যুক্ত হল শক্তিশালী অস্ত্র। বলাবাহুল্য এঁদের দাপটে বর্গিদস্যুরা ভয় পেয়েছিল। আক্রমণ করার সাহস হয়ে ওঠেনি তাঁদের। রানি জানকী এরপর খুশি হয়ে ওই ১২ জন পতুর্গিজ জলদস্যুকে মিরপুরে নিষ্কর জমি দেন বসবাসের জন্য। সেই থেকে মিরপুর গ্রামে আজও রয়েছেন ওই পোতুর্গিজদের বংশধররা। মোটামুটি বলা যায় ১৭৭০ থেকে ১৮০৪-এর মধ্যে কোনও এক সময়ই এঁরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন।^২ সেই মিরপুর আজ বদলে গিয়েছে। পরিবর্তন এসেছে তার পরতে পরতে। জলদস্যু পতুর্গিজদের বংশধররা আজ 'খোলস' হারিয়ে নিপাট বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের জল আলো বাতাসে পরিপুষ্ট হয়েছে তাঁদের জীবন। বাঙালিয়ানা এখন মিরপুরের পতুর্গিজদের সাথে সমার্থক। এখানে মিলবে যেসব পতুর্গিজ পদবি তা হল- তেসরা, রথা, লোবো, নুনিস, রোজারিও, ডিকোস্টা, ডিফ্রুস, গোমস, পেরেরা ইত্যাদি।^৩ পূর্বের পরিচয়ে তাঁরা পতুর্গিজ জলদস্যু হলেও আজ তাঁরা এ রাজ্যেরই নাগরিক। খ্রিস্টান ধর্মের অনুশঙ্গে প্রতিপালিত হলেও তাঁদের জীবনছন্দে দোলা খায় বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের আবেশ। সেই আবেশ সারা দেহে মেখে এখানকার অমর তেসরা, পল তেসরা, অ্যান্টনি রথা, অভিজিৎ লোবু, সুজাতা রথা-রা নিজেদের পরিচয় দেন 'বাঙালি পতুর্গিজ' হিসেবে। আর তখন যেন মনে হয় - 'এক জাতি এক প্রাণ, এক হাসি এক গান।'

এল.এস.এস. ও ম্যালি তার 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার মিডনাপুর'-তে লিখেছেন-
 "After these thanas most are found in thana Maslandpur (Mahisadal), where there is a curious colony of Christians near Geonakhali. They say that they are descendants of some Portuguese artillerymen, whom the Raja of Mahishadal imported to protect his estates. from the Maratha raids. Except that, they are christians and that some have Portuguese names, they can not be distinguished from their neighbours, indeed, in the same family one man may have a Portuguese name, such as Pedro and another a Hidnu name, such as Gopal."^৪ এছাড়া Census এও মিরপুরের পতুর্গিজ পল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায় These people have retained till today their Portuguese surnames. The following are some representative names: (1) Matilal Tessera, (2) Sachindra Rozario, (3) Luis Rota, (4) Harron Pereira, (5) Santosh Rozario, (6) Abani D'Cruz, (7) Margarette Lobo, (8) Pravudeu Rota and so on. "Sankirtan" or songs in praise of Jesus, usually composed by some amongst them or of their community, is is very common. These are composed in Bengali.^৫ O'Malley তাঁর Midnapur District Gazetteer

(1911)-এ মিরপুর গ্রামকে একটা খ্রিস্টান কলোনি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময় প্রায় দু'শ খ্রিস্টানের বাসভূমি ছিল মিরপুর। আজ এদের খ্রিস্টান এবং পর্তুগিজ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে চিহ্নিত করা ছাড়া স্থানীয় লোকদের থেকে আলাদা করার আর কোনো উপায় নেই।^৬

১৯৫২-৫৩ নাগাদ মিরপুর ভ্রমণ করে বিনয় ঘোষ লক্ষ্য করেছিলেন, “পর্তুগিজদের বংশধর বলে কোনো স্বতন্ত্র চেতনা তাদের নেই।”^৭ গবেষক ঘোষের দাবি, গির্জা ও খ্রিস্টান ধর্মচারণের মধ্যেও যা আছে, তার সবটাই খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি।^৮ সাংস্কৃতিকীকরণ-এর এই মিরপুরের খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ১৪০ টি পরিবারের অধিকাংশই (৯০ টি পরিবার) রোমান ক্যাথলিক, বাকিরা প্রোটেষ্ট্যান্ট।^৯ উভয় সংস্কৃতির খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মিরপুরবাসী ২০১৩ থেকে চেষ্টা করেছে সমবেতভাবে খ্রিস্ট জন্মোৎসব পালন করার।^{১০} ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত উৎসব চলে ফিরিঙ্গিপাড়ায়, বসে বাংলা গানের আসর। খোল-করতাল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাওয়া হয় খ্রিস্টকীর্তন। বড়দিনের আগের দিন রাত বারোটা থেকে শুরু হয় যিশুর উপাসনা, বাইবেল পাঠ। স্থানীয়রা বলেন, ‘খ্রিস্টের জাগরণ’। তারপরে শুরু হয় ‘মিশগান’ বা ‘ক্যারল সং’। আর ভোরবেলার আকর্ষণ নগরকীর্তন।^{১১}

খ্রীষ্টীয় কীর্তন বাঙালী খ্রীষ্টানের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের গান। খ্রীষ্টীয় কীর্তন, বাংলার কীর্তন ধারার একটি নতুন মাত্রা। বৈষ্ণবীয় কীর্তন যেমন কৃষ্ণের গান, খ্রীষ্টীয় কীর্তন তেমনি খ্রীষ্টের গান। মনে রাখতে হবে, খ্রীষ্টান ধর্মের উপাসনায় সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আগে থেকেই ছিলো। রবিবার বা অন্যান্য দিনের চার্চ সার্ভিসের সময়ে গান গাওয়া হয়, বড়দিনে ক্যারল গাওয়া হয়। চার্চের ভজন-প্রার্থনা একান্তভাবেই সঙ্গীতময়।^{১২} উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো খ্রিষ্ট কীর্তন নিয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ গুলি পাওয়া যায় যেমন, শেখ মকবুল ইসলামের লেখা ‘খ্রিস্টীয় কীর্তন’, জনসন সন্দীপের লেখা বঙ্গীয় খ্রিস্টান সমাজের সংগীত ও কীর্তন চর্চা, সমরেন্দ্র মন্ডলের লেখা কীর্তনীয়া প্রভৃতি গ্রন্থে খ্রিস্টান সমাজের সংগীত ও কীর্তন নিয়ে আলোচনা করা হলেও কোথাও গাঁওখালীর পর্তুগিজদের খ্রিষ্ট সঙ্গীত নিয়ে কোনরকম কোন আলোচনা করা হয়নি।

মিরপুর উৎসবে উত্তাল হয় বড়দিনের দিন। উৎসব চলে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। সাড়স্বরে পালিত হয় প্রভু যিশুর জন্মদিন। সেদিন প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারে যিশুর মূর্তি সেজে ওঠে। আর উৎসবের ৮ দিনই এখানকার খ্রিস্টানরা খোল করতাল নিয়ে নগর কীর্তন করতে বের হন। প্রতি বাড়ি বাড়ি যাওয়া হয়। যিনি প্রথম এই কীর্তন দল চালু করেন তাঁর নাম হল রবিনসন তেসরা। এই পরম্পরা চলছে চার পুরুষ ধরে। যেসময় এই কীর্তন দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন মহামারির প্রকোপ চলছিল। সম্ভবত সেই মহামারির হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে কীর্তন গান ও কীর্তন দলের প্রচলন হয়। এই কীর্তন গানের মূল বিষয় হল যিশু বন্দনা। যিশুর জীবনের নানা দিক গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এছাড়া পরিবেশের নানা দিক ও তাদের গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন।^{১৩}

গাঁওখালীর পর্তুগিজ পাড়ার খ্রিষ্ট কীর্তনে গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের মহিলা হলেন আইরিন তেসরা, শোভা তেসরা, সুম্যা ডিক্রুজ, পূরবী তেসরা, শর্মিলা রথা, অনিমা তেসরা, নমিতা তেসরা, আন্সামানু তেসরা, সুইটি রোজারিও, নিবেদিতা নুনিশ, সুপ্রীতি তেসরা, পম্পা তেসরা, দীপা তেসরা, রানী রোজারিও প্রমুখ। এসব মায়েরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত এবং এক একটি গ্রুপের

আলাদা কাজ ও দায়িত্ব থাকে। কোন গ্রুপ বিশেষ দিনে বা অনুষ্ঠানে কি কাজ করবে আগের থেকে ঠিক করা হয়। এই গ্রুপগুলো হল- St. Anna Group, Fatima Group, St. Monika Group, Gnanama Group, St. Don Bosco Group, St. John Group। এছাড়া অঞ্জন দানু তেসরা, আশীষ পেরেরা, অশোক রথা, অনিল রোজারিও, থমাস তেসরা, রতন তেসরা, শোভন তেসরা, স্বপন তেসরা প্রমুখড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

খ্রীষ্টীয় সমাজে কীর্তন তো আছে। প্রশ্ন হ'ল কোন সামাজিক প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টীয় কীর্তন গান গাওয়া হয়? তিনটি ক্ষেত্রে কীর্তন গাওয়া হয়ে থাকে। ক্ষেত্রগুলি হ'ল বড়োদিন, পুনরুত্থান এবং পারলৌকিক অনুষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত কীর্তন গানের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

বড়োদিনের সময় ক্যারল এবং কীর্তন দুই-ই গাওয়া হয়। ক্যারল ও কীর্তন দুটিই ঈশ্বরের বন্দনা গান। কীর্তন প্রাচ্যের ও ক্যারল পাশ্চাত্যের কালচার স্পেসিফিক পরিভাষা। দুটিরই অবলম্বন হ'ল সংগীত। ভারতের প্রেক্ষিতে 'ক্যারল' খ্রীষ্টানের। কীর্তন সনাতনপন্থী হিন্দুর। ক্যারল গানগুলি যীশুর আগমনের আনন্দগান। বলা চলে যীশুর আগমনি গান। যীশুর জন্মের কাহিনী লুক এবং ম্যাথু লিখিত সুসমাচারে রয়েছে (ম্যাথু: ১১৮-২৫; লুক ২১, ৩-২০)। গোয়ালঘরে প্রভু যীশুর জন্মের কাহিনী, দেবদূত কর্তৃক মেসপালকদের ত্রাণকর্তা যীশুর জন্মের সুসংবাদ প্রদান, প্রাচ্যের তিনজন পণ্ডিতের যীশুকে দর্শন - প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যেমন ক্রিসমাস ক্যারোল আছে, তেমনি খ্রীষ্টীয় কীর্তনও আছে। গানের উদাহরণ -

- উড়াও বিজয় পতাকা জয় যীশু বলে (ধর্মগীত-১:৯৮৮:৪২, গীতসংখ্যা-৬০, দ্র টীকা-৬, Web Ref-14)

বল জগতে আনন্দ সমাচার (ধর্মগীত-১:১৯৮৮: ৪২, গীতসংখ্যা-৬২)।

-আজ মহা পরিত্রাণ ভাই

পুনরুত্থান বাইবেল অনুসারে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর তিনদিন পরে যীশুর পুনরুত্থান হয়েছিলো এবং তিনি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেল এই ঘটনাকে রেজারেশন বা পুনরুত্থান বলেছে। মৃত্যুকে অতিক্রম করে যীশুর অমৃতলোকে যাত্রা খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বের এক উল্লেখযোগ্য দিক। পুনরুত্থানের বিখ্যাত কীর্তন হ'ল -

- জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় প্রভু যীশু হে পতিত-পাবন (ধর্মগীত-১: ১৯৮৮: ১০৫, গীতসংখ্যা-১৪৭)।

পারলৌকিক খ্রীষ্টানদের মৃত্যু হ'লে, ৪১-দিনে একটি প্রার্থনা সভা হয়। এমন পরিস্থিতিতে বাইবেলের ঘটনা অবলম্বন করে (যেমন রুখ-সারার দুঃখের কাহিনী) পালাকীর্তন গাইবার রেওয়াজ বাংলার কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে পালাকীর্তনের বিষয়ের নির্দিষ্টতা নেই। (হিন্দু সমাজেও মৃত্যুবাড়ীর অনুষ্ঠানে ঢপ-কীর্তন গাইবার রেওয়াজ ছিলো। মূলত: নারীরা এই কীর্তন করতেন।)^{১৪}

গেঁওখালীর পতুগিজদের খ্রিস্ট সংগীতে পরিবেশবাদ কিভাবে ফুটে উঠেছে তা নিম্নলিখিত খ্রিষ্ট সংগীত গুলির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। পতুগিজরা তাদের সংগীতের মাধ্যমে যীশুর বন্দনা, তার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন দুঃখ, দুর্দশা, বেদনা এবং পরিবেশের বিভিন্ন আঙ্গিক তাদের সংগীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নলিখিত খ্রিষ্ট সংগীত গুলি ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আশীষ পেরেরা, সুষমা ডিক্রুজ, পূরবী তেসরা, আইরিন তেসরা, অঞ্জন দানু তেসরা প্রমুখদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তারই কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১) সুজলা সুফলা জননী বাংলা/যায়রে বুঝি ভেসে/ডুবে যায় যার অতীত গরিমা/কি জানি কি হবে শেষে।।

বাংলার মাটি সুধাসম বারি/পান কর ভাই ত্যাজি সুরা-আজি। মুছে দাও' মার নয়নের জল/সুদিন আসিবে দেশে-।।

২) উজ্জ্বল রাত সুন্দর রাত/ এসেছে শুভ লগন/ও উজ্জ্বল রাত/জাগ পুরো বাঁশি/জাগ না আজি/থেকোনা ঘুমেতে মগন/আ, হা; হা.....।।

৩) এ আকাশ, এ বাতাস/পাখিরা যে গান গেয়ে যায়। তারা তোমার জন্ম বার্তা শোনায়/মেরীর কোলে গোয়াল ঘরে/মানুষ বেশে জন্ম নিলেন।।

৪) আয়রে আয়রে সবে বেথেল গোশালে/পাপি তাপি সকলে মিলে/পূজিব রাঙা চরণ অর্ঘ্য দিয়ে আয়রে/নিবুন্ম শীতের নিশুতি রাত। রাখালেরা ছিল আজি/সারা রাত জাগি/দূতের মুখে শুনে বানী শিহরীয়া যায়। উর্দে ঈশ্বরের মহিমা শান্তি এ ধরায়।।

উজ্জ্বল তারা দেখে পন্ডিতেরা ধায়/স্বর্ন, কুন্দুর, গন্ধরস, সঙ্গে লয়ে যায়। গিয়ে দেখে সোনার কমল শুয়ে গোশালায়। হরশিয়া প্রণামিল শিশু যীশুর পায়।।

৫) দুদিনের এই জীবনটাকে/খুশীতে ভরে নাও/সবাই সবায়ের বন্ধু হয়ে। আনন্দে দিন কাটাও দেখ চাঁদ তারারা কেউ ঝগড়া করে না। আর সব ফুল পাতা/তারা হিংসা করে না ছোট্ট একটা জীবন/কে জানে, কতদিন থাকবে/স্বর্গ সিঁড়ি বেয়ে। যীশুর কাছে চলে যাবে।।

৬) মোরা গড়ব নতুন ও সমাজ/থাকবেনা সেখানে মলিনতা/থাকবেনা সেখানে কলুসতা/সে সমাজ.....।।

৭) আজি আকাশে বাতাসে শুনি রিমঝিম-ঝিম/শোন ভাই এসেছে শুভ বড়দিন/দেখ পাখিরাও গেয়ে চলে সুরেলা বিহীন/শোন ভাই এসেছে শুভ বড়দিন।।

রাখালেরা জানালো দরশনে/শিশু যীশু শায়ওত বেংলেহেমে/তারা যীশুর শ্রীমুখ দেখে ধন্য হয়ে/বলে গেল আজ দুনিয়ার বড়দিন।।

মহাতারা উঠেছিল ঐ আকাশে/পন্ডিতেরা গেল, যীশু সকাশে। চলো আমরাও ছুটে যায় বেংলেহেমে আনন্দে বলি আমাদের বড়দিন।।

৮) অনাদি অনন্ত যিনি/আদিতে ছিলেন তিনি/সদা সর্বস্থানে গড়িলেন নিজ হাতে/এই পৃথিবী দিনে রাতে শুধু ছয় দিনে।।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা/নদী সাগর বরনাধারা/তোলে কলতাল/গাছপালা পশু পাখি/বইল না কিছু বাকি/সবই তারই দান।।।

৯) কালভেরীর সেই পাথর গুলো ভিজে ছিলো। তবু মানুষের হৃদয় গলেনি। তারা প্রভু যীশুর পবিত্র হাতে/তারা প্রভু পেরেকের চিহ্ন এঁকেছিল। কুক্ষি দেশে বর্ষার আঘাত দিয়েছিল/লাল রক্তের ঐ ফোঁটায় ফোঁটায়/পাথর গুলো ভিজেছিলো/তবু মানুষের.....।।

প্রকৃতির মাঝে ছিল নীরব ব্যাথার ই সম্পন্দন। প্রকৃতির মাঝে ছিল বুকভরা হাহাকার ত্রন্দন/আকাশের মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরেছিল/আকাশের মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে/ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে ছিল/তবু মানুষের.....

১০) সুন্দর পৃথিবী সুন্দর তুমি। তুমি যে চির মহীয়ান/তোমার নামে বিশ্বজুড়ে। মাতিছে ধরা ধাম/মোরা গায় তব নাম/তুমি সুন্দর হে মহান

আকাশ ও মণ্ডল তোমার যে সৃষ্টি,/বিশ্ব জগৎ জুড়ে গাহিছে তোমার সুরে/তুমি আদি তুমি যে অন্ত/মোরা যে তোমারি দান।।

১১) পাহাড় সরে যাবে ঝড় থেমে যাবে/মৃত জীবন পাবে/দুঃখ চলে যাবে, হতাশা দূরে রবে/বেদনা থেমে যাবে।।

যদি ভালোবাসি আমার যীশুকে/পাথরেও বার্না নামে/মরুতেও তৃষ্ণা মেটে। বিপদে আশা জাগে/জীবনে সুখ আসে/আনন্দে মুন হাসে/নতুন জীবন পেয়ে যদি ভালোবাসি আমার যীশুকে।।

১২) ভুবন ভরা তোমার মহান সৃষ্টি যখন দেখি অবাক হয়ে তখন প্রভু তাকিয়ে আমি থাকি/সুদূর নভে গ্রহ তারা গননা তীর সংখা তারা। দূরে সরায় আঁধার কারা আলোক মালা ডাকি/তাকিয়ে আমি থাকি।।

ফুলে ফলে রঙের বাহার কত মধুর সুবাস তাহার/প্রজাপতির পাখায় পাখায় রং দিল কে আঁকি/তাকিয়ে আমি থাকি।।

এই যে বায়ু বইছে যখন দেখা তারে যায়না তখন। চালু রাখে প্রানের স্পন্দন অব্যক্ত লাগে থাকি। তাকিয়ে আমি থাকি।।

নবপ্রজন্মের মধ্যে কীর্তনের প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই। তারা এখন হিন্দী-ইংরাজী সুরের গান বেশী পছন্দ করছে। খোল করতালের বদলে গীটার রিদম্ চাইছে, অত্যাধুনিকতা 'ডিজে' চাইছে। তাই নতুন প্রজন্মের মধ্যে কীর্তন অনেকটাই কমে এসেছে। এখনও যাঁরা কীর্তন গাইছেন তাদেরও সঙ্কট কম নয়। কীর্তনের তাল খোলে বাজাবার লোক দিন দিন কমছে। কীর্তন গান যদিবা কেউ গলায় তুলছেন, তাঁরা খোলের সঙ্গত পাচ্ছে না। ফলে খ্রীষ্টীয় কীর্তন গানের ব্যাপকতা কমছে। কীর্তন গানের পুরানো মানুষ চলে গেলে, তার স্থান পূরণ হচ্ছে না। অঞ্জন দানু তেসরা বলেন যে, 'আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাউকেই পাচ্ছি না, যাকে আমরা এইসব গান বা কীর্তনের দায়িত্ব দিয়ে যাব।' ^{১৫}

পরিশেষে বলা যায়, গৈঁওখালীর পতুঁগিজ খ্রিস্ট কীর্তন তাদেরকে অন্যান্য খ্রিস্ট কীর্তন থেকে আলাদা করে। খ্রিস্ট কীর্তনে তাদের পরিবেশ চেতনা, সমাজ চেতনা প্রভৃতি তাদেরকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে। খ্রীষ্টীয় কীর্তন লোপ পেয়ে যাবে এই আশঙ্কার কোনো কারণ এখনই নেই। পরিমাণে হ্রাস হ'লেও এখনও খ্রীষ্টীয় কীর্তন এনডেঞ্জারড্ নয়। তবে কতকগুলি পকেটে এবং কতকগুলি ব্যক্তিকে (গায়ক/বাদককে) আশ্রয় করেই তা টিকে থাকবে। একটা সময় খ্রীষ্টীয় কীর্তন গান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রচলিত ছিল। এখন তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই দায়িত্ব খ্রীষ্টান কমিউনিটিকেই নিতে হবে।

তথ্যসূত্র :

- ১। সব্যাসাচী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ইতিহাস অনুসন্ধান ২৮, মহা: জাহিদুর রহমান, পশ্চিমবঙ্গের মিরপুরে একটি বর্তমান পতুঁগিজ বসতি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২৪ শে জানুয়ারি ২০১৪, পৃ: ৬১১।
- ২। ভাস্কর ব্রত পতি, লৌকিক মেদিনীপুর, কবিতিকা, মেদিনীপুর, মে ২০১৯, পৃ-পৃ: ৬৫-৬৭।
- ৩। তদেব, পৃ: ৬৮।
- ৪। L.S.S.O' MALLEY, Bengal District Gazetteers: Midnapore, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911, p: 55.
- ৫। A. Mitra, District Handbooks Midnapur, Census 1951, West Bengal Government press, Alipore, 1953, pp: xliii - xlv.

- ৬। প্রণব রায় (সম্পাদ), মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল ২০২২, পৃ: ৪৯৯।
- ৭। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, দীপ প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০২০, পৃ: ১১৩।
- ৮। তদেব, পৃ: ১১৪।
- ৯। অরিন্দম ভৌমিক, মেদিনীকথা-পূর্ব মেদিনীপুর, midnapore.in, পশ্চিম মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, বাং, ১৪২৩, পৃ: ৯১।
- ১০। সুদীপ্ত সামন্ত, লোকসংস্কৃতির উষসী বাংলা, প্রেক্ষাপট, পূর্ব মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯, পৃ: ৯৩।
- ১১। হরিপদ মাইতি, মেদিনীপুর আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড, মেদিনীপুর আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর, জানুয়ারি ২০২২, পৃ: ২০০।
- ১২। শেখ মকবুল ইসলাম, খ্রিস্টীয় কীর্তন, একলব্য, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ: ১২২।
- ১৩। ভাস্কর ব্রত পতি, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০।
- ১৪। শেখ মকবুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৯-১৪০।
- ১৫। তদেব, পৃ: ২৩৪-২৩৫।

বাংলা কথাসাহিত্যে দেশভাগ : বৈষম্যের খতিয়ান

বিজন সরকার

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

মানিকচক কলেজ, মালদা

সারসংক্ষেপ: প্রাচীনকাল থেকে আমরা বৈষম্যের কথা জানতে পারি। ভারতবর্ষে বৈষম্যের সূত্রপাত হয় বৈদিক যুগে। ঋগবেদের দশম মন্ডলে পুরুষসূক্ত মাধ্যমে বৈষম্যের কথা জানতে পারা যায়। তবে এই বৈষম্য ছিল পেশাগত, জাতিগত নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে, ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের স্বার্থে হিন্দু এবং মুসলিম জাতিকে আলাদা করার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষের কিছু স্বার্থাশ্রয়ী নেতারা এই স্বার্থকে কাজে লাগান। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এবং পরবর্তীকালে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মুসলিমলীগ আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী করেন, যার চরম পরিণতি হল দেশভাগ -পাকিস্তান ও ভারত নামে। দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব পড়েছিল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলিম ঘর ছাড়া হয়েছিল, এমনকি আত্মীয়স্বজন হারাও হয়েছিল। তারই প্রতিফলন দেখা যায় বাংলা কথাসাহিত্যে। দুইবঙ্গের কথাসাহিত্যিকদের মাধ্যমে বৈষম্যে সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের থেকে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকদের মাধ্যমে দেশভাগের বৈষম্যের কথা জানতে পারা যায় অনেক পরে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শক্তিপদ রাজগুরু প্রমুখরা দেশভাগের বৈষম্যের কথা তুলে ধরেছেন। পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের কিছু কথাসাহিত্যিক তাঁদের লেখার মাধ্যমে দেশভাগের ফলে বৈষম্যের কথা তুলে ধরেছেন, তাঁরা হলেন- আনোয়ার পাশা, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবুল ফজল, আবু ইসহাক, সত্যেন সেন, রাজিয়া খান, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সরদার জয়েনউদ্দীন আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী ও সেলিনা হোসেন। আমার এই বিষয়ের উদ্দেশ্য হল এই সকল কথাসাহিত্যিকদের লেখনীর মাধ্যমে দেশভাগের ফলে যে বৈষম্য হয়েছিল তা তুলে ধরে এবং নতুন প্রজন্মকে বৌদ্ধিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা।

সূচক শব্দ: বৈষম্য, হিন্দু, মুসলিম, জিন্নাহ, নেহেরু, মুসলিমলীগ, জাতীয় কংগ্রেস।

মূল আলোচনা: প্রাচীনকাল থেকে আমরা বৈষম্যের কথা জানতে পারি। ভারতবর্ষে বৈষম্যের সূত্রপাত হয় বৈদিক যুগে বলে অনেক পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ঋগবেদের দশম মন্ডলের অন্তর্গত পুরুষসূক্তের দ্বাদশ ঋক্ বা মন্ত্রটির উল্লেখ করেন। ঋক্টি নিম্নরূপ :

“ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।

উরু তদস্য যদৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।”^১

মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে, আদি পুরুষ অর্থাৎ বিধাতার মুখ হল ব্রাহ্মণ, বাহু দুটি হল রাজন্য, উরু দুটি হল বৈশ্য, আর তাঁর পা দুটি থেকে শূদ্রের জন্ম হয়। এই শ্লোকটি উল্লেখ করে অনেক ঐতিহাসিক বলেন, ঋগবেদের সময় সমাজ ব্রাহ্মণ, রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

এই চারটি বংশানুক্রমিক জাতিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু বিভেদ ছিল পেশাগত, ধর্মগত নয়। সুলতানী বা মুঘল শাসনকালেও এই বিভেদ ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মগত বিভেদের সূচনা হয় ঔপনিবেশিক শাসনকালে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ আমল থেকেই ইংরেজ পদানত হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি জাতিও প্ররোচনাবশতঃ বা কখনও স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্ব মত্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হিসেবে ইংরেজ স্বার্থবুদ্ধি সেখানে প্রবল হলেও পক্ষপাতগ্রস্ত কোনো একটি জাতি এক এক সময়ে অন্য জাতির প্রতি রাজনৈতিকভাবে বিদ্বেষ আচরনেরই পরিচয় দিয়েছে। ভারতের ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের দুশো বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্তত সেই সাক্ষ্য দেয়। এযাবৎ অনেক আলোচক ও সমালোচক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সে বিতর্কে না গিয়েও রাজনীতি ও ধর্মীয় আদর্শের এই অশুভ টানা পড়নের মূল্যবোধে কয়েকটা কথা উঠে আসে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ শাসনকালে (১৮১৭-১৮৫৭ AD) ও তারপর ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনাত্মক সাম্রাজ্যকালে (১৮৫৭-১৯৪৭ AD) স্থানীয় ধর্ম বিরোধ, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে ইংরেজরা বারেবারেই তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো শাসনক্ষমতা স্যারিভের কাজে ব্যবহার করে গেছে। মনে রাখতে হবে, ইংরেজ জাতিরও একটি নিজস্ব ধর্ম ছিল এবং তা ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতি তুর্কি-আফগান-মুঘল শাসকেরা যেভাবে জনসাধারণের কাছে ‘মুসলমান শাসক’ বলে পরিচিত হয়েছিলেন, ইংরেজরা কিন্তু কখনই সেভাবে ‘খ্রীষ্টান শাসক’ বলে পরিচিত হননি। কিন্তু ইংরেজ শাসকের এই পরিচিতির মূল্য তাকে অসাম্প্রদায়িক তো করেইনি বরং তা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পুরোদমে হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বিভ্রান্ত ও ব্যাহত করার চেষ্টা করে গেছে এবং ইতিহাসের বিচারে তা ভারতবর্ষের দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এসবই ধর্ম ও রাজনীতির অশুভ আঁতাতের বিষময় ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল স্যার সৈয়দ আহমেদের দ্বিজাতি তত্ত্ব। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান অশুভ জাতি নয়। তাদের দীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে জীবন পদ্ধতির কিছু সাধারণ উপাদান জাগ্রত হয়েছিল কিন্তু তাদের দ্বারা ভারতবর্ষ একটি জাতিতে পরিণত হয়নি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি বললেন হিন্দু স্বার্থান্বেষী ও মুসলমান স্বার্থবিরোধী। কংগ্রেস যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন চাইছিল, তাঁর মতে তা মুসলমানদের স্বার্থোপযোগী নয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে পৃথক দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা সৈয়দ আহমদ খানের হাত ধরেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। অন্যদিকে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করেছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ পুনরায় আবার দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা গুরু করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মাধ্যমে।

১৯৪৫ খ্রিঃ জুলাই মাসে লন্ডনে লেবার পার্টি বিপুল ভোটে জয়ী হয় এবং তার ফলে জাতীয় রাজনৈতিক পট- পরিবর্তনের অনুকূল বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খ্রিঃ জাপানের আত্মসমর্পণের সাথে সাথেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে তখন শ্রমিক দলের সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। ক্রিমেন্ট অ্যাটলি সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ব্রিটেন সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। সেই জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট ‘ক্যাবিনেট মিশন’ ভারতে পাঠানো হয়। সেই তিন সদস্যরা ছিলেন, যথাক্রমে নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড পেথিক লরেন্স এবং চেম্বার অফ কমার্স এর সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও অ্যাডমিরালটির প্রধান লর্ড এ. ভি.

আলেকজান্ডার। ১৯৪৬ খ্রিঃ মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে মিশন ভারত সফরে আসে। আলোচ্যসূচির মধ্যে দুটি বিষয় ছিল স্বাধীনতা অনুমোদনের জন্য, নতুন সংবিধান রচনার পদ্ধতি ও নীতি এবং ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন। ক্যাবিনেট মিশনের পক্ষ থেকে ১৫মে ১৯৪৬ খ্রিঃ এক ঘোষণায় জানানো হয় যে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী ‘পাকিস্তান’ সৃষ্টি করলেই সমাধান হবে না। সেকথা মাথায় রেখে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না। ‘ক্যাবিনেট মিশন’ ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখেই ক্ষমতা হস্তান্তরের এক পরিকল্পনা তৈরী করে। সেটিই ইতিহাস খ্যাত ‘ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান’। প্ল্যানের এক নম্বর সুপারিশ ছিল ব্রিটিশ ও করদ রাজ্যগুলি নিয়ে একটিই ভারত ইউনিয়ন গঠিত হবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ এই তিনটি দপ্তরই শুধু ইউনিয়ন সরকারের হাতে থাকবে। প্রদেশগুলি এ.বি.সি এই তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ সংবিধান তৈরি করবে। তিনটি স্তরের জন্যই (প্রদেশ, গ্রুপ ও ইউনিয়ন) সংবিধান চূড়ান্তরূপে রচিত হওয়ার পরে, প্রদেশগুলি যেকোনো একটি গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার থাকবে, কিন্তু ইউনিয়ন থেকে বেরোতে পারবে না; দশ বছর অন্তর প্রদেশগুলি সংবিধান পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। সংবিধান পুনর্বিবেচনা করে চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে ‘স্বাধীনতা’ প্রদান। পেথিক লরেন্স ঘোষণা করেন – ‘ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান’ এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে স্বাধীনতা প্রদান করা ভারতবর্ষকে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে রেখে বা না রেখে সেটা ভারতীয়রাই ঝেঁজারি টিক করবে।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গৃহীত হবে বলে মনে হয়েছিল যখন ৬ই জুন মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব মেলে নেয় এই ভেবে যে, এই পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্তানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কথা নিহিত আছে এবং এই পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। বস্তুত ক্যাবিনেট পরিকল্পনার ভূমিকায় পাকিস্তান দাবি স্পষ্টতই নাকচ করা হয়, তা সত্ত্বেও কেন মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, সে বিষয়ে পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা আছে। জিন্নাকে ওয়াশেলে সম্ভবত আশ্বাস দিয়েছিলেন ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান না করলে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিয়ে আসা হবে। কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি নেহেরু কয়েকদিনের মধ্যে ১০ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলন ঘোষণা করেন যে সাংবিধানিক সভায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া কংগ্রেস অন্য কিছুতেই রাজি নয় এবং সম্ভবত গ্রুপ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে যাবে, যেহেতু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসাম এই ব্যবস্থায় রাজি নয়। নেহেরুর এই বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নেহেরুর এই বক্তব্য জিন্নাহর সামনে সুযোগ এনে দিয়েছিল। ২৭শে জুলাই জিন্না ঘোষণা করেন লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মানে না। ৩০শে জুলাই পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে মুসলিম লীগ ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মুসলিম জাতিকে আহ্বান জানান। কিন্তু এই সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ না সংখ্যাগরিষ্ঠদের, সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত লীগ নেতৃত্ব দেয়নি।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট থেকে পাকিস্তানের জন্য গণআন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ দিনটি সরাসরি আন্দোলন দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বাছা হয় এবং ওইদিনই কলকাতায় চরম বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন চার হাজারেরও বেশি মানুষ এবং ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হলেন। তারপর ভাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গার একটি বিশেষত্ব আলোচনা

করতে গিয়ে সুরঞ্জন দাস তাঁর “কমিউনাল রায়তস ইন বেঙ্গল” গ্রন্থে বলেছেন, মুসলমানরা হিন্দুদের সম্পত্তি ও দোকানপাট লুট করেছে এবং একই কাজ হিন্দুরাও করেছে, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের মানুষই সরকারি বা ইউরোপীয়দের সম্পত্তি লুট করেনি। দুই পক্ষের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা। প্যাণ্ডোরাল মুন তাঁর “ডিভাইড অ্যান্ড কুইট” গ্রন্থে হিসাব দিয়েছেন ১৯৪৬ - ৪৭ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় বলি হয় প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার মানুষ, এর মধ্যে ৬০ হাজার পশ্চিমের এবং ১ লক্ষ কুড়ি হাজার পূর্বের। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে ৬০ লক্ষ মুসলমান ও ৪৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ শরণার্থীতে পরিণত হন। মনু লিখেছেন মুসলমানরাই প্রাণ হারিয়েছিলেন বেশি এবং হিন্দু ও শিখরা হারিয়েছিলেন।

দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারতবর্ষে কংগ্রেস তার অবস্থান পরিবর্তন করে। নেহেরু একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে রাজি হলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। জওহরলাল নেহেরুকে এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। কিন্তু বিষয়টি পুরোপুরি তৃতীয় অবস্থায় আসে যখন অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লীগকেও সরকারে যোগদানের জন্য রাজি করানো হয়। অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তিক্ততা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ একটি বিকল্প সরকার গঠনে পরিকল্পনা করে। ফলে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেট এটলি সংসদে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারতবর্ষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসে উপস্থিত হন। ব্যাটেন মার্চ এপ্রিল মাস ধরে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার জটিলতা বুঝতে পারেন এবং সমাধানের জন্য নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মাউন্টব্যাটেন তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করার কথা ভেবেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার দুটি দিক ছিল এক পাকিস্তান গঠনের বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়েছিল, খুব শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ভাবা হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে থেকে অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এতদিন পর্যন্ত গান্ধী ভারত বিভাজনের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন কিন্তু তিনিও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন গোবিন্দ বল্লভ পন্ত। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন নেহেরু ও প্যাটেল। প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন মৌলানা আজাদ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ভারত বিভাজন মেনে নেওয়া বিষয়টি দুঃখজনক। গান্ধীজীর শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন এবং পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় সকল প্রান্তের প্রস্তাব সমর্থন করার আবেদন জানান। গান্ধীজীর আবেদন সত্ত্বেও ভোটাভুটি হয় এবং ২৫-১৫ ভোটে পন্তের প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কমিটির সভায় গৃহীত হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করার জন্য সীমান্ত কমিশন গঠিত হবে। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রদেশ দুটির বিভাজনের জন্য স্যার সিরিল র্যাডক্লিফের নেতৃত্বে কমিশন গঠিত হয়। লিওনার্ড মসেল বলেছেন যে র্যাডক্লিফকে পাঞ্জাব বাংলা বিভাজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে অঞ্চল তিনি

কখনোই চোখে দেখেননি এমনকি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানচিত্র সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল না। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয়। এই আইন অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক ডমিনিয়ন গঠিত হয়। সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের একাংশ, বাংলার একাংশ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশীয় রাজন শাসিত অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন থাকার অথবা ভারত বা পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। সর্দার প্যাটেলের তৎপরতায় এবং মাউন্ট মেট্রোলের সহযোগিতা কাশ্মীর জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদ ছাড়া প্রায় ৬০০টি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয়। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ হয় এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পায়।

এতো গেল ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগ ও বৈষম্যের খতিয়ান। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে বৈষম্যের খতিয়ান উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, ও কবিতার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা কথা সাহিত্যের পরিসর ব্যাপক এবং বিস্তৃত। বাংলা কথা সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, ও কবিতা। দেশ ভাগ ও তার বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্নভাবে তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। দেশভাগ নিয়ে যতটা লেখালেখি পূর্ব বাংলায় হয়েছে তার থেকে বেশি লেখালেখি হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমিয়ভূষণ মজুমদার তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখরা ছিলেন বিখ্যাত। পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে দেশভাগ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয় অনেক পরে, তাই তাঁদের লেখায় দেশভাগের প্রভাব খুব কম থাকলেও কয়েকজন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিকদের লেখায় দেশভাগ ও তার বৈষম্য কথা ফুটেছে তাঁরা হলেন আনোয়ার পাশা, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবুল ফজল, আবু ইসহাক, সত্যেন সেন, রাজিয়া খান, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সরদার জয়েনউদ্দীন আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাসেও দেশবিভাগের ইতিহাস-অভিঘাত রূপায়িত হয়েছে। শুধুমাত্র কথা সাহিত্যেই নয় দেশভাগ ও বৈষম্য কথা কিছু চিত্রনাট্যকরাও সিনেমায় পরিবেশন করেছেন। আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গে কথাসাহিত্য এবং বাংলা সিনেমায় কিভাবে দেশভাগ ও বৈষম্য চিত্র ফুটে উঠেছে তা জানার চেষ্টা করব।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্পের মতো কবিতাও দেশভাগকে ধারণ করেছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ইতিহাসের দেশভাগ আর কবিতার দেশভাগ যদিও এক নয় তবু ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই দেশভাগের কবিতা ঋদ্ধ হয়েছে। পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বলা যেতে পারে, দেশভাগের কবিতা দেশভাগেরই গর্ভজাত ফসল। যারা এই কবিতাগুলো লিখেছেন তাঁদের অনেকেই দেশভাগের শিকার। কেউ কেউ দেশভাগের সময় অপরিণত বয়স্ক এবং অপরিণতমনস্ক ছিলেন। প্রথমেই আমরা এমন একটি কবিতার কথা বলব যে কবিতার মধ্যে আমাদের প্রারম্ভিক আলোচনাক্রমের মূলসূত্রটি চোখে পড়ে। আমরা জীবনানন্দের ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতাটির কথা বলছি। জীবনানন্দের ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় রাজনীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী ধর্মের সহসা লুকিয়ে পড়ার ছবিটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সে বাস্তব প্রতিচ্ছবি কবির ভাষায়:

“মানুষ মেরেছি আমি তার রক্তে আমার শরীর

ভরে গেছে পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
 ভাই আমি আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
 হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
 কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমুঢ়কে
 বধ করে ঘুমাতেছি -
 যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
 বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
 হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ
 আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
 চোখ তুলে শুধাবে সে রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
 বলে যাবে, গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার"² ('১৯৪৬-৪৭', শ্রেষ্ঠ কবিতা)
 কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের -

“উদ্বাস্ত” কবিতায়, দেখি ভূষণ এবং তার পরিবারকে সব কিছু ছেড়ে যেতে,
 “চারধারে কী দেখছিস? ছেলেকে ঠেলা দিল ভূষণ - জলা-জংলার দেশ, দেখবার আছে কী!
 একটা কানা পুকুর একটা হেঁচা বাঁশের ভাঙা ঘর একটা একফসলী মাঠ একটা ঘাসী নৌকো -”³

নিজেদের ঘর-বাড়ি, নিজেদের আজন্ম পরিচয় ছেড়ে, তারা চলেছে এক নতুন
 দেশে, যেখানে তাঁদের পরিচয় ‘মানুষ’ নয়, সেখানে তারা শুধুই ‘উদ্বাস্ত’ -
 “আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে, আমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে, নতুন দেশের
 নতুন জিনিষ-মানুষ নয়, জিনিস -সে জিনিসের নাম কী? নতুন জিনিসের নতুন নাম-উদ্বাস্ত”⁴
 এই কবিতায় কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আমাদের এক নির্মম সত্যের সামনে এনে দাঁড়
 করান, যখন তিনি লেখেন আমরা সবাই উদ্বাস্ত -

“কেউ উৎখাত ভিটে-মাটি থেকে, কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে”⁵

ছেড়ে আসা বাংলাদেশের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে জীবনানন্দ দাশের “রূপসী বাংলার”
 কবিতায়-

“আবার আসিব ফিরে ধানসিড়ির তীরে — এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় — হয়তো বা
 শঙ্খচিল শালিখের বেশে; হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশার
 বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়; হয়তো বা হাঁস হব — কিশোরীর — ঘুঘুর
 রহিবে লাল পায়, সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে”⁶

তেমনি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের-ও অনেক কবিতায় ঘুরে ফিরে আসে দেশ ছেড়ে আসার

স্মৃতি, ফেলে আসা গ্রাম, নদী, প্রকৃতি ও মানুষজন -

“কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইন্ধুলে

নিখর দিঘির পারে বসে আছে বক

আমি কি ভুলেছি সব

স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক?

আমি কি দেখিনি কোনো মস্তুর বিকেলে

শিমুল তুলোর ওড়াউড়ি”⁷

(“যদি নির্বাসন দাও” - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

বাংলা কবিতার মতো বাংলা উপন্যাসেও দেশভাগ বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে।
অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসের দু-একটি সংলাপে তা ধরা পড়ে—

“শুনছেন মণ্ডল— দেশ ভাগ হতিছে।”

‘সে আবার কি?’ ‘হাঁ, একভাগ হিন্দুর, আর একভাগ মোসলমানের।’ ‘ভাগ কে করে?
ইংরেজ? তার নিজের জন্য কি রাখবি?’”^৮

রামচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল ‘কী আবার রাখবি। মনে কয়, ঘাসের জমি পত্তনি দিতেছে। মনে কয়, বিলেতে বসি খাজনা পাবি।’ রামচন্দ্র নিজে কিন্তু এক বড়ো চাষি। কেউ কেউ ‘হাসুলীবাঁকের উপকথা’-র করালীচরণের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। কিন্তু রামচন্দ্র নিজের জমিজমার পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ে যতটা আগ্রহী, সামাজিক জোট বেঁধে উচ্চবর্ণের কাজ থেকে মর্যাদা আদায়ের লড়াইয়ে তাকে দেখা যায়নি।

কিন্তু দেশভাগ সম্পর্কে রামচন্দ্রের এই সংলাপের মধ্য দিয়েই অমিয়ভূষণ এদের সম্ভ্রান্ত মানসিকতার কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে উপন্যাসে দেশভাগের বৃহত্তর পটভূমিকাও রচিত হয়। গড় শ্রীখণ্ড ওরফে চিকন্দী গ্রামে সান্যাল মশাইকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর যে প্রচেষ্টা হয় তা কলকাতার দাঙ্গার সংবাদে ব্যাহত হতে থাকে। শেষপর্যন্ত দেশভাগের ব্যাপারে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। সকলেই দেশভাগের মহামিছিলে সামিল। অমিয়ভূষণ একে ‘শ্মশানযাত্রা’ আখ্যা দেন। খুব বড়ো মাপের উপন্যাসিকের ব্যাপ্তি নিয়ে তিনি পদ্মার ভাঙন ও দেশের ভাঙনকে এক সূত্রে মিলিয়ে দেন। অমিয়ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, পদ্মাই তার কাছে একমাত্র নদী আর পদ্মা-বিদ্যোত জনপদই একমাত্র স্বদেশ। তাই তাঁর উপন্যাস শেষ হয় এইভাবে, ‘থেকে থেকে পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠছে, তখনো ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক। উপরে ড ড ড করে মেঘ ডাকছে। পুরাণটা যদি জানা থাকে, হয়তো কারো মনে হতে পারে, কেউ যেন অন্য কাউকে বলছে, দয়া করো, দয়া করো।’ আসলে মানুষ যখন দয়া করে না, তখন পদ্মার কাছে দয়াপ্রার্থনা করা ছাড়া উপায় কি? হয়তো এই প্রাকৃতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়েই নতুন গড় শ্রীখণ্ড গড়ে উঠবে। এই পথেই দেশবিভাগকে কেন্দ্রে রেখেও উপন্যাসটি বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে।

“অহল্যা কাহিনী” উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘অহল্যা’ নামে একটি মেয়ে, যার জন্ম হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের একটি অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে। অহল্যা সেই উদ্বাস্তু শিবিরের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে- “তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু, যারা ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তাঁদের জন্য এই শিবির। হলঘরের মতো বেশ লম্বা একটি ঘরে চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে পার্টিশন করা আটটি খুপির মধ্যে একটিতে আমরা থাকতাম- সেই দশ হাত বাই সাত হাত খুপির একপাশে আমার তিন দাদা এবং বাবা শুয়ে থাকাকালীনই আর একপাশে খাইয়ের সহায়তায় আমাকে জন্ম দিতে হয়েছিল আমার মা’কে। উদ্বাস্তু শিবিরে থাকাকালীন এর চেয়ে ভালভাবে সন্তান জন্ম দেওয়ার আর কোনও উপায় ছিল না কোনও মায়ের। আমার জন্ম তবু রাতের অন্ধকারে সামান্য টেমির আলোয় হয়েছিল বলে মায়ের লজ্জাটা তত প্রকাশ্য ছিল না। অনেক মায়েরা তো দিনের আলোয় কোলাহলের মধ্যে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরে থাকা কালেই অহল্যার দুই দাদার জন্ম হয়েছিল, তার বড়দাকে শিশু অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছিল। আর তাদের দুই বোনের জন্ম হয়েছিল দণ্ডকারণের উদ্বাস্তু শিবিরে”^৯

‘আদুরী’ উপন্যাসে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ছেলে-বউ রেখে সুদূর জঙ্গলে চাকরি করত মিত্তিরমশাই। সে দু-এক টাকার লোভ দেখিয়ে সেখানের সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে রাত্রিবাস করত। মাঝে মাঝেই কুলি-কামিন মেয়েদের নিয়ে তার ঠিকাদার কালীনাথ ব্যানার্জিকেও সম্ভ্রষ্ট করাত। ‘সামান্য বাড়তি আয়ের জন্য অভাবী সংসারের কোনও কোনও মেয়ে-বউরা কিছুক্ষণের জন্য শরীরটাকে ছেড়ে দেয় গগন মিত্তির এবং কালীনাথ ব্যানার্জির হাতে।’ একদিন সুযোগ বুঝে আদুরীকে গগন জড়িয়ে ধরলে আদুরী তাকে জোরের সঙ্গে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিলে গগন কোমরে ব্যথা পেয়ে সরে যায়। কিন্তু সেদিন থেকে পুষে রাখা তার প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা একদিন বিপদের মুখে ফেলতে পারে, সে কথা আদুরী বুঝতে পেরেছিল। তাই সে মিত্তির মশাইয়ের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে-দূরেই থাকত। মিত্তির আঘাত পেয়ে বলেছিল যে, ‘ঠিক আছে, আমিও শালা কায়েতের বাচ্চা! ছোট জাতের মেয়ের আবার সতীপনা। শালীর সতীপনা আমি ঘুচিয়ে ছাড়ব’।^{১০} এখানে মিত্তির যে শুধু যে আদুরীর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেনি, সে সমগ্র নিচু জাতের নারীর সতীত্ব সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা পোষণ করেছে অথচ সেই নিম্ন জাতের নারীকেই তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য জোর করে বাধ্য করতে চেয়েছে। ‘কায়েতের বাচ্চা’ বলে বর্ণ-সামাজিক নিয়মে এক প্রকার ঘৃণাবর্ণণ, আবার ব্যক্তি-মিত্তির সমগ্র ‘কায়স্থ জাতি’র নির্দেশ করে, অন্য একটি নিম্নবর্ণের জাতভুক্ত নারীকে ভোগ্য করার ঘৃণ্য বাসনা প্রকাশ করেছে। নারী নির্যাতনের সঙ্গে জাত-বর্ণের দ্বিঘাত দ্বন্দ্ব, বর্ণের অপমান এবং নারিত্ব হরণ, একই নিম্ন জাতির নারীকে দ্বৈত নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক হাসান আজিজুল হক তাঁর ‘আগুনপাখিতে’ দেশবিভাগের সমকালীন দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমানের এই অসহিষ্ণুতা ও নারকীয় হত্যার ঘটনার নিন্দা করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের ছেলে সত্যকে মুসলমানরা হত্যা করে, তেমনই ইউসুফ মিঞার নৃশংস হত্যা কিংবা স্কুলপড়ুয়া মুসলমান বালকটির বীভৎস মৃত্যুর করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে।

সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পে উঠে আসে দুই ধর্মের দুই মানুষের প্রতি মমত্ব, উৎকর্ষ আর উদ্বেগ। এখানে বাঁচার জন্য দুজনেই ডাস্টবিনের দুইপ্রান্ত ধরে দাঁড়ায়। আমরা পরিচয় পাই একজন তাঁতকলের মিস্ত্রি, আর একজন নৌকার মাঝি, তারপর আমরা আবার পরিচয় পাই মিস্ত্রি হিন্দু আর মাঝি মুসলমান। জীবন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে একে অপরকে অবিশ্বাস করলেও দুজনের চোখেই সন্দেহ ঘন হয়। আবার তারা বুঝতে পারে দুজনেরই জীবন বিপন্ন। তারা বেশি শিক্ষিত না তবু তারা প্রশ্ন করে কেন এই মৃত্যু মৃত্যু খেলা? এতে লাভ কাদের? তারপর তারা আবার মিলিত হয় একটি বিড়ি ধরিয়ে টান দেয় দুজন। আগামীকাল ঈদ। মাঝির কোমরে গোজা আছে মেয়ে আর ছেলের জন্য কেনা নতুন জামা। আটদিন ধরে সে বাসায় যেতে পারছে না। আজ তাকে যেতেই হবে চাঁদরাতে তার ছেলে মেয়ে এই নতুন জামা দেখে খুশি হবে। তাই মাঝি এগিয়ে যেতে চায়। মিস্ত্রির ততক্ষণে তার প্রতি গভীর মায়া জন্মে গেছে। তাই সে বাধা দেয় যেতে। কিন্তু মাঝির মন ছুটে গেছে তাই চলে যায়। মিস্ত্রি বলে- আদাব আবার দেখা হবে। মোড় ঘুরতেই মিস্ত্রি শুনে গুলির আওয়াজ। মাঝি নিশ্চয় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে।

তার কোমরে গোজা ঈদের নতুন কাপড়গুলো রক্তে ভিজে গেছে। কিন্তু দুইজনের এই আদাব বিনিময়ে ভালোবাসা রয়ে যায়। এইভাবেই রাজনীতি আর হিংসানীতির শিকার

হয়েছে সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের মনের ভেতর ছিল পরস্পরের প্রতি আদাব আর ভালোবাসা।

বাংলা কথা সাহিত্যের মতো বাংলা চিত্রনাট্যও দেশভাগের বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন ঋত্বিক ঘটকের “মেঘে ঢাকা তারা”, “কোমল গান্ধার”, “সুবর্ণরেখা”, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় এর “রিফিউজি”, বুদ্ধদেব দাসগুপ্তের “তাহাদের কথা”, গৌতম ঘোষের “শঙ্খচিল”, বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের “কাঁটাতার”, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের “রাজকাহিনী” প্রভৃতি। এর মধ্যে আমরা ঋত্বিক ঘটকের “সুবর্ণরেখা” সিনেমা সম্পর্কে জানব। সুবর্ণরেখা-র কাহিনীতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদের জাতপাতের বিদ্বেষ তুলে ধরা হয়েছে। দেশভাগে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ছিন্নমূল বাঙালি সব কিছু হারিয়েছে, কেবল বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে জাতিজ্ঞান। ছবিটিতে ঈশ্বর নিজের বোন সীতাকে নিয়ে জীবনে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। তারা জায়গা পায় নীচু জাতির অনাথ ছেলে অভিরামের কাছে। মেধাবী অভিরাম সীতাকে বিয়ে করে। অভিরাম আর সীতার প্রেম মেনে নিতে পারেনি ঈশ্বর। আবার অভিরাম হঠাৎ মারা গেলে সীতার জীবনে অন্ধকার নামে, গৃহবধূ হয়ে ওঠে পণ্য। এই সিনেমা তাই এক মানবিক অবক্ষয়ের ইতিকথা, দেশভাগ তাড়িত মরমিয়া জীবনের দুর্বিষহ আখ্যান। এই সিনেমার ঘটনাক্রমে সীতার আত্মহনন কিংবা ঈশ্বরের মানসিক বিপর্যয়ে মানুষের চেয়ে বেশি দায়ী সমাজ এবং সময়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইতিহাসে যেভাবে দেশভাগের কথা তুলে ধরা হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যে সেভাবে তুলে ধরা না গেলেও একথা স্পষ্ট যে বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি আছে যা বাংলা ভাষা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৭, পৃ. ১৫৬।
- ২। দাশ, জীবনানন্দ ১৯৪৬-৪৭, “শ্রেষ্ঠ কবিতা” অন্তর্জাল সংগ্রহ।
- ৩। সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, “উদ্বাস্তু” অন্তর্জাল সংগ্রহ।
- ৪। সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, “উদ্বাস্তু” অন্তর্জাল সংগ্রহ।
- ৫। সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, “উদ্বাস্তু” অন্তর্জাল সংগ্রহ।
- ৬। দাশ, জীবনানন্দ “রূপসী বাংলা”, অন্তর্জাল, সংগ্রহ, পৃ. ১৫।
- ৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, “যদি নির্বাসন দাও” অন্তর্জাল সংগ্রহ।
- ৮। মজুমদার, অমিয়ভূষণ ‘গড় শ্রীখণ্ড’, নাতানা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, অন্তর্জাল সংগ্রহ।
- ৯। হালদার, রঞ্জন, ‘অহল্যা কাহিনী’, কমলা পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭।
- ১০। ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, ‘ইতিবৃত্তে চণ্ডালজীবন’, কলকাতা পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৮-২৯।
- ১১। হক, হাসান আজিজুল, “আগুনপাখি”, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০০৮।
- ১২। বসু, সমরেশ, “আদাব”, সাহিত্যমেলা, পংবঙ্গ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত, পৃ. ১২৪।
- ১৩। মন্ডল, ভবেশ, বাংলার জনসংস্কৃতি ও সমাজ, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০২৫, পৃ. ১৭২।

- ১৪। সরকার, সমিত (আধুনিক ভারত ১৮৮৫- ১৯৪৭), কে. পি. বাগ্‌চি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা পুনর্মুদ্রণ, ২০২২, পৃ. ৩৩১-৩৩৪।
- ১৫। গুহরায়, সিদ্ধার্থ, চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন, (আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৭০৭- ১৯৬৪), প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০২১, পৃ. ৮৯৬-৯০২।
- ১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান (আধুনিক ভারতের ইতিহাস), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, তেলেঙ্গনা, ভারত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০২২, পৃ. ৫৫৯-৫৬৫।

উনিশ শতকে ভারতের কারিগরি বিদ্যাচর্চা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

প্রনয় দে
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যা। এই প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজ হয়ে উঠেছে আধুনিক ও উন্নততর। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ভারতে কারিগরি বিদ্যাচর্চা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার নিজেদের স্বার্থে এদেশে কারিগরি বিদ্যাচর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। যদিও প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ ঘটেছিল এবং এই ধারা মধ্যযুগের ভারতেও অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে কারিগরিবিদ্যার ধারা উন্নত হয়। কারণ বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতে আসলে তাদের উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটেছিল এদেশে। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কারিগরি বিদ্যাচর্চা ভারতে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনকালে। নিম্নপদস্থ দেশীয় কারিগর তৈরির জন্য ঔপনিবেশিক শাসকরা রুর্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গুডনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি কারিগরি বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

সূচক শব্দ: প্রযুক্তি, কারিগরিবিদ্যা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পার্যাক্রম।

মূল আলোচনা: ইঞ্জিনিয়ারিং কথাটি, যার বাংলা পরিভাষা কারিগরিবিদ্যা তা আজ আমাদের সমাজে বহুল পরিচিত ও উচ্চারিত শব্দ। তবে প্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ১৯৫৬ খ্রিঃ রচিত ‘ইঞ্জিনিয়ারিং হিস্ট্রি’ গ্রন্থে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল মানুষের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, যন্ত্র প্রভৃতির উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করার কৌশল হল কারিগরি।^১ ঔপনিবেশিক শাসনকালের প্রথমদিকে ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এর পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসকরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হয়েছিল। একথা উল্লেখ্য যে ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি পূরণের লক্ষ্যে ব্রিটিশরা ভারতে কারিগরি বিদ্যাচর্চায় সচেষ্ট হয়েছিল। মৌলিক বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের প্রসারের জন্য নয়, মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই একদল দেশীয় কারিগর তৈরির লক্ষ্যে ব্রিটিশরা ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিল।^২ ইংল্যান্ড থেকে আগত কারিগরদের বেতন বেশি থাকায় ঔপনিবেশিক সরকারের খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কারিগরদের অধীনস্থ নিম্নপদস্থ ভারতীয় কারিগর তৈরির জন্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ক্যানেল প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার পূর্ত বিভাগের অধীনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কলেজ স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিল।^৩ এই প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকে যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম

ছিল রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গুডনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি ইন্সটিটিউট প্রভৃতি। এই সময়ের মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। ১৮৪৪ খ্রিঃ জুন মাসে এলফিনস্টোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ক্লাস শুরু হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নিম্নপদস্থ পদে কারিগর তৈরি করা। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় সাড়ে তিন বছর অস্তিত্বের পর ছাত্রের অভাবের কারণে ১৮৪৭ খ্রিঃ ৩১শে ডিসেম্বর এই কারিগরি ক্লাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।^৪

রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ:

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বেশকিছু নির্মাণ ও সেচ প্রকল্প শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৮৪৭ খ্রিঃ গঙ্গা খাল প্রকল্প। ব্রিটিশ কারিগরদের খাল সেচ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকায় দরকার হয়ে পড়েছিল ভারতীয় কারিগরদের। এই ভারতীয়দের দক্ষ কারিগর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যাচর্চা। এই চর্চার মধ্য দিয়ে বেশকিছু যোগ্য ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও তত্ত্বাবধায়ক তৈরি করা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কারিগরি বিদ্যাচর্চার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর জেমস থমসন। পূর্ত বিভাগের তদারকিতে সেচ প্রকল্প, জরিপ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ক্যানেল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য দক্ষ ভারতীয় কারিগর তৈরির জন্য জেমস থমসন উত্তরপ্রদেশের রুরকিতে একটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৪৭ খ্রিঃ ভারতের প্রথম ও প্রাচীনতম কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পথচলা শুরু করেছিল।

১৮৪৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল আর.ম্যাকলাগান। প্রতিষ্ঠার সময় এই কলেজে প্রধানত তিনটি বিভাগ ছিল, যথা- উপ-সহকারী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ, নন-কমিশনড ইউরোপীয় অফিসার ও সৈনিকদের যারা ইতিপূর্বে পঠন, লেখা, অঙ্কন ও গণিতের প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের প্রশিক্ষণ এবং তরুণ ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ যারা বিনামূল্যে সার্ভে, ড্রয়িং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী। ১৮৪৭ খ্রিঃ এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল ১৮৪৮ খ্রিঃ যখন বেশকিছু ভারতীয় শিক্ষার্থী তৃতীয় বিভাগে যোগদান করেছিল। ১৮৫১ খ্রিঃ এই কলেজে সমস্ত শ্রেণীর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫০ জন, যার মধ্যে ৪২ জন ছাত্র পাশ করে উত্তীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৮৫৪ খ্রিঃ কলেজটির নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নামকরণ হয়েছিল থমসন কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং।^৫

১৮৫৬ খ্রিঃ থমসন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নতুনভাবে নির্মিত হওয়ার পর অতীত ও বর্তমান অবস্থার অনুসন্ধানে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে তিনটি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যথা- সিনিয়ার বিভাগ, সামরিক বিভাগ ও মাতৃভাষা বিভাগ। কলেজটির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৭০ খ্রিঃ মধ্যে এই থমসন কলেজটি একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। ১৮৭৩ খ্রিঃ থেকে ১৮৭৫ খ্রিঃ মধ্যে প্রায় ১৬ জন ভারতীয় এই কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।^৬ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত থমসন কলেজ মূলত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, সার্ভে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দান করে ভারতের কারিগরি বিদ্যাচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ক্যালকাটা:

বাংলা তথা পূর্ব ভারতের কারিগরি বিদ্যাচর্চার পথপ্রদর্শক ছিল ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যা পরবর্তীকালে বি ই কলেজ নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এটি ছিল ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ভারত তথা বাংলাতেও পথঘাট, ঘরবাড়ি, ক্যানেল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল দক্ষ ভারতীয় কারিগর। উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কারিগরদের অধীনস্থ নিম্নপদস্থ দক্ষ ভারতীয় কারিগর অপরিহার্য হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকার বাংলাতে কারিগরি বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বাংলার তৎকালীন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এইচ.গুডউইনের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৫৬ খ্রিঃ কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং- এর ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং ঘরে পথচলা শুরু করেছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ক্যালকাটা। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন ই.সি.এস.উইলিয়াম। ১৮৫৭ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রিঃ দুবছরের প্রশিক্ষণ সমেত তিনবছরের তত্ত্বগত পাঠ্যক্রমের লাইসেন্সিয়েট ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং দীননাথ সেন প্রথম স্থান ও স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে ১৮৬৪ খ্রিঃ ব্যাচেলার ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।^৭

ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মহাবিদ্রোহ, যা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। এই মহাবিদ্রোহের কারণে ব্রিটিশ সরকার ব্যয় সংকোচনের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি পৃথকভাবে পরিচালিত না করে ১৮৬৪ খ্রিঃ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের সাথে সংযুক্তিকরণ করেছিল।^৮ এর ফলে এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ। এই সময়ে কলেজটিতে মাত্র চারটি পদ নির্ধারিত হয় যথা- ইঞ্জিনিয়ারিং, সহকারী ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত ও ড্রয়িং-এর অধ্যাপক পদ। তবে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীনে থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিশেষ কোন উন্নতি লাভ না করায় ১৮৮০ খ্রিঃ হাওড়ার শিবপুরে বিশাল কলেজের পরিত্যক্ত স্থানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি স্থানান্তরিত হয়ে নতুন নামকরণ হয়েছিল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া, যার প্রথম বর্ষ ৭৩ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হয়েছিল।^৯ এই সময়ে কলেজের ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য শিবপুরে পূর্ত বিভাগের ওয়ার্কশপটি এই কলেজের সাথে যুক্ত হয়েছিল। একদিকে যেমন গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অ্যাগ্রেন্টিস বিভাগ শুরু হয় তেমনি অন্যদিকে শুরু হয়েছিল ভিজিটিং লেকচারশিপ। এই কলেজে লাইসেন্সিয়েট ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর পরিবর্তে লাইসেন্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ব্যাচেলার ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিবর্তে ব্যাচেলার অব ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রবর্তিত হয়। এইভাবে কলেজটি যখন প্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যায় যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছিল তখন প্রশাসনিক কাজকর্মের অসুবিধার কারণে ১৮৮৭ খ্রিঃ কলেজের নতুন নামকরণ হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। এই কলেজের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল হাসপাতাল ও কৃষিবিদ্যা বিভাগ স্থাপন। তাই বলা যায় দক্ষ কারিগর ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার পাশাপাশি শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চিকিৎসা ও কৃষি অর্থনীতিতে অবদান রেখেছিল। পরবর্তীকালে এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিচিতি লাভ করে কারিগরি বিদ্যাচর্চায় অবদান রেখেছিল।

কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, গুডনি:

অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে জরিপ ও সেচকার্যের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার দক্ষ প্রযুক্তিবিদ ও কারিগরদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। এরই পরিণতিতে মাইকেল টপিনের প্রস্তাব অনুসারে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ফোর্ট অব সেন্ট জর্জ ১৭৯৪ খ্রিঃ একটি সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জন গোল্ডিংগাম। যদিও পরবর্তীকালে অর্থের অভাবে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে জলসেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে চাইলে দক্ষ কারিগর তৈরির জন্য পুনরায় সার্ভে স্কুলটি ১৮১৯ খ্রিঃ চালু হয়েছিল। পরবর্তীকালে মাদ্রাজে দক্ষ কারিগর ও তত্ত্বাবধায়কদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে সার্ভে স্কুলটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পরিণত হয়ে চিপকের খালসা মহলে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিঃ এই স্কুলটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তরিত হয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।^{১০}

মাদ্রাজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল যথা- সিনিয়ার ও জুনিয়ার বিভাগ। অঙ্কন, জরিপ, যন্ত্রবিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিষয় এই কলেজে পড়ানো হত। ১৮৮৬ খ্রিঃ এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির নাম পরিবর্তিত হয়ে কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, গুডনি নামে পরিচিত লাভ করেছিল। এই কলেজ ছিল ভারতের একমাত্র কারিগরি বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রথম মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স চালু হয়েছিল। এইভাবে উনিশ শতকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী তথা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, গুডনি।

কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, পুণা:

বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ক্লাস শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই এই ক্লাস বন্ধ হয়ে গেলেও কারিগরি বিদ্যাচর্চায় বোম্বে প্রেসিডেন্সীর অবদান কম ছিল না। পূর্ত বিভাগের অধীনে বিভিন্ন নির্মাণকার্যের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভেয়ার, তত্ত্বাবধায়ক, কারিগর প্রমুখদের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠলে ১৮৫৪ খ্রিঃ পুণার ভবানীপীঠে পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস অ্যান্ড মেকানিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জেমস ম্যাকডুগাল।^{১১} এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ত বিভাগে নিযুক্ত অধঃস্থান পদের কারিগরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৮৬৪ খ্রিঃ এই স্কুলটি পুণা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হয়েছিল। এর পরবর্তীকালে ১৮৮৬ খ্রিঃ এই কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন ঘটেছিল। পুণা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দুটি নতুন শ্রেণী তথা কৃষিবিষয়ক ও বনবিষয়ক শ্রেণী যুক্ত হলে কলেজটির নতুন নাম হয় কলেজ অব সায়েন্স। এই কলেজ থেকেই পাশ করা এম.বিশ্বেশ্বরয়া বিশ্ব বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিঃ মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি এই কলেজ থেকে এল সি ই এবং এফ সি ই এল ডিগ্রী লাভ করে বোম্বের পূর্ত বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।^{১২} এই কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভকারী দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এম.বিশ্বেশ্বরয়াকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে প্রতি বছর তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৫ ই সেপ্টেম্বর 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' হিসাবে পালিত হয়।

ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, মুম্বাই:

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কারিগরি ও প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মুম্বাই- এর ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের পঞ্চাশ

বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বোম্বেতে জনগণ ৮০০০০ টাকা দান করেছিল এবং এর সাথে রিপণ স্মারক তহবিল থেকে আরো ১৫০০০০ টাকা একত্রিত করে ১৮৮৭ খ্রিঃ মুম্বাই-এ ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট নামক একটি কারিগরি বিদ্যাচর্চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।^{১৩} এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমে বয়নশিল্প ও যন্ত্রশিল্পে লাইসেন্সিয়েট কোর্স চালু হয়েছিল। এই শতকের ভিক্টোরিয়া জুবিলি ইন্সটিটিউট ছিল ভারতের একমাত্র কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রচুর পরিমাণে মেশিন ও যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হয়েছিল। শুধুমাত্র মুম্বাই নয়, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হয়েছিল। এইভাবে ১৯ শতকের ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট।

চার্লস উডের প্রতিবেদন অনুসারে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ- এই তিন প্রেসিডেন্সীতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞান, আইন, কলা প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী বিষয়ে ডিগ্রী প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়েও ডিগ্রী প্রদান করেছিল। কলকাতা, মাদ্রাজ ও পুণার- এই তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তাদের প্রেসিডেন্সীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুমোদিত হয়েছিল। ম্যাকডোনাল্ড স্মারকলিপি থেকে জানা যায় ১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ সময়কালে ভারতে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল যেখানে মোট ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ছিল ৬০৮ জন। এর পরবর্তীকালে কারিগরি শিক্ষার প্রতি জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল, যখন ১৮৯৮ খ্রিঃ জামসেদজী নুসেরওয়ানজি টাটা কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য ৩০ লক্ষ টাকার তহবিল দান করেছিল।^{১৪}

উনিশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার জন্য ঘরবাড়ি, পথঘাট, ক্যানেল প্রভৃতি নির্মাণের প্রয়োজনীয় দক্ষ দেশীয় নিম্নপদস্থ কারিগর তৈরির উদ্দেশ্যে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল। এর পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশী শিক্ষা ধারায় প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যাচর্চার দেশীয় উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ডন সোসাইটি, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রভৃতি। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থসিদ্ধি ও দেশীয় উদ্যোগ উভয়ই ভারতে কারিগরি বিদ্যাচর্চার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

- ১। রায়, সিদ্ধার্থ, ১৯৯২ খ্রিঃ, প্রাথমিক প্রযুক্তিবিদ্যা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃঃ ৩।
- ২। চট্টোপাধ্যায়, সব্যাসাচী ও রাজবংশী, সুজিত, ২০২১ খ্রিঃ, ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, পৃঃ ৭৬।
- ৩। Macleod, Roy and Kumar, Deepak, (Ed), 2022 AD (Second Edition), Technology and the Raj: Western Technology and Technical Transfers to India 1700-1947, Delhi, Aakar Books, Pp.216-217।
- ৪। Sen, S.N, 1991 AD, Scientific and Technical Education in India 1781-1900, New Delhi, Indian National Science Academy, P.285।
- ৫। Thomason Civil Engineering College Roorkee, U.P, Calendar 1927, Kolkata, Digital Library of the West Bengal Secretariat, Pp.17-23।

- ৬। Thomason Civil Engineering College Roorkee, U.P, Calendar 1930, Kolkata, Digital Library of the West Bengal Secretariat, P.26।
- ৭। Sengupta, Dipak and Sinha, Indra Nath, (Ed), 2014 AD, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur: Inaugural Souvenir, Howrah, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Pp.7, 9।
- ৮। দাস, বিভোর, জানুয়ারী ২০১৬, 'শিবপুর বি. ই কলেজ; কারিগরি শিক্ষার ঐতিহ্য- এর উত্তরাধিকার', শিক্ষা দর্পণ উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয় দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ /প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১০৮।
- ৯। Bhattacharyya, Madan, (Ed), 1956 AD, Bengal Engineering College: Centenary Souvenir, Howrah, Bengal Engineering College, P.24।
- ১০। Saha, Samir Kumar, 2012 AD, Engineering Education in India: Past, Present & Future, Kolkata, Sahitya Samsad, Pp. 31-34।
- ১১। Ray, Ajoy Kumar, 2014 AD, History of Science in India, Volume- VII, Engineering Science, Kolkata, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, P.150।
- ১২। Srinivasamurthy, A.P, 1984 AD, Sir. M.Visvesvaraya, Bangalore, IBH Prakashana, P.3।
- ১৩। কুমার, দীপক, ২০২৩ খ্রিঃ, ব্রিটিশ ভারতে বিজ্ঞান, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, পৃঃ ১৭৩।
- ১৪। Biswas, Gautam, Chopra, K.L, Jha, C.S, Sing, D.V, 2010 AD, Profile of Engineering Education in India : Status, Concerns and Recommendations, New Delhi, Narosa Publishing House, P 8-10।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ : নরনারীর জীবনদর্শন অগ্নিজ্বালা থেকে

আলোকপ্রভা

লোকেশ্বর রায়

স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সুচিত্রা ভট্টাচার্য ‘দহন’ উপন্যাসে সমাজের তথাকথিত আধুনিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে নির্মমভাবে উন্মোচন করেছেন। এখানে কেবল বহিরঙ্গের পরিবর্তন নয় বরং মানুষের অন্তঃস্থলের রূপান্তরহীনতাকেই গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসের প্রতিটি পাতায় প্রশ্ন জেগে ওঠে, সভ্যতার শিখরে পৌঁছেও মানুষ কি সত্যিই আধুনিকমনস্ক হতে পেরেছে? ‘নর-নারীর সমানাধিকার’ এই ধারণাটি কি বাস্তবে রূপ নিয়েছে? মৌখিক সাম্যের কথা বলা হলেও নারীকে আজও তার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র সংগ্রাম করতে হয়। উপন্যাসে দেখা যায়, তথাকথিত আধুনিক সমাজেও নারীরা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার। এই উপন্যাসে কেবল নারীর অপমান নয় বরং বিভূতির পেছনে ছোট্ট ছুটি করতে গিয়ে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও তুলে ধরা হয়েছে। তাই ‘দহন’ উপন্যাসের আলোচনায় আমার প্রবন্ধে কেবল একটি নারীর গল্প নয় বরং অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় ফুটে উঠেছে সেইসব নারীদের প্রতিচ্ছবি যারা সমাজের শত শৃঙ্খল ভেঙে নিজেদের অস্তিত্বকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে।

সূচক শব্দ: নারী, অন্তর্দহন, আধুনিকতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ।

মূল আলোচনা: সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ (১৯৯৮) উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কলকাতার প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর মূল প্রশ্নটি চিরন্তন- মানব সমাজ যতই আধুনিকতার দাবি করুক না কেন, মানুষের মন ও চেতনা কি সত্যিই পুরনো রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে গেলেও মানুষের মন ও চেতনা কতটা আধুনিক হয়েছে? প্রাচীনকালে নারীকে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব হিসেবে গণ্য করা হতো, আধুনিক সমাজের বাহ্যিক পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই মানসিকতা আজও বিদ্যমান। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীরা আজও একই ধরনের অবমাননা ও অসহায়তার শিকার। সমাজ যতই আধুনিক হোক না কেন, তা আজও পুরাতন সামাজিক ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেনি এবং নারীরা তাদের যোগ্য স্থান লাভে ব্যর্থ। নির্যাতিতা নারীর যন্ত্রণা উপলব্ধি করার বদলে, সমাজের তথাকথিত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তার কান্নাকেও দমিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো এই কাজে শুধু পুরুষ সমাজই নয় বরং একশ্রেণীর নারীরাও জড়িত। মেকি সামাজিক সম্মান ও বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য অপমানিত নারীর কান্না অবরুদ্ধ করে তার অন্তরস্থিত দহনকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ‘দহন’ উপন্যাসে নারীর অন্তর্দহন জ্বালার সেইসব অপ্রকাশিত দিকগুলোকেই অনুসন্ধান করা হয়েছে- যেখানে নারী তার সম্মান ও ব্যক্তিসত্তা রক্ষার জন্য একাকী লড়াই করে। এই লড়াইয়ে সমাজের দ্বৈতসত্তা, ভণ্ডামি এবং নারীর প্রতি চিরায়ত অন্যায্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ উপন্যাসে তরুণী শিক্ষিকা বিনুকের জীবনের এক ভয়াবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। এক বিকেলে বান্ধবী বিশাখার বাড়ি থেকে ফেরার পথে কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাসের মতো বিনুকের জীবনেও এক অপ্রত্যাশিত ঝড় আসে। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে নেমে সে দেখতে পায় বৃষ্টির কারণে ভিড়ে ঠাসা প্ল্যাটফর্মে একদল যুবক এক মহিলার স্ত্রীলতাহানি করছে এবং তার স্বামীকে মারধর করছে। এই অমানবিক দৃশ্যের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিকটি হলো- শত শত মানুষ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে কোনো মানবিকতা বা প্রতিবাদবোধ জাগ্রত হয় না। বিনুক এই অবমাননা সহ্য করতে না পেরে নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রতিবাদ জানায়। শারীরিকভাবে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বিনুক বলে ওঠে- “আপনারা এতগুলো লোক হাঁ করে দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! সকলের চোখের সামনে একটা মেয়েকে এভাবে...”^১ এই বাক্যটি সমাজের বিবেকের প্রতি এক জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। বিনুকের এই প্রতিবাদী পদক্ষেপ তাকে বাহ্যিক সম্মান এনে দিলেও তা সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে সামনে নিয়ে আসে।

সন্ধ্যায় রমিতা স্বামীর সঙ্গে নিউমার্কেট থেকে ফেরার সময় তার নারীত্বের ওপর যে এক নির্মম আঘাত নেমে আসবে সে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। এক আকস্মিক অসহায় মুহূর্তে সে চরমভাবে অপমানিত হয়েছে ঘটনার আকস্মিকতা তাকে স্তম্ভিত করে রেখেছিল। মুখে লেগে থাকা রক্তের ছাপ নিয়ে বিনুক গনগনে চোখে ভিড়ের দিকে দিক্কার ছুঁড়ে জানায়- “শহর নোংরা হয় না। শহরের মানুষরা নোংরা হয়। এতগুলো নপুংসক এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকলে ... থুঃ থুঃ।”^২ অসংখ্য মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়েও রমিতা একাকী, অসহায়। চারজন উন্মত্ত যুবকের বিকৃত লালসা যেন তার সম্মানকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে অথচ জনতা কেবল দাঁড়িয়েই রইল পাথরের মূর্তির মতো কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ জানায়নি। যেন লজ্জা আর অপমানের দৃশ্য তাদের কাছে এক নিছক বিনোদনমাত্র। বিনুক চিৎকার করে ওঠে- “চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনেক তো মজা দেখলেন, এবার অন্তত থানায় চলুন।”^৩ বৃষ্টি থামতেই যেভাবে তারা আশ্রয়ের খোঁজে ছুটেছিল সেভাবেই নির্বিকার ভঙ্গিতে গন্তব্যের পথে পা বাড়াল- যেন কিছুই ঘটেনি। রমিতা চারপাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো একজনও নেই। একমাত্র বিনুক রমিতা ও পলাশকে সঙ্গে নিয়ে শেষমেশ থানায় গিয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে। এরপরের কয়েকদিন বাড়িতে সাংবাদিকদের ভিড়, কাগজে-কাগজে তার ছবি, পাড়া-প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়-বন্ধুর অভিনন্দন সব মিলিয়ে বিনুক এক বীরাজনার আসনে অধিষ্ঠিত। স্কুলেও হেডমিস্ট্রেস থেকে সহপাঠীরা সবাই তাকে সম্বর্ধনায় ভরিয়ে দিয়েছে। যখন সবাই বিনুকের সাহস নিয়ে বাহবা দিচ্ছিল তখন মৃণালিনী দেবী বিনুককে জানায়, একজন মানুষ হয়ে মানুষের উচিত কাজই করেছে বিনুক। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বহীন হয়ে যায়নি বিনুক। সঠিককে সঠিক আর ভুলকে ভুল বলার মধ্যেই জীবনের মানে। ঠাম্মার এই উপলব্ধি বিনুককে অহংকারের ঘোর থেকে জাগিয়ে তুলে, বুঝতে পারে বীরত্ব বাহাদুরি নয় প্রকৃত শক্তি হলো বিবেকের পথ মেনে চলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। ঠাম্মি মৃণালিনী দেবী বিনুকের কাছে রমিতার কথা জানতে চাইলে বিনুক আড়ষ্ট হয়ে যায়। গত ক’দিনের অবিরাম প্রশংসার ঝড়ে বিভোর হয়ে সে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল সেই অসহায় তরুণীর কথা। অথচ রমিতাকেই তো সে গুণাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। ঠাম্মির কণ্ঠে করুণার সুর- “তা হ্যাঁ রে, সেই মেয়েটির খোঁজ

নিয়েছিলি? ...শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রইলি! তোর চোট তো কদিনেই সেরে যাবে, মেয়েটার কথা ভাব। লজ্জাঘেন্নায় মেয়েটার কী অবস্থা হয়েছে কে জানে!”^৪ মুহূর্তেই আত্মগর্বে মোড়া বিনুক ঠাম্মির প্রশ্নে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে। বিনুককে আদর করতে করতে ঠাম্মি তার কবজির ক্ষতচিহ্নে চাপ দিলে বিনুক ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে। এই ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে তিনি বিনুককে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শরীরের আঘাত সময়ে সেরে যায় কিন্তু নারীসম্মান একবার ভুলুপ্তি হলে তার ক্ষত আজীবন রক্তাক্ত থেকে যায়। সমাজ তখনও সেই নারীকেই দোষী করে তোলে- কাপড়, স্বভাব কিংবা চরিত্রের দোহাই দিয়ে অপমানের পাহাড় চাপিয়ে দেয় তার বুকে। যুগ পাল্টালেও এই অন্যায়ের শেকড় রয়ে গেছে সমাজের অন্তরে। নারীর সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা আজও ভিন্ন ভিন্ন রূপে চলমান। ঠাম্মির কথায় বিনুক রমিতার শ্বশুরবাড়িতে ফোন করলে রমিতার শাশুড়ি রমিতার সাথে যোগাযোগ করতে মানা করে দেয়। রমিতার শাশুড়ি একজন নারী হয়েও রমিতাকে একবারও মেয়ের মতো ভাবতে পারলেন না। বরং বংশমর্যাদা আর আভিজাত্যের অজুহাতে রমিতাকে চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। তার কাছে পরিবারের সম্মানই মুখ্য, অপমানিত পুত্রবধূর অশ্রু নয়। তার আশঙ্কা, যদি আবার রমিতা থানায় যায় বা সাহস করে মুখ খোলে তবে সমাজের কাছে পরিবার কলঙ্কিত হতে পারে। যেটুকু সম্মান বেঁচে রয়েছে সেটুকুও হারিয়ে যাবে। আজও সমাজে এই ধারণাটি প্রচলিত যে- “মেয়ে মানুষের গায়ে একটা দাগ পড়লেই মৃত্যু পর্যন্ত সে খুঁতো হয়ে যায়।”^৫ তাই রমিতার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়কে সাঙ্ঘনা দেওয়ার বদলে আড়াল করে রাখাই হয়ে উঠল প্রথম কর্তব্য। লীনা বাড়ির বড়বৌ তার পরিহাসের সুরে শাশুড়ির ভণ্ড আধুনিকতার মুখোশ উঠে আসে- “ওসব মর্ডান ফর্ডানের পলেক্সারা বাইরে থেকে একটা টোকা পড়লেই বুরবুর করে খসে পড়ে।”^৬ সত্যিই, পোশাক-আচরণে আধুনিকতার ভান থাকলেও মানসিকতায় তিনি রয়ে গেছেন পুরোনো পুরুষশাসিত কাঠামোর অন্ধ অনুসারী। তার দৃষ্টিতে নারী কেবল সংসারের সেবিকা, পুরুষের সম্পত্তি, সন্তানের জন্মদাত্রী। নিজের ভাবনা বা মতপ্রকাশের অধিকার তার নেই। পুরুষের অঙ্গুলিহেলনেই নারী চলবে, এটাই যেন অঘোষিত নিয়ম। রমিতা সদ্যবিবাহিতা এক তরুণী সেই পুরোনো সমাজব্যবস্থার শিকার। স্বামীর পরিবারে এত মানুষের উপস্থিতিতেও সে ভয়ঙ্কর একাকীত্ব ভুগছে। নিজের বেদনার পাশে দাঁড়ানোর মতো একজনকেও পায়নি। তার সম্মান ভুলুপ্তি হয়েছে অথচ তার যন্ত্রণা বোঝার পরিবর্তে সমাজ এবং পরিবার তার উপরেই দোষারোপ চাপিয়ে দিয়েছে। এই নির্মম বাস্তবতাই ঠাম্মির ভাষায় বিনুকের সামনে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তিনি জীবনের সত্যকে সহজ অথচ তীক্ষ্ণভাবে শিখিয়ে দেন বিনুককে। আর তাই ঠাম্মির সংস্পর্শেই বিনুক নিজের দোলাচল, আত্মগর্ব ও দ্বিধা কাটিয়ে মানবিকতার মর্মবাণী উপলব্ধি করে- অন্যায়কে সহ্য করা নয়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই জীবনের প্রকৃত অর্থ।

শেষব থেকেই রমিতা অফুরন্ত আদর-ম্নেহে বড় হয়েছে। স্কুলজীবনে সে শিখেছিল ঈশ্বর সর্বদা মানুষের পাশে থাকেন। অথচ এক ভয়ংকর ঘটনার পর থেকে সেই বিশ্বাস ভেঙে খানখান হয়ে গেল। চার উন্মত্ত যুবকের অশালীন আক্রমণ রমিতার মনোজগতে গভীর দাগ কেটে দিয়েছে। রাতের পর রাত সে আতঙ্কে কেঁদে উঠে, ঘুমের মধ্যে আত্ননাদ করে। ঘুমের ঘোরেও সারাক্ষণ বিড়বিড় করে- “অ্যাঁ ছুঁয়ো না আমাকে। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি।”^৭ প্রথম প্রথম সে পলাশের স্পর্শও সহ্য করতে পারে নি। এই সময়ে তার প্রয়োজন ছিল ম্নেহের আশ্রয়, মানসিক দৃঢ়তা জোগাবার মতো একজন সঙ্গী। অথচ স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির কেউ

পাশে দাঁড়াল না। পরিবারের কাছে রমিতার মানসিক ক্ষতের চেয়ে বড় বনেদিয়ানার মুখোশ। স্বামী পলাশ যে প্রথমে থানায় রিপোর্ট করে রমিতার মনে আশা জাগিয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেও পারিবারিক মর্যাদার দোহাই দিয়ে স্ত্রীর অপমানকে গোঁণ করে তুলে। পলাশের কণ্ঠেও শোনা যায় পরিবারের সুর- “মা তো ভট করে বলে বসল, আমরা তো জামাকাপড় সিনেমা থিয়েটার শপিং কোন ব্যাপারেই রমিতার স্বাধীনতায় হাত দিই না, সেই মেয়ের কি উচিৎ ছিল না থানায় রিপোর্ট লেখাতে যাওয়ার আগে একবার আমাদের কথা ভাবা? আমি কত করে মাকে বোঝালাম, ওই মেয়েটাই জোর করে আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মা বিশ্বাসই করে না। মা’ও হেল্লেস....। ঘাড়ের ওপর মহিলা সমিতির পাগুরা এসে নিঃশ্বাস ফেলছে.... একবার গ্রিন সিগনাল পেলেই সব হাল্লা মাচাতে শুরু করে দেবে.... থানার সামনে গিয়ে গাঁক গাঁক করে চোঁচাবে.... জঘন্য জঘন্য পোস্টারিং করবে.... নিউজওয়ালারাও আবার জুস পেয়ে যাবে। অসহ্য।”^৮

আধুনিক সমাজে দাঁড়িয়েও আমরা প্রকৃত অর্থে আধুনিক হতে পারিনি। রমিতার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা শুধু একজন নারীর ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা নয় বরং সমাজের অবক্ষয়িত রূপকে উন্মোচিত করে। আধুনিকতার নামে বিভ্রান্তি পরিবারের এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত সীমাহীন অর্থ ও ভোগলালসার প্রভাবে চরম উৎশৃঙ্খলতায় পৌঁছে গেছে। বিনুকের চোখে এরা- “চোখগুলো ঢুলুঢুলু। লম্পট লম্পট। তবে ঠিক প্রফেশনাল গুণ্ডা-মস্তানদের মতো নয়। ... এখন এক ধরনের ক্লাস তৈরি হয়েছে না, দামি দামি জামাকাপড় পরে, দেদার টাকা ওড়ায়, টকাটক ইংরিজি বলে, মোটর সাইকেল মারগতি নিয়ে ফুর্তি মেরে বেড়াচ্ছে.... রাস্তাঘাটে এরকম ছেলে আজকাল প্রচুর দেখতে পাবেন।”^৯ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এরা জানে না তারা শুধু অস্থির সময়ের ধারক ও বাহক। ‘দহন’ উপন্যাসে এই ধরনের চরিত্রগুলির অবনতি প্রকাশ ও তাদের অভিভাবকদের অর্থের বিনিময়ে সম্ভ্রান্তের কুসাজকে আড়াল করার কদর মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। পাশবিক আক্রমণের শিকার হওয়ার পর রমিতা শুধু অপরাধীদের মুখোমুখি হয়নি বরং স্বামী, শ্বশুরবাড়ি ও সমাজ থেকেও অবজ্ঞা ও আঘাত পেয়েছে। পলাশের ফুলকাকিমা থেকে শুরু করে শ্বশুর পর্যন্ত সকলেই রমিতার পোশাক-পরিচ্ছদকে দায়ী করেছে। পলাশের বাবাও বংশমর্যাদায় উদ্ভীষ্ট গজগজ করেছে- “কাসুন্দের চৌধুরী বাড়ির একটা ইজ্জৎ নেই! বনেদী বাড়ির বউ ওরকম একটা পিঠখোলা পোশাক পরে বিয়েবাড়ি যাবে!”^{১০} বনেদি পরিবারের বউ হিসেবে তার দুঃখ-অপমান গোঁণ হয়ে গেছে মুখ্য হয়েছে কেবল পরিবারের মান-মর্যাদা। থানায় অভিযোগ দায়ের করার জন্য রমিতাকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে, সে নাকি পরিবারের সম্মান রক্ষার কথা একবারও ভাবেনি। পলাশও শেষ পর্যন্ত জানায়, অভিযুক্তরা সকলেই ভদ্র বাড়ির ছেলে ফলে তাদের প্রকাশ্যে দোষারোপ করা কঠিন। সমাজের বিভ্রান্তীদের সঙ্গে সংঘাত মানে পারিবারিক অপমান। একজন ভদ্র বাড়ির ছেলে হয়ে অপর সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলের চিহ্নিত করা ভীষণ কঠিন কাজ- “এ যেন নিজেরাই নিজের চেনাচ্ছি।”^{১১} এই ভয়ই পরিবারকে রমিতার পাশে দাঁড়াতে দেয়নি। ফলে রমিতা দ্বিগুণ যন্ত্রণা ভোগ করে একদিকে পাশবিক অপমান অন্যদিকে স্বামী ও পরিবারের নির্মম উদাসীনতা।

রমিতাকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল বিনুক। সেই সাহসের জোরেই রমিতার ভেতরেও জেগে উঠেছিল নতুন সাহস। এ কথা পলাশ জানত, আর তাই তার রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। স্ত্রীকে সে ব্যঙ্গ করে বলে- “তোমারও দেখছি এখন অনেক বুলি ফুটেছে। সারাক্ষণ ওই ঝাঁসি রাগির ছবি দেখে দেখে? হুঁ, বীরঙ্গনা! মিনিমাম ফেমিনিন ডিগনিটিটাও

নেই। থানায় আবার পুলিশকে উপদেশ দিচ্ছিল কিডন্যাপিং চার্জটাকে ভালোভাবে স্ট্রেস দেওয়ার জন্য।”^{১২} পলাশ চেয়েছিল ঘটনাটা চাপা পড়ে যাক কারণ এতে তার পরিবারের সম্মান জড়িত। এ ধরনের কেসে পুলিশ আর আদালত অপ্রীতিকর প্রশ্ন করে, যা তাদের মতো ভদ্র পরিবারের জন্য অসম্মানজনক। কিন্তু বিনুক বারবার থানায় গিয়ে নিজে থেকে ঘটনার খোঁজখবর নেয়। পলাশের মনে হয় বিনুক অথবা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে। তার মতে, ঘটনাটা রমিতার সঙ্গে ঘটেছে আর বিনুক শুধু বাহবা কুড়োচ্ছে। এমনকি পলাশদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ না করেই সে নিজেই থানায় গিয়ে অপরাধীদের শনাক্ত করেছে এবং পুলিশকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছে। এতে পলাশ চরম বিরক্ত হয়। পলাশের ধারণা বিনুক শুধু নিজের প্রচার চায়, অন্যের পরিবারের সম্মান নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। বাড়িতে এসে সে রাগে ফেটে পড়ে রমিতার সামনে। কিন্তু রমিতা তাকে অবাধ করে দিয়ে জানায় বিনুক কোনো ভুল কথা বলেনি। যা ঘটেছে বিনুক তো সেটাই বলেছে। বিয়ের পর থেকে পলাশের মতের বাইরে না যাওয়া রমিতার এই আচরণে সে হতভম্ব হয়ে যায়। একজন শান্ত ধীরস্থির স্বামী হিসেবে তার যে মুখোশ ছিল, রমিতার এই প্রতিবাদে তা খসে পড়ে এবং তার ভেতরের পুরুষতান্ত্রিক ও হিংস্র রূপটা বেরিয়ে আসে। তার পূর্বপুরুষদের মতোই সেও নারীর সম্মানকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করে। পলাশ বুঝতে পারে তার মায়ের মতো রমিতাকে এই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে রাখা সহজ হবে না। কারণ বিনুক রমিতার পাশে দাঁড়িয়ে বারবার তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। পলাশের অনুভব এখনই রমিতাকে কঠোর হাতে দমন না করলে সে আর তার পৌরুষ রক্ষা করতে পারবে না। রমিতাকে পাঁচটা আঘাত করে পলাশ বলে ওঠে- “কিডন্যাপিং কেস দিলে তোমার খুব মজা লাগে, না? পুরোনো আশিকরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে.... কী ভাল লাগছে? ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে?”^{১৩} পলাশের মুখ থেকে এমন কথাও বের হতে পারে বিনুক তা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। “আশ্চর্য, এত অত্যাচার, অবিচার, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সহ্য করা সত্ত্বেও নারী চিরদিন পুরুষকে স্নেহ করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে এবং বিশ্বাস করিয়াছে! যাহাকে সে পিতা বলে, ভ্রাতা বলে, স্বামী বলে, সে যে এত নীচ, এমন প্রবঞ্চক, এ কথা বোধ করি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বোধ করি এখানেই তার মূল্য।”^{১৪} এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজ যতই আধুনিকতার দাবি করুক না কেন, নারীদের আজও পুরুষের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই থাকতে হয়। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ষিক্যে পুত্রের অধীনে থেকে তারা কখনোই পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে না।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রমিতা যখন শ্বশুরমশাইয়ের উকিলবন্ধুর শেখানো মিথ্যা বুলি বাধ্য হয়ে জানায়, জায়গাটায় আলো কম থাকায় কারো মুখ সে স্পষ্টভাবে দেখতে পারেনি। তখন পারিবারিক সম্মান রক্ষার নামে নারীর যে আত্মবলিদান তা প্রকট হয়ে ওঠে। রমিতা, বিনুক, মৃণালিনী দেবী প্রমুখ নারী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে নারীজীবনের এক গভীর যন্ত্রণা সুস্পষ্ট। রমিতার মানসিক বিপর্যয় এক বাক্যে দৃশ্যমান- “রমিতার গলা গহীন খাদে নেমে গেছে। কাঁপছে। গর্ভের শিশুটা কি নড়ে উঠল ! সে কি অন্য কিছু শুনতে চায় !”^{১৫} এই বাক্যটি কেবল রমিতার ব্যক্তিগত অন্যায় নয় বরং সমাজে-আদালতে যুগে যুগে বহু নারীর আত্মসম্মান ও লজ্জা বিসর্জন দেওয়ার চিরন্তন গল্প। প্রকাশ্যে আদালতে অপরাধীদের দেখেও প্রতিবাদ না করা, মাথা উঁচু করে সত্য বলতে না পারা কেবল সমাজ ও শ্বশুরবাড়ির

তথাকথিত সম্মান রক্ষায় নয়। নিজের জঠরে লালিত সন্তানের পিতৃপরিচয় সুরক্ষিত রাখার কঠিন তাগিদও তাকে এই মিথ্যাচারের পথে ঠেলে দিয়েছে। যদি সে পলাশের কথামতো কাজ না করত তবে পলাশ তাকে ও তার সন্তানকে অস্বীকার করত এবং সমাজ সেই সন্তানকে ‘জারজ’ আখ্যা দিয়ে প্রতিনিয়ত হেয় করত। রমিতার স্ত্রীলতাহানির ঘটনার কয়েকদিন পরেই তার গর্ভে পলাশের সন্তান আসার ফলে এই সামাজিক কলঙ্ক ও অনিশ্চয়তার ভয় আরও তীব্র হয়। তাই নিজের কষ্ট, যন্ত্রণা, অপমান নীরবে হজম করে রমিতা প্রতি মুহূর্তে এক আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে আদালতে তোতাপাখির মতো মিথ্যা আউড়ে যেতে বাধ্য হয়। রমিতার এই দহন জ্বালা সবচেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে বিনুক। প্রকৃতপক্ষে, ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিনুকের অদম্য তৎপরতা ও সাহসিকতার জন্যই অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু রমিতার সাক্ষ্য যেখানে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারত সেখানেই পারিবারিক সম্মান রক্ষার অজুহাতে রমিতা তাদের না চেনার ভান করতে বাধ্য হয়। রমিতার তীব্রতর দহন জ্বালা, অক্ষমতা ও চরম অসহায়তা তার বাবা তপনবাবুর কণ্ঠে ঝরে পড়ে- “...সংকোচে। আত্মধিকারে। ... এত ভিত্তি আমার মেয়েটা! হয়তো আমারই দোষ। ছোট থেকে সেভাবে গড়তে পারিনি। তা ছাড়া মা, সবাই তো সব পারেও না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দরকার, তা তোমারই আছে। আমার মেয়ের নেই। প্রার্থনা করি আমার মেয়ে যেন কোর্টে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়। আমার মেয়ে হারুক। তুমি অন্তত জয়ী হও।”^{১৬} তপনবাবুর এই আত্মধিকার, মেয়েকে দৃঢ় চরিত্রে গড়ে তুলতে না পারার আক্ষেপ যেন সমাজের অক্ষম কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদেরই প্রতিচ্ছবি। আমাদের সমাজ যতই আধুনিকতার দাবি করুক না কেন, আজও কন্যাকে পুণ্ড্রগত শিক্ষায় স্বনির্ভর করার চেয়ে জন্মলগ্ন থেকেই বেশি শেখানো হয় মানিয়ে নেওয়া। চোখের সামনে নিজের সন্তানের তিলে তিলে যন্ত্রণাকাতর হওয়া যে কোনো পিতা-মাতার কাছেই মৃত্যুসম। রমিতার কষ্ট অনুভব করেও কিছু করতে না পারার এই জ্বালা তপনবাবু প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছেন। তবে বিনুকের কাছে এই লড়াই কেবল রমিতার ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়। তার কাছে- “এটা এখন একটা মৌলিক প্রশ্ন। একজন নারীর এই সামাজিক পরিবেশে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে কি নেই, সেটা জানার প্রশ্ন। রমিতারা কি বলল, না বলল তাতে আর কিছুই যায় আসে না বিনুকের।”^{১৭} ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর সৃষ্ট বিনুক চরিত্রটির বয়ানে এভাবেই সমাজ ব্যবস্থাকে এক মৌলিক প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে, কেন কেবল পুরুষবাহিত অনভিপ্রেত ঘটনায় মেয়েদের গায়েই কলঙ্ক লেপে যায়? মেয়েরা কি কেবল মনবিহীন, মস্তিষ্কবিহীন একটি শরীর? নিছকই এক জঠর, এক গর্ভাশয়? নারীর সম্মান এমনই ঠুনকো যে, রাস্তায় অতি সাধারণ ছেলে অশালীন ইঙ্গিত করলেও মেয়েদেরই বলা হয় সাবধানে চলো। অথচ যারা প্রতিনিয়ত অন্যায় করে চলেছে তারা সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অবোধে বিচরণ করে। তাদের প্রভাব, অর্থবল ও রাজনৈতিক আনুকূল্য তাদের রক্ষাকবচ যা তাদের যেকোনো বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেয়। এই ক্ষমতাবান সমাজবিরোধীরা অনায়াসে পার পেয়ে যায় কারণ আমরা আমাদের ঠুনকো সামাজিক মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। সমাজের অবক্ষয় চোখে পড়লেও আমরা চোখ বন্ধ করে থাকি অথবা বিপদটি নিজের নয় ভেবে নীরব থাকি। আর কেউ প্রতিবাদে মুখর হলে তাকে ভয় দেখিয়ে, অ্যাসিড ছুঁড়ে বা গণধর্ষণ করে চূপ করিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ এই ভয়ে যেকোনো অন্যায় মুখ বুজে মেনে নেয়। বিনুক সরাসরি তার বাবাকে প্রশ্ন করে,

কেন তাকে ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছিল যে ছেলে-মেয়ে সমান অথচ এখন মেয়ে হওয়ার অপরাধে তাকে অন্যায় মেনে নিতে বাধ্য হতে হবে? শৈশব থেকে স্বাধীন মতাদর্শে গড়ে তুলে তাকে পুনরায় প্রাচীন সমাজব্যবস্থার মতো মেয়েমানুষ করে রাখার এই মানসিক ব্যবধান ঝিনুক কোনো ভাবেই মানতে পারেনি। ঝিনুক কেবল একজন মানুষ হতে চেয়েছিল যার নিজস্ব ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং মানবতাটুকু আছে। ঝিনুকের এই গভীর অন্তর্দাহনটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কেবল তার ঠাকুমা মৃণালিনী দেবী। সম্ভবত সে কারণেই ঝিনুক বারবার ‘শান্তিপারাবারের’ বৃদ্ধাবাসে ছুটে আসে তার অন্তরের ভালোলাগা, মন্দলাগা, স্ফোভ ও যন্ত্রণাগুলোর উপশম খুঁজতে।

‘দহন’ উপন্যাসে তিন প্রজন্মের নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার বিবর্তন ঘটেছে তা সুচিত্রা ভট্টাচার্য সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে প্রতিটি নারী চরিত্র যেন একেকটি যুগের প্রতিনিধি। মৃণালিনী দেবী যিনি প্রবীণ প্রজন্মের প্রতীক তিনি নিজের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমাজ, পারিবারিক মূল্যবোধ ও চারপাশের বাস্তব পরিস্থিতিকে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তার চোখে আমরা একদিকে অতীতের ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রভাব দেখি অন্যদিকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আসা টানাপোড়েনেরও পরিচয় পাই। তাই ঝিনুককে তিনি প্রকৃত সত্যের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য বলেন- “আমাদের সময়ে তাদের সময়ে কতটা কি তফাত হয়েছে বুঝি না বাপু। হ্যাঁ, তোরা এখন অনেক বেশি স্বাধীন, মিলিটারিতে যাচ্ছিস, হিমালয়ে উঠচ্ছিস, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখচ্ছিস, চাকরি করচ্ছিস! তবু বুকে হাত দিয়ে বল তো, সত্যি কতটা ছাড় পেয়েছিস তোরা? এটা বুঝিস না, ছেলেরা যতটা ছাড়বে ঠিক ততটাই জমি পাবি তোরা? তার বেশি এক চুল নয়। ছেলেরা একা সংসার চালাতে পারছিল না কিংবা বলা যায়, সংসারের প্রয়োজন হল, তাই তোরা চাকরি করতে বেরোলি। বেশি দূর যেতে হবে না, তুই তোর মা মাসিদের দ্যাখ, তাদের ওপরে ঠাকুমা দিদিমাদের দ্যাখ, তা হলেই বুঝতে পারবি কিভাবে একটু একটু করে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাদের।”^{১৬} সত্তর বছর বয়সী মৃণালিনী দেবীর দৃষ্টিকোণে লেখিকা উন্মোচন করেছেন নারী জাগরণের বিবর্তন যেখানে আধুনিকতার বহিঃস্পর্শ ছুঁয়ে গেলেও সমাজে নারী-পুরুষের ব্যবধান আজও সুস্পষ্ট। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো পুরুষকে নারীর স্বাধীনতাকে দমিয়ে রাখতে প্রশ্রয় দিয়েছে বরাবর। যুগ বদলালেও পোশাক-আশাক, চলন-বলন, এমনকি কর্মজীবনেও মেয়েরা আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও তাদের মানসিক স্বাধীনতা আজও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সংসারের প্রয়োজনে নারী ঘরে-বাইরে কর্মরতা হলেও শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাটুকু পুরুষের হাতেই রয়ে গেছে। আসলে স্বাধীনতা মানে কেবল সামাজিক স্বীকৃতি নয়, মনের মুক্তির অনুভূতি যা পুরুষতন্ত্র স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে চায় না। তাই রমিতা চৌধুরীর মতো নারীরা চরম লাঞ্ছনা সত্ত্বেও পারিবারিক তথাকথিত সম্মান রক্ষার দায়ে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তারা বনেদি পরিবারের অলঙ্কাররূপে সুন্দরী পুতুলে পরিণত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এই নির্মম সত্য প্রকট যে, নারীর স্ববিরোধিতা আজও তারই বিরুদ্ধে। আধুনিকতা কেবল বহিঃস্পর্শের পরিবর্তন নয় বরং তা মনন ও মানসিকতার নবজাগরণ, আত্মোপলব্ধির নির্ভুল স্ক্রুণ, অন্যায়-শোষণ-অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বল প্রতিবাদ। যখন সমাজ নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির জীব না ভেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করবে তখনই নারী প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হবে। নারীর এই সংঘর্ষ সম্পর্কে রামী চক্রবর্তীর স্বরে বলা যায়-

“‘আমি পুরুষ’ কখনও বলতে হয় না ফলে নির্দিধায়ই সে প্রথম এবং মূল লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। কিন্তু সে অবমাননা, অনাস্থার জন্য নারীকে বারবার নিজের ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’-এর অস্তিত্বহীনতার বিরুদ্ধে লড়াতে হয়, নারীর সংগ্রাম সেই মূল্যহীনতার বিরুদ্ধেই।”^{১৯}

তথ্যসূত্র:

- ১। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, প্রথম সংস্করণ: জুলাই ১৯৯৮, ‘দহন’, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ: ২৮।
- ২। তদেব, পৃ: ২৯।
- ৩। তদেব, পৃ: ২৯।
- ৪। তদেব, পৃ: ৪৪-৪৫।
- ৫। তদেব, পৃ: ৪৯।
- ৬। তদেব, পৃ: ৪৯।
- ৭। তদেব, পৃ: ৪৭।
- ৮। তদেব, পৃ: ৫৫।
- ৯। তদেব, পৃ: ৩২।
- ১০। তদেব, পৃ: ২১।
- ১১। তদেব, পৃ: ৫৬।
- ১২। তদেব, পৃ: ৫৬।
- ১৩। তদেব, পৃ: ৫৭।
- ১৪। সেন, সুকুমার (সম্পা.), প্রথম অখন্ড সংস্করণ: ১৩৯২, ‘শরৎসাহিত্য সমগ্র’, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ: ১৯৩২।
- ১৫। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, প্রথম সংস্করণ: জুলাই ১৯৯৮, ‘দহন’, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ: ১৫১।
- ১৬। তদেব, পৃ: ১৬০।
- ১৭। তদেব, পৃ: ১৪৮।
- ১৮। তদেব, পৃ: ১৬৬।
- ১৯। চক্রবর্তী, রামী, প্রথম প্রকাশ: ২০১৩, ‘কথাসাহিত্য ও নারী পরিসর’, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১৯৬।

কোভিড-১৯ মহামারিকালে অনলাইন শিক্ষা : সমস্যা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা

সুব্রত মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: কোভিড-১৯ মহামারিকালে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা গভীর সংকটে পড়েছিল। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিকল্প শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অনলাইন শিক্ষা ও ই-লার্নিং-ভিত্তিক পাঠদান চালু হয়। এই প্রবন্ধে কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে অনলাইন ও ধারাবাহিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই মহামারিকালে অনলাইন শিক্ষায় ডিজিটাল ডিভাইস ও নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের অভাব, শিক্ষকদের অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, অনুপযুক্ত পরিবেশ ও বৈষম্যের সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দেয়। বিশেষ করে গ্রামীণ ও নিম্ন-আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা এই পরিস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ ও ভার্চুয়াল ক্লাসরুম শিক্ষাকে নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যায়। ঘরে বসে শেখার, ইন্টারেক্টিভ ক্লাসরুমের সুযোগ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর পাঠক্রমের প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ তৈরি করে। তবে, এই গবেষণায় দেখা গেছে যে অনলাইন শিক্ষার সার্বিক মান, কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা রয়ে গেছে। গবেষণা পত্রটির শেষে অনলাইন শিক্ষার মানোন্নয়ন, সহজলভ্য প্রযুক্তি উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষকদের ডিজিটাল প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে, ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষানীতির সুপারিশও করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: কোভিড-১৯ মহামারি, অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষা বৈষম্য, গ্রামীণ শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষকদের ডিজিটাল দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণ।

ভূমিকা: ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের উহান শহরে প্রথম কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। এর অল্প সময়ের মধ্যেই এটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় প্রতিটি দেশ ও অঞ্চল এই বৈশ্বিক মহামারির প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্রুত সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের নাগরিকদের সচেতন থাকতে এবং নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আহ্বান জানায়। সেই সময়ে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক পরা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং বড় ধরনের জমায়েত এড়িয়ে চলার মতো বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহামারির বিস্তার রোধ এবং সংক্রমণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে অধিকাংশ দেশ লকডাউন এবং ঘরে থাকার নীতি কার্যকর করে (Sintema E. J. 2020)।

২০২০ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ, যেমন ভারত, ভুটান, নেপাল ইত্যাদি ঘোষণা করে যে স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এবং ব্যবসায়িক সময়সূচি সীমিত করা হবে (Kuensel, 2020)।

পরবর্তীতে ২০২০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারত, ভুটানসহ অন্যান্য দেশ পূর্ণাঙ্গ লকডাউনে চলে যায় (Palden T. 2020)। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থা। ঐ বছরের ১লা আগস্টের পর থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া শুরু হয়। অফিস ও কিছু জরুরি কাজের জন্য স্কুল-কলেজ আংশিকভাবে খোলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনলাইন শিক্ষা-কার্যক্রম চালু রাখা হয়। ফলে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির বহু শিক্ষার্থী, যাদের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল, তারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই মহামারির প্রভাব ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত এবং যা শুধু সেই শিক্ষাবর্ষেই নয়, আগামীদিনের শিক্ষাব্যবস্থার উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল সরাসরি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বন্ধ করে দিয়েছিল। শিক্ষা ও মূল্যায়নের বিকল্প পদ্ধতি দ্রুত তৈরি করে তা প্রয়োগ করা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতি শিক্ষার জন্য একদিকে ছিল যেমন বিপদের, অন্যদিকে তেমন বিভিন্ন সুযোগেরও তৈরি করেছিল। ডিজিটাল শিক্ষা এবং অনলাইন লার্নিং পদ্ধতির প্রসার ঘটানোর এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছিল এই মহামারি (Dhawan S. 2020)। তবে, গবেষণায় দেখা গেছে, এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় একাধিক দুর্বলতা ছিল। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলি ছিল জ্ঞানগত ব্যবধান, অনলাইন শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষকদের এই পদ্ধতিতে সীমিত অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ এবং উচ্চশিক্ষায় ন্যায়সঙ্গত সুযোগ ও শিক্ষাগত সাফল্যের অভাব। ফলস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রেই, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল।

এই প্রবন্ধে মূলতঃ কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং অনলাইন ও ধারাবাহিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের সুযোগ ও বাধা তৈরি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এ বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে, ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে দিকনির্দেশক হিসাবে এই প্রবন্ধে একটি বিস্তারিত উপসংহারও প্রদান করা হয়েছে।

অনলাইন শিক্ষার শিক্ষাদানে ধারাবাহিক পদ্ধতি: কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ দেশেই লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষ-ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে এবং শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। উচ্চমানের শিক্ষা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে শিক্ষকগণ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অনলাইন, দূরশিক্ষা এবং ধারাবাহিক শিক্ষা এই বৈশ্বিক সংকটকালে কার্যকর বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন শিক্ষায় রূপান্তর, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা, যেখানে তাদের পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগ ছিল না। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকসমাজ ‘জরুরি অবস্থায় শিক্ষা’ (Education in Emergency) ধারণ করতে বাধ্য হয় (Bond M. 2020)।

এই সময়ে ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মসমূহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Subedi et al. 2020)। তাছাড়া সেই সময়,

নতুন এই ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়দেই মানসিক প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহায়তা প্রদান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ‘গ্রেথ মাইন্ডসেট’ সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা দ্রুত মানিয়ে নিতে সক্ষম হলেও ‘ফিক্সড মাইন্ডসেট’ সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য তা ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। অনলাইন শিক্ষার জন্য কোন একক বা কোন সার্বজনীন পদ্ধতি কিছুই নির্দিষ্ট আকারে কার্যকর ছিল না। বরং এক্ষেত্রে বিষয়ভেদে এবং বয়সভেদে পৃথক পৃথক শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় (*Doucet et al. 2020*)। বিশেষ করে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন শিক্ষা তুলনামূলকভাবে সেই সময় অধিক স্বাধীনতা ও অধিক নমনীয়তা প্রদান করেছিল (*Basilaia & Kvavadze, 2020*)।

যাইহোক, এই মহামারিকালে, বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ফলে সৃষ্ট অপ্রত্যাশিত মানসিক ও সামাজিক প্রভাবের সম্মুখীন হন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ, একাকীত্ব এবং আবেগগত অসুবিধা তৈরি হয়। যার ফলে গঠনমূলকভাবে অনলাইন শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটে। এই পরিস্থিতিতে দূরশিক্ষার মাধ্যমে গৃহশিক্ষণের কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় (*Petrie C. 2020*)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা অনলাইন শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সেইসময়, গুগল ক্লাসরুম, মাইক্রোসফট টিমস, ক্যানভাস এবং ব্ল্যাকবোর্ডের মতো ইউনিফায়েড কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম শিক্ষকগণকে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিল (*Petrie C. 2020*)। এইসব প্ল্যাটফর্মসমূহ বার্তা আদান-প্রদান, ভিডিও মিটিং, ফাইল সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট বিনিময়সহ কুইজ ও রুব্রিক-ভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধাও প্রদান করেছিল।

এছাড়াও এই সময়ে ‘ফ্লিপড ক্লাসরুম’ পদ্ধতি অনলাইন শিক্ষায় বিশেষভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে আগে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধ, রেকর্ডকৃত ভিডিও এবং ইউটিউব লিঙ্ক প্রদান করা হয় এবং শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর গভীরতর অনুধাবন নিশ্চিত করা হয় (*Doucet et al. 2020*)। সমালোচনামূলক চিন্তন, সমস্যা সমাধান ও আত্মনির্ভরশীল শিক্ষা বিকাশে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। পাশাপাশি ইলিয়াস, মুডল, বিগ-ব্লু-বাটন, স্কাইপ এবং ভিডিও কনফারেন্সিং টুলস যেমন জুম, স্ল্যাক, সিসকো এবং ওয়েবএক্স-এর ব্যবহারও বহুল বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের অন্তরায় অনলাইন শিক্ষা: নানান অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং শিক্ষা-সম্পর্কিত সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই সকল প্ল্যাটফর্ম ও সম্পদ ব্যবহারের সময় নানা ত্রুটি ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। বিভিন্ন গবেষক এ বিষয়ে যে সমস্যাগুলি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেছেন, তা সংক্ষেপে এখানে উপস্থাপন করা হল।

প্রধানতঃ ই-লার্নিং-এর ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রবেশযোগ্যতা, ব্যয়, নমনীয়তা, আজীবন শিক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষানীতি - এই বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে (*Murgatrottd S. 2020*)। বহু দেশে ডিজিটাল ডিভাইস এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের অভাব একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য অনলাইন শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তদুপরি, অনলাইন শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে অতিবাহিত করার প্রবণতা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। এই পরিস্থিতি

মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের জন্য অফলাইন শিক্ষা কার্যক্রম এবং স্বনির্ভর অনুসন্ধানমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অধিকভাবে দেখা দেয় যাতে তারা তাদের নিজেদের জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াকে আরও স্বতঃস্ফূর্ত ও বৈচিত্র্যময় করে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল যে, বহু পরিবারের উভয় অভিভাবক (পিতা ও মাতা) কর্মরত থাকায় তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় অভিভাবকীয় তত্ত্বাবধান প্রদান সম্ভব হচ্ছিল না। পাশাপাশি, অনলাইন শিক্ষার জন্য উপযোগী পরিবেশ ও অনুকূল কর্মপরিসর গড়ে তোলার অভাবও একটি বাস্তব সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। তবে, যেসব শিক্ষার্থী উৎসাহী, আত্মপ্রণোদিত এবং আত্মনির্ভরশীল ছিল, তারা তুলনামূলকভাবে এই পরিস্থিতির দ্বারা কম প্রভাবিত হয়েছিল। কারণ, এ ধরনের শিক্ষার্থীদের নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ বা দিকনির্দেশনার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এর বিপরীতে, দুর্বল শিক্ষণ দক্ষতাসম্পন্ন এবং 'ঝুঁকিপূর্ণ' (susceptible) শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীরা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল (*Mundial B. 2020*)। বিশেষ করে, অনেক নিম্ন-আয়ের পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থী অনলাইন শিক্ষার সুযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সামর্থ্য লাভ করতে পারেননি। এছাড়া, অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সরাসরি যোগাযোগের ঘাটতি এবং পাঠদানের সময় বিষয়ভিত্তিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শের অভাব শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষতঃ অভ্যন্তরীণ এবং বার্ষিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ ও আয়ত্তের ক্ষেত্রে এই সংকটের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছিল (*Sintema E. J. 2020*)।

অনলাইন শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা আয়োজন করা হলেও তা নিয়ে অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংশয় ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। সেই সময়, অনলাইন পরীক্ষার পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, শিক্ষকদের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি-সুবিধার ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়েছিল। অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি থাকায় বহু স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরীক্ষায় অনাকাঙ্ক্ষিত নকল বা তথ্যচুরির প্রবণতা প্রতিরোধের জন্য কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শুধু অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কিংবা মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (যেমন: General Certificate of Secondary Education - GCSE) বিঘ্নিতই হয়নি, বরং স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে যুক্তরাজ্যের সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী ব্যাচের A-Level পরীক্ষাও বাতিল করা হয়েছিল। পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় সম্পূর্ণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া স্থগিত কিংবা বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল (*United Nations, 2020*)।

কোভিড-১৯ মহামারি এবং দেশব্যাপী লকডাউনের কারণে সেই সময় ভারতে বহু রাজ্যস্তরীয় বোর্ড পরীক্ষা, নিয়োগ পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সেমিস্টার ও বার্ষিক পরীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। একই সঙ্গে BITSAT 2020, NATA 2020, CLAT 2020, MAT 2020, ATMA 2020 সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন কিংবা পুনঃনির্ধারণ করাও হয়েছিল। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি দেশের স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছিল। একইসঙ্গে, এই বিঘ্নিত পরিস্থিতি কিছু শিক্ষার্থীর পেশাগত জীবনে সহায়ক ভূমিকা রাখার সম্ভাবনাও তৈরি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, নরওয়েতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ১০ম শ্রেণি সমাপ্তকারী সকল শিক্ষার্থীকে সরাসরি উচ্চমাধ্যমিক ডিপ্লোমা প্রদান করা হবে।

Maurin এবং *McNally (2008)*-এর বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, ১৯৬৮ সালের ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের সময় প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি বাতিল করা হয়েছিল, যার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রজন্মের কর্মজীবনে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তবে, বিদ্যালয়কাল শুধুমাত্র শিশুদের জন্য আনন্দময় অভিজ্ঞতাই নয়, বরং সামাজিক দক্ষতা অর্জন, পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (*Catalano et al. 2004*)। বিদ্যালয়ের বাইরে দীর্ঘ সময় অবস্থানের ফলে শিশুদের জীবনে সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী যখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাঠগ্রহণ করে এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে, তখন অনলাইন শোষণের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। *Vejmelka et al. (2022)*-এর গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনিয়ন্ত্রিত ও অতিরিক্ত অনলাইনে সময় অতিবাহিত করার ফলে শিশু ও কিশোররা সহিংস, অনুপযুক্ত এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের সংস্পর্শে আসার আশঙ্কায় থাকে এবং সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়ার প্রবণতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

সেই সময় বিদ্যালয় বন্ধ এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার কারণে অধিকাংশ পরিবার শিশুদের বিনোদন, শিক্ষা এবং বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যমের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। তবে, সকল শিশুর পক্ষেই অনলাইনে নিরাপদ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, জ্ঞান কিংবা প্রযুক্তিগত দক্ষতা সহজলভ্য ছিল না। কোভিড-১৯ মহামারিকালে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় যে, বহু দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ক্ষুদ্র গ্রামীণ অঞ্চলের বাসিন্দা এবং যাদের অভিভাবকেরা মূলতঃ অশিক্ষিত কৃষক। এই সকল শিক্ষার্থীরা শুধু পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পরিবারের গৃহস্থালি কাজ, কৃষিকাজ এবং গবাদিপশুর দেখভালের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের ভোরবেলা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার কারণে পরীক্ষার সময় দুপুরে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিবেচনা করতে হয়েছে। এছাড়া, কিছু শিক্ষার্থী জানিয়েছিল যে, অসুস্থ বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও তাদের কাঁধে বর্তেছিল। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে তাল মেলানো এবং নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে অংশ নেওয়া তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছিল।

নিম্ন-আয়ের পরিবারের অভিভাবকদের একাংশ মনে করতেন, এই সংকটকালে সন্তানদের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে পুনরায় ভর্তি করানোই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বাড়িতে টেলিভিশন, স্মার্টফোন কিংবা উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের অভাব ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও অফিসপত্র বন্ধ থাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষের আয় একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়া। ফলে এই পরিস্থিতি দেশের গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-অবকাঠামোর উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ডেটা প্যাকেজের মূল্য, গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের গড় আয়ের তুলনায়, যথেষ্ট ব্যয়বহুল ছিল এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ বজায় রাখা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ও আর্থিকভাবে চাপের বিষয়। অধিকাংশ অভিভাবক সরাসরি অনলাইন ভিডিও পাঠদানের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন, তবে নিম্ন-আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছিল যে, এই ধরনের অনলাইন ভিডিও

ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ডেটা প্যাকেজের প্রয়োজন হয়, যা তাদের পক্ষে বহন করা সেইসময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় (*Chisadza et al. 2021*)।

অন্যদিকে, কোভিড-১৯ মহামারির সেই অনিশ্চিত সময়ে শিক্ষকসমাজও এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখে পড়েছিলেন। কার মত গ্রহণ করা হবে এবং কোন পদ্ধতিতে পাঠদান পরিচালিত হবে — এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল বিশেষভাবে জটিল। অনেকের মতে, পূর্বে রেকর্ড করা ভিডিও-পাঠ শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী হতে পারত, তবে এতে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সরাসরি যোগাযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। সকল শিক্ষার্থীর জন্য সুবিধাজনক এবং তাদের পাঠ্যচাহিদা পূরণে সক্ষম এমন একটি কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সেই সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষণ ও শিক্ষাদানের ইতিবাচক দিকসমূহ: যদিও কোভিড-১৯ মহামারি কালে ই-লার্নিং ব্যবস্থার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, যাদের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না বা যারা দূরদৃষ্টি নিয়ে এগোতে পারেননি, তাদের জন্যও একাধিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়েছিল। তবু শিক্ষাবিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশের সরকার অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার এই ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে এই পরিস্থিতি পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করেছিল (*Sari & Ilyas, 2021*)। যেসব অভিভাবক ঘরে বসেই সন্তানদের পড়াশোনা পরিচালনা করতেন, তাদের সন্তানদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হত। বিশেষত এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে, যেসব শিশু, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছিল, তাদের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা ও বিশেষ নজরেরও প্রয়োজন হয়েছিল।

সেই সময় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো শিক্ষা ও শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গ্রুপ চ্যাট অ্যাপ যেমন টেলিগ্রাম, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, উইচ্যাট, ভার্চুয়াল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, গুগল ক্লাসরুম, জুম এবং অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ব্যাপকভাবে চেষ্টা এবং পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়। এমনকি সরাসরি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পুনরায় শুরু হওয়ার পরও এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর আরও উন্নয়ন ও ব্যবহারিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয় যাতে এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষা-সম্পদ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ভবিষ্যতে আরো ভালোভাবে তৈরি হতে পারে।

অনলাইন শিক্ষার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য মৌলিক ও সৃজনশীল ধারণা উপস্থাপন করার দায়িত্ব ছিল শিক্ষকদের ওপর। অনলাইন শিক্ষাদানের কৌশলকে আরও কার্যকর ও মানসম্মত করতে শিক্ষকরা স্থানীয় পর্যায়ে পরস্পরের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে কাজ করছিলেন। সেই সময় শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা সবাই একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ায়, পারস্পরিক সহযোগিতা, উদ্ভাবনী সমস্যা সমাধান এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার জন্য এই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম এক অনন্য সুযোগ তৈরি করেছিল (*Doucet et al. 2020*)। একটি আরও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা ও উৎসাহিত করতে, বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের নানা ধরনের সফটওয়্যার, টুলস ও শিক্ষাসামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করেছিল। ঐতিহ্যবাহী শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার বাইরে অনলাইন শিক্ষা এক নতুন ধারার শিক্ষাদান ও শেখার সুযোগ করে দিয়েছিল, যা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।

অনলাইন শিক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাগত ঘাটতি: জাতিসংঘের (২০২০) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ২০০টি দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের প্রায় ১.৭২৫ বিলিয়ন শিশু, কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থী মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা বৈশ্বিক শিক্ষার্থীর ৯৮.৬%। এই পরিস্থিতিতে ঘরভিত্তিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা সহজলভ্য ও কার্যকর করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। তবে অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে সরাসরি শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার জন্য গৃহীত পদ্ধতি এবং পাঠদানের রীতি একইভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিলনা। যদিও অনলাইন এবং দূরশিক্ষণের জন্য কিছু শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছিল, তথাপি অনেক শিক্ষক, সেই সংকট মুহুর্তে, প্রযুক্তিগত দক্ষতার স্বল্পতা, যথাযথ পেশাগত প্রশিক্ষণ, এবং উন্নয়নমূলক কর্মশালার অভাবে তাদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠদানে মনোনিবেশ করতে পারেননি।

অনলাইন শিক্ষায় সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়া এবং বাস্তবধর্মী মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক মূল্যায়ন এবং ত্বরিত প্রতিক্রিয়া প্রদান শিক্ষাগত দিক থেকে অত্যাবশ্যকীয় ছিল (*Doucet et al. 2020*)। তবে এই কাজটি শিক্ষক এবং শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সহজ ছিল না। কারণ শ্রেণির আকার বড় হওয়া, পর্যাপ্ত পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাব, দুর্বল অনলাইন পরিকাঠামো এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনীহা — এসব সমস্যা ভারত ও এশীয় দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছিল। এ ছাড়া, বর্তমান গবেষণাগুলিতে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সমস্যা, ছাত্রছাত্রীদের ওপর অনলাইন শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও মানসিক প্রভাব এবং শিক্ষকদের প্রযুক্তি-দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পরিপূর্ণ ও ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত ও গভীর অনুসন্ধান জরুরি।

শিক্ষাবৃত্তে ‘Mason before Bloom’ কথাটি সেই সময় প্রায়ই ব্যবহার করা হত। এর অর্থ — অনলাইন শিক্ষাদান শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের প্রাথমিক ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। মহামারির এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে অনলাইন শিক্ষা চালিয়ে নেওয়ার জন্য এটিই ছিল মূল লক্ষ্য। এছাড়া, অনেক গৃহস্থালির ভেতরেই অপরাধমূলক মানসিকতার উপস্থিতি এবং প্রতিবেশী মহলে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে, সেই সময় গার্হস্থ্য হিংসা ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল, যা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল এবং তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে মানসিক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (*Ravichandran & Shah, 2020*)।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ঘরে বসে শিক্ষাগ্রহণ (home-schooling) শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। তবে, সব পরিবারের জীবনযাত্রার মান কিংবা সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমান ছিল না। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উপর মহামারির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল (*Dimopoulos et al. 2021*)। এই প্রেক্ষিতে, অতি দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া বা ড্রপ-আউটের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে বিস্তৃত গবেষণা ছিল অত্যন্ত জরুরি। অনেক দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের দীর্ঘ সময়ের কারণে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার বা বিদ্যালয় ত্যাগ করার ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই পরিস্থিতিতে ড্রপ-আউটের হার নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। তাই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করলে বাস্তবচিত্র যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে, মহামারির

সময় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তুলেছিল, যা পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করা যেত (*Kang B. 2021*)। তবে, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর কাছে সেই অনলাইন সুবিধা সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং তা সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তোলা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (যেমন দৃষ্টিহীন, শ্রবণ প্রতিবন্ধী কিংবা চলাচলে অক্ষম) জন্য পাঠদানের পাশাপাশি অতিরিক্ত সহায়তা ও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন ছিল। এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনেকের পরিবারের সদস্য বা অভিভাবকেরা তাদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট সক্ষমও ছিলেন না। ফলে, এই শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি (Special Educational Needs – SEN), সহায়তা এবং শ্রেষ্ঠ বিকল্পসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট সময় ও সম্পদ বরাদ্দ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বসে অ্যাসাইনমেন্ট এবং পরীক্ষা সম্পন্ন করার ফলে তাদের প্রকৃত শেখা ও কাজের স্বতঃসিদ্ধতা নির্ধারণ করা শিক্ষকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, অনেক অভিভাবক সন্তানদের পরীক্ষামূলক মূল্যায়নে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন, যদিও এই সহায়তার মাত্রা ও পরিমাণ পরিবারভেদে ভিন্ন ছিল। যেহেতু মানসম্মত এবং যথোপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি, সেজন্য শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও গ্রেড নির্ধারণও একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারত।

উপসংহার: কোভিড-১৯ মহামারির শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব নিয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার পরও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচ্চ-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের জন্য উপযুক্ত পাঠদানের পদ্ধতি ও উপযোগী প্ল্যাটফর্ম নির্ধারণের জন্য আরও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন ছিল। বহু দরিদ্র দেশেই ইন্টারনেট সংযোগের সীমাবদ্ধতা এবং ডেটা ব্যবহারের খরচ অধিকতর মানুষের সাধের বাইরে ছিল। ফলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ও সামর্থ্য উভয়ই যথোপযুক্ত আকারে বিস্তার লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এই সমস্যার সমাধানে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে হস্তক্ষেপ অপরিহার্য ছিল। পাশাপাশি, অনলাইন পাঠদানের জন্য কার্যকর ও ফলপ্রসূ পঠন-পাঠনের কৌশল নির্ধারণ এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদান ও বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরির ক্ষেত্রেও গবেষণা চালানো একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এই বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেই ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা আরও কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সবার জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। সেইসময় একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল – ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে তোলা। এই সমস্যার সমাধানে শিক্ষামূলক উপকরণ প্রস্তুতকারকদের উচিত ছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী ও কার্যকর প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা। পাশাপাশি, নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও উপযুক্ত যথাযথ হস্তক্ষেপ ছিল অপরিহার্য। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায়, উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) এবং ফলপ্রসূ পাঠদানের কৌশল বিষয়ে, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আরও বেশি বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। গবেষণা ও উন্নয়নের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো কীভাবে সহজবোধ্য ও ব্যবহারবান্ধব অনলাইন শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদানকে আরও সৃজনশীল, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক

(interactive) করে তোলা যায়। এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতের অজানা ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রস্তুত রাখতে সহায়ক হবে।

কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। অনুধাবন করতে বাধ্য করেছে যে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। মহামারি-পরবর্তী সময়ে যখন নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুরু হয়, তখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এসব অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সম্ভাবহারে উৎসাহিত করা উচিত, যাতে শিক্ষাকে আরও কার্যকর ও গুণগত মানসম্পন্ন করা যায়।

সূত্র নির্দেশ:

১। এটি একটি মূল্যায়ন সরঞ্জাম যা একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য কী কী মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে এবং প্রতিটি মানদণ্ডের জন্য কার্যক্ষমতার বিভিন্ন স্তর (যেমন, খুব ভালো, ভালো, গড়, দুর্বল) চিহ্নিত করে।

তথ্যসূত্র:

- Basilaia G. & Kvavadze D. (2020): “Transition to Online Education in Schools during a SARS-Cov-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia”, *Pedagogical Research*, 5(4), 10.
- Bond M. (2020): “Schools and Emergency Remote Education during the COVID-19 Pandemic: A Living Rapid Systematic Review”, *Asian Journal of Distance Education*, 15(2), PP-191-247.
- Catalano R. F, Haggerty K. P, Oesterle S, Fleming C. B, & Hawkins J. D (2004): “The Importance of Bonding to School for Healthy Development: Findings from the Social Development Research Group”, *Journal of School Health*, 74, 252-261
- Chisadza C, Clance M, Mthembu T, Nicholls N. & Yitbarek E. (2021): “Online and Face-to-Face Learning: Evidence from Students’ Performance During the COVID-19 Pandemic”, *African Development Review*, 33, S114-S125.
- Dhawan S. (2020): “Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crises”, *Journal of Educational Technology*, 49(1), PP-5-22.
- Dimopoulos K, Koutsampelas C. & Tsatsaroni A. (2021): “Home Schooling through Online Teaching in the Era of COVID-19: Exploring the Role of Home-Related Factors that Deepen Educational Inequalities across European Societies”, *European Educational Research Journal*, 20(4), 479-497.
- Doucet A, Netolicky D, Timmers K. & Tuscano F. J. (2020): “Thinking About Pedagogy in an Unfolding Pandemic”, *An Independent Report*

on Approaches to Distance Learning during COVID-19 School Closure, Work of Education International and UNESCO.

- Kang B. (2021): “How the COVID-19 Pandemic is Reshaping the Education Service”, *The Future of Service Post-COVID-19 Pandemic, Volume 1: Rapid Adoption of Digital Service Technology*, 15-36.
- Kuensel (2020): “First Confirmed Coronavirus Case in Bhutan”.
- Maurin E. & McNally S. (2008): “Vive La Révolution! Long-Term Educational Returns of 1968 to the Angry Students”, *Journal of Labor Economics*, 26(1).
- Mundial B. (2020): Guidance Note on Education Systems Response to COVID-19. March-2020, PP-6.
- Murgatroid S. (2020): “COVID-19 and Online learning, Alberta, Canada”, *Journal of Educational Technology*, 9.3, PP-25-32.
- Palden T. (2020): “Women Test COVID-19 Positive after Five Tests Locking Down Entire Country”, *Kuensel*, PP-1-2.
- Petrie C. (2020): “Spotlight: Quality education for All during COVID-19 Crisis”, *Hundred Research Report# 01, United Nations*.
- Ravichandran P. & Shah A. K. (2020): “Shadow Pandemic: Domestic Violence and Child Abuse during the COVID-19 Lockdown in India”, *International Journal of Research in Medical Sciences*, 08(08), 3118.
- Sari I. P. & Iiyas A. (2021): “Collaboration between Parents and Teachers in Overcoming the Difficulties of Students in Learning Online during the Covid-19 Period”, *Current Issues in Counseling*, 1(1), PP-1-7.
- Sintema E. J. (2020): “Effect of COVID-19 on the Performance of Grade 12 Students: Implications for STEM Education”, *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 16(7).
- Subedi S, Nayaju S, Subedi S, Shah S. K. & Shah J. M. (2020): “Impact of E-Learning during COVID-19 Pandemic Among Nursing Students and Teachers of Nepal”, *International Journal of Science and Healthcare Research*, 5(3), 9.
- United Nations (2020): *Policy Brief: Education during COVID-19 and Beyond*. United Nations.
- Vejmelka L, Matkovic R, & Rajter M. (2022): “Cyberbullying in COVID-19 Pandemic Decreases? Research of Internet Habits of Croatian Adolescents”, *Information*, 13 (12), 586.

নারী মুক্তির কথাকার কৈলাসবাসিনী দেবী : বিস্মৃতির অন্তর্জালে

প্রত্যাষা দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ: কৈলাসবাসিনী দেবী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। তিনি সেই সময়ের একজন নারী হয়েও শুধুমাত্র নারী জীবনের অবহেলার কারণগুলোই চিহ্নিত করেননি বরং এ বিষয়ে অকুণ্ঠিত চিন্তে কলম ধরেছেন। স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের সহায়তায় লেখাপড়া শিখে তিনি নিজের চেষ্টায় চারটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর “হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা” এবং “হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি” প্রবন্ধদ্বয়ে তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতায় ব্যাখ্যা করেছেন নারীর দুর্গতির মূল কারণ শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি নারীর অবনতির কারণগুলো নিয়ে শুধু গভীরভাবে উদ্বেগ হয়েছিলেন তা-ই নয় পাশাপাশি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অসহায়ত্বকে চিহ্নিত করে কুসংস্কারে নিমজ্জিত সমাজের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। অথচ একবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় যখন শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত জগৎ গড়ে তুলতে অধিকতর সক্ষম হয়েছে তখন প্রায়শই দেখা যায় যারা প্রথম এই পথকে প্রশস্ত করেছেন তাঁদের ভুলে যাওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। কৈলাসবাসিনী দেবী- এমনই এক বিস্মৃতপ্রায় কণ্ঠস্বর, যিনি নারীর পরাধীনতার দিনগুলিতে নারীর আত্ম-মুক্তির কথা বলেছিলেন সোচ্চারে। তাই এই আলোচনায়, আমি তাঁর দুটি নারীকেন্দ্রিক প্রবন্ধের আলোকে নারী সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: নারী প্রগতির অগ্রদূত, নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, প্রতিবাদ, নারী অধিকার।

মূল আলোচনা: বিস্মৃতির আলেখ্যই আমাদের ইতিহাস। তাই আমরা ভুলে থাকতে পারি কোন মহামানবীর মহৎ চিন্তাধারা থেকে শুরু হয়েছিল আজকের নারী স্বাধীনতার চিরন্তন ইতিবৃত্ত। আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর বাধা-বন্ধনহীন, সর্ব অধিকার প্রাপ্তিতে অগ্রসর নারী স্বাধীনতার এক বিস্তৃত দুনিয়া কোন একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এই কাঠামো তৈরির পিছনে ছিলেন কৃষ্ণকামিনী দাসী থেকে কৈলাসবাসিনী দেবীরা, যাদের মুক্তচিন্তাস্বিত লেখনীর ছায়াপথ ধরে বাঁচতে শিখেছিল পশুবৎ নারীসমাজ, বুঝতে শিখেছিল যন্ত্রণার অন্তরালে থাকা আলোকময় জীবনের অস্তিত্বের সংজ্ঞাকে। তাই আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট বকুল যেমন মা এবং মাতামহীদের যন্ত্রণার্ত সংগ্রামী দিনলিপিকে বিস্মৃতির আড়াল থেকে উন্মোচিত করে স্মরণ করেছে, যেভাবে সে বলেছে— “মা, মাগো! তোমার পুড়ে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া লেখা, না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।”^১ আমিও আমার এই আলোচনার দ্বারা সেভাবেই আলোকিত করতে চাই নারীর মুক্তচিন্তার অন্যতম পথপ্রদর্শক কিন্তু কালের নিয়মে বিস্মৃতপ্রায় কৈলাসবাসিনী দেবীকে।

একসময়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজ তার নিষেধাজ্ঞার বেড়া জাল দিয়ে কণ্ঠরোধ করতে বসেছিল প্রধানত নারীসমাজের। তাই ঘোমটা ধারণ থেকে বসন-বাসন,

খাওয়া-দাওয়া থেকে শিক্ষা সমস্ত ক্ষেত্রেই কুসংস্কারের ক্রমঘূর্ণায়মান পরিণতি নারীসমাজকে বাধ্য করেছিল ‘কলুর বলদের মত’ চোখ বুজে সমাজের দ্বারা পরিচালিত এক যান্ত্রিক জড় পদার্থে পরিণত হতে। কিন্তু প্রত্যেক অত্যাচারেরই অবসান হয়, সমস্ত অহেতুক নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ হয় বলেই সত্যবতীর বলে ওঠে— “মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে!”^৭ আর এই উপন্যাসের সত্যবতীর মতই অন্ধকার হীনতার বশীকরণ থেকে সমাজকে ও ভীতু নারীদের টেনে প্রকাশ্যে বের করে আনার জন্য জন্ম নেন কৈলাসবাসিনী দেবীরা। কিন্তু চিরাচরিত কুসংস্কৃতির অহেতুক দাপট যেমন সংসারে মেয়েদের মুখ বন্ধ করে রাখে তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও তাদের চলার পথকে করে তোলে কন্টকিত। আর এই কারণেই চন্দ্রাবতীর রামায়ণ থেকে শুরু করে কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনা সবই কালের অতলান্তে তলিয়ে যাওয়া গ্রন্থমালাতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় কী অপূর্ব জ্ঞানরত্ন ও মুক্তচিন্তার আলেখ্য লুকিয়ে আছে এইসমস্ত অনালোচিত নারীদের লেখায়।

কৈলাসবাসিনী দেবী বাংলা সাহিত্যের এক বিস্মৃতপ্রায় নারী লেখক, যিনি তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে নারীর আত্মমুক্তির বহুবিচিত্র প্রয়াস নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। কৈলাসবাসিনী দেবী সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানার অবকাশ আমাদের ইতিহাস বা সাহিত্য কোথাও নেই, যতটুকু তাঁর সম্পর্কে জানা যায় তা তাঁরই গ্রন্থের ভূমিকাংশ থেকে। তাঁর রচিত ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’-এর ‘নিবেদন’ অংশ থেকে জানা যায় ১৭৭১ শকে বারো বছর বয়সে বিবাহের পর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তর হাত ধরে তাঁর প্রথম বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী তাঁর জন্মের বছর ধরা যায় ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে, এবং বিবাহের বছর ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর রচনা থেকেই জানা যায় সাধারণ হিন্দু গৃহস্থ পরিবারের কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করায় নারীশিক্ষার উচ্চাভিলাষ তার মধ্যে কোনকালেই ছিলনা— “আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালায়ে একটা বর্ণণ্ড শিক্ষা করি নাই, এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না। ... কিন্তু আমি এক প্রকার বিদ্যাবিরোধিনী ছিলাম;”^৮ তবে এই বিদ্যাবিরোধ কৈলাসবাসিনীকে যিনি বিদ্যাশিক্ষার প্রচলিত পথে উৎসাহী করে তুলেছিলেন তিনি তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত। প্রচলিত কুসংস্কারের নেতিবাচক আবহাওয়া থেকে কৈলাসবাসিনীকে তুলে এনে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার পালে হাওয়া লাগিয়ে জীবনতরী বাইতে শিখিয়েছিলেন দুর্গাচরণ। তাঁর এই আধুনিক ও অগ্রগণ্য মানসিকতার পিছনে ছিল তাঁর পেশাগত ও শিক্ষাগত ইতিবাচকতার পরিসর। দুর্গাচরণ নিজে ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র, ফলে তাঁর মেলামেশার পরিসর ছিল শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্ম সমাজের ব্যক্তিত্বরা। তাঁর অগ্রবর্তী মানসিকতার পরিচয় মেলে গোলাম মুর্শিদের কথায়— “তিনি কেবল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হননি, রীতিমতো উদ্যোগী পুরুষের মতো সেই লেখাপড়াকে অন্য আর পাঁচজনের মতো পারিবারিক ও বৈষয়িক কাজে ব্যবহার করেছিলেন।”^৯ তিনি ‘গুপ্ত ব্রাদার্স’ নামে একটি বইয়ের দোকান খোলেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর প্রকাশনা সংস্থার দ্বারা অভিধান প্রকাশের কাজ করার মধ্য দিয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষাশিক্ষার জগৎকে ত্বরান্বিত করেন। এর পাশাপাশি শিশুশিক্ষার জন্য তিনি দ্বিভাষিক সচিত্র শিশুবোধ এবং গুপ্তপ্রেস বর্ণমালা ও নারী অগ্রগতির কথা স্মরণ করে নারীকেন্দ্রিক বেশ কিছু বই প্রকাশ করেন— “গুপ্ত প্রশ্ন পঞ্জিকায় এ ধরনের বেশ কিছু বই-এর বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কন্যাবিক্রয় নাটক, কন্যাপণ বিনাশিকা, নারীচরিত, বাল্যোদ্ধার নাটক, বাল্যবিবাহ নাটক, বিধবা বিলাপ, বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা, বিধবা বিবাহের নূতন

প্রকার উত্তর, বিধবা বঙ্গাঙ্গনা, বালিকা বান্ধব, স্ত্রী গণের বিদ্যাশিক্ষা, স্ত্রী নীতিশিক্ষা, স্ত্রীধর্ম বিধায়ক-এর নাম বিষয়ভাবে উল্লেখযোগ্য।^{১৭} এই ধরনের গ্রন্থতালিকা অনায়াসেই দুর্গাচরণের নারী প্রগতির চিন্তা-ভাবনাকে দৃষ্টিগোচর করে তোলে। এই নারী প্রগতিতে ভাবিত দুর্গাচরণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায় এও অনুধাবন করেছিল যে দাম্পত্য সম্পর্ককে সুখময় করে তুলতে হলে নারী-পুরুষকে শিক্ষার অঙ্গনে সমান হতে হবে, তবেই মনের মিল সম্ভব। আর সেই কারণেই কৈলাসবাসিনীর যাবতীয় ভয়কে তুচ্ছ করে তিনি তাঁকে পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে অগ্রণী হয়ে ওঠেন। কৈলাসবাসিনী দেবীর কথায় জানা যায়— “আমি কোন মতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম না, কিন্তু তিনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন। পরে আমি অগত্যা তাহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি বচনাতিত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।”^{১৮}

তবে এই প্রগতিশীল সমাজসচেতন দুর্গাচরণের একান্ত আগ্রহে প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগ্রহণে অনাগ্রহী কৈলাসবাসিনী শুধুমাত্র শিক্ষিতই হলেন না, সেইসঙ্গে হলেন সমাজচিন্তক এবং একজন সার্থক নারী লেখক, যিনি প্রথম মহিলা হিসাবে তাঁর লেখাকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশের ক্ষমতাও প্রদর্শন করলেন। স্বামী দুর্গাচরণের পাশাপাশি কৈলাসবাসিনীর একাগ্রতা ও পাণ্ডিত্য না থাকলে তা কোনভাবেই সম্ভব হতনা। অসীম জ্ঞান এবং সাহসিকতায় ভর করে তিনি একের পর এক লিখে গেছেন— ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’ (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ), ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’ (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ), ‘বিশ্বশোভা’ (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ), ‘সভতা ও কুসংস্কার’ (১২৭৫ বঙ্গাব্দ) এর মত রচনা। সাংসারিক ঘেরাটোপে আবদ্ধ এক সামান্য গৃহবধূ হয়েও তিনি নারীমুক্তিকেন্দ্রিক মুক্ত চিন্তার পরিসরকে উন্মুক্ত করেছেন তাঁর প্রথম দুটি প্রবন্ধে। তিনি নারীকুলের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ হীনাবস্থার কারণ অনুসন্ধানার্থে এক গভীর চিন্তনলোকে অবগহন করে নারীজন্মের ইতিহাস থেকে তার বড় হয়ে ওঠার ক্রমপর্যায়ে তার দুরবস্থাকে চিহ্নিত করতে অগ্রবর্তী হয়েছেন। নারী মনের অন্তরালে প্রবেশ করে তাদের সুখ-দুঃখের কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা নারীর ‘আঁতের কথা’ বের করে আনার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’ রচনায় কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর লেখনী ধারণের অগ্রবর্তী অনুপ্রেরণাকারী বামাসুন্দরী দেবীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাইশটি ভিন্ন নামধারী পরিচ্ছেদের মাধ্যমে নারীজীবনের সূচনালগ্ন থেকে অন্তিমপর্ব পর্যন্ত নানা সমস্যার দ্বারোদ্ঘাটন করে দিনের পর দিন নারীর সঙ্গে হয়ে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তার কারণ অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি সমস্যার মূলকে খুঁজতে চেয়েছেন একদম নারী জন্মের প্রাথমিককাল থেকে নানা আচার-বিচারে পুরুষের সঙ্গে অসামঞ্জস্যের দিকটি চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে। জন্ম-বিবাহ এবং মৃত্যু— মনুষ্য জীবনের এই ত্রিকালিক পর্যায়ক্রমে নারী যেভাবে প্রতি মুহূর্তে অবমাননা ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের দ্বারা সমাজের নেতিবাচক বাস্তবের চিত্রটি উপস্থাপিত করেছেন কৈলাসবাসিনী। নিজে নারী হয়ে জন্মানোর সুবাদে নারী-পুরুষের অভূতপূর্ব সামাজিক বৈষম্য দেখার দুর্ভাগ্য তাঁর জীবনে স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল, তাই তিনি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ভূমিষ্ঠা কন্যার চিরসঙ্গী রোদন এবং দুর্ভাগ্য। তাই পুত্র জন্মালে যে জাঁকযমক হয় তার ছিটে ফোঁটাও কন্যা জন্মালে দেখার সৌভাগ্য হয়না। কন্যা সন্তান জন্মানোর পরে সন্তান জন্মের আনন্দ পরিণত হয় বিষাদে, সেখানে বাদ্য, বাজনা বা মঙ্গলাচরণের জায়গায় পরিবারকে গ্রাস করে দুঃখের করাল ছায়া,



তাই গভীর আক্ষেপের সঙ্গে এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজকে উদ্দেশ্য করে কৈলাসবাসিনী বলেছেন— “হা বিধাতঃ! আমরা কি এতই নিকৃষ্ট যে আমাদের জন্ম মৃত্যু উভয় কালই সমান হইবে?... হে সর্ব্ব জন হিতৈষী মহোদয়গণ! তোমরা সকলে যত্নবান হইয়া এই দুঃসহ অত্যাচারকে সমূলে নিমূল কর।”^৭

কৈলাসবাসিনী উন্মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন নারী জীবনের যে বিষাদঘনতা জন্ম থেকেই শুরু হয় তা চলতে থাকে আমৃত্যু। সেই কারণেই নারীর বেড়ে ওঠা যতটা না তার নিজের কথা ভেবে, তার থেকেও অনেক বেশি সমাজ-পরিবার এবং পরিজনের হিতচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। একজন নারীকে ছোটবেলা থেকে বিদ্যাশিক্ষার মুক্ত অঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়না শুধুমাত্র তার উপার্জনের অক্ষমতার কথা ভেবে। পরিবর্তে তাকে শেখানো হয় অন্ধ সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন ‘তুষতুষালী’, ‘নখছুট’, ‘শীলশীলেটম’, ‘অমাবস্যা’র মত কিছু ব্রতকথা, যার দ্বারা তাদের চিন্তার বিকাশের কোন সুযোগ নেই। প্রাবন্ধিক সেইসময়ের একজন সাধারণ নারী হয়েও অনুভব করেছিলেন জ্ঞানের বিকাশের দ্বারাই মনের বিকাশ সম্ভব, তাই তো অর্থ উপার্জনের হেতুকে দূরে সরিয়ে নারীর আত্মমুক্তির কথা চিন্তা করে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন— “হা মাতঃ বঙ্গভূমি! কতদিনে তোমার এই দুঃখিনী কন্যাগণ বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইবে, কতদিনে এই দীন ভাবের অভাব হইয়া তাহাদিগের জ্ঞান ভাবের আবির্ভাব হইবে, এবং সেই জ্ঞান প্রভায় তোমাকে প্রভাবিত করিবে।”^৮ যেভাবে একজন গৃহস্থ নারী আক্ষেপের সুরে বলে ওঠে— “... যখন স্ত্রীলোক বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধুলা ও নাটরঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায় ও লেখা পড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।”^৯ (স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক)— এই জ্ঞানহীনতার আক্ষেপ যে কোন এক নারীর নয়, তা যে সমাজের সমস্ত নারীর মিলিত আবেদন, সেই বিষয়টিকেই গ্রন্থাকারে আলোকপাত করে কৈলাসবাসিনী বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই অজ্ঞানতার তমসাই যে হিন্দু মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক হীনতার কারণ তা নির্দেশ করেই প্রাবন্ধিক তাদের কার্যাবলীর বিবরণ দিয়ে তাদের পশ্চাদপদ মানসিকতার পরিচয় উপস্থাপন করতেও কুণ্ঠিত হননি। তাই নব বধুর প্রতি ননদ, ভাণ্ডার পত্নী, দেবর পত্নীর হীন আচরণের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন— “ইহারা স্বভাবতই বিদ্রোহপরায়ণা হইয়া পরস্পরের প্রতি কুব্যবহার করিয়া থাকে, এবং একের অভ্যুদয়ে অন্য অতিশয় অনুতাপিত হয়, ও উভয়ে স্ব স্ব প্রাধান্য সাধনের নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা পায়, কিন্তু সেই প্রধানতা যে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন সদুপায় চিন্তা করেনা, এই নিমিত্ত তাহাদিগের কিছু মাত্র ঐক্য হয় না।”^{১০} তাদের এই মানসিক বিকাশের অনগ্রসরতাই যে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য প্রণয়কে বিকশিত হতে দেয় না, তাদের দাম্পত্যের সমানাধিকারের পথে বাধা দেয় সেই বিষয়টিকেও গভীর মনস্তত্ত্বের দ্বারা পর্যালোচনা করতে প্রাবন্ধিক ভোলেন নি। নারীর এই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীকরণে সমাজের প্রতি মুহূর্তে অহেতুক যুক্তির অবতারণাকেও তিনি সমালোচনা করেছেন। শিক্ষা মানেই যে স্বাধীনতার অপব্যবহার বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে তিনি বলেছেন— “বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে তৎ সংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে?... বঙ্গাঙ্গনাগণ ত অঙ্গ নাতিক্রম করিলেই কুলভ্রষ্ট হয়, তবে কি প্রকারে তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে?”^{১১} সমাজের যুক্তি অনুযায়ী শিক্ষিত হলেই যে মেয়েরা ইউরোপীয় মেমের মত আচরণ করবে না বরং বিদ্যার বিভায় নিজেদের আলোকোজ্জ্বল শোভা

বর্ধন করবে তাও কৈলাসবাসিনী স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আসলে তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা তো এই সমাজব্যবস্থায় নেই-ই, উপরন্তু আছে ‘বিদ্যা শিখিলে বিধবা হইবে’- এর মত অন্ধ কুসংস্কার, ‘ইহারা বিদ্যা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আর সাংসারিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেনা’-এর মত ভ্রান্ত ধারণা, ‘বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে’-এর মত অনাবশ্যক চিন্তাভাবনা ও মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রবর্তী করতে চাওয়া মানুষদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও সমালোচনার ঝড়। কৈলাসবাসিনীর মত সমাজ সচেতন মানুষের পক্ষে এহেন সংকীর্ণতা বরদাস্ত হয়নি বলেই তিনি তা মুখ বুজে সহ্য না করে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন।

প্রাথমিক জানিয়েছেন নারীদের হীনাবস্থার একটা অন্যতম কারণ যেমন অজ্ঞানতা, তেমনি সেই সঙ্গে দায়ী কৌলিন্যপ্রথা ও বাল্যবিবাহ। কুলের দোহাই দিয়ে অপাত্রে কন্যাদান বা অর্থের জন্য কন্যাকে যে কোন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার মত নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য সমাজমানসিকতাকে কৈলাসবাসিনী সমালোচনা করেছেন। একজন কুলীন পুরুষের নিজের ইচ্ছা মত দুই বা ততোধিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নারীর স্বপ্নের সংসারযাত্রাকে ভঙ্গ করে দেওয়ার প্রবণতার দ্বারা পৌরুষের যে ভয়ঙ্কর অবমাননা হয় তাকেও প্রশ্ন করেছেন। এই ধরনের পুরুষদের বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধাম্বিত হননি— “আহা! কি ঘৃণিত কার্য, ইহারা ব্যভিচার দোষকে দোষ বলিয়া ঘৃণা করেন না বরং শ্লাঘা করিয়া বলেন, আমরা কুলীন সন্তান আমাদের উহাতে লজ্জা কি?”^{১২} এই কৌলীন্যপ্রথার পাশাপাশি মেয়েদের সামান্য জ্ঞান হওয়ার আগেই, সংসারের মার-প্যাঁচ বুঝে ওঠার আগেই বাল্যব্যবস্থায় বিবাহ দানের মাধ্যমে সংসারকে নারীর কাছে পিঞ্জর বানিয়ে দেওয়া, শ্বশুর ঘরের কাউকে আপন করে নিতে না পেরে হীনমন্য হয়ে থাকা এবং স্বামীর সঙ্গে মনান্তর হওয়ার কারণকেও নারীর অবমাননার হেতু হিসেবে প্রাথমিক চিহ্নিত করেছেন। নারী-পুরুষের বিবাহে সমানতা প্রয়োজন, দুজনের মনের মিল হওয়ার জন্য মানসিক সঙ্গতি একান্ত কাম্য। কিন্তু বাল্যবিবাহের মত নিয়মাবলী হিন্দু সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের অসুখী হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে বলে তিনি মনে করেছেন। নারীদের এই সমস্ত অসহায়তার কথা স্মরণ করে তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহের দ্বারা কৌলীন্যপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরোধীতা করে অত্যন্ত দূরদৃষ্টির সঙ্গে তাই সমালোচনা করেছেন— “... এই বঙ্গদেশ নানা প্রকার অনিয়মে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার সমুদয় পরিবর্তন করিতে হয়, নতুবা একের ওপর টান পড়িলে অন্য আসিয়া উপস্থিত হয়; যেমন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহটি উঠিল না এবং বহুবিবাহ নিবারণের আইন প্রচলিত হইবে, কিন্তু কৌলীন্য মর্যাদাটি থাকিবে। বিধবা ও বহুবিবাহ ফল স্বরূপ কিন্তু কৌলীন্য মর্যাদা ও বাল্য বিবাহ বৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছে।”^{১৩} নারীদের বঞ্চনা কোন একটি দিক দিয়ে বিস্তার লাভ করেনি সমাজে, তাই বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের বিদ্বন্মার পাশাপাশি তাদের বৈধব্য যন্ত্রণার অসহনীয়তাকেও চিত্রিত করতে কৈলাসবাসিনী ভোলেননি।

এর পাশাপাশি একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়েও কৈলাসবাসিনী এক অপূর্ব সমাজমনস্কতা ও বাস্তববাদীতার পরিচয় দিয়েছেন সেই সময়ের সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্নতার উর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র জাতিভেদ প্রথা তুলে একত্রিত হওয়ার প্রয়াসকে সমালোচনা করে। এর মধ্যে সেই সময়ের সমাজব্যবস্থার সংকীর্ণতার ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি কৈলাসবাসিনীর মনের অন্দরে ছায়া ফেলেছে বলে তিনি জাতিভেদকে সমর্থন করতে কিছুটা আগ্রহী একথা অস্বীকার করা

না গেলেও এই জাতিভেদ প্রথার নিবারণই যে প্রাথমিকভাবে হিন্দু সমাজব্যবস্থা ও তার মহিলাগণের হীনাবস্থা দূরীকরণে সচেষ্ট হবেনা, তার জন্য যে আরও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক রীতিনীতিগুলির পরিবর্তনের প্রয়োজন সেই বিষয়ে তার মতামত এক প্রশংসনীয় দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে চলে একথা বলাই যায়। তাই তিনি যখন বিদ্রূপ করে বলেন— “কি দুঃখের বিষয় যে আমাদের এই নব্যসম্প্রদায়ী মহোদয়গণ কেবল এই জাতিভেদের ওপরেই বিরক্ত হইয়াছেন!... ইহারা এই জাতি ভেদের অভেদ হইলে কি প্রকারে স্বাধীন হইবেন তা ইহারা জানেন,... যদি তাহা হয় তবে ক্ষতি নাই, কেননা তাহা হইলে আমাদেরও এতাদৃশ দুরাবস্থা থাকিবে না, আমরা স্বাধীন দেশের মহিলা হইয়া এই হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার হইব এবং পরম সৌভাগ্যে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইব।”^{১৪} তখন সেই চিন্তাভাবনা বর্তমান ব্যবস্থাতে দাঁড়িয়েও সমগ্র সমাজকে তলিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।

‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’ রচনায় নারীর হীনাবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেভাবে কৈলাসবাসিনী বিদ্যাল্যভের মধ্য দিয়ে নারীর অন্তঃকরণকে সৌন্দর্যায়িত করার প্রয়াসে আগ্রহী হয়েছেন, বাহ্যিক অলঙ্কার সৌন্দর্য নয় বরং বিদ্যারূপ অন্তরের ভূষণই নারীকে স্থায়ী কর্মে রত করতে সক্ষম বলে তিনি মনে করেছেন। নারীর সেই শিক্ষালাভের অপরিহার্যতার পথে সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা প্রতিবন্ধকতা এবং তার পাশাপাশি সেই বাধাকে কাটিয়ে নারীর শিক্ষার ক্রমোন্নয়নকে সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির দ্বারা প্রাবন্ধিক পর্যালোচনা করেছেন ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’ রচনায়। তিনি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইতিহাসের আশ্রয়ে হিন্দু নারীর প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থার কারণকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। যবনদের অপ্রতিরোধ্য অত্যাচারে আহত হিন্দু জাতির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অভাবে মেয়েদের শিক্ষাপ্রাপ্ত না করাতে পেরে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শুধুমাত্র পুরুষদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে সহমর্মীতার সঙ্গে প্রাবন্ধিক পর্যালোচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি ‘সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলা জাতির অধিকার নেই’, ‘স্ত্রীগণ গৃহমধ্যে অঙ্কপাত করিলে লক্ষ্মীত্যাগ হয়’, ‘স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকাল বৈধব্যাদশা প্রাপ্ত হয়’ এর মত অন্ধবিশ্বাসকেও তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। যে দেশে নানা সময়ে বিদুষী নারীরা জন্মগ্রহণ করে তাদের কৃতকর্মের পরিচয় দিয়ে গেছে সেই দেশে নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য কৈলাসবাসিনী পতিরূপ পুরুষকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করাতেও দ্বিধা করেননি— “তাঁহারা বনিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য আশ্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না অথবা পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা গৃহকার্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে... এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাহারা স্ত্রীগণকে নিতান্তই নির্যোধ ও বিদ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।”^{১৫} প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন সমাজের এইরূপ ধ্যানধারণার শিকার হয়েও যেসব মেয়েরা একটুও লেখাপড়ার অভিলাষ করত সমাজ তাদের দাগিয়ে দিত অপরাধী বলে। কিন্তু এত নেতিবাচকতার পরেও ব্রিটিশ সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানাতে ভোলেননি, পাশাপাশি এই সমাজব্যবস্থাতে দাঁড়িয়েও যে পিতারা মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকেও তিনি কুর্নিশ জানিয়েছেন।

তবে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার সাধু উদ্যোগে তাদের ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, শিল্পবিদ্যার মত বহুমুখী শিক্ষাকে যেমন প্রাবন্ধিক সমর্থন করেছেন তেমনই তিনি সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন গৃহকার্যের নিপুণতাকে। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন অল্পশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে অহেতুক ঔদ্ধত্যকে, স্মরণ করেছেন তাদের গৃহকার্যের প্রতি বিমুখতাকে। তাই যে কৈলাসবাসিনী নারীর শিক্ষার জন্য আওয়াজ তুলেছেন তিনিই স্বল্পশিক্ষিত নারীর আচরণকেও সমালোচনা করেছেন— “তঁাহারা মনে করেন, যে কোন মতে লোকে জানুক যে আমি বড় বিদ্যাবতী এবং আমার তুল্য গুণবতী কামিনী এ ভারত রাজ্যে আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ মনে করিয়া তঁাহারা প্রকৃতরূপে কিছুই শিখিতে অভিলাষ করেন না।”^{১৬} তবে কিছু সংখ্যক নেতিবাচকতা থাকলেও ইংরেজ আমলে রাজোদ্যোগে মেয়েদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টাকে প্রাবন্ধিক আগামী দিনের নারী জীবনে ইতিবাচকতার উদ্ভাসের চিহ্নস্বরূপ বলে মনে করেছেন। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাদানে কৈলাসবাসিনী আগ্রহী হলেও তাদের পুরুষবিবর্জিত বিদ্যাঙ্গনে শিক্ষাদানের যে রীতির আভাস তিনি দিয়েছেন তা নারীশিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিমতকে কিছুটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে একথা বলাই যায়। আসলে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছেন, কিন্তু শিক্ষার প্রচলিত কাঠামোকে মেনে নিতে পারেননি। নারীশিক্ষার সঠিক পদ্ধতি কী হওয়া উচিত এই নিয়ে কোন স্পষ্ট মতবাদ প্রকাশ না করলেও যে ব্যবস্থা নারীসমাজকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে সেই শিক্ষাব্যবস্থা যে তিনি কামন করেননি তা স্পষ্টতই বোঝা যায় এই প্রবন্ধ পাঠ করলেই। সর্বোপরি তাঁর চিন্তাভাবনায় নারীর জীবনে শিক্ষার অবদান একদমই স্বাধীন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নয় বরং সাংসারিক উন্নতি ও নারীর ব্যক্তিগত আলোকোজ্জ্বল আত্মমুক্তিকেই চিহ্নিত করে, যা সামাজিক সংকীর্ণতা ও চাপিয়ে দেওয়া নিয়মের বেড়া জাল থেকে নারীসমাজকে বের করে আনতে সমর্থ্য হয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে কৈলাসবাসিনী দেবীর নারীমুক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। তিনি নারীমুক্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবি করেননি বা পতিভক্ত নারীকে হঠাৎ মুক্ত আলোর ঝলকানিতে বাইরে বের করে আনার সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারেননি। কারণ যে বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে এক নারীর মনে তিল তিল করে গড়ে তোলা হয় তা হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলা সবার পক্ষে সম্ভব হয়না, কৈলাসবাসিনী দেবীও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু তারপরেও স্ত্রীশিক্ষার বিধান নিয়ে তিনি ভাবতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি শিক্ষার হাত ধরে নারীর আত্মমুক্তির নিজস্ব আলেখ্য রচনা করতে সফল হয়েছেন। একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়েও নারীর হীনাবস্থার কারণ বুঝে ওঠার পাশাপাশি তাকে অপূর্ব গদ্যের আলোকে আভিধানিক শব্দের বুননে গ্রন্থের আকারে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা সেই সময়ে দাঁড়িয়েও কৈলাসবাসিনী যেভাবে দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তাই যখন কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখাকে সকলে পুরুষের লেখা বলে দাগিয়ে দিতে চেয়েছে তখন তাঁর লেখা পড়ে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের মত ব্যক্তিত্বও অতশয় আহ্লাদিত হয়ে তাঁর প্রয়াসকে প্রশংসাবাক্যে ভরিয়ে দিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন— “... ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে তুমি সাবিত্রী সমানা হইয়া পতি পুত্রাদির সহিত চির সুখিনী ও বঙ্গঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পথপ্রদর্শিনী রূপে সচ্চরিত্রতার সহিত ভাবি কাল অতিবাহিত কর ইতি।”^{১৭} এই একবিংশ শতাব্দীর নারী স্বাধীনতার বলয়ে প্রবেশ করে, নারীশিক্ষার ক্রমোন্নয়নের ইতিবাচকতার দুনায়ায় তাই কৈলাসবাসিনী দেবীর মত পথপ্রদর্শকদের স্মরণ করেতেই হয়, যাদের জন্য আজকের

নারীসমাজ আলোকময় পৃথিবীর আশ্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছি বিস্মৃতির এক গহীন অন্তর্জালে।

তথ্যসূত্র:

- ১। দেবী, আশাপূর্ণা, ১৯৬৬, ‘সুবর্ণলতা’, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৩৯৬।
- ২। দেবী, আশাপূর্ণা, মাঘ ১৪২৬, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ২৯।
- ৩। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’, পৃষ্ঠা- ২৭।
- ৪। মুরশিদ, গোলাম, বইমেলা ২০১৩, ‘নারীপ্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া’, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পৃষ্ঠা- ৪৮।
- ৫। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’, পৃষ্ঠা-৫
- ৬। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ২৭।
- ৭। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৩৩।
- ৮। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৩৪।
- ৯। বিদ্যালঙ্কার, গৌরমোহন, ১৩২১, ‘স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক’, কলকাতা, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, পৃষ্ঠা- ৩।
- ১০। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৬২।
- ১১। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৬৬।
- ১২। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৪৩-৪৪।
- ১৩। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৫০।
- ১৪। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৪৯।
- ১৫। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৮২
- ১৬। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৮৮।
- ১৭। দেবী, কৈলাসবাসিনী, ২০১১, ‘প্রতিষ্ঠাপত্র’, ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’, ‘কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৩০।

প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব - কপিলের সাংখ্য ও মহাভারতীয় সাংখ্য

অবলম্বনে

সুজয় সরকার

গবেষক, দর্শন বিভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় আন্তিক ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শন প্রাচীনতম। দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি- প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্মী। কিন্তু পুরুষ এর বিপরীত- পুরুষ গুণাতীত, বিবেকী, অবিসয়, চেতন ও অপ্রসবধর্মী অর্থাৎ অপরিণামী। সাংখ্য দর্শনের দ্বৈততত্ত্ব মহাভারতের শান্তিপর্বে, অনুশাসনপর্বেও লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতেও তেমনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের স্বরূপ জানতে পারলে প্রকৃতির স্বরূপ জানা সম্ভব হয়। তবে, মহাভারতের প্রকৃতি ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই লীন হয়। পুরুষ স্বয়ং পরমাত্মা এবং তিনি অজ-নিত্য-শাস্বত-সনাতন। মহাভারতে পরমাত্মা স্বরূপ যে পুরুষ তাঁকে শ্রীনারায়ণ রূপেও অভিহিত করেছেন। মহাভারতেও প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নতা উপলব্ধিই মুক্তির পথ। জীবকূল যখন দুঃখ, মোহ ও বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন, তখন শ্রী নারায়ণের পাদপদ্মে আশ্রয় পায়। এই দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করেই মানবজীবনে আত্মজ্ঞান ও মুক্তি সম্ভব হয়, যা সাংখ্য দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হল কপিলের সাংখ্য ও মহাভারতের সাংখ্য দর্শনের আলোকে প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণ।

সূচক শব্দ: সাংখ্যদর্শন, প্রকৃতি, পুরুষ, গুণত্রয়, মুক্তি।

মূল আলোচনা:

কপিলের সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ

সাংখ্য দর্শনে দুই প্রকার মূল তত্ত্ব স্বীকৃত- প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগবশত জগতের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পূর্বে জগত প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ বা সান্নিধ্য মাত্রই সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় এবং বিরূপ পরিণাম শুরু হয়। অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণগুলির মধ্যে বিরূপ পরিণাম শুরু হয় এবং গুণগুলি একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চেষ্টা করে। ফলে, জগতের অভিব্যক্তি শুরু হয় এবং এই অভিব্যক্তির জন্যই বিভিন্ন তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতি থেকে পরম্পরাক্রমে উপন্ন হয় মোট ২৩ প্রকার তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ সহ সর্বমোট পঁচিশ প্রকার তত্ত্ব স্বীকার করা হয়, যা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নামে পরিচিত। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে-

প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহংস্কারস্তস্মাদগণচ ষোড়শকঃ।

তস্মাদপি ষোড়শকাং পঞ্চভ্যাং পঞ্চভূতানি।^১

অর্থাৎ, প্রকৃতি থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে মৌলটি বিকার (মন, পঞ্চগুণেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং মৌলটি বিকারের অন্তর্গত পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার তিনি তাঁর গ্রন্থের শুরুতে ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতি ও পুরুষকে প্রণাম করে মঙ্গলাচরণ করেছেন-

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।

অজা যে তাং জুষমানাং ভজন্তে জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমন্ত্ন।।^৭

মঙ্গলাচরণ কারিকার প্রথম চরণে প্রকৃতিকে প্রণাম করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় চরণে পুরুষকে। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই। জগত সৃষ্টিতেও ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। সেজন্য, সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়। সাংখ্যে প্রকৃতিই হল সৃষ্টির মূল। একারণে প্রকৃতিকে প্রধান, মূলা প্রকৃতি, পরা-প্রকৃতি ইত্যাদি বলা হয়। সুতরাং, সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির স্বরূপ ও অস্তিত্ব এবং পুরুষের স্বরূপ ও অস্তিত্ব জানা আবশ্যিক।

প্রকৃতি

সাংখ্যমতে জগতের আদি উপাদান হল প্রকৃতি। এই বিচিত্রময় জগৎ প্রকৃতির পরিণামের জন্যই সম্ভব হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি থেকেই এই জগৎ অভিব্যক্তি ঘটেছে। পুরুষ হল অপরিণামী। পুরুষ হল নিত্য, অবিকারী, অসঙ্গ, উদাসীন এবং চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতি থেকেই এই বিচিত্রময় জগতের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতি হল জগৎ-প্রসবিনী। প্রকৃতি পুরুষের ভোগ সাধনের জন্যই জগত সৃষ্টি করেছেন। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতির ভিত্তিই হল কার্যকারণবাদ, যা সংকার্যবাদ নামে পরিচিত। সংকার্যবাদ অনুসারে কার্য তার উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান থাকে এবং কার্য হল সেই কারণের বাস্তব পরিণাম। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রকৃতি হল জগতের মূল কারণ এবং জগত উৎপত্তি হওয়ার পূর্বে প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান থাকে।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্য কারিকায় প্রকৃতির স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন-

কারণমন্তব্যাক্তং প্রবর্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।

পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ।।^৮

অব্যক্ত বা প্রধান জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের কারণ আছে। জলের মতো পরিণামবশতঃ প্রতিটি গুণকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে এবং অণুগুণগুলিকে সহকারী পেয়ে ত্রিগুণ থেকে সমুদিতভাবে এই সমগ্র জগতের উদ্ভব হয়।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র প্রকৃতির লক্ষণে বলেছেন- ‘প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানম্, সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা’^৯। অর্থাৎ যে করে কিন্তু কারো দ্বারা কখন কৃত হয় না, যে সর্বদা কড়ত্ব বিশিষ্ট হয়, কিন্তু কখনই কর্মত্ব বিশিষ্ট হয় না, তাকে প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি হল আদি ও মূল, কেননা, প্রকৃতি এমন এক কারণ যার আর কোন কারণ নেই, এইজন্য প্রথম ও মূল কারণ বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই হল প্রকৃতি।

‘সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ’^{১০} সূক্ষ্মতার জন্যই প্রকৃতির অনুপলব্ধি হয়, অভাববশত নয়। প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করছেন-

ভেদানাং পরিমাণাং সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেচ।

কারণ কার্য বিভাগাৎ-অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য।।^{১১}

উক্ত কারিকায় প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করার জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করেছেন - ১. ভেদানাং পরিমাণাৎ, ২. সমস্বয়াৎ, ৩. শক্তিত প্রবৃত্তেঃ, ৪. কারণ-কার্যবিভাগাৎ ও ৫. বৈশ্বরূপ্যস্য অবিভাগাৎ।

পুরুষ

সাংখ্যশাস্ত্রে শুদ্ধ চৈতন্য আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়েছে। পুরুষ কোন কিছুর কারণ নয়, কোন কিছুর পরিণামও নয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় বলেছেন-

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যচেতনং প্রসবধর্মি।

ব্যক্তং তথা প্রধানম্ তদ্বিপরিচয়ত্বা চ পূমান্।।^৭

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও প্রকৃতি থেকে ব্যক্ত পদার্থ মাত্রই ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্মী। কিন্তু পুরুষ এর বিপরীত- পুরুষ গুণাতীত, বিবেকী, অবিষয়, চেতন ও অপ্রসবধর্মী অর্থাৎ অপরিণামী।

গুণত্রয় চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের সাধর্ম্য হতে পারে না, ওইগুলি পুরুষের বৈধর্ম্য। কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্তের গুণত্রয় ধর্ম পুরুষে কখনও থাকতে পারে না। এই গুণত্রয় পুরুষে না থাকার জন্যই পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধি হয়। কৈবল্য হল পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম। অর্থাৎ পুরুষ হল ত্রিগুণাতীত। ত্রিগুণের অভাব বশত পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মধ্যস্থ, দৃষ্টত্ব, অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা নিত্য হওয়ায়, উৎপন্নও হয় না এবং বিনষ্টও হয় না। পুরুষ মধ্যস্থ বা উদাসীন, কেননা পুরুষ সুখ-দুঃখমোহ রহিত। অজ্ঞানবশত পুরুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারে না। ফলে, সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রকৃতির দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে। অসঙ্গম্যেম পুরুষঃ- অর্থাৎ পুরুষ হল আশক্তি শূন্য। পুরুষ অসঙ্গ হওয়ায় সুখ দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

শুদ্ধ জ্ঞানাত্মক কূটস্থ ও নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। পুরুষের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ না থাকায় কোন বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তা অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করেছেন।

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যাদধিষ্ঠানাৎ

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেচ্।।^৮

সংঘাত বস্তু মাত্রই অপরের প্রয়োজনের নিমিত্ত, ত্রিগুণাদি বস্তুর বিপরীত হেতু, জড় বস্তুর অধিষ্ঠান হেতু, ভোক্তৃভাব হেতু এবং জগতসংসারে বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের হেতু থেকে চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় বলেছেন- ‘জ্ঞানেন চ অপবর্গ’^৯ অর্থাৎ কেবল বিবেক জ্ঞানের দ্বারাই দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। এই তত্ত্বজ্ঞানই হল- ‘ব্যক্তব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ’^{১০}। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিনটি পৃথক পৃথক জ্ঞানই হল বিবেক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। ব্যক্ত হল মহাদাদি কার্য বা প্রকৃতির পরিণাম ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব। অব্যক্ত বলতে প্রকৃতিকে বোঝান হয়েছে এবং জ্ঞ হল পুরুষ। সাংখ্যশাস্ত্রে মূল উপজীব্যই হল প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ জ্ঞান এবং এই জ্ঞান সাধকের জীবনে সিদ্ধ হলে সর্বদুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব, দুঃখের নিবৃত্তি হলেই মুক্তির তাৎপর্য সার্থক হয়।

মহাভারতীয় সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ

মহাভারতীয় শান্তি পর্বই সর্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। কেননা, শরশয্যায় শায়িত কুরুপিতামহ মহাবীর ভীষ্ম, রাজা যুধিষ্ঠিরের জগত ও জীবন সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার সমাধান করেছেন। বিশেষ

করে সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা কপিলের প্রশিষ্য পঞ্চশিখাচার্যের সাংখ্য চিন্তাকে উদ্ধার করে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তা মহাভারতের সাংখ্য চিন্তার এক আসাধারণ অবদান বলতে হয়। সাংখ্য শাস্ত্র হল মহাজ্ঞান স্বরূপ। শাস্তি পর্বে বলা হয়েছে-

জ্ঞানং মহদ্ যদ্বি মহৎসুরাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।

যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যগতাং তন্নিখিলং নরেন্দ্র।^{১১}

পিতামহ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, বেদ, যোগ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে, তা সমস্তই সাংখ্যশাস্ত্র থেকে এসেছে। সংসারের সকল উৎকৃষ্ট জ্ঞানের আকর হল সাংখ্যশাস্ত্র। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ সাহিত্য, আরণ্যক ও উপনিষদ সাহিত্যের মধ্যেও প্রাচীন সাংখ্যের বীজ আছে।

মহাভারতেও সাংখ্যকারিকার ন্যায় তত্ত্ব গুলি আলোচনা করা হয়েছে। মনু বৃহস্পতি সংবাদে বলা হয়েছে-

পুরুষঃ প্রকৃতিবুদ্ধির্বিষয়াচ্চেন্দ্রিয়াণি চ।

অহঙ্কারো ভিমানশ্চ সমূহো ভূতসংজ্ঞকঃ।^{১২}

অর্থাৎ, পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চতন্মাত্র, ও পঞ্চমহাভূত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই ভূত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহাভারতীয় সাংখ্যে ঈশ্বর বা পরম ব্রহ্মেরও স্থান পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতীয় সাংখ্যীয় মুক্তি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কখনই সম্ভব নয়। মহাভারতের সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষ ও ত্রয়োবিংশতি সমাহারে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরেও বলা হয়েছে-

“ষড়্বিংশ বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্...”^{১৩}

অর্থাৎ, মহাভারতে চৈতন্যময় পরমব্রহ্ম ষড়্বিংশ তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেছেন- ষড়্বিংশমিতি নিরুপাধি চৈতন্যমেব সর্বপ্রকাশকম্ ইত্যর্থঃ।^{১৪} সুতরাং মহাভারতীয় প্রাচীন সাংখ্য মত অনুযায়ী সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

মহাভারতীয় সাংখ্যে যে ষড়্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম তত্ত্বের নাম হল প্রকৃতি। গুণত্রয়ের সাম্যবস্থাই যে প্রকৃতি তারও উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়- “প্রধানে প্রকৃতিং যাতে গুণসাম্যে ব্যবস্থিতে”^{১৫}। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্য অবস্থাই হল প্রকৃতি। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের স্বরূপ জানতে পারলে প্রকৃতির স্বরূপ জানা সম্ভব হয়।

মহাভারতে প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে মহাদাদি সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে সর্বপ্রধান হল প্রকৃতি-

বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বানাং পরমেশ্বরী।^{১৬}

মহাদাদি তত্ত্বান্তর সৃষ্টির পরেও প্রকৃতি যে অবিকৃতই থাকে, তা মহাভারত কাব্য করে বলেছে-

দীপাদন্যে যথা দীপাঃ প্রবর্তন্তে সহস্রশঃ।

প্রকৃতিঃ সূর্যতে তদ্বদ্ আনন্ত্যাম্পাটীয়তে।^{১৭}

অর্থাৎ, যেমন একটি দীপ থেকে সহস্র সহস্র দীপ উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতির যেহেতু কোনো অপচয় ঘটে না, তাই সে অবিকৃতই থাকে। মহাভারতে এই ভাবে প্রকৃতিকে অনন্ত, অসীম বলে চিহ্নিত করায় এবং বহুবিধ বিকার সত্ত্বেও তার ক্ষয় অপচয় নেই।

মহাভারতে আচার্য্য বশিষ্ঠ জনক রাজাকে কিভাবে অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ব্যক্ততত্ত্ব গুলি পরিণত হয় তার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। বশিষ্ঠ বলেছেন যে- একটি তত্ত্ব থেকে অপর একটি তত্ত্ব উৎপন্ন হয় অনুলোমক্রমে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয় প্রতিলোম ক্রমে। অর্থাৎ, অনুলোম ক্রমে তত্ত্বের উৎপত্তি হয় এবং প্রতিলোম ক্রমে তত্ত্বের লয় হয়।

যস্মাদ্ যদভিজায়তে তত্ত্বত্রৈব প্রলীয়তে। ইত্যাদি।

জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্ সু প্রলীয়তে। ইত্যাদি।^{১৮}

সৃষ্টিতে ঈশ্বরেরও নিমিত্তকারণতা স্বীকার করতে হবে। তাঁর ইচ্ছায় প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। প্রকৃতির বহুমুখী পরিণতির নামই সৃষ্টি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বহুভাবে ব্যক্ত বস্তুগুলি আপন আপন কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে এক প্রকৃতি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। মহাভারতে বলা হয়েছে, জগৎ সৃষ্টিতে প্রকৃতি ব্রহ্মের দ্বারা অধিকৃত হয়ে ধর্মাদ্বয় অনুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। - “পুরুষাধিষ্ঠিতান্ ভগবান্ প্রকৃতি সূয়তে সদা!”।^{১৯}

মহাভারতে পুরুষতত্ত্ব আলোচনা হয়েছে পঞ্চশিখ জনক সংবাদে মধ্যে, পঞ্চশিখের গুরু আসুরির কাছে শিষ্যরা পরম পুরুষ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অধ্যায়ে লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতিকে অব্যক্ত না বলে পুরুষকে অব্যক্ত বলা হয়েছে-

পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং ন্যবেদয়ত।^{২০}

এই অব্যক্ত পুরুষের উপরে প্রকৃতির নির্ভরতা লক্ষ্য করা যায় সৃষ্টিকার্য্যের সময়। অচেতন, জড়রূপা প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠিত হয়ে জীবের ধর্ম ও অধর্ম অনুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কপিলের সাংখ্যে পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়- নিরাকার, বিবেকী, অসংসৃষ্ট, নির্গুণ। মহাভারতে পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে- মহাদাদি ব্যক্তপদার্থ যে সকল নশ্বর পদার্থ সৃষ্টি করে, সেই সেই নশ্বর পদার্থই কোন আকার আশ্রয় করে থাকে, প্রতিলোমক্রমে চতুর্বিংশতিতম পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতি, আর পঞ্চবিংশতিতম পদার্থ পুরুষ নিরাকার। অন্যের সঙ্গে অসংসৃষ্ট, নিত্য, সর্বশরীরব্যাপী, নিরাকার, চিন্ময় ও আত্মস্বরূপ সেই পুরুষই সমস্ত শরীরের হৃদয়ে অবস্থান করেন। সৃষ্টি ও বিনাশ যদিও প্রকৃতির ধর্ম, তথাপি সেই প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ পুরুষ যেন সৃষ্টি ও বিনাশ যুক্ত হন এবং পুরুষ নিরাকার বলে সকলের অগোচর হয়েও প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ সর্বদা সকলের গোচরে থাকেন; আর পুরুষ নির্গুণ হয়েও প্রকৃতির সংসর্গবশত যেন গুণবান্ হয়ে পড়েন।^{২১}

পুরুষ নিরাকার হলেও প্রকৃতির সহবাসবশত নিজের রূপ না বুঝে, নিজেকে পঞ্চভূতাত্মক দেহের থেকে অভিন্ন বলে মনে করে এবং প্রকৃতিস্থিত গুণেরই অনুসরণ করেন। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতিই নির্গুণ, সুখ-দুঃখ-মোহ এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সুখ দুঃখ পুরুষে আরোপিত ধর্ম মাত্র। মহাভারতে বলা হয়েছে-

তমঃসত্ত্বরজোযুক্তস্তাসু তাস্মিহ যোনিষু।

লীয়তে প্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাং।।^{২২}

অর্থাৎ; প্রকৃতির সহবাসবশত পুরুষ নিজেকে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণশালী ভাবেন এবং অজ্ঞান মানুষের মত ব্যবহার করেন। উপমা সহযোগে বলা যায়- মাকড়সা যেমন নিজের সূত্রদ্বারাই নিজেকে বন্ধন করে, তেমনি পুরুষ নির্গুণ হয়েও স্বসংযুক্ত প্রকৃতির গুণ দ্বারা নিজেকে বন্ধন করে থাকেন-

কোষকারো যথাহ্বানং কীটঃ সমবরুদ্ধতি।

সূত্রতন্তুগুণৈর্নিতং তথায়মগুণো গুণৈঃ।।^{২৩}

মহাভারতে বদ্ধ এবং মুক্ত, নিত্য এবং অনিত্য, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই উভয় প্রকার পুরুষের কথাই বলা হয়েছে। যতক্ষণ না পুরুষ নিজের নিগুণ, নিত্য, চতন, নিষ্ক্রিয় স্বভাবের কথা অবহিত হন, ততক্ষণই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সংসর্গ করেন। মহাভারতের ঋষি যাঙ্কবল্ল্য জনক রাজাকে এই বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট প্রকৃতি পুরুষের সংসর্গের কথা নানাবিধ উপমার সাহায্যে বিস্তারিত করেছেন। যাঙ্কবল্ল্য তাঁর সাংখ্য উপদেশে বলেছেন- জলে মৎস্য বাস করে ঠিকই, ডুমুর গাছে মশক বসে থাকে ঠিকই, পদ্ম জলের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় ঠিকই, কিন্তু জলে অবস্থিত মৎস্য, ডুমুরবৃক্ষস্থিত মশক এবং জলমধ্যগত পদ্ম পরস্পর পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।^{২৪}

জগত সৃষ্টিতে প্রচলিত সাংখ্যমত থেকে মহাভারতের মত ভিন্ন। মহাভারতের সাংখ্য আলোচনায় পুরুষের ভূমিকা অনেক বেশি প্রকৃতির থেকে। জগত সৃষ্টিতে বলা হয়েছে-

পুরুষাধিষ্ঠিতান্ ভাবান্ প্রকৃতিঃ সূয়তে যদা।

হেতুযুক্তমতঃ পূর্বং জগত সংপরিবর্ততে।^{২৫}

জগত সৃষ্টি প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠ লিখেছেন- প্রকৃতি অচেতন বলে পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়েই সৃষ্টি ও সংহারকার্য সম্পন্ন করে থাকে। জীবের ধর্ম ও অধর্ম অনুসারে প্রকৃতি পুরুষাধিষ্ঠিতা হয়ে মহৎ প্রকৃতির সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন। পুরুষের অধিষ্ঠানের জন্যই প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য এখানে নিরস্ত হয়ে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।^{২৬}

মহাভারতের পুরুষ স্বয়ং পরমাত্মা। এই পরমাত্মা আদি মধ্য অন্তহীন। পুরুষ অজ-নিত্য-শাস্বত-সনাতন এবং সকল দ্বন্দ্বরহিত। পুরুষ বেদান্ত দর্শনের সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সকলের আশ্রয় এবং পরমপদ। জীব যখন পরমব্রহ্মকে লাভ করেন তখনই তিনি জন্ম-জরা-মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর পরমপদ লাভ করেন। মহাভারতে বলা হয়েছে-

কালাস্তং ভগবান্ বিষ্ণুর্য়স্য সর্বমিদং জগৎ।

নাদির্ন মধ্যং নৈবান্তস্তস্য দেবস্য বিদ্যতে।।

তদ্ ব্রহ্ম পরমং প্রোক্তং তদ্ধাম পরমং স্মৃতম্।

তদ্ গতা কালবিষয়াদ্ বিমুক্তা মোক্ষমাপ্রিষ্ঠাঃ।^{২৭}

পুরুষ বা জীবাত্মা হল নিগুণ তাঁর স্বভাবের কখন ব্যতিক্রম হয় না। অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির ধর্ম নিজের মধ্যে আরোপ করে সুখ দুঃখের ভোক্তরূপে তাঁর অভিমান হয় এবং নিজের সাক্ষিস্বরূপত্ব বুঝতে পারে না বলে এত দুঃখ।

প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে কপিলমুনির সাংখ্যচিন্তা ও মহাভারতের সাংখ্যচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উভয় তত্ত্বই মুক্তির পথে এক দার্শনিক কাঠামো তৈরি করেছে। কপিলের সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হওয়ায় তা যুক্তিভিত্তিক, কিন্তু মহাভারতীয় আলোচনায় ঈশ্বরের প্রাধান্য থাকায় তা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত। কপিলের সাংখ্য চিন্তায় ও মহাভারতীয় সাংখ্য চিন্তায় উভয়ের সম্মিলনে আমরা এক গভীর দার্শনিক চিন্তার মুখোমুখি হই, যা আমাদের আত্মজ্ঞান ও মুক্তির পথে ভাবতে বাধ্য করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। স্বামী, ভাবঘনানন্দ অনূদিত, ২০০০, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.২৭, কারিকা নং ২২

- ২। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র অনূদিত, পঞ্চম প্রকাশ ১৪১৮, শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ.১
- ৩। স্বামী, ভাবঘনানন্দ অনূদিত, ২০০০, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.২১, কারিকা নং ১৬
- ৪। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র অনূদিত, পঞ্চম প্রকাশ ১৪১৮, শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ.৩৬
- ৫। স্বামী, ভাবঘনানন্দ অনূদিত, ২০০০, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.১২, কারিকা নং ৮
- ৬। পূর্বোক্ত; পৃ.২০, কারিকা নং ১৫
- ৭। পূর্বোক্ত; পৃ.১৬, কারিকা নং ১১
- ৮। পূর্বোক্ত; পৃ.২২, কারিকা নং ১৭
- ৯। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র অনূদিত, পঞ্চম প্রকাশ ১৪১৮, শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ.১৩
- ১০। স্বামী, ভাবঘনানন্দ অনূদিত, ২০০০, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ.৩, কারিকা নং ২
- ১১। তর্করত্ন, শ্রী পঞ্চগনন সম্পাদিত, ১৮২৬, মহাভারত খণ্ড-২, কলিকাতা, শ্রী নটুবিহারিরায়েণ রাজধান্যাম্, পৃ.১৭৪৬
- ১২। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস সম্পাদিত, ১৩৩৮, মহাভারতম, কলিকাতা, বিশ্ববাণী, পৃ.১৯৩৫
- ১৩। পূর্বোক্ত; পৃ.৩১৮১
- ১৪। পূর্বোক্ত; পৃ.৩১৮১-৩১৮২
- ১৫। তর্করত্ন, শ্রী পঞ্চগনন সম্পাদিত, ১৮২৬, মহাভারত খণ্ড-২, কলিকাতা, শ্রী নটুবিহারিরায়েণ রাজধান্যাম্, পৃ.১৭৬৫
- ১৬। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস সম্পাদিত, ১৩৩৮, মহাভারতম, কলিকাতা, বিশ্ববাণী, পৃ.৩১৬৩
- ১৭। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৫ পৃ.২০৪৯
- ১৮। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৫, পৃ.৩১৫৪
- ১৯। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৫ পৃ.২০৪৯
- ২০। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস সম্পাদিত, ১৩৩৮, মহাভারতম, কলিকাতা, বিশ্ববাণী, পৃ.২১২৫
- ২১। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৬ পৃ.৩১০৯
- ২২। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৬ পৃ.৩১১০
- ২৩। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৬ পৃ.৩১১৪
- ২৪। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৭ পৃ.৩২৩১-৩২৩২
- ২৫। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৫ পৃ.২০৪৯
- ২৬। পূর্বোক্ত; খণ্ড ৩৫ পৃ.২০৪৯-২০৫০
- ২৭। তর্করত্ন, শ্রী পঞ্চগনন সম্পাদিত, ১৮২৬, মহাভারত খণ্ড-২, কলিকাতা, শ্রী নটুবিহারিরায়েণ রাজধান্যাম্, পৃ.৬০৭।

নারীচর্চার এক আলোকিত অধ্যায় : শিক্ষাভবনায় বাঙালি মহিয়ার নারী

প্রতীক্ষকুমার রীত
অধ্যাপক, রবীন্দ্রচর্চা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অনেক মনীষীর নীরব সাধনা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। রামমোহন বিদ্যাসাগরের পর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, হেমলতা দেবী, সুসমা দেবী, বাণী দেবী প্রমুখ প্রত্যেকেই এক একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির বাইরের অনেক মহিলাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কৃষ্ণভাবিনী দাস, রত্নমালা দেবী, বেগম রোকেয়া প্রমুখের নামও বাংলা শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয়। সেই ইতিহাসের দিকচিহ্নগুলি তুলে ধরা হল। বাংলার সমাজে এঁদের অপারিসীম ভূমিকা আমাদেরকে সচকিত করবে। পূর্বে ছিল সংস্কৃত শিক্ষা। টোল-পাঠশালা, চতুষ্পাঠীতে, আশ্রমে শিক্ষালাভ হত। তারপর পরাধীন বাংলায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। তারপর অনেক মনীষীর শিক্ষাভবনার ফলশ্রুতিতে আমরা ক্রমশ স্বাধীন শিক্ষালাভে সমর্থ হই। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারপর শিক্ষাভবনায় রাবীন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য। মাঝে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুরের লোকশিক্ষা মহিমাময়। বিভিন্ন সাহিত্যিকরাও তাঁদের রচনার মাধ্যমে শিক্ষাভবনার অংশীদার হয়েছেন। সে এক বিস্তৃত প্রসঙ্গ। পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও শিক্ষাভবনায় নানাভাবে এগিয়ে এসেছেন। ঠাকুরবাড়ির বাইরের কিছু মহিলা শিক্ষাভবনার ইতিহাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সেই ইতিহাসকেই বর্তমান রচনায় সঞ্জীবিত করা হল। সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালে নারীচর্চার একটি বলিষ্ঠ ধারা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে ‘women studies centre’। নারীচর্চা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। মহিলা রচিত বাংলা সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহিলা রচিত কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধাদি, নাটক ইত্যাদি দীর্ঘ অধ্যায় লক্ষ্য করা যায়। মহিলা সম্পাদিত পত্রপত্রিকা, ভ্রমণ সাহিত্য রচনা, মহিলাদের নাট্যচর্চা- এমনি নানা দিক আছে। তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাংলা শিক্ষাভবনার ইতিহাসে মহিলাদের অবদান। শিক্ষাভবনায় বাঙালি মহিয়ার নারীদের কথা এখানে ফিরে দেখা হবে। সমাজ বিজ্ঞানে এঁদের নিয়ে পূর্ণতর গবেষণার প্রয়োজন, সেদিকে আলোকপাতই বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য। অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনালোকিত দিক উদঘাটিত হবে, সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নও এখনো বাকি।

সূচক শব্দ: নারীচর্চা, শিক্ষাভবনা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা, বেগম রোকেয়া, কৃষ্ণভাবিনী দাস, সমাজ বিজ্ঞান।

প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সুষমা দেবীকে নিয়ে একটি গ্রন্থের কাজ ‘ঠাকুরবাড়ির সুষমা’ পারুল প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। উল্লেখ্য সুষমা দেবী শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বশিক্ষা সম্মেলনে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে বিলেত যান, রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাত্রার দশ বছর পরে। প্রতিভাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘স্ত্রী শিক্ষা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি’ গ্রন্থ। বিষয়গুলি উল্লেখের দাবী রাখে। ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা’ এবং ‘শিক্ষা ভাবনায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা’ প্রবন্ধ দুটি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হতে দেখা যায় ‘জাগ্রত বিবেক’ পত্রিকায় (দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির)। নারীচর্চার ধারায় বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাস ও বিশ্লেষণাত্মক কাজ সবিশেষ দেখা যায় না।

আন্তর্জাতিক পাঠশালা পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত সাময়িকপত্র সম্পাদনায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অবদান আলোচনাটি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। নাট্যচর্চায়, বাংলা ছোটগল্প চর্চায়, ভ্রমণসাহিত্যচর্চায় ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের অবদান বিষয়ে তিনটি পিএইচডি গবেষণা সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে, এই বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য। বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহিলা সদস্যদের আলোকিত ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করে তোলা বর্তমান রচনার মূল উদ্দেশ্য। ঠাকুরবাড়ির মহিলা সদস্যদের শিক্ষাভাবনা বর্তমানকালে কতটা প্রাসঙ্গিক বা উপযোগী তা মূল্যায়ন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ঠাকুরবাড়ির বাইরের মহিলা বেগম রোকেয়া, কৃষ্ণভাবিনী দাস, রত্নমালা দেবী, প্রমুখের বাংলা শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের পরিমাণ নিরূপণ করা বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য। বর্তমানকালে এইসব ভাবনার গুরুত্ব বিশ্লেষণের অবকাশ তৈরি করা হল।

মূল আলোচনা:

অনেক বাঙালি মনীষীর শিক্ষাভাবনার ফলশ্রুতিতে ক্রমশ আমরা স্বাধীন শিক্ষালাভে সমর্থ হই। বাংলার শিক্ষাভাবনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনেক মনীষীর নীরব সাধনা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে বিকশিত করেছে। সে এক বিস্তৃত, বিচিত্র, কৌতূহলজনক ইতিহাস। সে ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি, যা নিয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের জনক। তিনি নিজ ব্যয়ে ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুল’ স্থাপন করেন (১৮২৩)। বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেছেন, তারপর সংস্কৃত কলেজে। তারপর তিনি বিভিন্ন জেলায় অনেক স্কুল স্থাপনার কাজ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। ‘বর্ণপরিচয়’ প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ তাঁর অমর সৃষ্টি। বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম (১৮১৭ - ১৮৫৮) বাংলার শিক্ষাজগতে অবিস্মরণীয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকের জন্য তা অপেক্ষা করছে।

এদের পাশাপাশি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যা বাংলার শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে অতীব মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছেন, যা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার নবজাগরণে এ বাড়ির অবদান অসীম। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় এ বাড়ির সদস্যরা পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

শিক্ষাভাবনার ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সদস্যদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ বিষয়ে তাঁর কার্যাবলি আমাদের অবাক করবে। তারপর

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষাবিশয়ে নানা ভাবনাচিন্তা করে নীরব মহান বিপ্লব সাধন করে গেছেন। পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অনেক মহিলা সদস্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এ বিষয়ে।

এসবের পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির বাইরের অনেক মহিলাও শিক্ষাভাবনায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস, রত্নমালা দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানি, কাননকুমারী দেবী, শান্তা দেবী, সত্যবালা দেবী প্রমুখ। বাংলার শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে এঁদের অবদান মনে রাখার মত। রমাবাঈ, কামিনী রায়, বেগম রোকেয়া, লীলা রায় প্রমুখের নামও বাংলা শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয়। এ বিষয়ের গবেষক বর্তমানকালে প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অস্বেষণ করবেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (২৬. ০৭. ১৮৫০ - ০১. ১০. ১৯৪১) যশোরের অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ও নিন্তারিণী দেবীর কন্যা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৮৫৭ সালে। মাত্র সাত বছর বয়সে ঠাকুরবাড়িতে বউ হিসেবে পদার্পণ করলেও পরে পরে তিনিই ঠাকুরবাড়ির কত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর দেবর হেমেন্দ্রনাথের কাছেই তাঁর শিক্ষা। তাছাড়া অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর (ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য) কাছেও পড়েছেন তিনি। যাই হোক, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী নারী স্বাধীনতার বিস্তারে তথা বাংলার নবজাগরণে কিংবদন্তি ভূমিকা পালন করে গেছেন। পোশাকে-আশাকে, নাট্য অভিনয়ে, ফটোগ্রাফি চর্চায়, চিত্রচর্চায় তাঁর অনেক অবদান আছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের বিদগ্ধ পরিমণ্ডলে দিনে দিনে ঋদ্ধ হয়েছেন। কলকাতায় বা বিলেতে জ্ঞানদানন্দিনী-সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অনেকবার থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ‘বালক’ পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও ‘ভারতী’-তে অনেক প্রবন্ধ ও কিছু নাটক লেখেন— ‘টাক ডুমা ডুম ডুম’, ‘সাত ভাই চম্পা’ প্রভৃতি। তাঁর শিক্ষাবিশয়ক দুটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা ‘স্ত্রীশিক্ষা’ এবং ‘কিন্তার গার্টেন’। দীর্ঘ দুটি প্রবন্ধই মূল্যবান, সবিশেষ আলোচনার দাবিদার। গবেষকের জন্য তা তোলা থাকল।

স্বর্ণকুমারী দেবী (২৮. ০৮. ১৮৫৬ - ০৩. ০৭. ১৯৩২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশম সন্তান, চতুর্থ কন্যা, স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের ন-দিদি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি সব্যসাচীর মতো দু’হাত ভরে লিখেছেন, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, গান, নাটক, বিজ্ঞান প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা। সেকালের ‘সাহিত্যসম্রাজ্ঞী’ হয়ে উঠেছিলেন। বাড়িতেই তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন মহর্ষিদেব। দীর্ঘদিন ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ‘ভারতী’, ‘সখা’, ‘বসুমতী’ ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। তাঁর প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ‘সখিসমিতি’র পক্ষে অনেক কাজ করেছেন। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা সরলা দেবীও নানাভাবে খ্যাতনামা। স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল’ (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯৪, পৃ. ২২৪-২২৯) একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তাঁর ‘আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার’ (প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ৩১৪-৩২০) একটি মূল্যবান, দুস্ত্যাপ্য রচনা। তাঁর রচনা থেকে জানা যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকেই ঠাকুরবাড়িতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বৈষ্ণবী মহিলা, কখনও বা বিদেশিনী মহিলাদের আনিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারে আরও সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ের গবেষক ইতিহাসটি উন্মাদিত করবেন।

হিরণ্ময়ী দেবী (০৫. ১২. ১৮৬৮ - ১৩. ০৭. ১৯২৫) স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের প্রথম সন্তান। তিনি প্রথমে ভাটন স্কুলে ও পরে বেথুন স্কুলে পড়েন। ১৮৯৪ মার্চে

তাঁর বিবাহ, বোটারির অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বর্ণকুমারী সখিসমিতির সক্রিয় কর্মী। মায়ের হাত থেকে ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। দুঃস্থ মেয়ে ও বিধবাদের জন্য তিনি বিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষাশ্রম স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ এর জন্যই ‘ব্রতধারণ’ প্রবন্ধ লেখেন এবং সাহায্য করেন। এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস অনালোকিতই থেকে গেছে। তা উদ্ধারের জন্য বিষয়টিতে একটি গবেষণা প্রয়োজন।

‘ভারতী’ পত্রিকায় তাঁর শিক্ষাবিষয়ক দুটি রচনা মুদ্রিত হতে দেখা যায়। যথা— ‘নিউহ্যাম কলেজ’ এবং ‘সমারভিল হল’। তাঁর শিল্পাশ্রম বিদ্যালয়ের ইতিহাসটি ‘ভারতী’ পত্রিকা থেকে উদ্ধার করা গেল—

অন্তঃপুর কলাভবন

(সাপ্তাহিক সম্মিলনী)

[ভারতী, ভাদ্র ১৩১৯, পৃ. ৫৬৩-৬৬]

কয়েক বৎসর হইল অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে মহিলা শিল্প সমিতি কর্তৃক অন্তঃপুর কলাভবন নামে কলিকাতায় একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। মহিলা শিল্পসমিতি শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই সমিতির অন্তর্গত হিন্দু বিধবাশ্রম তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এবং অন্তঃপুর কলাভবনও তাঁহারই যত্ন ও উদ্যোগে স্থাপিত।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখন কাহারও মতভেদ নাই এবং তাহার আয়োজনও অনেক প্রকার হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যে সকল বালিকা ও মহিলারা রীতিমত স্কুল কলেজে পড়িতেছেন তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এ শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য নহে, অন্তঃপুরমধ্যে কী প্রকারে সংশিক্ষা প্রচলন হইতে পারে তাহাই আমাদের চেষ্টার বিষয়। অন্তঃপুর কলাভবনের দৈনিক ক্লাশে সাড়ে এগারোটা হইতে সাড়ে তিন ঘটিকাকাল পর্যন্ত লেখাপড়া ও রীতিমত শিল্পশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং মহিলাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। যে সকল বালিকারা বিবাহের পর সাধারণ বিদ্যালয়ে যাইতে পারেন না তাঁহাদের জন্যই ইহার বিশেষ উপযোগিতা। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা এরূপ অন্তঃপুর শিক্ষালয়েও আসিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদেরও শিক্ষার জন্য বাড়ী বাড়ী শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবার উদ্দেশ্যও সমিতির ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সমিতির প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমে কয়েকটি রমণীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু এখন ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এই কার্য্য হস্তে লওয়ায় শিল্পসমিতি ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে বলা আবশ্যক ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রবর্তিকা শ্রীমতী সরলা দেবী এবং শিল্পসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী উভয়েই পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। বস্তুতঃ ২৫-৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতি নামে সমিতির দুইটি উদ্দেশ্যই দুই ভগিনীতে ভাগ করিয়া লইয়া তাহা সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে দুইটি উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করায় ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছে।

আমাদের কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতায় বাস্তবিক পক্ষে ভদ্র পরিবারের রমণীগণ নিরক্ষরা এখন কেহই নহেন। অথচ এই জন্যই স্ত্রীশিক্ষার উপর অনেক লোকের শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা বলেন একালের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা বেশ বিন্যাসে পটু, আমোদনিরতা—থিয়েটার নবেলের পক্ষপাতী, আমাদের দিদিমাদের মত গুণসকল তাঁহাদের নাই, দয়া ধর্ম নাই, ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাটা কি ঠিক? দেশকালভেদে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং শিক্ষাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে হয়। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। আগে রেলগাড়ী ছিল না যাত্রীদের সদাসর্বদা

গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে হইত—তখন গৃহিণী রাত্রি দ্বিপ্রহরে উঠিয়া অতিথির পরিচর্যা করিতে বা আপনার অঙ্গের থালা অতিথিসেবায় দিয়া অনাহারে দিন কাটাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এখন তাহার দরকার নাই—তাই এ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু রমণীহৃদয় এই দয়া প্রকাশের জন্য সেইরূপই প্রস্তুত আছে। নূতন অবস্থায় তাহা নূতনভাবে শত দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইতেছে। অনেক নবীনা রমণী আপনার অলঙ্কার দেশের কার্যে দান করায় প্রবীণাগণ কর্তৃক কত না তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। আর এই যে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস—ইহারা স্বদেশীয়া ভগিনীগণের উন্নতির জন্য অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে শরীর মন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার তুলনা কোথায়? শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী কলিকাতার স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্পাদিকা। বস্তুত রমণীরা অনেকস্থলে সুযোগ্যভাবেই হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন না। তাঁহাদের দোষী করিবার পূর্বে অন্ততঃ সে সুযোগটুকু তাঁহাদিগকে দেওয়া চাই। সাধারণতঃ তাঁহারা যেটুকু অল্প লেখাপড়া জানেন তাহাতে বাজে নভেল পড়া ছাড়া আর কিছু কুলায় না। আমোদপ্রিয়তা একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং কর্মের অবসরে আবশ্যিক। গৃহে আমোদ পাইবার তাঁহাদের কি উপায় আছে? শিল্প বা সঙ্গীত কিছুতেই অধিকার নাই। এরূপ স্থলে থিয়েটারে যাওয়া ভিন্ন তাঁহাদের গতান্তর কি? এইরূপে নভেল পাঠ ও থিয়েটার যাওয়ার যে সুফল তাহা তাঁহাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা ত জানা কথাই। ইহার একমাত্র উপায় এমন কোন বন্দোবস্ত করা যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের এই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি সুপথে চালিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই অন্তঃপুর কলাভবনের সৃষ্টি। পূর্বে ২৫ নং লালডাউন রোড ও ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে প্রতি সপ্তাহে ইহার অধিবেশন হইত। নানা কারণে ইহার কার্য কিছুকাল স্থগিত ছিল। এখন হইতে প্রতি শনিবার বিকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত ৬ নং নলিন সরকারের স্ট্রীটে মহিলাশ্রম বাটীতে ইহার অধিবেশন হইবে। কলিকাতার মহিলাগণ ইহাতে যোগ দিলে বিশেষ আপ্যায়িত হইবে। এই সম্মিলনে কি ধনশালিনী কি গৃহস্থপত্নী কি শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা কি স্বদেশীয়া কি বিদেশীয়া সম্ভ্রান্ত রমণীগণের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইয়া মনের উৎকর্ষসাধন হইবে। ইহার কার্যবিবরণ এইরূপ:

১ম ঘণ্টা। যাহারা কোনরূপ শিল্প শিক্ষা করিতে চাহেন তাঁহাদের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। যাহারা তাহা না চাহেন তাঁহারা লাইব্রেরী গৃহে কোন পুস্তক পাঠ করিতে পারেন বা পরস্পর কথাবার্তা কহিতে পারেন।

২য় ঘণ্টা। বিশুদ্ধ সঙ্গীত বা কোন শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের পাঠ এবং ধর্মালোচনা।

—শিল্পসমিতির একজন সদস্যা

সরলা দেবী (০৯. ০৯. ১৮৭২ - ১৮. ০৮. ১৯৪৫) স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় কন্যা। পড়াশোনা বেথুন স্কুলে, তখন থেকেই তিনি স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামক দোকান থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' পত্রিকা প্রকাশিত হত। তিনি সংগীতেও অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। 'জীবনের ঝরাপাতা', 'শতগান' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। 'ভারতী' পত্রিকা দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেন। 'ভারতী' ও অন্যান্য পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ, গান, গল্প লিখেছেন। 'হিন্দুস্থান' পত্রিকাও কিছুদিন চালিয়েছেন। সরলা দেবীর 'আমাদের উচ্চশিক্ষা' (ভারতী, ভাদ্র ১৩১১, পৃ. ৪৯৯-৫০১) একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে যা মূল্যবান। সেখানে তিনি উচ্চশিক্ষা নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা একালেও গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলির আলোচনা করে বিশ্লেষণ করবেন এ বিষয়ের গবেষক।

ইন্দিরা দেবী (২৯. ১২. ১৮৭৩ - ১২. ০৮. ১৯৬০) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা। পড়াশোনা সিমলায় অকল্যাণ্ডে, পরে লরেটো কনভেন্টে, ইংরাজি সাহিত্যে বি. এ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রথম হন, পান পদ্মাবতী স্বর্ণপদক। কাকা রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহের, ছিন্নপত্রাবলীর প্রাপক। সংগীতেও সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই। অনেক রবীন্দ্রগানেও সুরারোপ করেন। ১৮৯৯ সালে বিবাহ হয় প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। ‘স্মৃতিসম্পূট’, ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’ তাঁর দুই বিখ্যাত গ্রন্থ। ‘বালক’ পত্রিকা, ‘সবুজপত্র’ পত্রিকা প্রভৃতিতে লিখেছেন। তাঁর স্মৃতিকথা গ্রন্থদ্বয়ে শিক্ষাপ্রসঙ্গ অল্প হলেও আছে। তাঁর শিক্ষাবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা হল ‘বর্তমান জ্ঞানশিক্ষাবিচার’ (ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ. ৩৮১-৩৯০) রচনাটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩১৯, পৃ. ৫৩১) এবং ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ পত্রিকায় (১৩১৯) একই বছরে প্রকাশিত হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শিক্ষাভবনার ইতিহাসে এ রচনা গুরুত্বপূর্ণ। সেই ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি।

হেমলতা দেবী (১৮৭৪ - ১৯৬৭) রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা তথা দ্বিজেন্দ্রনাথের বড় জামাই মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বোন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্নী রূপে ঠাকুরবাড়িতে তাঁর আগমন। হেমলতা দেবীর স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথের অনেক অন্তরঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঠাকুরবাড়িতে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা হয় বিদেশিনী দ্বারা। তাঁর ধর্মবিশ্বাসে, ভক্তিতে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। অ্যাড্জু, পিয়র্সনের কাছেও তিনি পড়েছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখেছেন। বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। দাদার কাছে ম্যাকলাউড স্ট্রিটে গিয়ে (১৯০৭-০৮) মাধুরীলতার সঙ্গে ছোটদের পড়বার ভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অনালোকিত থেকে গেছে। এলমহাস্টকে তিনিই বাংলা শিখিয়েছিলেন। তাঁর গল্পে শিশুশিক্ষা ও বাউল গানের নানা প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবিষয়ের গবেষক বিষয়টিকে তুলে ধরবেন। বর্তমানকালে এগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরী।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কয়েক পুরুষ ধরে জ্ঞানশিক্ষা ভাবনায় আলোড়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জ্ঞানশিক্ষা’, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞানশিক্ষাবিষয়ে একাধিক রচনা, ক্ষিতীন্দ্রপুত্র ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারত ইতিহাসে জ্ঞানশিক্ষা’, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জ্ঞানশিক্ষা’ প্রবন্ধ স্মর্তব্য। ক্ষিতীন্দ্রনাথের বোন সুসমা দেবীও (১১. ০৪. ১৮৮১ - ১৯৬৪) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছেন।

রবীন্দ্র-ভ্রাতৃপুত্রী সুসমা দেবী (সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের সপ্তম কন্যা) সেকালের পক্ষে অনেক অগ্রবর্তিনী ছিলেন। নারীপ্রগতিতে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ বিস্ময়ে আমাদের অভিভূত করে আজও। এদেশে নারীজাগৃতির জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি কলম ধরেছিলেন। তাঁর ব্যতিক্রমী জীবন ও কর্ম এ প্রজন্মের কাছে এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিলেত গিয়েছিলেন, বেড়াতে, বিনোদন করতে, স্বামীসঙ্গ দিতে। কিন্তু সুসমা দেবী রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা গমনের ১১ বছর পর ১৯২৭-এ সেখানে World Education Conference-এ ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যান একাকী। বক্তৃতায় সেখানে আলোড়ন ফেলেছিলেন (৩৮টি বক্তৃতায়)। সমকালীন দেশবিদেশের পত্রিকায় তার সংবাদও প্রকাশিত হয়। ‘বালিকা শিক্ষা সংঘ’ ছাড়াও ঠাকুরবাড়িতেও মেয়েদের এক স্কুল চালাতেন তিনি। বিড়লা পরিবারে ও গায়কোয়াড় রাজপরিবারে ইংরাজির গৃহশিক্ষিকাও ছিলেন

তিনি। নারী প্রগতিকর্মেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন দেশে ফিরেই। তত্ত্ববোধিনীতে লেখন ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী। তাছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখেছেন ‘আধুনিক ছাত্রজীবন’ (১৮৪৬ শক, পৃ. ৩৪০), ‘বাল্যবিবাহ’ (১৮৪৭ শক, পৃ. ২৬৯)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর লেখা ‘শিক্ষার তাড়না’ (১৮৪৭ শক, পৃ. ২৪৯) প্রবন্ধটি বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিশুর বিকাশ ও সামগ্রিক শিক্ষার দিকে লক্ষ ছিল তাঁর। বর্তমানকালেও তা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাজের সমাজমূল্য অপরিসীম। যার মূল্যায়ন এখনো হয়নি। গবেষক তা আলোকিত করবেন, এমন দিকনির্দেশ করা হল। এককথায়, সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর শ্রদ্ধার আসন প্রাপ্য।

বাণী দেবী (বাণী ঠাকুর) ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে অনেক গান লিখেছেন, তাঁর দাদা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সংগীতপ্রতিভা। ক্ষিতীন্দ্রনাথের দিদি প্রতিভা দেবী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে সংগীতের গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর বাড়ির অনেকে সংগীতের গুণী মানুষ ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘গীতিগুচ্ছ’, সরলা দেবীর ‘শতগান’ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সরলা দেবীর গান শুনে সেকালে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেন দেবেন্দ্রনাথ। সরলা দেবীর কণ্ঠে ‘বন্দেমাতরম’ গান আজ ইতিহাস। এহেন ঠাকুরবাড়িতে বাণী দেবী (চট্টোপাধ্যায়) সংগীতশিক্ষার ইতিহাসে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সংগীতশিক্ষাবিষয়ক অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখেন। যেমন— ‘শিশুদের সংগীত শিক্ষার প্রয়োজন’, ‘শিশু ও সঙ্গীত’, ‘সঙ্গীতচর্চার প্রয়োজন’, ‘ভারতীয় সঙ্গীতের অধ্যাত্মভাব’, ‘রাগরাগিনী ও স্বর সম্বাদের সমন্বয় সাধন’, ‘প্রকৃতির উপর রাগ-রাগিনীর প্রভাব’ প্রভৃতি। ‘Music Therapy’-র নানাদিকের আলোচনা করেছেন বাণী দেবী। বস্তুত সঙ্গীত একটি রীতিমতো বিজ্ঞানসম্মত কলাবিদ্যা। সঙ্গীতচর্চার নানাদিকের প্রতি ভাবনা ছিল বাণী দেবীর। তাঁর রচনাগুলি থেকে তা অনুধাবন করা যায়। তাঁর গানের স্কুলটিও সুনাম অর্জন করে। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতির নানাদিকে সেকালে তাঁরা ভেবেছেন, মনে রাখার মত কথা। তাঁর ভূমিকাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সেকথা আমরা খুব বেশি অবহিত নই। গবেষক সে দিকটি উদঘাটিত করবেন, সমাজমূল্য নিরূপণ করবেন, এমন দিক নির্দেশ করা হল।

পুনরায় উল্লেখ্য যে, ‘প্রকৃতির উপর রাগরাগিনীর প্রভাব’ বিষয়ে তাঁর গবেষণা এবং এ নামে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আছে। ‘Music Therapy’ এর নানাদিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলায় এবং ইংরেজিতে। ‘সঙ্গীতের মূর্তি ও সার্থকতা’ প্রবন্ধ এবং ‘Indian Music and Simultaneous Harmony’ প্রভৃতি রচনায় পাঠক তার পরিচয় পাবেন। সঙ্গীত ভাবনার আশ্চর্য পরিচয় আছে তাঁর রচনায়। ‘শিশু ও সংগীত’ রচনাটিও নতুন ধরনের। শিশু মনস্তত্ত্বের উপর গানের প্রভাব আলোচিত হয়েছে এখানে। তাছাড়া ‘শিশুদের সংগীত শিক্ষার প্রয়োজন’ রচনাটিতেও শিশুদের সংগীত শিক্ষা সম্বন্ধে নানাদিকের আলোচনা রয়েছে। মৎপ্রণীত ‘ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় সংগীতচর্চা’ গ্রন্থটিতে (পত্রলেখা, ২০১২) সমস্ত পরিচয় তুলে ধরেছি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যার স্মৃতিকথা গ্রন্থগুলিতে শিক্ষাভাবনার নানান টুকরো কথা ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সেগুলি আহরণ করলে নানা বিচিত্র শিক্ষাচিন্তার পরিচয় মিলবে, যা বাংলা শিক্ষার ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ।

ঠাকুরবাড়ির পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষাভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠাকুরবাড়ির পত্রপত্রিকায় (তত্ত্ববোধিনী, সাধনা, ভারতী, পুণ্য, বালক প্রভৃতি) শিক্ষাভাবনার অনেক কথা

দেখা যায়। ঠাকুরবাড়ির সদস্য এবং বাইরের অনেক সদস্য-এর নানাবিধ শিক্ষাচিন্তার পরিচয় মেলে। ইতিপূর্বে মৎপ্রণীত 'স্ট্রীশিক্ষা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে প্রতিভাস (২০১৩) থেকে। মৎপ্রণীত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিক্ষাভাবনা' (Bliss, ২০১৫) গ্রন্থটিও প্রকাশিত। প্রসঙ্গত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল। গবেষক অনেক উপকরণ পাবেন, আশা করা যায়।

রমাবাসী (১৮৫৮ - ০৫.০৪.১৯২২) ম্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা ১৮৭৮-তে ভ্রাতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। কলকাতার পণ্ডিতগণ তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'সরস্বতী' ও 'পণ্ডিতা' উপাধি দেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে, মূলত বাংলা ও অসমের গ্রামে গ্রামে তিনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মহিলাদের শিক্ষাদান-ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হন। ১৮৮৩ সালে তিনি পুনা থেকে ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে চেষ্টেনহ্যামের মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা হন। ১৮৮৬-তে আমেরিকা যান, ১৮৮৭-তে সেখানে 'রমাবাসী অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। ১৮৮৯-তে ভারতে ফিরে মুম্বাইয়ে 'সারদা সদন' স্থাপন করেন, হিন্দু বিধবাদের শিক্ষাদানের জন্য। তিনি অবাঙালি হলেও কলকাতা ও বাংলায় শিক্ষাদান-ব্যবস্থায় সংযুক্ত হয়েছেন অনেকটা সময়। শিক্ষাভাবনায় বাঙালি মহিয়ারী নারীদের কথা বলতে গেলে রমাবাসীর নাম প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। গবেষক বিষয়টি পূর্ণতররূপে আলোকিত করবেন।

শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৫. ০৭. ১৮৬১ - ১১. ০৪. ১৯২০) লাহোরে পিতার কাছে ৩ বছর বয়সে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং ৬ বছর বয়সে লাহোর ইউরোপিয়ান স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১০ বছর বয়সে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা দুজনেই ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠ; রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লাহোরিনী' বলে ডাকতেন। তাঁরা 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় চক্রে উৎসাহী সভ্য ছিলেন। শরৎকুমারী দেবী 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'ধ্রুব', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় অজস্র লিখেছেন বেনামে বা স্বাক্ষরহীন ভাবে। শিক্ষা বিষয়েও তাঁর অনেক রচনাদি আছে। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম' (ফাল্গুন ১৩২০, পৃ. ১১৯০ - ১১৯৩) রচনাটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁদের ভাবনাগুলি একালেও গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪ - ১৭. ০২. ১৯১৯)-এর মাত্র ৯ বছর বয়সে বিয়ে হয় সেধুরি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। স্বামীর আগ্রহে লেখাপড়া করেন। স্বামী বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস পাশ করেন। পরে স্বামীর সঙ্গে তিনিও বিলেত যান। বিলেতে নারীমুক্তির স্বরূপ থেকে উৎসাহিত হন। ১৮৮৫-তে বিলেতে 'বঙ্গমহিলা' নামে গ্রন্থ লেখেন, গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয় নারীমুক্তির কথা বলার জন্য। 'সখা' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'-এর সেবা কাজে যোগদান করেন (১৯০৯)। কলকাতার পথে ঘুরে পর্দানশিন মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তাঁর চেষ্টায় মণ্ডলের তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সেলাই, হাতের কাজ, সংগীত ও যন্ত্রবাদন শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯১৬-তে তিনি একটি বিধবা আশ্রমও করেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষা না পেলেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হন। তাঁর লেখা 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'সখা', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। মেয়েদের মুক্তি, শিক্ষার জন্য তাঁর ভূমিকা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে, যার মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ বিষয়ের গবেষকের জন্য সে কাজ তোলা থাকল।

‘ভারতী’ পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ. ১৯৩-২০২) প্রকাশিত হয় ‘ইংরাজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি’ রচনা। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা ‘জলন্ধর কন্যা বিদ্যালয়’ (ফাল্গুন ১৩২০, পৃ. ৫৩৪), ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ‘শিক্ষিতা নারী’ (আষাঢ় ১২৯৮, পৃ. ২৮৬-৯১) এবং ‘প্রতিবাদের উত্তর’ (মাঘ ১২৯৮, পৃ. ৪৭৪-৫০৮)। রচনা দুটি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গবেষক সে বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

শিক্ষাভাবনায় বাঙালি মহীয়সী নারীদের একজন হলেন কামিনী রায় (১২. ১০. ১৮৬৪ - ২৭. ০৯. ১৯৩৩), বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স। ১৮৮৬-তে এই কলেজেই শিক্ষয়িত্রীর পদে যোগদান করেন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক। ‘আলো ও ছায়া’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত (১৮৮৯) হবার পর তিনি কবিখ্যাতি পান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯৩২ - ৩৩) হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ প্রদান (১৯২৯) করে। বাংলার শিক্ষাজগৎ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

১৮৬৪-তে জন্মগ্রহণ করেন আর একজন মহীয়সী নারী। তিনি লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪ - ১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্ট্রীশিক্ষা’ প্রবন্ধের শুরুতেই আছে তাঁর কথা। তাঁর স্ট্রীশিক্ষা ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ছিল। তিনি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা তথা ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহধর্মিণী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিধবাদের তাঁর কাছে পাঠাতেন সুশিক্ষা ও সুপাত্রস্থ করার ব্যবস্থার জন্য। বহু নারী তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করেছে। তাঁর লেখা ‘জীবন কথা’ গ্রন্থ থেকে অনেক কথা জানা যায়। তিনি নিজে অনেক মহিলার শিক্ষা নিয়ে ভেবেছেন। সেকালের প্রেক্ষাপটে তা একটি উল্লেখ্য বিষয়। এ বিষয়ের গবেষক সেই ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করবেন।

‘সাহিত্য সংসদ চরিতাভিধান’, ঢাকা ‘বাংলা অ্যাকাডেমি চরিতাভিধান’, ‘সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা’, ‘বঙ্গসাহিত্যাভিধান’ প্রভৃতি বিভিন্ন চরিতাভিধানে রত্নমালা দেবীর নামের উল্লেখ দেখা যায়নি। পরবর্তী সময় প্রকাশিত ‘নারী চরিতাভিধান’-এও এই রত্নমালা দেবীর নাম আসেনি। রত্নমালা দেবীর কতিপয় গ্রন্থ সেকালে প্রকাশিত হলেও, তিনি প্রচারের আলো পাননি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তাঁর লেখা বই আছে। তাঁর লেখা ‘হিমালয় পরিভ্রমণ’ গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণে ভূমিকা লেখেন সজনীকান্ত দাস। এ গ্রন্থের সমালোচনা সমকালীন অনেক পত্রিকায় দেখা যায়। গ্রন্থটিকে নবরূপে সম্প্রতি প্রকাশ করতে পেরেছি, ‘পরশপাথর’ প্রকাশনা থেকে। মহিলা রচিত ভ্রমণ সাহিত্যে গ্রন্থটি স্মরণীয়।

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র পাঠায় তিনি লেখেন ‘স্ট্রীশিক্ষা’ (শ্রাবণ ১৮৫০ শক, পৃ. ১১৫-১১৬), ‘নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা’ (কার্তিক ১৮৫৩, পৃ. ১৯৪-১৯৬), ‘স্ট্রীশিক্ষায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার’ (অগ্র ১৮৫২ শক, পৃ. ১৯০-১৯১) প্রভৃতি। মদনমোহনকে নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। সেগুলিকে দে’জ পাবলিশিং (কমলিনী প্রকাশন বিভাগ) থেকে প্রকাশিত (২০১২) এক সংকলনে ধরা গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পত্রালাপ হত তাঁর। সেগুলি জোড়াসাঁকো প্রদর্শনশালায় রক্ষিত আছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো তাঁর এই নাতনী বাংলা শিক্ষার ইতিহাসে মর্যাদার আসন দাবি করবেন। গবেষক তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল্যায়ন করবেন।

রত্নমালা দেবীর মা প্রয়াত হওয়ার সংবাদ দেখা যায় ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় (আষাঢ় ১৮৫৪, পৃ. ১০২)-

“শোক সংবাদ/ আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গত ২৯শে জৈষ্ঠ রবিবার তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার অন্যতম সুলেখিকা শ্রী রত্নমালা দেবীর মাতাঠাকুরাণী ঊর্দনমোহন তর্কালঙ্কারের তৃতীয়া কন্যা বিনোদমালা দেবী পরলোকগত হইয়াছেন। আমরা রত্নমালা দেবীকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।” তাঁর পুত্রের মৃত্যুসংবাদও ‘তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায়’ প্রকাশিত হয়েছিল।

তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায় রত্নমালা দেবীর ‘হিমালয় পরিভ্রমণ’ গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কতকগুলি গ্রন্থের সমালোচনাও লেখেন রত্নমালা দেবী। বিষয়গুলি মনোনিবেশ দাবি করে। সেকালে শিক্ষা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লেখেন তিনি। মহিলা রচিত শিক্ষাবিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে রত্নমালা দেবী এক স্মরণীয় নাম।

শিক্ষাভাবনায় বাঙালি মহীয়সী নারীদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেগম রোকেয়া (০৯. ১২. ১৮৮০ - ০৯. ১২. ১৯৩২) একজন শিক্ষাব্রতী এবং নারী জাগরণের প্রবক্তা। পদপ্রথার শিকার হয়ে নিজে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারেননি। নিজের চেষ্টায় পড়াশোনা করেছেন। অগ্রজের সাহায্য পেয়েছিলেন শৈশবে, বিয়ের পর স্বামী সাহায্য করতেন পড়াশোনায়। স্বামী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। মেয়েদের স্কুল তৈরির জন্য তাঁর স্বামী তাঁকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর অনতিবিলম্বে তিনি ভাগলপুরে শুরু করেন ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’। ১৯১৯-এ কলকাতায় শুরু হল ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’। মেয়েদের স্কুলে আনা ও বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল তাঁর স্কুল। বর্তমানকালেও তাঁর শিক্ষা-আদর্শ প্রবাহিত। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসীম। তাঁর কথা আমরা সকলে অবহিত। তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে অনেক লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। একটি মেয়ে নিরক্ষর থাকলে সে যে ভালো মা বা স্ত্রী হতে পারে না, এ কথা তাঁর লেখায় বারে বারে এসেছে। তিনি নারীমুক্তি, নারীশিক্ষার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

শান্তা দেবী (২৯. ০৪. ১৮৯৩ - ৩০. ০৫. ১৯৮৪) ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। শৈশব কাটে এলাহাবাদে। ১৯০৯ সালে কলকাতার বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৪-এ বি. এ.-তে প্রথম হন। পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, গণিত ও অর্থনীতিতে পারদর্শী হয়ে উঠেন। ১৯১২-তে ছাত্রাবস্থায় শ্রীশচন্দ্র বসুর ‘Folk Tales of Hindusthan’ ‘হিন্দুস্থানী উপকথা’ নামে অনুবাদ করেন। চিত্রকলাতেও দক্ষতা অর্জন করেন। আমেরিকা প্রবাসে মিনেসোটার ম্যাকালেস্টার কলেজে বাংলা সাহিত্য নিয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন (১৯৫২-৫৩)। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন (১৯৪১) ‘ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা’ গ্রন্থটির জন্য। অনেক গল্প-উপন্যাস-শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি শিক্ষা নিয়েও তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা ‘নারী শিক্ষা সমিতি’ (বৈশাখ ১৩২৮, পৃ. ৮৫), ‘নারীদের চারু ও কারু শিল্প শিক্ষা’ (মাঘ ১৩৩৩, পৃ. ৫২৫) প্রভৃতি। নারীশিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনার প্রমাণ রচনাগুলি। সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এইগুলির যথাযথ মর্যাদা প্রাপ্য। কাননকুমারী দেবী ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় লেখেন ‘স্ত্রীশিক্ষা’ (বৈশাখ ১৩১৯, পৃ. ১১৮) নামক প্রবন্ধ। তাঁর

পরিচিতি না জানা গেলেও বাংলা শিক্ষার ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি, নারীজাগরণ প্রবক্তা হিসেবে। বাংলার সমাজ ইতিহাসে তিনি প্রণম্য।

সত্যবালা দেবীর লেখা ‘বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৮, পৃ. ১৪৭)। কাননকুমারী দেবী ও সত্যবালা দেবীর রচনাগুলির প্রকাশকাল থেকে বোঝা যায়, তাঁরা অনেক পূর্বের লেখিকা। সেসময় মহিলা রচিত বাংলা শিক্ষামূলক প্রবন্ধ হিসেবে সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যবালা দেবীরও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

‘বঙ্গনারী’ নামে ‘ভারতী’ পত্রিকায় একটি স্ত্রীশিক্ষামূলক রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ছদ্মনাম হলেও লেখিকা যে একজন মহিলা, এমন নিশ্চিত ধারণা পোষণ করা যায়। রচনাটির নাম— ‘স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ. ৭৫৮-৭৬৫)

লীলা রায় (০২. ১০. ১৯০০ - ১১. ০৬. ১৯৭০) বেথুন কলেজে স্নাতক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. (১৯২৩), প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। মহিলাদের কল্যাণের জন্য গঠন করেন ‘দীপালী সংঘ’ (১৯২৩)। ‘দীপালী সংঘের’ উদ্যোগে অনেকগুলি উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২৬-এ ‘দীপালী ছাত্রী সংঘ’ নামে ছাত্রী সংগঠন (ভারতে প্রথম) ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি চর্চার সূচনা করে। ১৯৩০ সালে মহিলাদের আবাস ‘ছাত্রীভবন’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১-এ ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেও, বাংলার নারীশিক্ষার ইতিহাসে তিনি এক আলোকিত অধ্যায়। তাঁর নারীজাগরণের ভাবনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলার সমাজ ইতিহাসে তিনি অমর। বাংলার সমাজ ইতিহাসে তাঁর স্থানটিকে সু-চিহ্নিত করতে চাইছি।

‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ’ (কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ২৯৯-৩০৫) এবং নিরুপমা দেবীর ‘হিন্দুবালিকার শিক্ষা’ (ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ১০২-১০৫) রচনাগুলি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এমন নমুনা খুঁজলে আরো কিছু পাওয়া যেতে পারে।

বাঙালি মহিলাদের শিক্ষাভাবনার আলোচনার শেষে দুজন অবাঙালি মহিলার নাম করে প্রবন্ধ শেষ করা যায়। একজন অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭ - ১৯৩৩) এবং অন্যজন সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯)। অবাঙালি হলেও বাঙালি শিক্ষাভাবনার ক্ষেত্রে তাঁদের নাম স্মর্তব্য। বাংলার সমাজ ইতিহাসে তাঁর শ্রদ্ধার আসন প্রাপ্য।

উপসংহার:

বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে আলোচ্য মহিলারা সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন, যা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদের ভূমিকার মূল্যায়ন আজও হয়নি। গবেষকের জন্য সে কাজ তোলা থাকল, আশা করব অদূর ভবিষ্যতে তা পূরণ হবে। সেকালে নানা প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা কঠিন ব্রত পালন করেছিলেন। শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে বাঙালি মহীয়সী নারীদের ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করে তোলা হল সংক্ষিপ্ত পরিসরে। সেকালে অন্ত:পুর শিক্ষা ছিল মেয়েদের জন্য। মেয়েদের শিক্ষার ছিল নানা প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু এক একজন অগ্রণী মহিলা নারী শিক্ষার জন্য যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়, বর্তমান রচনায় যার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। নারীর মুক্তি, নারীশিক্ষা, নারী জাগরণ সকলেরই মূল ভাবনা ছিল। তাই বাঙালি মহীয়সী নারীদের শিক্ষাভাবনা গবেষণার দাবি রাখে।

সহায়ক গ্রন্থ

- ১। রীত, প্রত্যাশকুমার, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : প্রসঙ্গ শিক্ষা, ২০১৫, ব্লিস, কলকাতা, পৃ. ১৬৭।
- ২। রীত, প্রত্যাশকুমার, স্ত্রীশিক্ষা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃ. ১২৮।
- ৩। রীত, প্রত্যাশকুমার, ঠাকুরবাড়ির সুষমা, ২০১১, পারুল, কলকাতা, পৃ. ২২৪।
- ৪। সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, ১৯৭৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৮৯২।
- ৫। রীত, প্রত্যাশকুমার, ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় সঙ্গীতচর্চা, ২০১২, পত্রলেখা, কলকাতা, পৃ. ২৬৪।
- ৬। রীত, প্রত্যাশকুমার, বাঙালি নারীর ভ্রমণকথা, ২০২০, এসবিএস পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩২০।
- ৭। রীত, প্রত্যাশকুমার, স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথা, ২০১২, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ৩২০।
- ৮। রীত, প্রত্যাশকুমার, সরলা দেবীর ভ্রমণকথা, ২০২১, লোক সেবা শিবির, নদিয়া, পৃ. ১৭৬।
- ৯। রীত, প্রত্যাশকুমার, সুষমা দেবীর শ্রীনগরের পথে, ২০১০, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৭২।
- ১০। রীত, প্রত্যাশকুমার, রত্নমালা দেবীর হিমালয় পরিভ্রমণ, ২০১৪, পরশপাথর, কলকাতা, পৃ. ২০৮।
- ১১। রীত, প্রত্যাশকুমার, রত্নমালা দেবীর মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ২০১৩, কমলিনী প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৭২।
[এটি লেখকের জাতিত বিবেক ও মাতৃশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ]।

মুক্তি প্রসঙ্গে মন : সাধারণ মানুষ, বিশেষত কায়ব্যূহকারী যোগীর

মুক্তিলাভ প্রক্রিয়া

পিউ চক্রবর্তী

অতিথি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মোক্ষ বা অপবর্গ প্রাপ্তির কথা বলতে গিয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেছেন, শাস্ত্রের যথাযথভাবে অধ্যয়ন বা তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়। শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা তত্ত্বজ্ঞানের ফলে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মসাক্ষাৎকার হতে পঞ্চক্লেশের নিবৃত্তি হয়। পঞ্চক্লেশের নিবৃত্তি হলে মুমুক্শু সাধক তখন নিকাম কর্ম করতে থাকেন। এর ফলে ধীরে ধীরে ফলভোগ পরিসমাপ্ত হয়। ফলভোগের এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হলে যোগবলে কায়ব্যূহ করার উপায়ও শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। এখন কায়ব্যূহকারী যোগীর জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়া আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞান যে মনের গুণ নয়, আত্মার গুণ এই প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এছাড়াও প্রশ্ন থেকে যায়, কায়ব্যূহকারী যোগী ফলভোগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে গিয়ে তার নিজনির্মিত শরীরের সমানসংখ্যক মন কোথা থেকে পান, তা কি নতুন করে সৃষ্টি করেন? কিন্তু মন যদি নিত্য হয়, তাহলে তিনি তা সৃষ্টি করতে পারেননা। তাহলে কি যোগী নিজ শক্তিবলে মুক্ত পুরুষাদিগণের মনকে আকর্ষণ করেন নতুন শরীরের ক্ষেত্রে? – এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: মন, শরীর, আত্মা, কায়ব্যূহ, ইন্দ্রিয়, অপবর্গ।

মূল আলোচনা: ন্যায় মতে, মোক্ষ বা অপবর্গ হল একুশ প্রকার দুঃখের আতাত্তিক নিবৃত্তি^১। শরীর, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়, ছয় প্রকার বিষয়, ছয় প্রকার বিষয়ের জ্ঞান, সুখ ও মূলদুঃখ – এই হল একুশ প্রকার দুঃখ। এই একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে মূল দুঃখই প্রকৃত দুঃখ, আর ইন্দ্রিয়, বিষয়, বিষয়ানুভব এবং শরীর মূলদুঃখের সাধন হওয়ায় তারাও দুঃখ রূপে গণ্য। বৈশেষিক মতে, আত্মার জ্ঞান প্রভৃতি নয়টি বিশেষগুণের উচ্ছেদসাধনই হল মুক্তি।

এই অপবর্গ প্রাপ্তি কীভাবে সম্ভব – তা বলতে গিয়ে নৈয়ায়িকার্চাৰ্যগণ বলেছেন – মুমুক্শু সাধকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হল শাস্ত্রের যথাযথভাবে অধ্যয়ন। যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম বা রূপ, সেটিই তার তত্ত্ব। ন্যায়মতে দ্বাদশ প্রমেয়ের অন্তর্গত আত্মার যথার্থ স্বরূপজ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হলে সাংসারিক বিষয়সমূহের দুঃখসমূহ প্রভৃতি দোষের দর্শন হয়। –দোষসমূহের দর্শনের ফলে বিষয়সমূহের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়। বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য হতে ব্যক্তির মোক্ষ বা অপবর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছা প্রবল হয়। তখন মুমুক্শু ব্যক্তি পরিণামে দুঃখপ্রদ বিষয়ের চিন্তা না করে যোগশাস্ত্রবিহিত ধ্যানবিধি অনুসারে আত্মার বাস্তবস্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত হন। এভাবে সুদীর্ঘকালযাবৎ আত্মচিন্তনের ফলে মুমুক্শু সাধকের চিন্তন পরিপক্ব হয়, এবং তার ফলে যথাসময়ে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মসাক্ষাৎকার হতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশরূপ পঞ্চক্লেশের নিবৃত্তি হয়। ক্লেশরূপ দোষের নিবৃত্তি হলে মুমুক্শু সাধক তখন নিকাম কর্ম করতে থাকেন। নিকাম কর্ম থেকে তখন আর নতুন করে ধর্মাধর্মের সংঘর্ষ হয় না। সাধক এই অবস্থায় কেবল পূর্বজন্ম

অর্জিত ধর্মাধর্ম হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যোগাভ্যাসের ফলে প্রাপ্ত শক্তির দ্বারা সেইসব অর্জিত ধর্মাধর্মকে জেনে একই সঙ্গে অর্থাৎ যুগপৎ ধর্মাধর্মের ফলভোগ করতে থাকেন। একইসঙ্গে ফলভোগ করার অর্থ হল সাধককে অর্জিত ধর্মাধর্মের ফলভোগ করতে হলে যে যে যোনিতে শরীর ধারণ করতে হবে, সেই সময় যোনির শরীরকে যোগবলে একইসঙ্গে রচনা করে অর্থাৎ কায়ব্যূহ সৃষ্টি করে এইসব শরীরের দ্বারা একইসঙ্গে পূর্বজন্মের সমস্ত কর্মের ফলভোগ করা^২। এভাবে কায়ব্যূহ (একাধিক শরীর) রচনা করে কর্মফল ভোগ করলে অতিশীঘ্র ফলভোগ পরিসমাপ্ত হয়। যে কর্মসমূহের ফলভোগের জন্য বর্তমান শরীর ধারণ, সেই প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগও একই সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ পরিসমাপ্ত হলে বর্তমান শরীর বিনষ্ট হয়। পুনরায় নবীন শরীর উৎপত্তির কারণীভূত ধর্মাধর্মের অভাবে তখন নবীন শরীরের উৎপত্তি রুদ্ধ হয়। তার ফলে শরীর পরিগ্রহরূপ জন্ম না হলে শরীরাদি একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। অর্থাৎ শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মাতেই সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। জীবের জন্ম রুদ্ধ হলে শরীরের অভাবে শরীরের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন আত্মাতে সুখদুঃখের অনুভব হয় না। তখন সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। -এভাবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ।

অপবর্গ প্রাপ্তির এই প্রক্রিয়ায় (কায়ব্যূহ রচনা করে মোক্ষ প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ায়) অধিক যোগসাধনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং মুমুক্শু সাধক যদি যোগসাধনায় সম্যকরূপে সিদ্ধ না হন, তাহলে পূর্বপূর্ব অসংখ্যজন্মের অর্জিত কর্মরাশিকে এবং এইসব কর্মরাশির ফলভোগের জন্য বিভিন্ন যোনির শরীর সমূহকে জানতে সমর্থ হবেন না। তার ফলে কর্মফল ভোগের জন্য যোগশক্তিলভ্য কায়ব্যূহ রচনা করতেও সমর্থ হবেন না। তখন ঐ মুমুক্শু ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় আর এক প্রক্রিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। মুমুক্শু ব্যক্তির উচিত, সর্বপ্রথম কাম্যকর্মের পরিত্যাগ করে ক্রিয়মান কর্মের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া। - তার ফলে নিত্য, নৈমিত্তিক^৩ ও নিক্শাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা নতুন ধর্মাধর্মের সঞ্চয় অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তখন সাধকের উচিত সঙ্কীর্ণ কর্মের পাহাড়কে ধ্বংস করা, আর তার জন্য প্রয়োজন হয় তত্ত্বজ্ঞানের।

এখন, কায়ব্যূহকারী যোগী পুরুষের জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তার পূর্বে জ্ঞান যে মনের গুণ নয়, আত্মার গুণ, সেই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা না করলে কায়ব্যূহকারী যোগীর জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়া বোধগম্য হওয়া দুষ্কর হবে বলে মনে হয়।

জ্ঞান মনের গুণ নয়, যেহেতু যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না^৪ - যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে গন্ধাদি নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, তা মহর্ষি গৌতমের সিদ্ধান্ত। যুগপৎ গন্ধাদি নানা বিষয়ের অপ্রত্যক্ষই মনের লিঙ্গ, অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম মনের অনুমাপক - তা মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের ষোড়শ সূত্রে দেখিয়েছেন^৫। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যে মন অনুমিত হয়, জ্ঞান তার গুণ নয়, অর্থাৎ সেই মন জ্ঞাতা বা জ্ঞানের কর্তা না হওয়ায় জ্ঞান তার গুণ হতে পারে না, যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা জ্ঞান তাঁরই গুণ। কারণ জ্ঞাতা স্বতন্ত্র, জ্ঞানের করণ ইন্দ্রিয়াদি ঐ জ্ঞাতার বশ্য। স্বাতন্ত্র্যই কর্তার লক্ষণ। অচেতন পদার্থের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তা কর্তা হতে পারে না। কর্তা ও করণাদি মিলিত হলে তন্মধ্যে কর্তাকেই চেতন বলে বুঝতে হয়। করণাদি অচেতন পদার্থ ঐ চেতন কর্তার বশ্য। কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যাভীত অচেতন কোন কার্য জন্মাতাই পারে না। জ্ঞাতা চেতন, সুতরাং বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র। জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়াদি করণের দ্বারা জ্ঞানাদি করেন,

এজন্য ইন্দ্রিয়াদি তার বশ্য। “জ্ঞান যার গুণ” – এই অর্থে জ্ঞাতাকে “জ্ঞানগুণ” বলা যায়। মনকে “জ্ঞানগুণ” বললে মনের করণত্ব থাকে না, জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু মন অচেতন, সুতরাং তার জ্ঞাতৃত্ব থাকতে পারে না। যদি কেউ বলেন, মনকে চেতনই বলব – মনকে জ্ঞানগুণ বলে স্বীকার করলে তা চেতনই হবে। তাঁদের উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন, ঘ্রাণাদি করণবিশিষ্ট জ্ঞাতারই গন্ধাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষ হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষের করণরূপে ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়, এবং সুখাদির প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির করণরূপে বহিরিন্দ্রিয় হতে পৃথক অন্তরিন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়। সুখাদির প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির করণরূপে যে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়, তাই মন এবং তা জ্ঞানের কর্তা নয়, তা জ্ঞানের করণ, সুতরাং জ্ঞান তার গুণ নয়। কেউ বলতে পারেন, জ্ঞান মনেরই গুণ, মন চেতন পদার্থ, তাহলে ঐ মনকেই জ্ঞাতা বলতে হবে। কিন্তু একই শরীরে দুটি চেতন পদার্থ থাকলে জ্ঞানের ব্যবস্থা হতে পারে না। সুতরাং এক শরীরে একটি চেতনই স্বীকার করতে হবে। তাহলে, পূর্বপক্ষবাদীদের কথিত জ্ঞানরূপ গুণবিশিষ্ট মনের নাম “আত্মা” এবং সুখ-দুঃখাদি ভোগের সাধনরূপে স্বীকৃত অন্তঃকরণের নাম “মন” – এইরূপে সংজ্ঞাভেদই হবে, পদার্থভেদ হবে না। জ্ঞাতা ও তার সুখ-দুঃখাদি ভোগের সাধন পৃথকভাবে স্বীকার করলে নামমাত্রে কোন বিবাদ থাকে না। মূলকথা, মহর্ষি যেরূপে মনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা কখনোই জ্ঞাতা হতে পারে না, অর্থাৎ জ্ঞান তার গুণ হতেই পারে না।

সূত্রোক্ত^৭ “চ” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার অন্য হেতুর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘যেহেতু যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, ইহা “চ” শব্দের অর্থ’। অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নয়, তা সিদ্ধ করতে মহর্ষি এই সূত্রে সকল মানুষের যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধিকে প্রথম হেতু বলে গণ্য করে, “চ” শব্দের দ্বারা কায়বূহস্থলে যোগীর নানা দেহে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় –তাকে দ্বিতীয় হেতু বলেছেন। তাহলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে সূত্রের অর্থ করতে হবে –“যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধি বশতঃ এবং কায়বূহকারী যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিবশতঃ জ্ঞান মনের গুণ নয়”। ভাষ্যকার তাঁর ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অণিমাদি সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হলে পর যোগী তখন “বিকরণধর্মা” অর্থাৎ অযোগী ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়াদি করণ হতে বিলক্ষণ করণবিশিষ্ট হয়ে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত নানা শরীর নির্মাণপূর্বক সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ যোগী অবিলম্বেই মুক্তিলাভে ইচ্ছুক হয়ে নিজ শক্তির দ্বারা নানা স্থানে নানা শরীর নির্মাণ করে সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ তাঁর অবশিষ্ট প্রারন্ধ কর্মফল নানা সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। যোগীর ক্রমশঃ বিলম্বে সেই সমস্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হলে তাঁর মুক্তিলাভে বহু বিলম্ব হয় এবং তাঁর কায়বূহ নির্মাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পূর্বোক্তরূপ নানা দেহ নির্মাণই যোগীর “কায়বূহ” –এইরূপ হল যোগশাস্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলী বলেছেন, কায়বূহকারী যোগী তাঁর নিজনির্মিত শরীরের সমসংখ্যক মনেরও সৃষ্টি করেন^৮। কিন্তু ন্যায়মতে মনের নিত্যাবশতঃ মনের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই, মুক্তি হলেও তখন আত্মার ন্যায় মনও থাকে। এইজন্যই তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়মতানুসারে বলেছেন যে, কায়বূহকারী যোগী মুক্ত পুরুষাদিগের মন সমূহকে আকর্ষণ করে তার নিজনির্মিত শরীরসমূহে প্রবিষ্ট করেন। কারণ মনঃশূণ্য শরীরে সুখ-দুঃখ ভোগ হতে পারে না। সুতরাং যোগীর সেই সমস্ত শরীরেও মন থাকা আবশ্যিক। তাই তাৎপর্যটীকাকার ঐরূপ কল্পনা করেছেন। আবশ্যিক বুঝলে কোন যোগী নিজ শক্তির দ্বারা মুক্ত পুরুষাদিগের

মনকে আকর্ষণ করে নিজ শরীরে গ্রহণ করতেই পারেন, তা অসম্ভবও নয়, যদিও এবিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু, যদি কায়ব্যূহকারী যোগী তাঁর সেই নিজনির্মিত শরীরসমূহে মুক্ত পুরুষাদিগের মনকেই আকর্ষণ করে প্রতিষ্ঠ করেন, তাহলেও ঐ সমস্ত মনকে তখন তাঁর সুখ-দুঃখের ভোজ্য বলা যায় না। কারণ, মুক্ত পুরুষাদিগের মনে অদৃষ্ট না থাকায় তা সুখ-দুঃখের ভোজ্য হতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বলাও যায় না, ঐ সমস্ত মন তখন সেই যোগীর সেই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না। আর যদি পতঞ্জলির সিদ্ধান্তানুসারে যোগীর সেই সমস্ত শরীরে পৃথক মনের সৃষ্টিই স্বীকার করা হয়, তাহলেও ঐ সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বলা যায় না। কারণ, পূর্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা জ্ঞাতার নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়েছে। কায়ব্যূহকারী যোগী প্রারব্ধ কর্ম বা অদৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত নানা শরীরে যুগপৎ নানা সুখ-দুঃখের ভোগ করেন, সেই অদৃষ্টবিশেষ তাঁর নিজনির্মিত সেই সমস্ত মনে না থাকায় ঐ সমস্ত মন তাঁর সুখ-দুঃখের ভোজ্য হতেই পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বলা যায় না। জ্ঞান ঐ সমস্ত মনের গুণ হতেই পারে না। সুতরাং মনকে জ্ঞাতা বলতে হলে জ্ঞান মনেরই গুণ - এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে হলে পূর্বোক্ত স্থলে কায়ব্যূহকারী যোগীর পূর্বদেহস্থ সেই নিত্য মনকেই জ্ঞাতা বলতে হবে। কিন্তু ঐ মনের অণুত্ববশতঃ সেই যোগীর সমস্ত শরীরের সহিত যুগপৎ সংযোগ না থাকায় ঐ মন যোগীর সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞাতা হতে পারে না। সমস্ত শরীরে জ্ঞাতা না থাকলে সমস্ত শরীরে যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু পূর্বোক্ত যোগী যখন যুগপৎ নানা শরীরে নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি করেন, - তা স্বীকার করতে হবে, তখন ঐ যোগীর সেই সমস্ত শরীরসংযুক্ত কোন জ্ঞাতা আছে, অর্থাৎ জ্ঞাতা বিভূ - তাই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য্য। তাই ভাষ্যকার বলেছেন যে, যোগীর নানাস্থানস্থ নানা শরীরে যে যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তি, তা জ্ঞাতা বিভূ হলেই উপপন্ন হয়, অতি সূক্ষ্ম মন জ্ঞাতা হলে তা উপপন্ন হয় না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, মনকে জ্ঞাতা বলে তাকে বিভূ বলে স্বীকার করব, তাহলে পূর্বোক্তস্থলে অনুপপত্তি নেই। এজন্য ভাষ্যকার বলেছেন যে, মনকে জ্ঞাতা বলে বিভূ বললে সেই পক্ষে জ্ঞানের আত্মগুণত্বের খন্ডন হবে না। অর্থাৎ তখন আত্মারই নামান্তর হবে “মন”। সুতরাং বিভূ জ্ঞাতাকে “মন” বলে স্বীকার করে তার জ্ঞানের সাধক পৃথক অতিসূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয় অন্য নামে স্বীকার করলে বস্তুতঃ জ্ঞান আত্মারই গুণ তাই স্বীকৃত হয় - নামমাত্রে কোন বিবাদ থাকে না। যদি কেউ বলে যে, মন অন্তঃকরণভূত অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় বলেই স্বীকৃত এবং তাকেই বিভূ হওয়ায় তাকেই জ্ঞাতাও বলব, এবং তা হতে অতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা স্বীকার করব না, অন্তরিন্দ্রিয় মনই জ্ঞাতা অর্থাৎ কর্তা - এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। তার উত্তরে ভাষ্যকার বলেছেন যে, তাহলে ঐ বিভূ মনের সর্বদা সর্বেন্দ্রিয়ার সহিত সংযোগ থাকায় সকলেরই যুগপৎ সর্বেন্দ্রিয় জন্ম নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে। অর্থাৎ ঐ আপত্তিবশতঃ অন্তরিন্দ্রিয় মনকে বিভূ বলা যায় না। মহর্ষি কণাদ ও গৌতম জ্ঞানের যৌগপদ্য অস্বীকার করে মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নানা স্থানে জ্ঞানের অযোগ্যপদ্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে নিজ বক্তব্যের সমর্থন করেছেন। কায়ব্যূহস্থলে যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হলেও অন্য কোন স্থলে কারোরই যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মায় না - এইরূপ বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত। কিন্তু, অন্যান্য সম্প্রদায় তা একেবারেই স্বীকার করেন না। সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সম্প্রদায় স্থলবিশেষে জ্ঞানের যৌগপদ্যও স্বীকার করেছেন। সুতরাং তাঁরা মনের অণুত্বও স্বীকার করেন না। তবে, জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করে মনকে অণু না বললেও সেই মতেও মনকে জ্ঞাতা

বলা যায় না। কারণ, যে মন, জ্ঞানের করণ বলে সিদ্ধ তা জ্ঞানের কর্তা হতে পারে না। অন্তরিন্দ্রিয় মন, জ্ঞানকর্তা জ্ঞাতার বশ্য, সুতরাং তার স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তাকে জ্ঞানকর্তাও বলা যায় না। আর জ্ঞানকর্তা না হলে জ্ঞান তার গুণও হতে পারে না।

সুতরাং, ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন হল অন্তরিন্দ্রিয়। এই মন প্রত্যেক প্রাণিশরীরে সংখ্যায় একটি করে, প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, নিত্য এবং অণুস্বরূপ। তাই বলে এমন নয় যে, আত্মার একত্বের জন্য মনের একত্ব, বরং, দেহের একত্বের জন্যই মনের একত্ব স্বীকার্য। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার মুক্তি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার সাথে মনের সম্বন্ধ অটুট থাকে। আত্মা মুক্ত হয়ে গেলে মন তখন নিরর্থক হয়ে যায়। এই অবস্থায় ঐ মনকে যন্ত মন, নপুংসক মন প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। তবে কখনও কখনও এইসব নপুংসক মনকে যোগীরা কাজে লাগান। যখন কোন যোগীর মুক্ত হওয়ার কামনা প্রবল হয়, তখন তিনি ভোগের দ্বারা প্রারম্ভ কর্মের অতিশীঘ্র সমাপ্তির জন্য (যেহেতু কেবল ভোগের দ্বারাই প্রারম্ভ কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) একই সঙ্গে অনেক শরীর সৃষ্টি (ধারণ) করেন। -একেই বলা হয় কায়বুহ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী কায়বুহ করলে এক আত্মারই অনেক দেহের জন্য অনেক মনের অপেক্ষা হয়। অল্পভট্ট মন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন “একৈকস্যাত্মনঃ একৈকং মনঃ”^{১০} - এই কথাটি হয়ত তিনি কায়বুহ প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেই করেছেন। বস্তুতঃ প্রতিদেহে মন ভিন্ন ভিন্ন। -এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে - যতোসংখ্যক আত্মা ততোসংখ্যক মন স্বীকার করলে কায়বুহকারী যোগী দেহসমানসংখ্যক মন সংগ্রহ করেন কিরূপে? নিত্য হওয়ার জন্য শরীরের মতো মন তো আর তৈরী করে নেওয়া যায় না? উত্তরে ন্যায় ও বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন - যে সমস্ত পুরুষ মুক্তিলাভ করেছেন তাদের পরিত্যক্ত অনুপযোগী যন্তমনকে^{১১} গ্রহণ করে সেই মনগুলির সাহায্যে যোগী সমস্ত শরীরে একই সঙ্গে বিভিন্ন কর্মের (বিভিন্ন প্রারম্ভ কর্মের) ফলভোগ করতে থাকেন। -কারণ একটিমাত্র শরীরের দ্বারা সমস্ত প্রারম্ভ কর্মের ভোগ করতে যত সময় লাগে, অনেক শরীরে সেই প্রারম্ভ কর্মের ভোগ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রারম্ভ কর্মের ভোগ হয়ে যায়। তার ফলে যোগী অতিশীঘ্র মুক্তিলাভ করেন।

ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যগণ মনের সাহায্যে জন্মান্তরগ্রহণ প্রক্রিয়ারও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁরা মৃত্যুর পরক্ষণেই মনের বিনাশ স্বীকার করেন না। মৃত্যুর পরেও যে মন থাকে, তা শ্রুতিসিদ্ধও। মহর্ষি কণাদ ও গৌতম সূক্ষ্ম শরীরের কোন উল্লেখ করেননি। তাঁদের মতে, নিত্য মনই অদৃষ্টবিশেষবশতঃ অভিনব শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং মৃত্যুকালে বহির্গত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদ বলেছেন যে, মৃত্যুকালে জীবের অতিবাহিক শরীর নামে এক শরীরের উৎপত্তি হয়, - তার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে জীবের মনই স্বর্গ ও নরকে গমন করে শরীরান্তরে প্রবিষ্ট হয়। প্রশস্তপাদের উক্ত মতই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সম্মতও বুঝতে হবে। মৃত্যুকালে অতিবাহিক শরীর বিশেষের উৎপত্তি ধর্মশাস্ত্রেও কথিত আছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিত, তর্কভাষ্য, দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, পৌষ ১৪১৫ (প্রথম প্রকাশ), পৃষ্ঠা-৪৬৭।
- ২। ঐ, পৃষ্ঠা-৪৭০।

- ৩। “কর্ম” শব্দের দ্বারা কর্মজনিত শক্তি এবং কর্মফল উৎপাদনের সুপ্ত শক্তিকে বোঝায়। এই অর্থে কর্ম দুই প্রকার - ১। অনারন্ধ কর্ম এবং ২। আরন্ধ বা প্রারন্ধ কর্ম। যে কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু যার ফলভোগ শুরু হয়নি, তাই অনারন্ধ কর্ম; এবং যে কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এবং যার ফলভোগও শুরু হয়েছে, তাই প্রারন্ধ কর্ম। অনারন্ধ কর্ম আবার দুই প্রকার - প্রাক্তন বা সঞ্চিত (অতীত জীবনে কৃতকর্ম), এবং সঞ্চিয়মান কর্ম (বর্তমান জীবনে কৃতকর্ম)। - Chatterjee, S.C.; and Dutta D.M; *An Introduction to Indian Philosophy*; 1960; page-15,16.
- ৪। যা না করলে সঞ্চিত পাপ থেকে যায়, তাই নিত্যকর্ম, যেমন-সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি; আর যে কর্মসমূহ কোনও নিমিত্ত উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলে নৈমিত্তিক কর্ম, যেমন-পুত্র লাভ করার জন্য পুত্রেষ্ট্রি যজ্ঞ প্রভৃতি। - ভট্টাচার্য্য, সুখময়; *পূর্বমীমাংসা দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ১৯৮৩ (প্রথম প্রকাশ), পৃষ্ঠা-৯১।
- ৫। “যুগপজ্জ্ঞেয়ানুপলক্বেশ ন মনসঃ” - ন্যায়সূত্র-১৯/২৯০- গৌতম সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী সহিত), *ন্যায়দর্শন*, তৃতীয় খন্ড, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৭৩, ১৯৮২ (ডিসেম্বর), পৃষ্ঠা-২৩৩।
- ৬। “যুগপজ্জ্ঞানানুপলক্বেশ ন মনসঃ” -ন্যায়সূত্র-১৬ - গৌতম সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী সহিত), *ন্যায়দর্শন*, প্রথম খন্ড, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৭৩, ১৯৮১ (জুলাই), পৃষ্ঠা-২২২।
- ৭। “যুগপজ্জ্ঞেয়ানুপলক্বেশ ন মনসঃ” - ন্যায়সূত্র-১৯/২৯০- গৌতম সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী সহিত), *ন্যায়দর্শন*, তৃতীয় খন্ড, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৭৩, ১৯৮২ (ডিসেম্বর), পৃষ্ঠা-২৩৩।
- ৮। “নির্মাণচিহ্নান্যস্মিতামাত্রাৎ” - সূত্র ৪/৪ - মহর্ষি পতঞ্জলী, *যোগদর্শন*।
- ৯। “একৈকস্যাত্মন একৈকং মন আবশ্যকমিত্যাত্মনামনেকত্বান্ননসোহপ্যনেকত্বমিত্যর্থঃ পরমাণুরূপমিতি।।” - শ্রীমদনগ্ণভট্টবিরচিতঃ, *তর্কসংগ্রহদীপিকা*, বঙ্গানুবাদ-শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, আশ্বিন-১৩৯০ (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ), পৃষ্ঠা-১৯৫।
- ১০। শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিত, *তর্কভাষ্য*, দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, পৌষ ১৪১৫ (প্রথম প্রকাশ), পৃষ্ঠা-৪৫৯, ৪৬০।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেহ-মনের সম্পর্ক : দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ

তপন রুইদাস

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: আমার এই গবেষণামূলক পত্রিকায় মূল আলোচনার বিষয় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন-চর্চায় দেহ-মন সম্পর্কিত তত্ত্ব। বিশেষত: আধুনিক পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজকে অনুসরণ করে এই তত্ত্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি মূলত দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ কীভাবে দেহ ও মনের প্রকৃত স্বরূপকে (Essence) প্রতিপাদন করেছেন? তাদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বর্তমান? এই সম্বন্ধের ভিত্তি কি? উক্ত জিজ্ঞাসু গুলিকে সামনে রেখে একটি তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। আধুনিক দর্শন-চর্চায় দেকার্ত, লাইবনিজ দেহ ও মনকে দ্রব্য (Substance) রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু দেকার্ত দেহকে বিস্তারযুক্ত জড় (Material Substance) ও মনকে চিন্তায়ুক্ত চেতন দ্রব্য-রূপে (Spiritual Substance) স্বীকার করেছেন। এছাড়া, দেহ ও মনের নিবিড় সম্বন্ধের ভিত্তিস্বরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Interaction) উল্লেখ করে, তিনি কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে, লাইবনিজ দেহকে বিস্তারযুক্ত জড় রূপে স্বীকৃতি না দিয়ে, দেহ ও মনকে অন্তর্নিহিত শক্তির তারতম্য ব্যতীত চেতন দ্রব্য বলেছেন। সাথে সাথে তিনি দেহ ও মনকে জীবন দর্পণ (Living Mirror) ও গবাক্ষহীন (Windowless) চিং-পরমাণু রূপে অভিহিত করে কার্যকারণ সম্বন্ধকে অস্বীকার করে, তাদের সম্বন্ধের হেতুরূপে পূর্ব-স্থাপিত সামঞ্জস্য নিয়মের (Pre-established Harmony) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু স্পিনোজা এই সমস্ত অভিমতকে নস্যৎ করে, দেহ ও মনকে তথা বিস্তার ও চিন্তাকে গুণ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি পরস্পর দৈহিক অথবা পরস্পর মানসিক অবস্থার কার্যকারণ সম্বন্ধের কথা স্বীকার করলেও, দেহের সাথে মনের সরাসরি কোন কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি নজর না দিয়ে, একমাত্র পরম দ্রব্যের দুটি দিক হিসাবে দেহ ও মনের সহ-পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সূচক শব্দ: দ্রব্য, গুণ, বিকার, কার্য-কারণ, প্রত্যক্ষণ, সংপ্রত্যক্ষণ, বিস্তার, চেতন, মনাদ, চিং পরমাণু, অসীম, বিশ্বদর্পণ, গবাক্ষহীন, স্বতন্ত্র, সমান্তরাল।

মূল আলোচনা: অন্ধকার মধ্যযুগের কুসংস্কার, গোঁড়ামি থেকে দর্শনকে যুক্তিপ্রবণ, বুদ্ধিদীপ্ত করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগে মুক্ত মননের আলোকে। সেই আধুনিক যুগের দর্শন চর্চাকে যারা নতুন রূপে সমাজের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রেনে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ। তাঁরা সকলে প্রায় এক মত হয়েছিলেন, অত্যন্ত যুক্তি, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতায় দর্শনকে ব্যাখ্যা ও তার চর্চা করতে হবে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, গণিতের মত, জ্যামিতির মত দর্শনেও এক সুনিশ্চিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। উক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার এই পত্রিকার মূল আলোচনার বিষয় হল, দেহ মন সম্পর্কিত তত্ত্বের বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজের অভিমতের উপর তুলনামূলক

পর্যালোচনা করা। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হল, বুদ্ধিবাদ কি? সাধারণত বলা হয়েছে যে, যে মতবাদে স্বীকার করা হয়, বিশুদ্ধ বুদ্ধিই হল জ্ঞান লাভের প্রকৃত উৎস, তাকে বুদ্ধিবাদ বলা হয়। দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ হল এই মতবাদের সমর্থক। তবে মনে রাখা দরকার, তাঁরা সকলে বুদ্ধিবাদী হলেও তাঁদের দার্শনিক মত এক খাতে বয়ে চলেনি। দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র চিন্তা তুলে ধরেছেন।

দেহ মন সম্পর্কিত আলোচনা আধুনিক দর্শনে বিশেষ করে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজের দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে মত পার্থক্য আছে। যার ফলেই কিন্তু দেহ মন সম্পর্কিত আলোচনাটি অত্যন্ত সমাদরের সাথে পণ্ডিত মহলে স্থান পেয়েছে। মূল যে প্রশ্ন, আমাদের সকলেরই দেহ ও মন উভয়ই আছে। আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছি, দেহ কখন মনের উপর প্রভাব ফেলছে, অন্যদিক মনও দেহের উপর প্রভাব ফেলছে। ব্যবহারিক জীবন তার সর্ব উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যখনই শরীরে আঘাত লাগে, তখনই আমাদের ব্যথার অনুভব হয়। অপরদিকে, যখনই আমরা ভয় পায় তখনই আমাদের শরীরের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। সুতরাং খুব স্পষ্ট যে, দেহের সাথে মনের একটা নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু কীভাবে দেহের সাথে মনের নিবিড় সম্পর্ক সংঘটিত হয়? কারণ দেহ আলাদা তা জড় প্রকৃতি এবং মন চেনন প্রকৃতি সুতরাং দেহ আলাদা বিষয় ও মন আলাদা বিষয়। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দেহ মন সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়।

দেকার্ত দেহ ও মনকে দুটি ভিন্ন দ্রব্য রূপে স্বীকার করেছেন। কারণ দেহের আবশ্যিক গুণ বিস্তার, মনের আবশ্যিক গুণ চিন্তা। ফলে তিনি দ্বৈতবাদী। এছাড়া তিনি তাদের সম্পর্কের আলোচনায় পিনিয়াল নামক গ্রন্থের উল্লেখ করে, কার্য-কারণ নিয়মের কথা বলেছেন। এবং এই আলোচনাটি আধুনিক দর্শন পরিসরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-বাদ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

স্পিনোজা দেহ মনকে দ্রব্য বলেননি। তিনি দেহ মন যথা বিস্তার চিন্তনকে গুণ রূপে স্বীকার করেছেন। তবে সম্পর্কের বা সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে মূল ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করেছেন, একই সত্তার দুটি দিকে কথা উল্লেখ করে। এই মতবাদকে বলা হয়েছে সমান্তরালবাদ।

লাইবনিজ দেহ ও মনকে স্বয়ংপূর্ণ রূপে চিৎ পরমাণু রূপে স্বীকার করেছেন। তবে দেহকে বিস্তার যুক্ত জড় বলেননি, চেনন বলেছেন, যা সুপ্ত বা নিশ্চেতন। আর দেহ ও মনের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব স্থাপিত সামঞ্জস্য নিয়মের উল্লেখ করেছেন। এবং ঈশ্বরকে দেখেছেন একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসাবে।

(Rene Descartes) দেকার্ত:

অন্ধকারময় মধ্যযুগের সমাপ্তির পর, আধুনিক যুগের দর্শন চর্চার পথ চলা শুরু মূলত দেকার্তের হাতে ধরে। দেকার্ত মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁড়ামির অন্ধবিশ্বাস বা মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে যুক্তি ও বুদ্ধিকে হাতিয়ার করে দর্শনে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াস করেছিলেন, সেই প্রয়াসের মানদণ্ড ছিল স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা (Clearness and Distinctness)। ‘Discourse on Method’ গ্রন্থে বলেছেন- “To accept nothing as true which I did not clearly recognizes to be so: that is to say, carefully to avoid precipitation and prejudices in judgements, and to accept them nothing more than what was presented to my mind so clearly and distinctly that I could have no occasion to doubt it।”^১ যার জন্য দেকার্তকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলা হয়

(Father of Modern Philosophy)। এই আধুনিক দর্শন-চর্চায় দেকার্ত ‘Meditations on the first Philosophy’ গ্রন্থে মানুষের দেহ ও মনের (mind and body) সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেটি অরিজিনাল ল্যাটিন ভাষায় রচিত হয়েছিল। ল্যাটিন ভাষায় যার নাম ‘Meditations de prima Philosophia, in qua dei existentia et animae immortalitas demonstratur’। দেহ ও মনের আলোচনা করার পূর্বে আমরা সকলে অবগত যে, আমরা মানুষ রূপে দেহ ও মনের সমন্বয়ে গঠিত। রেনে দেকার্ত বলেছেন, এই দেহ ও মন হল দুটি দ্রব্য। অর্থাৎ Mind and Body both are Substance। দেহটি জড় দ্রব্য (Material Substance) ও মন হল (Spiritual Substance) অর্থাৎ চেতন দ্রব্য। তবে আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি একমাত্র ঈশ্বরকে পরম দ্রব্য (Absolute Substance) হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পরম দ্রব্যের স্বরূপে ‘principles of philosophy’ গ্রন্থে বলেছেন- “substance is an existent thing which requires nothings but itself in order to exist.”^২ অর্থাৎ যা স্বনির্ভর, যা তার নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনও কিছুর উপর নির্ভর করে না, তাই দ্রব্য। যেহেতু ঈশ্বর একমাত্র স্বনির্ভর, অর্থাৎ বিশ্ব জগতের যাবতীয় কিছু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হলেও, ঈশ্বর কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, সুতরাং ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। এখানে অনেকের মনে সংশয় উদয় হতে পারে যে, ঈশ্বর যদি পরম দ্রব্য হয়, তাহলে দেহ ও মন কি অর্থে দ্রব্য? সেই দ্রব্যের স্বরূপই বা কিরূপ?—দেকার্তের দর্শনে তাদের (Relative or Created Substance) আপেক্ষিক বা সৃষ্ট দ্রব্য বলা হয়েছে। এইরূপ দ্রব্যের স্বরূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে- “Substance is the substratum of qualities”^৩ অর্থাৎ দ্রব্য হল গুণের আধার বা আশ্রয়। তিনি স্বীকার করেন, আমরা যে বিশ্বজগতে বসবাস করি তা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত, একটি জড় জগৎ অন্যটি হল চেতন জগৎ। জড় জগতে আছে পাহাড়, পর্বত, নদী, ও চেতন জগতের আছে আমার, তোমার, অপরের মন। কিন্তু দেকার্ত বলেন, জড় জগতে জড় বস্তুকে ও চেতন জগতের চেতন বস্তুকে আমরা সরাসরি জানতে পারি না। কারণ তাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না, তা বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ। অভিজ্ঞতায় আমরা কেবলমাত্র বস্তুর গুণগুলিকে জানতে পারি। এবং আমাদের বুদ্ধি ঐ গুণগুলিকে নির্ভর করে, গুণের আশ্রয় স্বরূপ দ্রব্যকে অনুমান করে। যেহেতু গুণ কখনও আধার বা আশ্রয় ছাড়া থাকতে পারে না। এই ভাবে দেখালেন যে, বিস্তার ছাড়া জড় বস্তু নেই, ও চিন্তা ছাড়া কোনো চেতন বস্তু নেই। তাই বিস্তার ও চিন্তা গুণের আশ্রয় স্বরূপ জড় দ্রব্য ও চেতন দ্রব্যকে স্বীকার করেছিলেন।

দেহ ও মনের আলোচনায় পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, দেহ হল জড় দ্রব্য ও মন হল চেতন দ্রব্য। রেনে দেকার্ত বলেছেন, দেহ ও মন শুধু দুটি দ্রব্যই নয়, তারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিপরীতধর্মী দ্রব্য। Mind and Body both are independent and opposite to each other। স্বতন্ত্র কারণ দেহ ও মন সৃষ্ট দ্রব্য হিসাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হলেও স্বক্ষেত্রে তারা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয় তাই তারা স্বতন্ত্র। বিপরীতধর্মী যেহেতু দেহের আবশ্যিক ধর্ম ও মনের আবশ্যিক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে আলাদা। দেহ জড় দ্রব্য হবার কারণে তার আবশ্যিক ধর্ম (Essential Attribute) ‘বিস্তার’ (Extension) এবং মন চেতন দ্রব্য হবার সুবাদে তার আবশ্যিক ধর্ম ‘চিন্তা করা’ (Thinking)। এইরূপ ভাবে দুটি দ্রব্যকে স্বীকার করায় তাঁর দর্শনে দ্বৈতবাদের সূচনা হয়েছে। যার ফলে তাঁকে দ্বৈতবাদী দার্শনিক বলা

হয়ে থাকে। আধুনিক দর্শন-চর্চায় যাকে কার্তেসীয় দ্বৈতবাদ (Cartesian Dualism) বলা হয়েছে।

কিন্তু দেকাতের দেহ ও মন সম্পর্কিত দ্বৈতবাদে কিছু সমস্যার বা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলে যা খুবই যুক্তি সঙ্গত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি করি যে, দেহ ও মনের মধ্যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ আছে। মন যেমন দেহের উপর প্রভাব ফেলে, ঠিক অনুরূপভাবে, দেহও ঠিক তেমনি মনের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, আমাদের শরীরে আঘাত লাগলে, ব্যথার অনুভব করি। শরীরে আঘাত পাওয়া দৈহিক ঘটনা, ব্যথার অনুভবটি মানসিক ঘটনা। অন্যদিক থেকেও বলতে পারি, আমাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চারণ হলে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। এখানে, ভয় পাওয়া মানসিক ঘটনা এবং হৃৎপিণ্ড বা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়াটি মানসিক ঘটনা। সুতরাং সহজে উপলব্ধি হয়, মনের সাথে দেহের ও দেহের সাথে মনের একটা নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। অথচ দেকর্ত বলেছেন, দেহ ও মন স্বতন্ত্র ও বিপরীতধর্মী। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে- দেহ ও মন যদি স্বতন্ত্র হয় ও বিপরীতধর্মী হয় তাহলে দেহ ও মনের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

দেকর্ত পরবর্তীকালে এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়াস হয়েছিলেন। 'The Passions of soul' গ্রন্থে সমাধানের জন্য একটি অনন্য পন্থা বা ফ্যাক্টরের উল্লেখ করেন, তা হল পিনিয়োল গ্রন্থি, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Pineal gland। পিনিয়োল গ্রন্থি কি? না, পিনিয়োল গ্রন্থি হল যা আমাদের মস্তিষ্কের কেন্দ্রে মধ্যে অবস্থিত। কোথায়? না, মস্তিষ্কের একটি এপিথ্যালামাস নামে অংশ আছে, যার দুটি অংশ আছে, ঐ দুটি অংশ যে স্থানে সংযুক্ত হয়েছে, সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র খাঁজের মধ্যে গ্রন্থিটি অবস্থান করে। সুতরাং এটি কিন্তু দেহেরই একটি অংশ বিশেষ, যার কোনো বিভাগ নেই, এটি একটাই ও খুবই সংবেদনশীল। ফলে যখন, আমরা দুটি চোখ দিয়ে কোনো বস্তুকে দেখি তখন দুটো বস্তু দেখি না, একটা বস্তুকেই দেখি। আবার দুটি কান দিয়ে শুনলেও দুটি শব্দ শুনি না, একটা শব্দই শুনি। এছাড়া এটি পাইন কোণের মত দেখতে বলে গ্রন্থিটির নামকরণ করা হয়েছে পিনিয়োল গ্রন্থি। কিন্তু কীভাবে এই গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ ও মনের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা যাবে? তিনি অর্থাৎ দেকর্ত বলেন, যখনই মনের মধ্যে কোনো চিন্তার উৎপন্ন হয়, Animal Spirit (জৈব শক্তি) দ্বারা সেই বার্তা পৌঁছায় পিনিয়োল গ্রন্থিতে। পিনিয়োল গ্রন্থি সেই চিন্তার অনুরূপ দেহের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অন্যদিক থেকেও যখনই দেহের মধ্যে কোনো উত্তেজনা দেখা যায়, সেই বার্তা গিয়ে পৌঁছায় পিনিয়োল গ্রন্থিতে, পিনিয়োল গ্রন্থি ঐ উত্তেজনার অনুরূপ মনের মধ্যে চিন্তা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ পিনিয়োল গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ মনকে ও মন দেহকে পরস্পর পরস্পরকে (Interaction) বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে। ফলে যখনই দেহের মধ্যে কোনো ক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে, তখনই তার অনুরূপ মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হচ্ছে। অনুরূপভাবে মনের ক্ষেত্রেও তাই। ফলে আধুনিক দর্শনে দেকাতের দেহ মন সম্পর্কিত আলোচনাটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (Interactionism) নামে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে তিনি এখানেই থেমে থাকছেন না, আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কও বর্তমান। কারণ দেহের মধ্যে দৈহিক কোনো অবস্থার পরিবর্তন হলেই অনুরূপভাবে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। আবার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হলেই দেহেরও দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কখন দৈহিক অবস্থা মানসিক অবস্থার কারণ হচ্ছে

আবার কখন মানসিক অবস্থা দৈহিক অবস্থার কারণ হচ্ছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত পিনিয়েল গ্রন্থির সাহায্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও কার্য-কারণ নিয়মের উল্লেখ করে দেহ ও মনের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

(Benedict Baruch Spinoza) স্পিনোজা:

স্পিনোজা হলেন আধুনিক যুগের দার্শনিক ও বুদ্ধিবাদের অন্যতম সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে, স্পিনোজা বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নেই, যা বুদ্ধির আলোকে প্রকাশিত হবে না, এবং বুদ্ধি তার বিশুদ্ধ ধারণা ও সাক্ষাৎ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিচিত্র জগতের সব কিছু পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে জানার ক্ষমতা রাখে। তিনিও দেকার্তের মত চেয়েছিলেন দর্শনে সুনিশ্চিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে। দেকার্তের ন্যায় মনে করতেন যে, বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ স্পষ্ট ও বিবিক্ত (Clear and Distinct) স্বতঃসিদ্ধ ধারণার উপর নির্ভর করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। মূলত তাঁর দর্শনে লক্ষ্য ছিল গাণিতিক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের ন্যায় সর্বজন গ্রাহ্য এমন জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করা। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, '২+২=৪' অথবা 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রী'। তবে স্পিনোজা গাণিতিক পদ্ধতির পরিবর্তে জ্যামিতিক পদ্ধতিকে (Geometrical method) অনুসরণ করেছিলেন। এই পদ্ধতির নিয়মকে অবলম্বন করে তাঁর দর্শন পরিসরে অধিবিদ্যক আলোচনায় প্রাথমিকভাবে এই বিশ্বজগতের সং বস্তু রূপে দ্রব্যের কথা উঠে এসেছে। এবং সেই দ্রব্য রূপে এক ও পরম ঈশ্বরকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে দ্রব্য ও প্রকৃতি রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে বিশ্বপ্রকৃতি ও ঈশ্বর অভিন্ন। তাঁর কথায় ল্যাটিন ভাষায় "Dues sive natura."^৪ ইংরেজি ভাষায়- God and Nature are interchangeable. So there is no distinction between the creator and the creation. তাই তাঁর দর্শনে অনন্য রূপ ধরা পড়েছে এইভাবে- "দ্রব্য= ঈশ্বর= প্রকৃতি"^৫। ফল স্বরূপত, এই স্বতন্ত্র অনন্য ভাবনা থেকে তিনি নিষ্কাশন করেছেন 'চিন্তা' ও 'বিস্তার' গুণের এবং বিকার রূপে বিশ্বজগতের জীব ও জড় বস্তুর। স্পিনোজা মতে, দেহ মন সমন্বিত মানুষ হল এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যা তাঁর দার্শনিক আঙিনায় 'বিকার' রূপে ধরা পড়েছে। এবং আধুনিক দর্শন-চর্চায় স্পিনোজার মানুষের দেহ ও মন সম্পর্কিত আলোচনা অনন্য নজির ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

স্পিনোজা দেহ ও মন সম্পর্কিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দেকার্তের থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তবে তিনি দেকার্তের ন্যায় দেহ ও মনকে সৃষ্ট দ্রব্য তো অনেক দূরের কথা, দ্রব্য রূপে স্বীকারই করেননি। তিনি মূলত দেহ ও মন দেখেছেন বিকার (Modes) রূপে। স্পিনোজা দ্রব্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন একমাত্র ঈশ্বরকে (God)। তাঁর কাছে একমাত্র একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে তা হল ঈশ্বর। যা একমাত্র পরম দ্রব্য। সেই দ্রব্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে 'Ethics' গ্রন্থে বলেছেন- "By Substance I understand that which is in itself and is conceived by means of itself. That the conception of which can be formed without the aid of the conception of any other thing"^৬ অর্থাৎ দ্রব্য হল যা স্বনির্ভর ও স্ববেদ্য। যার ধারণা অন্য সব কিছুর ধারণাকে বাদ দিয়েও চিন্তা করা যায়। পরম ঈশ্বর যেহেতু একমাত্র স্বনির্ভর, তাই ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। তবে তিনি বলেন, একমাত্র ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে দেহ ও মন সমন্বিত মানুষ কেবল জানতে পারে দুটি গুণকে। ফল স্বরূপত, তিনি 'বিস্তার' ও 'চিন্তা' গুণের উল্লেখ করেছেন। দার্শনিক স্পিনোজা এক

ঈশ্বরের বিস্তার ও চিন্তা রূপে যথা দেহ ও মনকে বিকার (Modes) হিসাবে স্থান দিয়েছেন। এই আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসবে গুণ কি? আবার বিকারই বা কি? তিনি গুণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পরম দ্রব্যকে সরাসরি ভাবে জানা সম্ভব নয়, দ্রব্যকে জানতে পারা যায় গুণের মধ্য দিয়ে। তিনি গুণের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন—“By Attribute I mean that which the intellect perceives as constituting the essence of substance”^৭ অর্থাৎ গুণ মানে, “বুদ্ধি দ্রব্যস্থ যে-পদার্থটিকে দ্রব্যের স্বরূপ বলে উপলব্ধি করে, তা।”^৮ এবং তাঁর অধিবিদ্যক আলোচনায় ‘চিন্তা’ ও ‘বিস্তার’ গুণের উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন, পরম দ্রব্যের অসংখ্য গুণ থাকলেও দেহ ও মন সমন্বিত মানুষ কেবল দুটি গুণকেই জানতে পারে। অন্যদিকে, বিকারের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, “By Modes I understand the affections or modifications of substance, or that which is in another thing through which also it is conceived”^৯ অর্থাৎ বিকার হল দ্রব্যের প্রকার বা অবস্থা, যা দ্রব্যের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং যার চিন্তা করতে গেলে দ্রব্যের মধ্য দিয়েই করতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই বিকার বা প্রকার দ্রব্য থেকে সরাসরিভাবে নিঃসৃত হয় না। বিকার নিঃসৃত হয় দ্রব্যের গুণ থেকে। এটা থেকে স্পষ্ট যে, বিকার কিন্তু স্বনির্ভর নয়, তা পরনির্ভর। অর্থাৎ এক পরম দ্রব্য একমাত্র স্বনির্ভর। সুতরাং বিকার পরম দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। দার্শনিক স্বনির্ভরতা ও পরনির্ভরতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে, দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বনির্ভরতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ‘Natura Naturans’ ও পরনির্ভরতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ‘Natura Naturata’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যাদের বাংলা প্রতিশব্দ হল ‘সৃজনী প্রকৃতি’ ও ‘সৃষ্ট প্রকৃতি’। অতএব এক পরম দ্রব্য ঈশ্বর হল ‘Natura Naturans’। কারণ ঈশ্বরই একমাত্র স্বনির্ভর তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়া এই পরিবর্তনশীল জগত যাদের স্পিনোজা বিকার বলে আখ্যা দিয়েছেন তাদের ‘Natura Naturata’ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর কথায়, “In passing from consideration of God as an infinite substance with divine attributes to consideration of the modes of God the mind is passing from Natura Naturans to Natura Naturata; that is, from God in himself to ‘creation’, though one must not take the last phrases to mean that the world is distinct from God।”^{১০} সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, দেহ ও মন সমন্বিত মানুষ এক পরম ঈশ্বরে বিকার। তবে তা সসীম বিকার। কারণ স্পিনোজার বিকার বিভিন্ন প্রকারের অসীম ও সাক্ষাৎ, অসীম অসাক্ষাৎ এবং সসীম ও পরিবর্তনশীল। এবার আমি নিম্নে দেহ ও মনের আলোচনা করলাম।

স্পিনোজা দেহ ও মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাদের যেমন স্বতন্ত্র দ্রব্য বলেননি। আবার তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধও স্বীকার করেননি। কারণ তিনি বলেন, দেহ ও মন হল এক ঈশ্বরের দুটি ভিন্ন দিক। তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গির। একই সরল রেখার মত পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত না করে সমান্তরাল ভাবে চলে অর্থাৎ তারা সহ পরিবর্তন হয় শুধুমাত্র। যখনই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয় অনুরূপভাবে দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। অন্যদিক থেকেও দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হলে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। তবে আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, দৈহিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকলেও পারস্পরিক দৈহিক

ও মানসিক অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। যা অস্বীকার করা অসম্ভব। যথা- কোনো প্রিয় বস্তুর জ্ঞান থেকে সেই বস্তুকে পাবার ইচ্ছা থাকতে পারে। এখানে বস্তুর জ্ঞান ও ইচ্ছা দুটোই মানসিক অবস্থার বিষয়। এবং তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। বস্তুর জ্ঞান হল ঐ বস্তুকে পাবার ইচ্ছার কারণ, ইচ্ছা হল কার্য। তেমনি, কোনো শারীরিক ঘটনার কারণ অন্য কোনো শারীরিক ঘটনা হতে পারে। যথা- মস্তিষ্কের কোন স্নায়ু কেন্দ্রে স্পন্দন হলে কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারে। আসলে এক মানসিক অবস্থা ‘ক’ পরবর্তী মানসিক অবস্থা ‘খ’-কে উৎপন্ন করতে পারে। ‘খ’ আবার পরবর্তী ‘গ’ মানসিক অবস্থাকে উৎপন্ন করতে পারে। এই ভাবে মানসিক অবস্থা গুলি একটি সরল খাতে বয়ে চলতে থাকে, আমরা তা কল্পনা করতে পারি। আবার অনুরূপভাবে, দৈহিক অবস্থা গুলিও একই রকমভাবে অন্য একটি খাতে বয়ে চলতে থাকে। ফলে দৈহিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থা পরস্পরকে প্রভাবিত করে না ঠিকই, কিন্তু তারা সমান্তরালভাবে নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে। এর অর্থ হল দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হলে অনুরূপভাবে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয় এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হলে অনুরূপভাবে দৈহিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। এই সমান্তর প্রবাহ কখনও থেমে যায় না।^{১১} এই জন্য স্পিনোজার দেহ-মন সম্পর্কিত মতবাদকে সমান্তরালবাদ (Parallelism) বলা হয়। এছাড়া বলা হয়ে থাকে (Double Aspect Theory) এবং (Theory of psycho-physical parallelism)। সুতরাং দার্শনিক স্পিনোজা কার্য কারণ সম্বন্ধ ছাড়া, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যতীত এক ঈশ্বরের দুটি বিকার হিসাবে সহ-পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেহ ও মনের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

(Gottfried Wilhelm Leibniz) লাইবনিজ:

আধুনিক দর্শন-চর্চায় লাইবনিজ অন্যতম দার্শনিক। দেকার্ত দ্বৈতবাদী ও স্পিনোজা সবেশ্বরবাদী হলেও লাইবনিজের দার্শনিক পরিসর বহুত্ববাদে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বহুত্ববাদী। এই মতবাদের মৌলিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মনাদতত্ত্বের উপর। তাঁর মননে দেখা দিয়েছে যে, এই বিশ্ব জগতের মৌলিক সত্তা হল অসংখ্য চিৎ-পরমাণু, যা কখনও জড় নয়, অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত নয়। সচেতন। এই অসংখ্য চিৎ পরমাণুকে মনাদ ও দ্রব্য বলে স্বীকার করেছেন। চিৎ-পরমাণু জড় নয়, এর কারণ হিসাবে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, বিস্তার এর অর্থ যা বিভাজ্য। যার অংশ স্বীকার করা হয়। ফলে তার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। আর যার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে এই রূপ কোনো প্রকার যৌগিক পদার্থকে স্বনির্ভর দ্রব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই বিস্তার কখন দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম হতে পারে না। দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে ‘Monadology’ তিনি বলেছেন- “স্বনির্ভরতা (Self-independent) ও স্বয়ংক্রিয়তা”^{১২} (Self-activity) হল দ্রব্যের লক্ষণ। তাঁর কথায়, “Substance is a being capable of action।”^{১৩}

তাঁর দেহ ও মনের সম্পর্কিত আলোচনা একটু ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। দেকার্ত মনকে চিন্তাযুক্ত চেতন দ্রব্য, দেহকে বিস্তারযুক্ত জড় দ্রব্য বললেও, স্পিনোজা দেহ ও মনকে দ্রব্যের বিকার রূপে আখ্যা দিলেও লাইবনিজ কিন্তু দেহকে জড় বলেননি এবং দেহ ও মনকে স্পিনোজার ন্যায় বিকারও বলেননি, তিনি উভয়কেই চেতন দ্রব্য বা চিৎ পরমাণু রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে মানুষের মন ও দেহকে একই পর্যায়ের বা সমজাতীয় মনাদ বা চিৎপরমাণু বলেননি। তিনি মনাদের বা চিৎ পরমাণুর অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশক্তি তারতম্য অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, সুপ্ত বা নিশ্চেতন মনাদ। দ্বিতীয়ত, আত্মা মনাদ, তৃতীয়ত,

আত্ম সচেতন মনাদ, চতুর্থ, সর্বশ্রেষ্ঠ মনাদ বা ঈশ্বর মনাদ। মানুষের দেহ হল প্রথম প্রকার অর্থাৎ সুপ্ত বা নিশ্চেতন মনাদ বা চিৎ পরমাণু। এই মনাদের মধ্যে ক্রিয়া শক্তির প্রকাশ ঘটেনি। ফলে স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তির প্রকাশ ঘটেনি। তাই মানুষের দেহ এই প্রকার মনাদ। অন্যদিকে, মন হল তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ আত্ম সচেতন বা বিচারশীল মনাদ। কারণ এই প্রকার চিৎ পরমাণুতে নিজের অন্তর্নিহিত ক্রিয়া শক্তির কারণে প্রত্যক্ষণ সামর্থ্য ছাড়াও সংপ্রত্যক্ষণ থাকে ফলে স্মৃতিশক্তি, চিন্তা শক্তির সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও থাকে।

আমরা যদি লাইবনিজের দেহ ও মন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাই যে, তিনি দেহ ও মনের ব্যাখ্যায় কোন প্রকার কার্যকারণ নিয়মের উল্লেখ করেননি। কারণ তাঁর ভাবনায় মনে হয়েছে, দেহ হল নিশ্চেতন ও মন হল আত্ম সচেতন চিৎ-পরমাণু এবং তারা উভয়েই স্বরূপত 'গবাক্ষবিহীন (Windowless) জীবন দর্পণ (Living Mirror)' ^{১৪} সুতরাং তাদের মধ্যে কোন রকম কার্য-কারণ সম্পর্ক হতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হল কীভাবে দেহ ও মনের সম্পর্ককে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন? আসলে তিনি দেকার্ত, স্পিনোজার থেকে স্বতন্ত্র চিন্তা ধারায় উপনীত হয়েছিলেন, সেখানে এই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। নিয়মটি হল (Law of Pre-established Harmony) অর্থাৎ পূর্ব স্থাপিত সামঞ্জস্য নিয়ম। তাঁর মতে, এই নিয়মের দ্বারা দেহ মনের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি বলেন যে, এই সৃষ্টিলগ্নের মূলে আছে একটি উদ্দেশ্যমূলক সামঞ্জস্য ব্যবস্থা বা বিধান, আর সেই বিধানের নাম হল পূর্ব স্থাপিত সামঞ্জস্য নিয়ম। সৃষ্টির লগ্নে ঈশ্বর দেহ ও মন চিৎ পরমাণুর মধ্যে এমন সামঞ্জস্য বা শৃঙ্খলা বেঁধে দিয়েছেন যে, যখনই দেহে অর্থাৎ দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হলেই তার অনুরূপভাবে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। অন্যদিকেও যখনই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয় তখনই তার অনুরূপ দৈহিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ হিসাবে তিনি ঘড়ি ও ঘড়ি প্রস্তুতকারকের উল্লেখ করেছেন। লাইবনিজ বলেন যে, একজন ঘড়ি নির্মাণকারী বা প্রস্তুতকারক তাঁর নিজের পরিকল্পনায় ঘড়ি নির্মাণ করার সময় দুটি ঘড়িকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করেন অর্থাৎ এমন সামঞ্জস্য শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করেন যে, দুটি ঘড়িতে একই সময় পরিলক্ষিত হয়। এবং সেখানে তাঁর অর্থাৎ ঘড়ি প্রস্তুত কারকের বারংবার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে না। আসলে লাইবনিজ ঈশ্বরকে দেখেছেন ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসাবে এবং দেহ ও মন চিৎ পরমাণুকে দেখেছেন দুটি ঘড়ি হিসাবে। অতএব লাইবনিজ ঈশ্বরকে স্বীকার করে পূর্ব স্থাপিত নিয়মের উল্লেখ করে দেহ ও মন সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন।

দেহ মন সম্পর্কিত তুলনামূলক পর্যালোচনা:

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেহ ও মনের তত্ত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ তাঁদের বুদ্ধিবাদের আলোতে দেহ ও মনের সম্পর্ককে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এবং প্রত্যেকে বিচার বিশ্লেষণের প্রতি একটু যেন বেশি নজর দিয়েছেন। মনে হয়েছে প্রত্যেক দার্শনিক সমালোচনাকে হাতিয়ার করে এই তত্ত্বের বা সম্পর্কের প্রতি একটু বেশিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা সাধারণ দর্শনপ্রেমি ব্যক্তিগণের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও মনোগ্রাহী রূপে ধরা পড়েছে এই তত্ত্ব।

সমগ্র আলোচনার প্রেক্ষিতে সকল দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ ঈশ্বরকে পরম দ্রব্য রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই ধারণার মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। তবে দেহ ও মন সম্পর্কিত তত্ত্বের আলোচনায় মত পার্থক্য বর্তমান। দার্শনিক দেকার্ত মানুষের দেহ ও মনকে

দ্রব্য রূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, তিনি তাদের ঈশ্বরের ন্যায় পরম দ্রব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেননি। তাঁর ভাবনায় দেহ ও মন সৃষ্টিরূপে দ্রব্য। এবং দেহকে দেখেছেন ‘বিস্তার’ গুণের উপর ভিত্তি করে, অপরদিকে, মনকে দেখেছেন ‘চিন্তা’ গুণের ভিত্তি রূপে। ফলে দেকার্ত আধুনিক দর্শনে দ্বৈতবাদী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। সর্বোপরি, যখন দেহের সাথে মনের ও মনের সাথে দেহের প্রভাব বা সম্পর্কের কথা উঠে আসে, তখন সেখানে সেই সম্পর্কের ভিত্তিরূপে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে কার্য-কারণ সম্পর্কে স্বীকার করেছেন দেকার্ত। এছাড়াও দেকার্ত বেশি জোর দিয়েছেন মস্তিস্কের এক এবং অবিভাজ্য জৈব শক্তি স্বরূপ পিনিয়েল গ্রন্থির উপর, যা মূলতভাবে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূলভিত্তি।

দার্শনিক স্পিনোজা কিন্তু দেহ ও মন সম্পর্কিত আলোচনায় দেহ ও মনকে দ্রব্য রূপে স্বীকৃতি দেননি, যেমনটা দেকার্ত দিয়েছিলেন। স্পিনোজা একমাত্র ঈশ্বরকে দ্রব্যের দরজাটা দিয়েছেন। আসলে তাঁর মননে দেহ ও মনকে নিয়ে স্বতন্ত্র চিন্তা ধরা পড়েছে। তাঁর কাছে দেহ ও মন বিকার। দেহ একটু স্পষ্ট করে বললে বিস্তার, ও মন হল চিন্তা বা চিন্তন। সুতরাং এটা খুব স্পষ্ট যে, স্পিনোজার সাথে দেকার্তের মত পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। দেকার্ত মতে, দেহ ও মন দ্রব্য, কিন্তু স্পিনোজার কাছে তারা বিকার। এছাড়াও স্পিনোজার সাথে দেহ ও মনের সম্পর্ক নিয়েও মতভেদ রয়েছে। স্পিনোজা, দেহের সাথে মনের বা মনের সাথে দেহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করেননি। কার্য-কারণ সম্পর্কের কথা বলেননি। আবার পিনিয়েল নামক কোন প্রকার গ্রন্থির কথা তাঁর দর্শনে উঠে আসেনি। তিনি মূলত, ঈশ্বরকে পরম একমাত্র দ্রব্য রূপে স্বীকার করে ‘বিস্তার’ তথা দেহ ও ‘চিন্তন’ তথা মনকে দুটি দিক বা দৃষ্টি ভঙ্গি রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আসলে তারা একই সত্তার দুটি দিকের মত যেমন, একটি কড়ির হেড ও টেল দুটি দিক, সেরূপ। যেহেতু একটি সত্তারই দুটি দিক, সুতরাং তারা একে অপরকে প্রভাব বিস্তার না করলেও তারা একই তালে চলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্পিনোজার দর্শনে দেহ ও মনের সম্পর্কের মূলভিত্তি কিন্তু ঈশ্বর, পিনিয়াল গ্রন্থি নয়।

লাইবনিজের দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেহ ও মনের আলোচনা সম্পূর্ণ অনন্য ভাবনা। তাঁর আধুনিক চিন্তায় ধরা পড়েছে যে, তিনি স্পিনোজার মত দেহ ও মনকে বিকার বলেননি। তিনি দেকার্তের ন্যায় দ্রব্য বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি দেহ ও মনকে দ্রব্য রূপ স্বীকার করে চিৎ পরমাণু বা মনাদ বলে অভিভূত করেছেন। লাইবনিজের দর্শনে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, লাইবনিজ দেকার্তের ন্যায় চিন্তা গুণযুক্ত আত্ম সচেতন রূপে মনকে স্বীকার করলেও দেহকে কিন্তু বিস্তারযুক্ত জড় দ্রব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেননি, যেমন টা দেকার্তের দর্শনে দেখা দিয়েছিল। তিনি আসলে তাঁর দর্শনে জড় দ্রব্য স্বীকারই করেন না। যা তাঁকে অন্যান্য দার্শনিক যথা দেকার্ত, স্পিনোজা থেকে আলাদা করেছে। কারণ লাইবনিজ দেহকে দেখেছেন চিৎ- পরমাণু হিসাবে, তবে সেই দেহ রূপ চিৎ পরমাণু হল সুপ্ত বা নিশ্চেতন। অর্থাৎ দেহ হল সুপ্ত বা নিশ্চেতন পরমাণু। এছাড়াও তিনি দেহ ও মনের সম্পর্কের ব্যাপারেও স্বতন্ত্র চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব- স্থাপিত সামঞ্জস্য নিয়মের উপর নজর দিয়েছেন, কার্য- কারণ এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, পিনিয়াল গ্রন্থি সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে। এছাড়াও লাইবনিজ দেহ ও মনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে দেখেছেন ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসাবে এবং দেহ ও মনকে দেখেছেন ঘড়ি রূপে। সুতরাং কি দেকার্ত, কি স্পিনোজা, কি

লাইবনিজ দেহ ও মন সম্পর্কিত তাঁদের দার্শনিক প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র অনন্য। যা আধুনিক দর্শন চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, এই দেহ মন সম্পর্কিত আলোচনাটি অত্যন্ত বিতর্কিত ও মনোগ্রাহী। তবে আধুনিক দর্শনের প্রেক্ষাপটে স্পিনোজা ও লাইবনিজের মত একটু বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ তারা দেহ ও মনকে দেকার্তের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দ্রব্য রূপে স্বীকৃতি দেননি। স্পিনোজা যেমন দেহ ও মনকে এক পরম ঈশ্বরের দুটি দিক বলে বর্ণনা করেছেন। লাইবনিজও কিন্তু দেহ ও মনকে চিৎ পরমাণু রূপে স্বীকার করেছেন। ফলে তাদের সম্পর্কিত অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। Copleston, Frederick. (1994). A History of Philosophy. New York: Image Books Doubleday, p. 74.
- ২। Copleston, Frederick. (1994). A History of Philosophy. New York: Image Books Doubleday, p. 117.
- ৩। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. (২০১২). পাশ্চাত্য দর্শনে ইতিহাস. কলকাতা: বুক সিডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৮১।
- ৪। Armstrong, A. C. (stranslated) (2012). History of Modern Philosophy by Richard falckenberg. Kolkata: Progressive publishers, P. 141
- ৫। মঙ্গী, রমেশচন্দ্র এবং দীপালী দত্ত. (২০১২). পাশ্চাত্য দর্শন ইতিহাস. কলকাতা: বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, পৃ. ১২৯।
- ৬। Copleston, Frederick. (1994). A History of Philosophy. New York: Image Books Doubleday, p. 214.
- ৭। Masih, Y. (1994). A Critical History of Western Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, p. 229
- ৮। ভট্টাচার্য, চন্দ্রোদয়. (১৯৮০). পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৮২।
- ৯। Masih, Y. (1994). A Critical History of Western Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, p. 232
- ১০। Copleston, Frederick. (1994). A History of Philosophy. New York: Image Books Doubleday, p. 217.
- ১১। দাস, রমা এবং শিবপদ চক্রবর্তী. (২০১৫). পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৩০৭-৩০৮।
- ১২। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. (২০১২). পাশ্চাত্য দর্শনে ইতিহাস. কলকাতা: বুক সিডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩৯০।
- ১৩। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু. (২০১৫). পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস. কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, পৃ. ২১২।
- ১৪। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. (২০১২). পাশ্চাত্য দর্শনে ইতিহাস. কলকাতা: বুক সিডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩৯৪।

ব্যক্তিত্ব গঠনে স্মৃতির ভূমিকা

জগদীশ দাস

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: স্মৃতি ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, ব্যক্তিত্বও স্মৃতিকে প্রভাবিত করে। এখানে প্রতিপাদ্য ব্যক্তিত্বে স্মৃতির প্রভাব। একটি বিশেষ ব্যক্তির উদাহরণ নিয়ে দেখানো হয়েছে যে স্মৃতির প্রভাব ব্যক্তিত্বে কেমন ও কতখানি। এই ব্যক্তির মস্তিষ্কের একটি অংশ একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাদ পড়ে যায়। দেখা যায় সেই অংশ বাদ পড়লে তা তাঁর স্মৃতিতে প্রভাব ফেলে না কিন্তু স্মৃতিতে থাকা জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য মস্তিষ্কের যে অংশ কাজ করে তা বাদ যাওয়ায় সেগুলির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। এখানে এই বিষয়টি কিছু গবেষণাপত্রের আলোকে দেখানো হয়েছে যে প্রয়োগ আলাদাভাবে অভ্যাস না করলে জ্ঞান স্মৃতিতে যতই থাকুক তা ব্যক্তিত্বকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পারে।

সূচক শব্দ: স্মৃতি, ব্যক্তিত্ব, Phineas P. Gage, Dr. Harlow, status-epilepticus।

মূল আলোচনা: ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে আমরা অনেক সময় এক করে দেখে থাকি। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক জিনিস নয়। ‘ব্যক্তিত্বের সাথে নৈতিক মূল্য যুক্ত করলে তা হয় চরিত্র আর চরিত্র থেকে নৈতিক মূল্য বাদ দিলে তা হয় ব্যক্তিত্ব’।^১ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির আচার-আচরণের ধারণা বা ভঙ্গী, তার মনোভাব, দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। “ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিসত্তাই তার ব্যক্তিত্ব”।^২ ব্যক্তি মাত্রই কিছু না কিছু ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রত্যেকের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন—আয়াসী, বুদ্ধিমান, ধীরস্থির, প্রভুত্বকামী, প্রফুল্ল, কোমল হৃদয়, মার্জিত, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, দুঃসাহসী, তেজস্বী, অতি-অনুভূতিপ্রবণ, বন্ধুভাবাপন্ন ইত্যাদি। এইসব বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যক্তিকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব দান করে থাকে। এইসব মানসিক ও কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাহারকে ব্যক্তিত্ব বলা যায়। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ গঠন হয় কিছু জন্মগত সংস্কার ও কিছু অর্জিত শিক্ষা অনুসারে। জন্মগত সংস্কারের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাই সে বিষয়টি এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না করে অর্জিত শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্বকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করে তা আলোচনা করা হয়েছে। অর্জিত শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্বকে যখন নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাতে স্মৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিতে যদি অর্জিত শিক্ষা না থাকে তাহলে তার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। আবার স্মৃতিতে থাকলেও তার বাস্তবে প্রয়োগ সব সময় সম্ভব হয় না। দেখা যায় অনেকেরই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান থাকলেও তার বাস্তব প্রয়োগ বা অনুশীলনে বিরত থাকেন। কোনো বৈশিষ্ট্যের বাস্তব প্রয়োগের জন্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান থাকাটাই যথেষ্ট নয়। একটি পরীক্ষা ও গবেষণায় পাওয়া গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান থাকলেও তার প্রয়োগ না থাকাও সম্ভব। বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য গবেষণাপত্রটির প্রেক্ষাপট দেখা দরকার। তাই তার প্রেক্ষাপট নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

প্রেক্ষাপট: ১৮৪৮ সালের এক গ্রীষ্মে Phineas P. Gage^৩ নামক একজন ২৫ বছর বয়সের ব্যক্তি যিনি পেশায় ছিলেন রেলপথ নির্মাণের ঠিকাদার, তিনি Vermont^৪ এর Cavendish^৫ নামক স্থানে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েন। পথে একটি পাহাড় পড়ে। তখন সেই পাহাড়ে

বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। Phineas P. Gage ছিলেন একজন দক্ষ কর্মী। সুস্থাস্থ্যের অধিকারী এই ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করতেন। এই কাজে শারীরিক শক্তির সাথে সাথে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ছিল। সুড়ঙ্গ তৈরি করতে কতকগুলি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গর্ত খুঁড়তে হয়। সেই গর্তে বিস্ফোরক পাউডার ভর্তি করা হয়, সেখানে একটা সলতে ভরে দিতে হয়, তারপর বালি দিয়ে মুখ বন্ধ করে লোহার রড দিয়ে চেপে দিতে হয়। বালি না দিলে বিস্ফোরণ পাহাড়ের মধ্যে না হয়ে বাইরে চলে আসতে পারে। ভদ্রলোক বালি দিয়ে গর্তের মুখ চেপে দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ ধরনের লোহার দণ্ড তৈরি করেছিলেন।

তারপর ঘটল সেই ঘটনা। সেটা ছিল গ্রীষ্মকালের এক বিকেল বেলা। প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। তিনি গর্তে বিস্ফোরক পাউডার ভরে তাতে একটা সলতে করে দিয়েছিলেন। এবং তার সহযোগী একজনকে বললেন গর্তের মুখটা বালি দিয়ে ভরে দিতে। এমন সময় পাশ থেকে কেউ তাকে ডাকে। Gage সে দিকে তাকান। তার মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। সহযোগী বালি দিয়ে মুখ ভরার আগেই তিনি বিস্ফোরক পাউডারের উপরে লোহার দণ্ড দিয়ে ঠাসতে থাকেন। সেই মুহূর্তেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। বিস্ফোরণ এর আঘাত এসে পড়ে তার মুখে। দুর্ঘটনাটি খুব মারাত্মক ছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা। একটি লোহার দণ্ডটি গেজের চোয়াল ভেদ করে মস্তিষ্ক হয়ে ১০০ ফুট দূরে গিয়ে পড়ে। তাতে লেগে থাকে রক্ত এবং মস্তিষ্কের অংশ। গেজ ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েন। যদিও তিনি নিস্তক্ক হয়ে পড়েন তবুও তিনি সচেতন ছিলেন।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে ছিটকে পড়ে গেলেও তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে কথা বলেছিলেন। তিনি বললেন তার লোকেরা তাকে দুহাতে তুলে রাস্তায় নিয়ে গেছিলেন। সেখান থেকে সাড়ে ১৬ ফুট দূরে এবং তাকে বলদে টানা গাড়িতে বসিয়ে সোয়া এক মাইল রাস্তা পার করে Mr. Josef Adams এর হোটেল নিয়ে আসেন। সেখানে Gage নিজেই গাড়ি থেকে নেমে আসেন তার সহযোগীর সাহায্য নিয়ে।

তাঁর চিকিৎসক Dr. Harlow-র বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি কিভাবে Gage তার হারানো দৈহিক শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি স্পর্শ করা, শ্রবণ করা, দেখা ইত্যাদি কাজগুলোর সাথে সাথে কথা বলতে পারতেন। যদিও তিনি তার বাঁ চোখে দেখতে পেতেন না কিন্তু ডান চোখে দেখতে পেতেন। তিনি ভালোভাবে হাঁটতে পারতেন, তিনি হাত দিয়ে শক্ত করে কিছু ধরতে পারতেন এবং ভাষার ব্যবহারও করতে পারতেন। তা সত্ত্বেও হারলৌ বর্ণনা করেছেন যে তাঁর বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া এবং পাশবিক প্রবণতার মধ্যে সাম্য ভেঙে গেছিলো। এই পরিবর্তন ধরা পড়ল যখন মস্তিষ্কের আঘাত প্রশমিত হলো। তার দক্ষতা কমে এল, স্থূলতম অঙ্গীল বিষয়ে কালক্ষেপ করতে থাকলেন—যেগুলি তিনি আগে করতেন না। সহকর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করলেন, মতবিরোধ হলে ধৈর্যহারা হয়ে পড়লেন। তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক পরিকল্পনা করতে লাগলেন কিন্তু সেগুলি একের পর এক জমা হতে লাগল, কিন্তু তাদের বাস্তবে রূপ দিতে পারলেন না। তার বুদ্ধি শিশুসুলভ অথচ প্রবৃত্তিমুখিনতায় একজন শক্তিশালী মানুষের মত। তার ভাষা এত কুৎসিত হয়ে পড়েছিল যে মহিলাদের তার আশেপাশে বেশিক্ষণ না থাকার উপদেশ দেওয়া হত। কারণ তা না হলে তার কথার দ্বারা ওই মহিলারা মনোক্ষুন্ন হতেন। অর্থাৎ শারীরিক স্বাস্থ্য ফিরে এলেও মানসিক স্বাস্থ্য তথা স্বাভাবিক

ব্যবহার ফিরে আসেনি। Gage এক নতুন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন, যেখানে বর্তমান বিক্ষুব্ধ ব্যবহার এবং দুর্ঘটনা-পূর্ব-বিবেচনা-পূর্ণ শক্তিশালী চরিত্র—এদের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেল।

দুর্ঘটনার আগে তার মানসিক ভারসাম্য সুন্দর ছিল যার ফলে পরিচিত ব্যক্তির তাকে দক্ষ, কৌশলী ও ভালো ব্যবহারকারী মনে করতেন। তিনি তার ব্যবসায়ী পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতেন। অর্থাৎ সর্বোপরি তিনি একজন সফল পেশাদার ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনার পর তার পরিচিতরা তাকে চিনতে পারলেন না। তারা দেখলেন সেই Gage আর যেন সেরকম নেই। তার চরিত্রের এত পরিবর্তন হয়েছিল যে যেখানে তিনি কাজ করতেন সেখানে তাকে আর পূর্ণবাহাল করা হয়নি। এক্ষেত্রে শারীরিক সমস্যা ছিল না, সমস্যা হয়েছিল তার মধ্যে যেন এক নতুন চরিত্রের আবির্ভাব হওয়ার কারণে।

Gage-এর এই মানসিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, তাই সে আর আগের জীবিকার্টি ধরে রাখতে পারল না। অবশেষে একটি ঘোড়ার আস্তাবলের কাজ নিলেন। নিয়মানুবর্তিতার অভাবে তার কোন কাজই দীর্ঘস্থায়ী হত না। তিনি যেন সে রকম কাজ খুঁজে বেড়াতেন যা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে তিনি একটি সার্কাসে কাজ নিলেন। সেখানে তিনি নিজের মস্তিষ্কের ক্ষত আর সেই লৌহদণ্ডটি দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতেন। এই সময় তিনি পশুদের প্রতি এবং বিভিন্ন বস্তুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে দেখা যায়। যা আগে দেখা যায়নি। এই ধরনের সমস্যা সাধারণতঃ এইরকম আঘাত প্রাপ্তদের অথবা যাদের অটিস্টিক রোগ আছে তাদের দেখা যায়।

যে অপরিণাম তথ্য পাওয়া যায় সেই তথ্য অনুযায়ী Gage মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ১৮৬১ সালের ২১ মে কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থতার পর তিনি প্রাণ হারান। মৃত্যুর আগে পর পর অনেকগুলি খিঁচুনি একের পর এক আসতে থাকে। সেই তীব্র কম্পন এবং খিঁচুনি থেকে তিনি আর সচেতন অবস্থায় ফিরে আসেননি। এই অবস্থাকে বলা হয় status-epilepticus^১। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি প্রাণ হারান।

Gage-এর এই ঘটনাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার চরিত্রের অবনমন হওয়া, কিন্তু মনের যে অন্যান্য দিকগুলো যেমন—আগ্রহ, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, ভাষা, বুদ্ধি ইত্যাদি অবিকৃত থেকে গেল, অর্থাৎ, যে দিকগুলির সাথে চারিত্রিক বিষয়টি অনেকটা সম্পর্কযুক্ত নয় সেই দিকগুলি অবিকৃত থেকে গেলো। এই বিষয়টিকে অর্থাৎ মনের বিভিন্ন ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কোন একটির অন্যান্য সবকটির থেকে আলাদা হওয়ার ঘটনাকে dissociation^২ বলে। এই dissociation অন্যান্য রোগীদের ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয় যা বাদবাকি অন্যান্য মানসিক বিষয় থেকে আলাদা এমনও হতে দেখা যায়। তখন সেই বিশেষ বিষয়টি যা কিনা অন্যান্য মানসিক ব্যাপারগুলো থেকে আলাদা সেই বিষয়ের dissociation আছে বলা হয়। Gage-এর এই dissociation বাকি জীবনে বহাল ছিল। চরিত্রের এই পরিবর্তনগুলি নিজে থেকে সারবার নয় সেটা Dr. Harlow লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ Gage তার শারীরিক সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছিলেন। সামাজিক ব্যবহারে তার অপারগতা কোনরকমে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ছিল না।

ব্রিটিশ শারীরবিদ David Ferrier^৩, Gage এর এই ঘটনাটির বিশ্লেষণের পর্যবেক্ষণ করেন দক্ষতা ও অনুরাগের সাথে। তিনি ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন পশুপাখিদের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কটেক্স বাদ দিয়ে দিয়ে। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান আমাদের মোটর এবং ল্যাঙ্গুয়েজের নিয়ন্ত্রণকারী একটি অংশ আছে মস্তিষ্কে। তিনি তার নাম দিলেন prefrontal cortex^৪, এবং এই অংশের ক্ষতি হলে ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিবর্তন হওয়া

সম্ভব। বিশেষ করে বলতে হয় Gage-এর ক্ষেত্রে যা হয়েছে সেটি হল মানসিকতার অবনতি। Harlow এবং Ferrier উভয়ে Phrenology^{১০} থেকে এই প্রেরণা পান।

যদিও Gage-এর মস্তিষ্কের কিছু অংশ যা দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেছিল সেই অংশটুকু তার ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা, সামাজিক-ব্যবহার এবং নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন জানা গিয়েছিল। তথাপি ঠিক কোন অঞ্চল, কোন ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তা আবিষ্কার করা তৎকালীন যুগে যথেষ্ট কঠিন ছিল। যদিও পরবর্তীকালে অনেক গবেষণায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্মৃতিতে থাকা জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না ঐ দুর্ঘটনার কারণে।

দেখা গেল যে ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সেই জ্ঞানের প্রয়োগ সব সময় সম্ভব হয় না। বিশেষ করে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশ্লেষণ করেও দেখানো গেছে যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান থাকা ও তার প্রয়োগের ব্যাপার দুটি নিয়ন্ত্রণকারী মস্তিষ্ক অঞ্চল দুটি এক নয়। মস্তিষ্কের দুটি পৃথক অঞ্চল এই দুটি প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা গেছে Phineas Gage দুর্ঘটনার ফলে তার মস্তিষ্কের কিছু অংশ বাদ গেছে। যে অংশটি ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান থাকার জন্য আবশ্যিক সেই অংশটি থেকে গেছে তাই সেই সব জ্ঞান দুর্ঘটনার পরেও বিদ্যমান। আবার ঐ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকু না থাকার কারণে তার ব্যক্তি জীবন দুর্বিসহ ও অসামাজিক রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিত্ব গঠনে শুধুমাত্র স্মৃতির ভূমিকাই পর্যাপ্ত নয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের বাস্তব প্রয়োগের দিকটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

- ১। Personality—Allport. P.52
- ২। Introduction to Psychology, N.L. Munn., p-233
- ৩। Descartes Error, p-3
- ৪। A state of USA.
- ৫। Cavendish is a town in Windsor County, Vermont, United States. The town was likely named after William Cavendish, 4th Duke of Devonshire.
- ৬। RG Beran - Epilepsy & Behavior, 2008 – Elsevier
- ৭। The Human Hear, 2024, Eric. J. Kolb
- ৮। Brain map, 1873
- ৯। José Luis Valdés G.1 y Fernando Torrealba L, 2005
- ১০। Kristin Swenson, 2020

তথ্যপঞ্জী:

ইংরেজি গ্রন্থ:

১. Arnold, M.B. (Ed). *Feeling and Emotions*. Academic Press, New York, 1970.
২. Basu, Chaitali. *Hobbes and the Individual*. Progressive Publishers, Calcutta-73, 2001.
৩. Bgnoli, Carla. (Ed). *Morality & Emotions*. Oxford University Press,

Oxford, 2011.

8. Gordon W. Allport. *Personality A Psychological Interpretation*. Digital Library of India, Jan 2017.
৫. Munn, Norman Leslie. *Introduction to Psychology*. AITBS Publications, India, 1962

জার্নাল:

১. Bryan, Kolb. “Brenda Milner: Pioneer of the Study of the Human Frontal Lobe”, *Frontiers in Human Neuroscience*, vol-15, Jan 2021.
২. Jose Luis Valder G. & Fernando Torrealba L. “The parietal association cortex of the rat”. *Biological Research*, vol-41, issue-4, 2008, pp. 369-77.
৩. J. T. Kelly, A. K. Prasad, and A. S. Wexler. “Detailed flow patterns in the nasal cavity”, *The American Physiological Society*, vol-89, 2000, pp. 323-337. <http://www.jap.org>.
8. Lazer J Wayne. “Nineteenth and twentieth century brain maps relating to location and construction of brain functions”. *Journal of the History of Neuroscience*, vol-13, issue. 2-3, May 2002, pp. 368-93.

ওয়েবসাইট:

- Adult Norms for Rey. Osterrieth Complex Figure Test, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/clin.13.1.30.1976>, Accessed 12-11-2022.
- A Genetic Simulation System for Intelligent Agent Designs, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08839519508945488>, Accessed 01-01-2024
- A General Statistical Analysis for fMRI Data, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811901909334>, Accessed 24-11-2023.
- Cognitive Neuroscience and the Study of Memory, [https://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273\(00\)80987-3](https://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273(00)80987-3). Accessed 11-12-2022.
- Computer analysis of computed tomography scans of the lung: a survey, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1610745>, Accessed on 02-01-2023.
- Developmental interaction between thalamus and cortex, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095943881730297>, Accessed 07-08-2023.

চৈতন্যের উত্থান পরবর্তীতে বাংলার আর্থসামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন ও বর্তমান নবদ্বীপস্থিত বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের গুরুত্ব

অচিন্ত্য দেবনাথ

মাকায়াস ফেলো

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ

সারসংক্ষেপ: আলোচ্য পত্রটিতে আমি বর্তমান নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতৃপরিবার ও তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মীয় শিষ্য সম্প্রদায়ের জাত, পেশা ও আর্থিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছি। এবং এর দ্বারা সামাজিক মেলবন্ধনের যে ধারা চৈতন্যদেব শুরু করেছিলেন তা কতটা বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারই বিচার করেছি। যে প্রশ্নের উত্তর আমি এই স্থানে দেবার চেষ্টা করেছি তা হল বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতৃপরিবার কি আদৌ সোশ্যাল মোবিলিটির অথবা সামাজিক মেলবন্ধনের যাত্রায় সক্রিয়, নাকি তাঁরা সম্পূর্ণরূপে রক্ষণশীল বৈষ্ণব? তাঁরা কি কেবলমাত্র উচ্চ বর্ণের শিষ্যই গ্রহণ করেন, নাকি তাঁরা উচ্চনীচ বর্ণের ভেদাভেদ বিচার করেন না শিষ্যত্ব গ্রহণের সময়? তাঁদের বর্তমান শিষ্য-শাবকদের জাত কি?
সূচক শব্দ: আর্থসামাজিক, সোশ্যাল মোবিলিটি, জাতি।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা: মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা ভাষায় জীবনচরিত সাহিত্যে, পদাবলী কীর্তনে, সঙ্গীতে ও শিল্পে, আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। আর এই ঐতিহাসিক যুগের হাত ধরেই সোশ্যাল মোবিলিটির এক নতুন যাত্রা পূর্ণ মাত্রায় শুরু হয়েছিল বলা যায়। কারন শ্রীচৈতন্যদেব নাম-প্রেমমূলকভক্তি দিয়ে আপামর সর্বসাধারণের উন্নত ধর্মে প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করেছিলেন, যাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিলনা, বিগ্রহ দর্শনে অধিকার ছিলনা, তাঁদেরই নামের অধিকার দিয়েছিলেন, বিগ্রহ দর্শন ও সেবার অধিকার দিয়েছিলেন। অবহেলিত সম্প্রদায়ের মুক্তির বিষয়ে মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলন নিয়ে তাই বৃন্দবন দাস লিখেছেন-

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।

জী শূদ্র আদি

যত মূর্খেরে সে দিবা।।

অথবা

আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ লৈয়া।। (বৃ. দাস ১০৮)

বর্তমান নবদ্বীপের মন্দির কেন্দ্রিক আর্থসামাজিক পটভূমিতে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের গুরুত্ব ও তার প্রকৃতিগত চরিত্র:

সমগ্র নবদ্বীপবাসীর কাছে মহাপ্রভুর মন্দির ও বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নবদ্বীপের অধিকাংশ পরিবারই এই পরিবারের শিষ্য আর তাদের যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে এই সেবাইতরা পৌরোহিত্য করেন। তাই দেখা যায় বংশ পরম্পরায় এরা কোন কোন পরিবারের পুরোহিত হিসাবে থেকে গেছেন শতাব্দী জুড়ে। পুরোহিত হিসাবে গোস্বামীরা বিবাহ হতে শুরু করে শিশুর অল্পপ্রাশন, উপনয়ন সকল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

যেমন নিম্নে ছবিতে (চিত্র নং. ১.১) আমরা একটি শিশুর অন্তপ্রাশন করাতে দেখছি এই পরিবারের এক সদস্যকে। আবার পিতামাতার বিয়োগের পর এ শহরের বহু মানুষ আজও সাধ্য অনুযায়ী নূনতম পাঁচজন বা তার অধিক গোস্বামী সন্তানকে নিজ গৃহের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করে কৃতার্থ হন। “এই সমৃদ্ধ পরিবারে বহু খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, শ্রীভাগবত ব্যাখ্যাতা, সুগায়ক, বিখ্যাত বাদক, রসজ্ঞ কীর্তিনিয়া, সুদক্ষ অভিনেতা এই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে স্বনাম ধন্য হয়ে আছেন” (শ. ল. গোস্বামী, ২০১৪ নবদ্বীপ, নদীয়া) - এই দিক থেকে পরিবারের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিস্তার উপলব্ধি করা যায়। এছাড়াও মন্দিরের দানপত্র থেকে সামাজিক মেলবন্ধনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দানপত্র গুলি গোস্বামীদের শিষ্যদের দেওয়া। এতে তাঁদের জাত ও পেশা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই জন্য আমি একাধিক দান পত্রের বিচার বিশ্লেষণ করব।



জনৈক শিশুর অন্তপ্রাশনে মন্দির পুরোহিত
(চিত্র নং ১.১)

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় যে, বিষয়প্রিয়া পরিবারের মন্দির কেন্দ্রিক যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ধর্মীয় ভাবনা দ্বারা পরিপুষ্ট। শিষ্যদের প্রণামী থেকে শুরু করে মন্দিরের সেবাইত ব্যবস্থা সকল কিছুর মূলধন মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য দেশ বিদেশ থেকে যে বৈষ্ণব ভক্তরা আসেন তাঁদের জন্যই বিরাট ধর্ম কেন্দ্রিক টুরিজম শিল্প গড়ে উঠেছে নবদ্বীপে। সারা বছরই তাই দর্শনার্থী ও পূর্ণার্থীর ভিড় থাকে নবদ্বীপে। যদিও দোলের সময় তা বিরাট আকার ধারণ করে। তাই নবদ্বীপস্থিত যাবতীয় ব্যবসার আর্থিক চরিত্র ও প্রকৃতিগত দিক থেকে বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রিক। যেমন কাঁসাপিতলের কুটার শিল্প (চিত্র নং. ১.২) থেকে শুরু করে তাঁত শিল্প পর্যন্ত সকল কিছুর মূল উপজীব্য বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রিক মন্দির ও তার সাথে সম্পর্কিত বিরাট বাজার।



কাঁসা ও পিতলের শিল্প গড়ে উঠেছে মন্দিরের আশপাশ অঞ্চলে, তারই একটি বিক্রয় কেন্দ্র,
মহাপ্রভুপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া (চিত্র নং. ১.২)

বেশ কিছু বছর আগেও ১৩০০-র বেশি রিক্সা চালক প্রতিদিন পর্যটকদের মহাপ্রভুর মন্দির দেখিয়ে নিজেদের রুটিবুজির ব্যবস্থা করত। বর্তমানে ব্যাটারি চালিত ১০০০-র বেশি টোটো গাড়ি এই কাজে অংশ নিয়েছে। এই টোটো রিক্সাওয়ালারা পর্যটকদের মন্দিরে নিয়ে যাওয়ায় মন্দির গুলি পর্যটকদের অনুদান লাভে উপকৃত হয়। পাশাপাশি এই চালকরা এখানে গাইডের অভাব পূরণ করে দেয়। বর্তমানে এই টোটো চালকদের ইউনিয়ন মহাপ্রভু পাড়ায় স্থাপিত হয়েছে ও এখানেই যাত্রী নিয়ে আগত টোটো গুলির পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে যে কেবল মন্দির দর্শনের সুবিধা হয়েছে তাই নয় একই সাথে এই ইউনিয়ন ও মন্দির কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সহযোগিতাও শুরু হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সমস্যা যে হয় না তা নয় তবে সমস্যা হলেও তা দ্রুত মেটানো হয়ে থাকে।

প্রকৃতিগত দিক থেকে গোস্বামীরা পরম্পরা বজায় রাখার পক্ষপাতী। তাই তাঁরা সাধারণত নিজ বংশের বিবাহ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতে দেননা, যদিও এর অন্যথা হয়েও থাকে। সাধারণত তাঁরা পরম্পরা মেনেই বিবাহ করে থাকেন। সুতরাং অনুমান করা যায় নবদ্বীপের গোস্বামীরা বৈষ্ণব জগতে নিজস্বতা ও পরম্পরা বজায় রেখে এক রক্ষণশীলতার জন্ম দিয়েছে। যদিও তাঁরা বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য অনুসারে সামাজিক মেলবন্ধনের সাথে জড়িত, তবুও তাঁরা একই সাথে ব্যক্তিগত স্তরে আবদ্ধ। তবে চরিত্রগত দিক থেকে নবদ্বীপের সব গোস্বামীরা দীক্ষা গুরু হিসাবে সীমিত ভাবে হলেও উন্মুক্ত থেকেছেন বলা যায়। তাছাড়া, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই চলে আসছে। এর সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের পদ রচনা ও তাঁদের অন্তর্ভুক্তিকরণ (শ. দাস ৯-১১)।

সামাজিক মেলবন্ধন তথা সোশ্যাল মোবিলিটি ও জাত মেলবন্ধনের (কাস্টমোবিলিটির) প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার:

বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার একটি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পরিবার। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও সমাজের অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে বিভেদ চিরকালীন একটি সত্য সমস্যা। তাই সামাজিক মেলবন্ধনের ইতিহাসে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের কোন ভূমিকা আছে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এই প্রশ্নের উত্তর এই পরিবারেরই সদস্য প্রদীপ্ত গোস্বামী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

ব্রাহ্মণ হিসাবে যেমন তাঁদের অহংকার নেই তেমনি যারা মন্দিরের সেবা পূজার সঙ্গে দীক্ষা দান কর্মসূচীতে যুক্ত আছেন, কাকে দীক্ষা দেবেন বা কাকে দীক্ষা দেবেন না এমন ভেদাভেদকেও তাঁরা কখনো গুরুত্ব দেন না। সমস্ত মানুষকেই তাঁরা একেবারে নিজের মত করে ভাবেন। তাঁদের দীক্ষিত সন্তান নিজের সন্তানের মতই। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার দেখা যায় (প. গোস্বামী, প্রদীপ্ত গোস্বামী (মাধব আচার্যের ১৩তম বংশধর) এর মৌখিক বিবরণ)।

আমি সামাজিক মেলবন্ধনের পর্যালোচনায় বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের যে দিক গুলি বিচার্য বিষয় হিসাবে বিশ্লেষণ করব সেগুলি হল তাঁদের শিষ্যদের জাত নির্ণয় ও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দানপত্রলিপি সমূহের চরিত্র নির্ণয়। প্রথমেই বলে রাখি এই পরিবারের সকলেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন না এবং অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা দ্বারা উপার্জন করে থাকেন। যেমন প্রদীপ্ত গোস্বামী মহাশয় গৃহী এবং বাংলার শিক্ষক। তাঁর কোন শিষ্য নেই। এখন যাদের শিষ্য আছে তাঁদের শিষ্যদের জাত নির্ণয় করলে দেখা যায় যে নবদ্বীপের একটি বড় অংশের শিষ্য-শাবক গুনারি

সম্প্রদায়ভুক্ত সাহা। সোশ্যাল মোবিলিটির পর্যায়ে সাহাদের অবস্থান ও তাদের পেশা নিয়ে হিতৈসরঞ্জন সান্যাল বিশদে আলোচনা করেছেন-

The Sahas are a beakaway group from the caste of the Sunris whose occupation of manufacture and sale of spirituous liquor was held to be a very low one in the traditional Hindu society. The Barendra subcaste of the Sunris in eastern Bengal had started giving up their traditional occupation and switching over to trade in foodgrains, salt, timber and jute from about the middle of the eighteenth century (Sanyal, Social Mobility in Bengal 43).

সাহা ছাড়াও কাঁসা পিতলের কারিগর যারা সাধারণত জাতিতে কাঁসারি পাল তারাও অনেকে এই গোস্বামী পরিবারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে (চিত্র নং. ১.৩)। বিভিন্ন জীবিকা ও জাতের বহু শিষ্য আসাম, মণিপুর, উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশের থেকে আগত যা দানপত্র গুলিতে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে। অনেকের দান করা অর্থের পরিমাণও দেয়া আছে। শিষ্যত্বের বিভিন্ন জাত ও জীবিকার সংমিশ্রণ সামাজিক মেলবন্ধনের সপক্ষে দৃঢ় ইঙ্গিত দেয়।

জাতিতে কিছু কুমোর পালও হয়তবা এই শিষ্যদের মধ্যে পড়ে থাকবে (পাল পদবীর নির্দিষ্ট জাতের উল্লেখ করা নেই দানপত্র গুলিতে)। কিন্তু যে বিষয়টি আলোচ্য স্থানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিভিন্ন কাস্ট অর্থাৎ জাতের মানুষের সংমিশ্রণ। যেমন বলা যায় শিষ্যদের কেউ বনিয়া জাতির, কেউ কুমোর অথবা কাঁসারি পাল আবার কেউ কর্মকার, দাস, সংপতি, তালুকদার, পোদ্ধার, রায়, হালদার, দে, কুণ্ডু, দত্ত, সাহা, সরকার ইত্যাদি (চিত্র নং. ১.৩)। সুতরাং গোস্বামী পরিবারের শিষ্যদের জাত কায়স্থ হতে শুরু করে কলু, তেলী, বনিয়া, কামার, কুমোর ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ মাত্রায় মিশ্রিত (চিত্র নং. ১.৪)। যা কাস্ট মোবিলিটির একটি স্পষ্ট উদাহরণ বলা যায়।



(চিত্র নং. ১.৩)



(চিত্র নং. ১.৪)

ভাগ্যকুলের জমিদার গুরুপ্রসাদ রায় বর্তমান মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে অদ্যপি শ্রীমূর্তি বিরাজিত। গুরুপ্রসাদ রায়ের মন্দির নির্মাণ প্রমান করে যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতৃপরিবারবর্গ মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণে কিংবা দীক্ষা দিবার নিমিত্ত শিষ্যের জাত বিচার করেননি। সুতরাং বৈষ্ণবীয় সমাজে এদের অবস্থান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দিক থেকে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এদের সীমাবদ্ধতাও মনে রাখতে হবে, যা যথেষ্ট পরিমাণে না হলেও কিছু পরিমাণে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য দিক বিশেষ বিবেচ্য, যা এদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে।

গুরুপ্রসাদ রায় ছিলেন জাতিতে তেলী। হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয় তেলী সম্প্রদায়ের কাস্ট মোবিলিটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় ধনী বিভবান তেলীদের মন্দির নির্মাণ। তেলীদের মন্দির নির্মাণ তাদের কাস্ট মোবিলিটির সাক্ষ্য দেয়। যদিও তেলী ও তিলি কাস্টের মোবিলিটির ভিন্ন ধরণ রয়েছে তবুও মন্দির নির্মাণ যে তাদের মোবিলিটির একটি অন্যতম উপায় ছিল তা স্পষ্ট। এই জন্যই হিতেস রঞ্জন সান্যাল মন্তব্য করেছেন-

A clear indication of the importance of the Telis in the economic and social life of Bengal in the 18th and 19th centuries can be obtained from a study of the temples built by the prosperous members of the caste during this period. Wealthy Telis enthusiastically participated in temple building in the 18th and 19th centuries (Sanyal, Continuities of Social Mobility in Traditional and Modern Society in India: Two Case Studies of Caste Mobility in Bengal 327).

আর এই দিক থেকেই ভাগ্যকুলের জমিদার গুরুপ্রসাদ রায়ের মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মন্দির নির্মাণ যেহেতু সর্বদাই সামাজিক মর্যাদার পরিচায়কত্ব সেহেতু মন্দির নির্মাণ নিম্নবর্ণের উচ্চবর্ণে স্থানান্তরের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিল (Sanyal, Temple Promotion and Social Mobility in Bengal 343-347)। হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয় তেলীদের কাস্ট মোবিলিটির বিষয়ে তাই ভাগ্যকুলের জমিদারদের আর্থিক অবস্থার উপর বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন-

One of the leading Teli mercantile families of the 19th century was the Roys (Kundu) of Bhagyakul (Dacca district, East Pakistan), who were very prominent in the field of domestic trade. They established quite a number of mercantile and banking firms in various trade centers of Bengal including Calcutta (Sanyal, Continuities of Social Mobility in Traditional and Modern Society in India: Two Case Studies of Caste Mobility in Bengal 328).

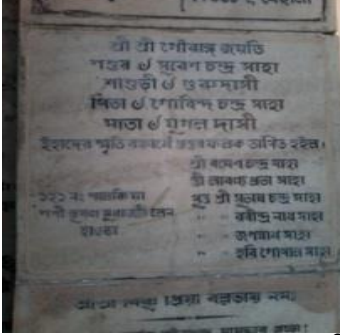
এবার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দানপত্র গুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক (চিত্র নং. ১.৫, ১.৬)। দানপত্র গুলির বিশেষত্ব হল এই যে এগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রায় স্বচ্ছল পরিবারের প্রেরিত। সকল দানপত্র গুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই পরিবারের শিষ্যত্ব গ্রহণকারীরা সমাজের সকল স্তর ও শ্রেণী থেকে আগত। যা সামাজিক মেলবন্ধনের ইতিহাসে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যেমন বলা যায় যে বনিয়া জাতি অথবা শূনারি জাতির সাহারাই অদ্যস্থানে শিষ্যরূপে গৃহীত হয়েছে তাই নয়, একই সাথে দাস ও তেলী জাতির রায়রাও গোস্বামীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত মহাপ্রভুর নতুন মন্দিরটি যেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত মূর্তির অবস্থান বর্তমান সেই মন্দিরটি ভাগ্যকুলের জমিদারের তৈরি, যারা জতিতে তেলী। সুতরাং তেলী জাতির গোস্বামীদের মন্দির নির্মাণ কাস্ট মোবিলিটির প্রবাহের ধারা পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়েছিল বলা যায়। যদিও গোস্বামীদের রক্ষণশীলতাও উপেক্ষণীয় নয়।

তাই সাধারণ ভাবে বলা হয় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকলকে দীক্ষার দেবার উদারনীতি বহুক্ষেত্রে কাস্ট মোবিলিটির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। বিশেষত নিম্ন বর্ণের আর্থসামাজিক উচ্চতায় আগমন ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা করণ সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়। যেমন ভাবে বিষ্ণুপদ দাস বলেছেন যে-

The constraints on caste mobility were relaxed to some extent. Since their conversion to the faith. A vaishnava convert belonging to low caste could elevate his social status as a clean, devout and godly person. The claim was conceded by the Samajpatis as the Goswamis supported the claim (Das 140).



(চিত্র নং ১.৫)



(চিত্র নং ১.৬)

আলোচ্য স্মৃতিফলক গুলিতে দেখা যাচ্ছে যে রায় যারা জাতিতে তেলী অথবা তিলি, সাহা যারা জাতিতে বনিয়া এবং দাস সবাই একত্রে মহাপ্রভুর মন্দিরে দানপত্র দিয়েছে। “সরকার” যারা জাতিতে “কায়স্ত” এবং দত্ত যা জাতিতে “বনিয়া” বা ব্যবসায়ী একত্রে নিজ নিজ ফলক মন্দিরে দানপত্রের মাধ্যমে প্রদান করেছেন (চিত্র নং. ১.৭)। এছাড়াও দত্ত ও রায় পদবীধারী লোকের ফলকও আলোচ্য স্থলে উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে আমরা সামাজিক মিলন কৃষ্টির উদাহরণ পাই।



(চিত্র নং ১.৭)

উপরিক্ত সমস্ত ছবির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে “সাহা” ও “দাস” পরিবার দ্বারা অনুদানের স্মৃতিফলক “দাস” ও “সাহা”দের সাথে মন্দিরের সামাজিক যোগাযোগ তুলে ধরেছে। এই মন্দিরকেই কেন্দ্র করে নবদ্বীপ শহর ও পার্শ্ববর্তি অঞ্চলে কাস্ট মোবিলিটি হচ্ছে ও হয়েছে তা বলা যায়। অনেক বৈষ্ণব মহন্তরা নিজের মঠ নির্মাণ করে নবদ্বীপে এক মিশ্র বর্ণের বৃহত্তর সামাজিক কৃষ্টির ক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন।

নবদ্বীপে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে আমি প্রদীপ্ত গোস্বামীর নিম্নে উল্লিখিত বয়ানটি আলোচ্য স্থানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মেলবন্ধনের ইতিহাসে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের ভূমিকা ও অবস্থানসম্পর্কে প্রদীপ্ত গোস্বামী বলেছেন-

সামগ্রিক ভাবে গৌরঙ্গের সেবা পূজা করার ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের মধ্যে অন্য পরিবারের কেউ অন্য ধর্মেরও কেউ যদি আসে তাঁর ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধের প্রাচীর থাকে না। স্বয়ং মহাপ্রভু ধামেশ্বর গৌরঙ্গ মহাপ্রভু এমন কোনো বিভেদ রচনা করেননি বরঞ্চ তিনি দুহাত প্রসারিত করে আপন বক্ষে সবাইকে যেমন স্থান দিয়েছেন, এই পরিবারও পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষকে সমান ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত (প. গোস্বামী, প্রদীপ্ত গোস্বামী (মাধব আচার্যের ১৩তম বংশধর) এর মৌখিক বিবরণ)।

উপসংহার:

সোশ্যাল মোবিলিটির সাথে জড়িত বৈষ্ণব ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে নামজাদা ঐতিহাসিক সমাজবিদেদের অমূল্য গবেষণা করেছেন। যেমন হিতেশরঞ্জন সান্যাল, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ দাস প্রমুখ। কিন্তু এরা কেউই সোশ্যাল মোবিলিটি বিষয়ে নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের গোস্বামীদের আলোচনা করেননি। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে নবদ্বীপের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের স্বতন্ত্র অবস্থানের এক তুলনামূলক আলোচনা করা হল। উক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে নবদ্বীপের গোস্বামীরা একই সাথে শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্মের উত্তরসূরি আবার সীমিত রক্ষণশীলতারও মূর্ত প্রতীক। দীক্ষা দানের ক্ষেত্রে, মহাপ্রভুর প্রসাদ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বিতরণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের দান ফলক কিংবা একত্রে মহাপ্রসাদ ভোজন অথবা শ্রীমূর্তির দর্শন, পাদুকা স্পর্শ সকল কিছুর অনুমতি দানের ক্ষেত্রে গোস্বামীদের উদারতা দেখা যায়, যা সোশ্যাল মোবিলিটির সাক্ষ্য দেয়। এমনকি পারিবারিক সম্পর্ক যথা বিবাহ ক্ষেত্রেও এরা সামাজিক মেলবন্ধনের ইঙ্গিত রেখেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে প্রদীপ্ত গোস্বামী বলেছেন-

জন্মগত অভ্যাস থেকে অবশ্যই পাত্র পক্ষরা ব্রাহ্মণ পাত্রীর খোঁজ করেন। আবার পাত্রী পক্ষ ব্রাহ্মণ পাত্রের খোঁজ করেন। কিন্তু বৈদিক যুগের অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের মত তাঁদের পরিবারে অন্য গোত্রের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ যদি বধূ হিসাবে যুক্ত হন বা তাঁদের পুত্র বা কন্যা যদি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে বিবাহ করেন সে বিবাহকে মান্যতা দেওয়া হবে না বা তাকে অস্পৃশ্য করে রাখা হবে দূরে সরিয়ে রাখা হবে এরকম ভেদাভেদ নেই (প. গোস্বামী, প্রদীপ্ত গোস্বামী (মাধব আচার্যের ১৩তম বংশধর) এর মৌখিক বিবরণ)।

গ্রন্থপঞ্জী:

- Bandyopadhyay, Sekhar. "Social Mobility in Bengal in the late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries." 1985. shodhganga. 28 March 2022 <<https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/158357>>.
- Das, Bishnupada. Some aspects of socio-economic changes in south western frontier Bengal since introduction of neo-Vaiṣṇavism. Calcutta: Firma KLM Private limited, 1996.
- Ghose, Sisirkumar. Lord Gouranga or Salvation for all. Calcutta: Smith and co's Press, 1897-1898.

- Sanyal, Hitesranjan. "Continuities of Social Mobility in Traditional and Modern Society in India: Two Case Studies of Caste Mobility in Bengal." The Journal of Asian Studies 30, No. 2 (1971): 315-339.
- —. Social Mobility in Bengal. Kolkata: Papyrus, 1981.
- Sanyal, Hitesranjan. "Temple Promotion and Social Mobility in Bengal." Chattopadhyaya, Debiprasad. History and Society: Essays in Honour of Professor Niharrranjab Ray. Calcutta: K.P Bagchi @ company, 1978. 341-372.
- গোস্বামী, প্রদীপ্ত. প্রদীপ্ত গোস্বামী (মাধব আচার্যের ১৩তম বংশধর) এর মৌখিক বিবরণ অচিন্ত্য দেবনাথ. ৯ অক্টোবর ২০১৪।
- গোস্বামী, প্রদীপ্ত. প্রদীপ্ত গোস্বামী (মাধব আচার্যের ১৩তম বংশধর) এর মৌখিক বিবরণ অচিন্ত্য দেবনাথ. ১১ এপ্রিল ২০২৩।
- দাস, বৃন্দাবন. চৈতন্য ভাগবত. কলকাতা: সাহিত্য একাডেমী, ২০২১।
- দাস, শ্রীহরিদাস. শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন .কলকাতা: দি নিউ জয়কালী প্রেস, ২০২১।

Mothering the Marginalized : Disability and Emotional Resistance in Sarat Chandra's *Bindur Chhele*

Ratan Sarkar

Asst. Prof., Dept. of Education

School of Humanities and Social Sciences

Tezpur University (A Central University), Assam, India

Abstract: *Sarat Chandra Chattopadhyay's short story Bindur Chhele (Bindu's Child) presents a poignant narrative of disability, motherhood, and social prejudice in colonial Bengal. This paper critically examines the representation of intellectual disability through the character of Bindu's son, exploring how the text subtly challenges dominant socio-cultural norms surrounding ability, value, and care. The story portrays a child perceived as 'deficient' by a judgmental society, yet deeply loved and accepted by his mother, whose unwavering affection emerges as a form of emotional resistance against systemic marginalization. By reading the story through the lens of Critical Disability Studies and feminist ethics of care, the paper unpacks how Bindu's maternal agency subverts prevailing ideologies of normalcy and worth. Her character resists not only social ridicule but also internalized notions of shame, asserting the right of her child to live with dignity and affection. The story, although embedded in early twentieth-century Bengal, anticipates contemporary discourses on inclusive parenting and disability rights. Through a literary and cultural analysis, the paper highlights the emotional labour and silent strength of mothers navigating social stigma, thereby framing motherhood as a powerful, if often overlooked, site of resistance. Bindur Chhele becomes more than a sentimental tale—it is a critique of ableism, and a testimony to love's capacity to defy exclusion.*

Keywords: *Disability, Motherhood, Emotional Resistance, Sarat Chandra Chattopadhyay, Bengali Literature.*

Introduction: Sarat Chandra Chattopadhyay (1876–1938) remains one of the most revered and widely read figures in Bengali literature and Indian literary history. His writings, known for their realism and emotional depth, have consistently engaged with themes of gender injustice, caste hierarchies, poverty, and the lives of those relegated to the social margins. What sets Sarat Chandra apart is his rare ability to depict human

suffering with empathy and clarity, often centering his narratives on women, children, and the socially ostracized.

Among his extensive oeuvre, *Bindur Chhele* emerges as a profoundly moving text that confronts the theme of intellectual disability—a subject seldom addressed in early twentieth-century Indian literature. The story narrates the deep and unwavering bond between Bindu, a poor mother, and her intellectually challenged son, portraying their daily struggles amid societal derision and neglect. In a cultural milieu where disability was largely seen as a source of shame or divine punishment, Sarat Chandra's portrayal of maternal devotion and emotional resistance offers a radical counter-narrative.

This paper seeks to examine *Bindur Chhele* through the intersecting frameworks of Critical Disability Studies and feminist care ethics. It argues that Bindu's love and advocacy for her son constitute a powerful form of emotional resistance that challenges dominant cultural narratives which devalue and pathologize disabled lives. Rather than framing disability through a tragic or medicalized lens, the story foregrounds the dignity and humanity of the child through his mother's gaze. The analysis further explores how Bindu's caregiving, often dismissed as private and apolitical, becomes an act of agency and defiance.

By situating the story within both its historical context and contemporary theoretical discourses, the paper aims to reframe *Bindur Chhele* as an important literary intervention into the politics of recognition, inclusion, and human worth. The narrative resonates with present-day concerns about inclusive caregiving, the emotional labor of mothers, and the broader fight for disability justice in postcolonial societies.

Literature Review

Despite Sarat Chandra Chattopadhyay's enduring influence on Bengali and Indian literature, scholarly engagement with his portrayal of disability remains notably limited. Much of the existing criticism centers on his progressive treatment of gender roles, caste oppression, and rural poverty, often within the nationalist or reformist paradigms (Sen, 2005; Chatterjee, 2011). *Bindur Chhele*, though widely recognized for its emotional appeal, has not been systematically analyzed through the interdisciplinary lens of Disability Studies. This oversight reflects a broader trend in South Asian literary scholarship, where disability has

historically been marginalized or treated metaphorically rather than as a lived social identity (Grech & Soldatic, 2016).

Recent developments in **Critical Disability Studies (CDS)** offer an important corrective to such readings. CDS shifts attention away from individual impairment and instead interrogates the socio-political structures that define, regulate, and marginalize disabled bodies (Garland-Thomson, 2005; Davis, 2013). Scholars such as Tom Shakespeare (2013) and Lennard J. Davis (2010) argue for a cultural and relational understanding of disability—one that recognizes how dominant narratives reinforce ableism by privileging autonomy, productivity, and normative intelligence. Applying this framework to *Bindur Chhele* allows for a more nuanced analysis of how the child's difference is socially constructed as deficiency, and how this construction is challenged through maternal care and emotional resilience.

In the South Asian context, scholars like Anita Ghai (2015) and Nilika Mehrotra (2011) have emphasized the intersection of disability with patriarchy, poverty, and religious beliefs. Ghai critiques the deeply entrenched cultural attitudes that frame disability within paradigms of shame, karma, or divine punishment. Within such settings, caregiving—especially by mothers—is often stigmatized and invisibilized. Reading *Bindur Chhele* alongside these critiques highlights how the story subverts dominant perceptions of disability by refusing to isolate the child as a medical anomaly and instead situates him within the fabric of love, dependence, and human dignity.

The caregiving dimension of the story finds critical resonance within the framework of **Feminist Care Ethics**, a philosophical tradition that reorients moral discourse toward interdependence, vulnerability, and emotional responsibility. Pioneered by Carol Gilligan (1982) and further developed by Joan Tronto (1993) and Eva Feder Kittay (1999), care ethics values relationships and the moral labor of caregivers, particularly mothers, in sustaining lives often deemed unworthy by mainstream society. Kittay's (1999) concept of “dependency work” is especially relevant to Bindu's character, who not only provides physical and emotional support to her son but also confronts social exclusion through her acts of everyday care. Her caregiving becomes an epistemological site of resistance—an embodied critique of both patriarchy and ableism.

Moreover, care ethics also challenges the traditional dichotomy between public and private spheres, arguing that acts of care, though

confined to the domestic, hold political significance. In Bindu's case, her refusal to relinquish or hide her child, despite societal pressures, exemplifies what Tronto (1993) terms a "politics of care"—a moral stance that contests the devaluation of both disabled lives and caregiving labor.

Thus, by drawing on these intersecting theoretical perspectives, this paper positions *Bindur Chhele* as a rich and underexplored text at the crossroads of disability justice, gendered ethics, and literary representation. It contributes to the growing body of scholarship that seeks to decolonize disability studies by foregrounding culturally situated, non-Western narratives of care and difference.

Textual Analysis

The narrative of *Bindur Chhele* opens with the quiet yet powerful portrayal of Bindu, a financially impoverished yet emotionally steadfast mother, who is raising her intellectually disabled son within an unsympathetic and often hostile rural society. The community around her is quick to label the boy as "pagol" (mad), employing a language of mockery and ostracization that reflects deep-seated cultural biases against cognitive and developmental disabilities. These villagers repeatedly urge Bindu to abandon or institutionalize the child, portraying him as a burden not only on the family but also on the collective social conscience.

However, it is precisely against this tide of dehumanization that Bindu's character emerges with profound moral clarity. Sarat Chandra deliberately avoids naming or diagnosing the boy, resisting the impulse to medicalize or pathologize his condition. Instead, the child is represented through his interactions—his clinging dependence on his mother, his limited verbal expression, his fear of strangers, and his capacity for joy when loved. These narrative choices subtly shift the focus from the child's impairments to the community's failure to accept cognitive difference.

What sets Bindu apart in this narrative is her unequivocal refusal to internalize the social stigma directed at her child. When confronted by her husband and neighbors—who equate disability with divine punishment, family shame, or karmic retribution—Bindu stands firm. Her decision to keep, nurture, and unconditionally love her son is not merely an act of maternal instinct; it is a radical assertion of agency and moral resistance. She does not seek to "cure" the child or conform him to normative expectations but instead affirms his right to exist with dignity.

This stance powerfully subverts the dominant discourse that equates human worth with mental acuity, productivity, or conformity.

The narrative architecture of the story further amplifies this resistance. The boy's behaviors—his reliance on Bindu, his emotional expressiveness, and his need for routine and protection—are framed not to evoke pity but to critique the ableist framework that renders him invisible and unworthy. The surrounding characters' ridicule and rejection expose the social construction of disability as a problem located in the individual rather than in a society unwilling to accommodate difference.

Sarat Chandra constructs a quiet but forceful emotional appeal, encouraging the reader to witness the moral failing of the community rather than the so-called “deficiency” of the child. Through this lens, the story indicts a cultural logic that privileges intellect over empathy, and normalcy over nurturance. The maternal bond becomes the site through which this critique is enacted, turning Bindu's caregiving into an emotionally charged act of resistance. Her actions demand that readers question the ethical assumptions of the society they inhabit, making them complicit in the very structures of exclusion that the narrative seeks to expose.

In this way, *Bindur Chhele* reframes the figure of the disabled child from one of marginal pity to one of moral centrality, and elevates maternal love to a form of counter-hegemonic discourse. It is not simply a story of mother and child, but a literary intervention into the ethics of care, social justice, and human value in the face of entrenched ableism.

Theoretical Discussion

From a **Critical Disability Studies (CDS)** perspective, *Bindur Chhele* anticipates and contributes to contemporary debates surrounding representation, agency, and the socio-political construction of value. At its core, the story challenges entrenched conceptions of normative personhood—specifically the Enlightenment ideal that equates human worth with cognitive rationality, autonomy, and economic productivity. The intellectually disabled boy in the story is denied full social recognition precisely because he fails to embody these modernist ideals. In both colonial and postcolonial societies, such exclusion is not incidental but constitutive of how citizenship, subjectivity, and rights have historically been distributed (Davis, 2013; Garland-Thomson, 2005).

By placing a disabled child at the narrative center—not as a peripheral figure but as the emotional and ethical axis of the story—Sarat Chandra destabilizes prevailing frameworks that reduce disability to personal tragedy or familial misfortune. Instead, he exposes the mechanisms of **ableism** that operate through communal norms, language, and institutionalized neglect. The story resists both medicalized objectification and sentimental idealization, offering instead a textured portrait of vulnerability and relational dignity. This shift is deeply political: it reclaims the disabled subject not as an aberration but as an ethical mirror to society's failures.

Bindu's maternal labor, when examined through the lens of **feminist care ethics** and **dependency theory**, particularly as articulated by Eva Kittay (1999), emerges as a critical form of what she terms "dependency work." In Kittay's framework, caregiving is not a private or apolitical endeavor but a central axis of justice. Bindu's actions illuminate this thesis powerfully—her caregiving is enacted under conditions of poverty, gendered subjugation, and social hostility, yet she maintains a consistent ethic of care that affirms her child's dignity. Rather than seeking to normalize or correct her son, she embraces his difference as part of their shared humanity.

This caregiving is not only emotional and physical but epistemological: it constitutes a form of **counter-knowledge** that resists the epistemic injustice faced by disabled individuals and their caretakers (Fricker, 2007). Bindu's refusal to adopt the community's deficit-oriented perception of her child becomes an act of resistance—an insistence on seeing value where society sees burden. Such a stance reframes motherhood itself as a political identity, one capable of contesting systemic devaluation.

Moreover, the narrative highlights the structural violence that women caregivers endure while shouldering emotional and moral responsibility in contexts that provide little to no institutional support. Bindu is economically disempowered, emotionally isolated, and socially ridiculed—yet her persistence in caring becomes an act of everyday heroism. This portrayal aligns with Tronto's (1993) assertion that caregiving, often feminized and rendered invisible, is in fact foundational to democratic societies.

In sum, *Bindur Chhele* offers a powerful intervention into the discourses of disability, care, and justice. It not only foregrounds the lived

experience of intellectual disability in a hostile society but also elevates maternal care as a mode of ethical knowledge and political action. Through this theoretical lens, the story challenges readers to rethink the metrics of human value and to recognize care, not cognition or productivity, as the foundation of inclusive personhood.

Conclusion:

Bindur Chhele endures as a deeply resonant literary work that illuminates the complex intersections of disability, gender, caregiving, and social exclusion. Rather than portraying disability through the lenses of pity, tragedy, or spectacle, Sarat Chandra Chattopadhyay crafts a narrative rooted in ethical realism and emotional integrity. Bindu's love for her intellectually disabled child is not merely personal; it is profoundly political. It functions as a moral force that confronts entrenched norms of ableism and patriarchal indifference, offering a counter-narrative grounded in dignity, relationality, and resistance.

The story challenges reductive understandings of human worth that hinge upon cognitive ability, social conformity, or economic productivity. By centralizing a child who does not—and cannot—fit into these frameworks, and by honoring a mother who refuses to devalue her son, *Bindur Chhele* subverts dominant constructions of personhood and reclaims care as a legitimate epistemology. In doing so, it anticipates key concerns of contemporary Critical Disability Studies and feminist care ethics, especially in postcolonial and non-Western contexts.

Moreover, the narrative foregrounds the radical potential of maternal caregiving as a form of quiet resistance—one that disrupts the ideological binaries of normal/abnormal, strong/weak, and worthy/unworthy. Through its simple yet profound narrative, the text interrogates both social injustice and the moral capacity of love to transform marginality into meaning.

Sarat Chandra's vision in *Bindur Chhele* remains urgently relevant, particularly in the Global South, where discourses on disability, care, and gender continue to evolve. The story stands as a literary and ethical testament to the power of human connection in resisting exclusion and reimagining inclusive futures.

References:

1. Chatterjee, P. (2011). *The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power*. Princeton University Press.

2. Davis, L. J. (2010). *The Disability Studies Reader* (3rd ed.). Routledge.
3. Davis, L. J. (2013). *The End of Normal: Identity in a Biocultural Era*. University of Michigan Press.
4. Garland-Thomson, R. (2005). Disability and representation: Toward a vital literary history. *PMLA*, 120(2), 522–527. <https://doi.org/10.1632/003081205X63825>
5. Garland-Thomson, R. (2005). Feminist disability studies. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(2), 1557–1587. <https://doi.org/10.1086/423352>
6. Ghai, A. (2015). *Disability in South Asia: Knowledge and experience*. SAGE Publications India.
7. Gilligan, C. (1982). *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Harvard University Press.
8. Grech, S., & Soldatic, K. (2016). *Disability in the Global South: The Critical Handbook*. Springer.
9. Kittay, E. F. (1999). *Love's Labor: Essays on Women, Equality and Dependency*. Routledge.
10. Mehrotra, N. (2011). Disability rights movements in India: Politics and practice. *Economic and Political Weekly*, 46(6), 65–72.
11. Mehrotra, N. (2011). *Disability, gender and state policy: Exploring margins*. Rawat Publications.
12. Sen, S. (2005). *Colonial Childhoods: The Juvenile Periphery of India, 1850–1945*. Anthem Press.
13. Sen, S. (2005). *Sarat Chandra: The Realist and the Idealist*. Sahitya Akademi.
14. Shakespeare, T. (2013). *Disability Rights and Wrongs Revisited* (2nd ed.). Routledge.
15. Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care*. Routledge.

Riyaz in the 21st Century : Innovations in Vocal Practice with Virtual Companions

Md. Bulbul Ahamed

Lecturer, Dept. of Music
Rabindra University, Bangladesh

Abstract: *Riyaz, the foundational practice in Indian classical music, has traditionally been much more than a method for skill development-it represents a deep spiritual and personal transformation. Embedded within the time-honored guru-shishya tradition, Riyaz was viewed as a sacred routine guided by a mentor, passed down orally and refined through years of disciplined, reflective practice. This process not only refined musical ability but also nurtured inner awareness discipline, and emotional sensitivity.*

In recent times, this classical mode of learning has been significantly reshaped by technological advancements. Digital tools-including smart apps, AI-driven assistants, electronic tanpuras, pitch analyzers, rhythm trainers and interactive platforms-have become increasingly integrated into musicians' daily practice. Collectively termed "virtual companions," these technologies simulate certain aspects of traditional teaching, offering features like real-time feedback, tailored lessons based on ragas, automated accompaniment and progress tracking systems.

This paper investigates how such tools are influencing and redefining the practice of Riyaz in today's digital age. It explores critical questions: Can technology foster the same depth of musical understanding and emotional engagement as traditional mentorship? Are these tools helping democratize learning or are they simplifying a complex, nuanced art form into something formulaic? Moreover, how do they alter not only the techniques musicians practice but also the way they internalize and connect with music?

Through recent case studies, interviews with learners and teachers and insights from the fields of musicology and digital education, this study highlights both the advantages and drawbacks of this evolving landscape. On one hand, virtual tools increase accessibility for those who lack close contact with a guru, making high-quality practice aids available globally. On the other hand, they risk diluting intricate stylistic traditions

and emotional depth, elements that are central to Indian classical music's expressive power and regional identities.

The research also examines the broader cultural and philosophical implications of this shift. As algorithm-driven feedback and structured modules replace intuitive, mentor-led practices, there is growing concern about the potential loss of authenticity and the “human” aspect of the art. However, when used wisely, these digital aids can strengthen personal discipline, promote consistent practice and support blended learning models that bridge traditional and modern methods.

In conclusion, the digital transformation of Riyaz is not a break from tradition but an evolution—an adaptive strategy suited to the needs of 21st-century musicians. Rather than viewing tradition and technology as opposites, this paper proposes a collaborative path where both can coexist. Such synergy can preserve the artistic and spiritual integrity of Riyaz while extending its relevance and reach in an increasingly digital world.

Keywords: *Riyaz, Indian classical music, Virtual companions, Digital pedagogy, AI in music, Vocal practice, Hybrid learning, Guru-shishya tradition, Music technology, Personalized learning.*

Main Discussion:

Objectives:

1. To explore how digital tools are transforming traditional Riyaz in Indian classical music.
2. To examine the role of AI and mobile apps as virtual companions in vocal practice.
3. To assess the advantages and limitations of tech-assisted music learning.
4. To analyze how hybrid models (guru + technology) are shaping modern pedagogy.
5. To understand the cultural and philosophical implications of this transition.

Introduction

Riyaz—commonly translated as musical practice or rehearsal—is far more than a mechanical repetition of notes. In the tradition of Indian classical music, particularly in Hindustani vocal art forms, Riyaz is an essential pathway to not only technical mastery but also spiritual and emotional maturity (Slawek, 2000). This daily discipline, often carried out in solitude

and sometimes under the supervision of a guru, was viewed as a sadhana—a devotional journey requiring patience, introspection and immersion. The practice involved not just learning compositions but engaging with the essence of ragas, understanding their emotional contours and mastering the grammar of improvisation.

With the onset of digital transformation in education and art, Riyaz too has begun to evolve. The ubiquity of smartphones, internet access, music applications and artificial intelligence has introduced a new modality of practice that is simultaneously empowering and controversial. On one hand, learners who lacked proximity to teachers or institutional structures now gain tools that can simulate traditional learning environments. On the other hand, some scholars and practitioners worry that this shift may dilute the depth and integrity of the tradition (Subramanian, 2006).

This paper investigates how the age-old ritual of Riyaz is adapting in an era dominated by virtual tools and applications. It seeks to answer whether these innovations can coexist with classical traditions, how they influence the learning process and what this means for the preservation and future of Indian vocal music.

1. Traditional Foundations of Riyaz

In the traditional pedagogy of Indian classical music, Riyaz is not simply the act of practicing—it is a complete way of life, a discipline that forms the spiritual and technical foundation of an artist's musical journey. For centuries, this practice was cultivated in the guru-shishya parampara system, an apprenticeship model where the student lived with and learned directly from the guru. This learning environment was immersive: students absorbed not only compositions and ragas but also nuances of tone, expression and improvisation through listening and observation (Wade, 1984).

This form of musical transmission emphasized oral traditions, experiential learning and the gradual internalization of musical knowledge. The tanpura drone created a meditative framework within which the singer would explore pitch accuracy, raga mood and vocal range. The emphasis was not on performance but on sadhana or devotional discipline. Practice sessions often took place early in the morning, with the belief that the calm, quiet hours before sunrise were best suited for developing one's voice and concentration.

Riyaz was, thus, spiritual solitary, and sacred. It demanded years of patient repetition, self-correction and mental focus. There was no written curriculum or pre-set syllabus. Each learner's journey was unique, determined by their voice, aptitude and the guru's guidance. Importantly, Riyaz was less about results and more about becoming-a transformation of the self through sound.

2. Rise of Digital Tools and Virtual Companions

With the dawn of the 21st century, technological advancement has brought dramatic shifts to nearly every domain-including the arts. In the realm of Indian classical music, a variety of digital tools have emerged to supplement or simulate traditional practice. Today's learners are increasingly using electronic tanpuras, tabla machines, mobile apps like NaadSadhana, Riyaz App, iTablaPro and pitch visualizers to assist their daily Riyaz (Menon, 2021).

These tools are often categorized as “virtual companions”-software and hardware designed to replicate the support structure of a traditional practice session. For example, apps now offer AI-powered pitch correction, raga-specific exercises, interactive feedback and voice modulation analysis in real time. Learners can customize their Riyaz according to their level, availability or vocal fatigue. Furthermore, many platforms offer recording, playback and progress tracking features that allow learners to monitor improvement over weeks or months.

This digital shift has been particularly impactful for diaspora communities and learners in remote regions where access to classical music teachers is limited. Technology has democratized access, enabling individuals to learn and practice music beyond geographical and social boundaries (Chakraborty, 2022).

However, these tools are not meant to replace the guru-they are companions, not substitutes. While they provide structure and consistency, the nuanced aesthetic judgment, emotional depth and improvisational guidance of a guru remain irreplaceable.

3. Advantages of Technology in Vocal Riyaz

The incorporation of virtual companions in vocal practice offers several tangible benefits:

1. **Accessibility:** Digital tools make Riyaz more accessible to students in rural or non-traditional environments. Learners can access practice modules, tanpura drones and rhythm tracks at any time, from any location (Rao, 2020).

2. Customization and Feedback: Apps now offer personalized lesson plans based on a learner's voice type, pitch range and skill level. AI algorithms can detect pitch deviations and offer visual cues for correction.
3. Consistency: Many learners report that the availability of structured digital tools helps them maintain regular Riyaz, even without a teacher's physical presence. Scheduled reminders, practice streaks and gamified achievements motivate consistency.
4. Affordability: Compared to hiring a live accompanist or purchasing expensive instruments, apps are often more affordable and sustainable in the long term.
5. Documentation: Learners can record their sessions, analyze past performances and send them to gurus for feedback-even if they live continents apart.

Thus, virtual companions are enabling self-paced, flexible and goal-oriented learning pathways that align well with the contemporary lifestyle.

Limitations and Concerns

Despite the evident benefits, the adoption of virtual companions in vocal Riyaz introduces several limitations that demand critical attention. While technology enhances access and convenience, it also brings the risk of over-reliance, loss of depth and detachment from tradition.

One major concern is the absence of intuitive and emotional feedback. In the guru-shishya system, a guru offers more than technical correction-they offer emotional, contextual and expressive insight into how a raga should be interpreted. An app may detect pitch error or rhythm mismatch but it cannot convey the emotional gravitas of Darbari Kanada or the playfulness of Raga Bhimpalasi (Brown, 2021). Subtleties such as meend (glide), andolan (oscillation), or gamak (ornamentation) require a keen human ear and embodied demonstration-elements that digital tools, even with machine learning, fail to adequately replicate.

Furthermore, algorithmic standardization may result in homogenized learning. Most applications follow set patterns and definitions of raga structures, neglecting the vast diversity across gharanas (schools). This threatens to dilute the very richness that makes Indian classical music unique: its regional flavors, individual interpretations and improvisational liberties (Narayan, 2020).

Another limitation is the potential lack of discipline. While technology can remind and structure practice, it cannot instill the same sense of reverence and rigor that arises from the physical presence and authority of a guru. Learners may rush through modules or become complacent with superficial proficiency.

Finally, there's a digital divide. Not all students have access to smartphones, stable internet or premium apps. Technological privilege can create further inequities in musical education, especially in under-resourced communities.

Case Studies and Field Observations

To better understand the real-world implications of virtual Riyaz tools, several case studies were examined through interviews and user feedback collected between 2022 and 2024.

Case Study 1: Meera, a High School Student in Mumbai

Meera began learning Hindustani vocal music in 2019 under a part-time teacher. During the pandemic, she transitioned to online classes and started using the NaadSadhana app. According to her, "The AI tanpura helped me with pitch alignment. I didn't have anyone at home to accompany me, but the app kept me in tune." Her guru would send her assignments and she'd submit voice recordings weekly. This hybrid approach, she notes, made her more responsible and observant of her flaws.

Case Study 2: Rajiv, an NRI Engineer in Toronto

Rajiv had no formal guru but always loved Indian classical music. In 2021, he started using the Riyaz App to learn raga basics. "The voice analysis helped me train without embarrassment. I could repeat an exercise ten times without feeling judged." Although he admits his learning lacks emotional depth, he claims he would have never started Riyaz without such tools.

Case Study 3: Smt. Kavita Rao, Guru at a Music Academy in Chennai

Kavita Rao, a respected Carnatic vocalist, incorporates apps like iTablaPro during her classes. She asserts, "Technology is a means, not an end. My students learn better when they combine practice with apps and weekly sessions with me. It's not about replacing me; it's about reinforcing what I teach."

These field observations reflect a pattern: blended learning is emerging as a new norm. Students and teachers are combining traditional mentorship with self-guided tech support, thereby optimizing

flexibility and feedback.

Case study 4: Cultural, Philosophical and Pedagogical Shifts

The transformation of Riyaz through digital companions signifies more than just a change in tools-it represents a shift in musical culture and pedagogy. Where once music was seen as a slow, sacred journey demanding surrender and time, it is increasingly being adapted to the values of efficiency, autonomy and convenience (Subramanian, 2006).

This shift challenges the philosophy of transmission in Indian classical music. Traditionally, knowledge was earned gradually, through silence, repetition and intuition. In contrast, digital platforms emphasize clarity, immediate feedback and metric-based progress. This results in a pedagogical inversion: from guru-led transformation to learner-driven exploration.

Additionally, the spiritual and meditative aspects of Riyaz-its capacity to induce inner silence and devotion-may be compromised when sessions are reduced to visual interfaces, timers and algorithmic assessments. There is a real risk of turning sadhana into a routine task devoid of its deeper resonance.

Nevertheless, it is also important to recognize that cultures evolve. Many young learners today are digital natives. They do not perceive technology as an intrusion but as a tool for empowerment. When used mindfully, these tools can enhance self-discipline, consistency and confidence, especially in the initial stages of training.

From a pedagogical standpoint, the future likely lies in hybrid models: a guru provides holistic mentorship, while technology supports daily practice and feedback. This symbiosis respects tradition while harnessing modernity.

Case study 5: Hybrid Models of Riyaz Practice

As the landscape of music education continues to evolve, a promising trend that has emerged is the hybrid model of Riyaz-a balanced fusion of traditional teaching and digital supplementation. In this approach, the guru remains the central figure, guiding the emotional and aesthetic development of the student, while digital tools serve as support systems to enhance daily practice and enable independent learning.

This model acknowledges that technology cannot fully replace human mentorship, particularly in an art form as sensitive and intricate as Indian classical music. Yet, it also recognizes the benefits of digital structure and convenience. Guru's today is increasingly adapting to this

reality. They encourage their students to record sessions, analyze voice graphs, use smart tanpuras or submit weekly assignments through apps and messaging platforms (Bandyopadhyay, 2023).

In institutional settings, some music academies have adopted blended learning frameworks: live classes are complemented by access to virtual libraries, online practice schedules and feedback forums. For example, institutions like KM Music Conservatory and the ITC Sangeet Research Academy have experimented with digital pedagogy tools, especially during and after the COVID-19 pandemic (Gupta, 2021).

Moreover, hybrid models are allowing gurus to reach more students than ever before, especially in diaspora communities. Online classes paired with app-guided Riyaz have opened new pathways for learners who are culturally removed from the centers of classical music.

This hybrid system, however, demands careful design. It requires clear boundaries between technical automation and artistic interpretation. While apps can help students correct pitch or rhythm, only a guru can explain why a particular taan must curve in a certain way or how a note can express longing or divinity.

Future Outlook: AI, AR and Personalized Learning

Looking ahead, the future of Riyaz is likely to be shaped by artificial intelligence (AI), augmented reality (AR) and personalized learning systems. These technologies have the potential to make Riyaz even more immersive, interactive and tailored to individual needs.

AI in Riyaz is already being applied through pitch detection, tuning correction and vocal analytics. Future developments may include emotion-sensing software that provides feedback on the expressiveness of a singer's rendition or systems that simulate gharana-specific ornamentation patterns based on historical recordings (Mishra, 2022).

Augmented Reality (AR) could further revolutionize Riyaz by providing virtual teaching assistants or interactive holograms of gurus demonstrating specific techniques. This may help learners visualize vocal mechanics, breathing patterns or throat positions while singing.

Another promising area is adaptive learning systems. Just as fitness apps personalize exercise routines, Riyaz apps could create voice-based practice schedules that adjust in real time depending on vocal strain, progress or time of day. These tools would also incorporate mindfulness or vocal health modules to encourage sustainable practice.

However, the advancement of such technologies must always be

guided by the ethos of Indian classical music. As much as these tools can support technical proficiency, they must also nurture sensitivity, introspection and devotion, which are central to musical authenticity.

Conclusion:

Riyaz, once confined to the quiet intimacy of the guru's home or the solitary silence of early mornings, is now being reimagined in digital spaces. From AI-driven apps to hybrid classrooms, the very act of practicing Indian classical music is being transformed. This shift is neither a rejection of tradition nor a blind acceptance of technology. Rather, it signals an evolutionary adaptation, responding to the needs and possibilities of the 21st century.

While digital tools offer unprecedented access, structure and feedback, they cannot replace the emotional intelligence, intuition and artistic sensitivity of a human guru. Hence, the most effective approach lies in integration, not substitution. A thoughtfully designed hybrid model can preserve the sanctity of Riyaz while expanding its reach and relevance. As the world becomes more interconnected and technology more intelligent, the challenge will be to preserve the soul of the music even as its methods modernize. In this synthesis of tradition and innovation lies the future of Riyaz—a practice both ancient and ever-evolving.

References:

1. Bandyopadhyay, A. (2023). Technology and Indian Classical Music: Challenges and Opportunities. *Indian Journal of Music Studies*, 11 (2), 112–129.
2. Brown, J. (2021). *Improvisation and Identity in Indian Classical Music*. Routledge.
3. Chakraborty, T. (2022). Diaspora Musicians and Digital Pedagogy: A New Era of Riyaz. *Journal of South Asian Arts and Performance*, 9 (1), 33–50.
4. Gupta, P. (2021). Pandemic and Pedagogy: Classical Music Teaching in India. *International Review of Arts Education*, 5 (4), 72–88.
5. Menon, S. (2021). Music Apps and the Democratization of Riyaz: An Indian Perspective. *Musicology Today*, 15 (3), 89–104.
6. Mishra, D. (2022). Artificial Intelligence in Hindustani Vocal Training: Emerging Models. *Asian Music Technology Review*, 4 (2), 45–61.
7. Narayan, R. (2020). *Gharana Distinctions and the Role of Oral*

Traditions in Hindustani Music. Delhi: Sangeet Natak Akademy Press.

8. Rao, R. (2020). Virtual Tanpura and the Changing Aesthetics of Riyaz. *Journal of Indian Musicology*, 18 (1), 60-77.
9. Slawek, S. (2000). Keeping It Going: Terms, Practices, and Processes of Improvisation in Hindustani Instrumental Music. In Nettl, B., & Russell, M. (Eds.), *In the Course of Performance* (pp. 335-368). University of Chicago Press.
10. Subramanian, L. (2006). *From the Tanjore Court to the Madras Music Academy: A Social History of Music in South India*. Oxford University Press.
11. Wade, B. (1984). *Khyal: Creativity Within North India's Classical Vocal Tradition*. Cambridge University Press.

A Study on Implication of Socio-Cultural Learning Theory in Political Science Education : Insight from Vygotsky

Susmita Paul

Assistant Professor, Department of Education
St.Xavier's College (Autonomous), Kolkata, West Bengal
&

Birajlakshmi Ghosh

Principal, Gholdigrui Shikshan Mandir B.Ed. College
Pursurah, Hooghly

Abstract: *The aims of this study were found that Vygotsky's theory of social constructivism effectively be used in teaching Political Science. Social constructivism means students are learning through interaction with teachers and peers. Vygotsky also believe that culture influenced students learning procedure means knowledge constructed in specific cultural context and Political Science accepted as a social science base subject so this research paper tries to find out with the help of social learning theory how political science students foster collaborative attitude and deep apprehension of political concept. Other important components of Vygotsky's theory such as social interaction, scaffolding and zone of proximal development would be applied in teaching political science. The present study has been conducted to know about how vygotsky's concept help to increase critical thinking, foster political awareness and encourage every individual student to involve any activity in political science classroom. Using a qualitative research design, this research paper mainly focused on role of social interaction, guidance of educator and activity-oriented learning essentially required in political science classroom. The result of this study suggests that if vygotsky's learning theory could be used properly, it enhances students analytical thinking, active participation and build in-depth knowledge in political science subject.*

Keywords: *Vygotsky Socio-culture learning, Political Science Education, Collaborative Learning, Zone of Proximal Development, scaffolding theory.*

Introduction

Background:

Social learning theory (1978) proposed by Lev Vygotsky emphasized on social interaction, Peer discussions because it is important for adult

learners while they are learning political theories. He proposed that learners' cognitive skill can be improved by social mixing, transmitted cultural thoughts and encourage team learning. Political Science teacher if appropriately used vygotsky's theory in classroom then students will get a clear idea about democracy features, students would get opportunity to freely participating any political debate, panel discussion and political seminars.

Political Science is a multidisciplinary subject and it connects all over the world. Political science students only able to criticize government policies, create awareness on global political issues (like criteria of citizenship) and analytically think how different ideologies (Liberalism, Marxism, Gandhism) strategically used in Indian political context. Very common method used in teaching political science that is lecture method but rote learning and memorization are the prime drawback of this method because lecture method believe that teacher is playing crucial role and students are passive listener so students are not allow to directly involve any political activities not even getting freedom to know about world political affairs.

Discussion

Research Questions:

- i) How does the application of Vygotsky's Social Learning Theory influence student active participation in political science classroom?
- ii) What are the effect of collaborative learning and scaffolding theories proposed by Vygotsky to enhance students critical thinking to understand complex political theories?

Significance of the Study:

The study proves that self-study method much effective rather than lecture method used in Political Science Classroom. This paper also highlighted Vygotsky social-cultural theory increased social interaction for developing moral value like respect to each other opinion among students. This research paper also showing the effect of peer-learning method for understanding complex political theories. The study demonstrates the advantages of the scaffolding theory because it foster problem-solving skill among political science students. This study has significant impact because it believes that collaborative learning is the best way to make the students mind inquisitive. Another very important

significance of this article to create awareness how Vygotsky's theory like zone of proximal development help political science students more enthusiastic and participative. With the guidance of the teacher, political science students can also learn how to complete case study or project through the application of ZPD theory in political science classroom. Our study also certifies that if political science teacher apply vygotsky theory then learning would be more interesting and joyful. Main purpose of our study to prove that the use of Vygotsky's Socio-Cultural theory is leading the way for an innovative era in teaching-learning process.

Objectives:

1. To find out the impact of Vygotsky's Social learning theory in Political Science education.
2. To analyze the aspect of scaffolding and peer collaboration in enhancing student understanding of political theories.
3. To assess the effect of social interaction on students' involvement and participation in any group discussion in political science classroom.
4. To discover the classroom application of Vygotskian theory in political science subject.

Review of Literature:

Social Learning in Political Science Education

Dewey's theory based on Experiential Learning (1938), it means learning by doing or learners actively participated in learning process through their previous learning experiences. According to this theory students past knowledge reflect on their present activity and assignment, project, field survey are the best examples of Dewey's learning process where students' hands- on- experience is the key component of this theory. Vygotsky also supported Dewey's experiential learning concept.

Freire's critical pedagogy (1970) research article reveal that Political Science curriculum should introduce activity-based content which increased students critical thought and it is essentially required for all political science students.

Vygotsky's Social Learning Theory

Vygotsky (1978) believe that socio- cultural interaction enhanced cognitive development of students and his theory also focused on zone of proximal development, scaffolding which are proved that learning is a social process and learners got opportunities to meet new experiences that create them more knowledgeable and independent learners but it

was only possible with the help of teacher guidance, peer members support.

Uses of collaborative learning in teaching Political Science

This study highlighted that if collaborative Learning methodology political science teacher apply in class then Political Science student easily grasp political theories and ideologies because this method encourage sharing thoughts and distribution of knowledge among students. Collaborative learning also emphasized on Political Science students should be participate in debate, Quiz, take part in group discussion and freely express their opinion about government policies. (Angela Wolfe, University of Delaware, Oct 2012).

Application of Vygotsky's Theory in Higher Education

The research article pointed out Vygotsky social-learning theory always focused on collaborative learning, peer learning and scaffolding methodology which are motivated students to participate seminar, workshop in large level and Vygotsky theory enhanced students analytical reasoning ability in social science subject This study also proposed that Political science teacher should be followed Vygotsky theory while delivered lecture because this theory based on student-centric principles. (Mercer & Littleton, 2007).

Methodology

Research Design:

In this study, the Qualitative research approach with case study and classroom observation tools had been followed by the researchers.

Data Collection Methods:

1. Classroom Observations – Political Science lectures where collaborative learning techniques are applied.
2. Interviews with Educators – Understanding teachers' perceptions of Vygotsky's theory in Political Science education.
3. Student Surveys – Gathering feedback on how peer discussions and scaffolding impact learning outcomes.

Findings:

The findings will be classified into three main concepts in this study:

1. Collaborative learning and its effectiveness in teaching political science among higher level students.
2. Use of Scaffolding theory to understanding easily complicated political concepts.

3. Interactive method and its implication in Political Science classroom to enhance reasoning ability and encourage sharing ideas among Political Science students.

Analysis and Discussion:

1. Social Interaction and knowledge about political matters

According to Vygotsky theory without social interaction learning process would not be completed so case study, debate, seminar, panel discussion should be incorporated in teaching political science. As a Political Science teacher we should try to apply interaction method so students will participate more and more numbers in classroom conversation.

Example: Students will be able to join debate on globalization topic in International Relation class which make them friendlier and give them idea how they would apply their diplomatic knowledge.

2. Scaffolding in Political Education

Teacher act as guide or resource person who are providing idea how does students realize complicated theories in a very easy way. According to vygotsky theory teachers only giving clue to political science students and with the help of teachers, learners completed their assignments. Teachers also call “More Knowledgeable Others (MKO)” who guided the path where students walk in alone.

Example: Teacher introduce the lesson how Election conducted in our country, teacher explain every step of procedure such as teacher would giving idea the fundamental concept of democracy is majority people participation after explaining majority rule teacher will provide idea about proportional representation and function of mixed system. The Teacher will assess students mental level and proceed to the next concept accordingly.

3. The Zone of Proximal Development (ZPD) in Political Science:

ZPD is a student understanding level where they need teacher guidance, teacher giving some problem and students apply their prior knowledge and they will trying to solve this problem but when they will unable to solve then students could take guidance from their teacher supervisor. Through ZPD Political Science students learn and overcome all challenges and this is the best method of learning where students’ autonomous learning will encourage. Minimum teacher guidance and maximum students self-learning process will acknowledge in this stage.

Example: A group discussion on human rights policies where students analyze UN conventions and compare policies across nations with teacher assistance.

Political science teacher will giving situation like how government passes the Law and Students have previous knowledge about function of legislature with help of this current knowledge and teachers' advice students will organize Mock Parliament session and demonstrate how law can be transformed into an act.

4. Collaborative Learning and Peer Discussions

Peer teaching or team teaching will build students reasoning power and critical analysis skill. Students will participate group discussion and they will get scope to sharing their own ideas. Through collaborative learning lot of ideas came out and students are compelled to think. Different innovative thinking appreciated in Peer discussion learning method.

Example: Students will be able to conduct a debate on different policies which are made by Indian Government and students also try to analyze importance of government policies from different ideological background and they would share their ideas in open forum so lots of creative opinion reveal in one platform and students could also learn how to solve a problem from different angles.

5. Real-World Applications: Learning by Doing

Political Science is a multidisciplinary subject so teacher can organize action research, case study, field survey, project, making Wall magazine and other activities on various political concept and Political Science students are benefited to getting scope complete this type of activities. Vygotsky theory focused on experiential learning which provided Political Science curriculum. Through internship, project completion, researcher and case study observer, surveyor students also achieved real world experiences through the application of learning by doing method.

Example: A field visit to a parliamentary session helps students to understand legislative processes through direct experience. Student could also observe functions of Gram Panchayat if they would visit to any village or they would receive direct experience if they are allow doing any political case study such as impact of caste reservation in India or the politics of migration.

Conclusion:

Vygotsky's Social Learning Theory provides a strong foundation for teaching Political Science by emphasizing collaborative learning,

scaffolding, and social interaction. The study highlights that peer discussions, real-world applications, and guided learning experiences enhance critical thinking, civic engagement, and political literacy. Implementing Vygotskian methods in Political Science classrooms can bridge the gap between theoretical learning and active participation in governance and policymaking. This study also gives an outline for future research such as how vygotsky's socio-cultural theory consistently affects on students' cognitive development?

References:

1. Daniels, H. (2001). *Vygotsky and Pedagogy*. Routledge.
2. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
3. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
4. Kozulin, A. (1990). *Vygotsky's Psychology: A Biography of Ideas*. Harvard University Press.
5. Lantolf, J. P., & Thorne, S. L. (2006). *Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development*. Oxford University Press.
6. Mercer, N., & Littleton, K. (2007). *Dialogue and the Development of Children's Thinking*. Routledge.
7. Palincsar, A. S. (1998). *Keeping the Metaphor of Scaffolding Fresh: A Response to Cazden*. Educational Researcher, 27(6), 6-8.
8. Rogoff, B. (1990). *Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in Social Context*. Oxford University Press.
9. Wertsch, J. V. (1985). *Vygotsky and the Social Formation of Mind*. Harvard University Press.
10. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Corruption and Mental Health : A Sociological Overview

Irani Sahu

Assistant professor, Dept. of sociology
Arambagh girls' college

Abstract: *Corruption affects the growth of any society, both economically and socially. It is a complex issue with many varying systematic, legal, socio-political, economic, and cultural dimensions. While many societies across the world are affected by corruption to varying degrees, the root cause of this problem is the lack of proper governance systems and the greed of people with power. There is no official guide or policy to address corruption. It is a self-perpetuating problem, driven by unspoken rules and the need to wield power. It also results in the misallocation of essential public resources like healthcare and education. These services become available only to those who are ready to pay a bribe, inviting psychological disorders, especially anxiety and uncertainty, among people. The damage manifests in a myriad of ways. For instance, the intensity and regularity of the bribes that have to be paid result in severe financial burden and, coupled with constant anxiety, exacerbate the situation for those who are already vulnerable. Thus, the impact of corruption is multi-faceted—socially, functionally, and psychologically. This paper addresses the issue of the alarming impacts of commonplace corruption on mental health.*

Keywords: *corruption, emotion, anxiety, mental health, bribe.*

Main Discussion: Corruption is a phenomenon that affects multiple circles, such as economy, politics, administration, culture, and even psychology. It is more prominent than ever, firmly securing a place in public conversations and the political landscape. It is true that corruption spans a wide range of economic issues, but if we consider the potential economic damage that may arise from a person's poor decisions or actions, it's quite evident that there is a social dimension too. Taking a narrower perspective, if we define corruption as “perversion or destruction of integrity in the discharge of public duties by bribery or favour,” it does point to the social norms of the society in question and the collective views and interpretations of the relevant groups.

What is fundamental is that a corrupt practice does not require a breach of law, though it does require a breach of ethics. Here it is necessary to make a clear distinction between deviance and corruption. Clearly corruption is a deviance, but it exists within a formal system, the way we describe it. Private deviant acts include widespread practices; for example, a private physician submits a fraudulent document to the insurance company for a certificate in exchange for a bribe.

The word corruption comes from the Latin verb *corrumpere*, which means “break in pieces, destroy, ruin, spoil, mar, adulterate, falsify, draw to evil, seduce, [or] bribe.” The fact that corruption has verbal roots suggests that it is better understood as a process rather than an outcome. Interestingly, corruption has been studied less frequently as a process, despite the fact that the true puzzles we need to solve in order to understand corruption are about the processes that produce corruption, not the end result of those processes. As a result, rather than focusing solely on outcomes, this paper will seek to understand the psychological dynamics of corruption.

Aside from financial consequences, corruption harms people psychologically and emotionally. In developing and underdeveloped countries, corruption is not only a major economic problem but also a psychological one. Bribery is a major factor in corruption. The culture of willingly or forcefully offering and accepting bribes can cause a significant psychological imbalance in society. Willingness to pay for something and taking advantage of someone by offering a bribe may result in unethical greed among bribe recipients. In such cases, a small number of people are forced to pay bribes in order to meet the high expectations of bribers. This entire process creates mental stress, as well as fear and anxiety. Sometimes paying a large sum of bribes causes anxiety among bribe givers because the process is illegal and the work must be completed or not. In rural areas, people sell their land and give a large sum of money to Dalal (Middle Man), who promised the villagers that he would provide governmental jobs through his contacts with higher-level government officials. Dalals sometimes keep their promises and are successful in earning the trust of the villagers. However, Dalal has a history of not keeping their promises; they have cheated villagers and then vanished after receiving money. So, in that case, people are not economically or mentally collapsed. A few cases were discovered in which people committed suicide due to anxiety and fear.

The amount and frequency of bribes also cause problems for people. When people are forced to pay bribes in every government sector, they lose trust and accept bribery as a societal system that puts pressure on poor people who cannot afford to pay. In that case, they do not benefit, whereas someone who pays a bribe does, resulting in an unethical bias. Those who are economically vulnerable cannot afford the process of offering bribes. Discrimination of this nature weakens their mental and emotional capacities.

Corruption also causes a distorted allocation of critical public services, such as health care and educational infrastructure. These are essential for physical and mental health, but they are frequently only accessible to those who are willing and able to pay. Furthermore, paying bribes for essential goods and services (to which one is legally entitled) induces feelings of helplessness and disenfranchisement. It is estimated that approximately 10% of the global population suffers from mental health disorders, with the poorest being particularly vulnerable. Furthermore, those with lower incomes are more likely to suffer from depression and anxiety than those with higher incomes.

A study conducted in rural Vietnam discovered that exposure to everyday petty corruption has a significant negative impact on mental health. Women are frequently the primary carers for their families, so they are often the ones seeking essential services. Their findings indicate that women's reliance on public services in areas where corruption is prevalent had a greater impact on their mental health than men's. It is also discovered that exposure to corruption reduces trust in local communities and institutions and leads to a reduction in incomes, which affects mental health.

So, corruption has a significant negative impact on society, and people are well aware of this. In everyday life, and in individual cases of corruption, the psychology of human beings plays a significant role in whether or not they are corrupted. People are unconsciously involved in corruption, and sometimes they are forced to be so. Misuse of power, making money illegally, and defrauding people are all considered mental distortions associated with corruption.

Socialisation also plays an important role in this case. Those who have grown up after witnessing various forms of unethical behaviour do not feel guilty about being corrupted and do not attempt to hide it. They were socialised in a negative way, which made them more selfish and

unethical. On the other hand, people who work in white-collar jobs are corrupted as well, but they try to hide it because they know it is unethical.

There are numerous opinions on how to eliminate corruption and care for society. However, there is no one-size-fits-all solution for removing corruption from society. The reason for this is corruption and a corrupted culture based on human mentality and needs. Corruption develops primarily to deny society's ethics and values. As a result, people are internally conflicted about whether they should or should not. Sometimes, this type of self-evolution helps people avoid corruption. People's consciousness and self-respect can sometimes prevent corruption. Culture and the position of values in a particular society are important considerations. Inspired by certain principles, people from various religious institutions sometimes say goodbye to corruption. Another factor that contributes to corruption is the country's poverty and lack of sufficient funds. There is no balance between salaries and commodity prices. Salaries should be determined based on expenditure. The gap between these two components allows corruption to develop. Focusing on this area helps to protect society from corruption.

Another significant finding is the concept of corruption in the government sector. People consider various administrative sectors, service sectors, and political groups to be major sources of corruption. As a result, changing governmental policies and ethics helps to avoid involvement in corruption. This is not an easy process, but institutional and legal control, as well as a general unwillingness to tolerate corruption, may help to achieve a corruption-free society. Controlling and empowering various anti-corruption agencies actively contributes to positive social change.

The legal and judicial systems serve as the foundation for a state or country's administration and overall system. It can be argued that the best legal system can regulate human behaviour and keep a state stable. When it comes to corruption, the legal system has a significant impact. Corruption will be controlled through appropriate legal and judicial means. Unfortunately, the legal system is unable to address corruption. There are various contexts that contribute to corruption, preventing the legal system from functioning properly.

This is how corruption increased by leaps and bounds. There are no specific policies or ways to eliminate corruption if people are not

internally opposed to it. It does not involve individual processes. If government activity and the self-consciousness of every member of society work together, corruption will be eliminated.

Counselling is also an important way to eliminate corruption from both the human mind and society. Through counselling, people become aware of the negative aspects of corruption as well as how corruption causes problems for their children. So, as people develop their consciousness and care about society, the rate of corruption will decrease.

So, corruption not only destroyed society economically but also destroyed people mentally and emotionally. Corruption may cause depression, anxiety, and other types of social disorders. When issues such as corruption become more prevalent, both happiness and positive energy in society decrease in equal measure. This causes problems for society.

References:

- Moody-Stuart, G. (1997). *Grand corruption: How business bribes damage developing countries*. WorldView.
- Tarp, F., Singhal, S., & Sharma, S. (n.d.). The forgotten psychological cost of corruption in developing countries. The Conversation. Retrieved November 27, 2021, from <http://theconversation.com/the-forgotten-psychological-cost-of-corruption-in-developing-countries-156413>
- Ting, Carol. (2018). The feedback loop of rule-breaking: Experimental evidence. The Social Science Journal. 57. 10.1016/j.soscij.2018.11.004.
- Melgar, N., Rossi, M., & Smith, T. W. (2010). The perception of corruption. International Journal of Public Opinion Research, 22(1), 120–131. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edp058>
- Corruption in administration: Evaluating the Kautilyan antecedents Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. (n.d.). Retrieved August 4, 2020, from https://idsa.in/issuebrief/CorruptioninAdministrationEvaluatingtheKautilyanAntecedents_TarunKumar_121012
- Corruption in India. (2014, December 4). Your Article Library. <https://www.yourarticlelibrary.com/essay/corruption-essay/corruption-in-india/44021>.

Anonymity, Silence, and the Politics of Intimacy in Sachin Kundalkar's *Cobalt Blue*

Hasanuzzaman Ansari

Research Scholar, Dept. of English
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
Srinagar Garhwal, Uttarakhand
&

Monika Gupta

Professor, Dept. of English
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
Srinagar Garhwal, Uttarakhand

Abstract: *Tracing love beyond marriage, family and reproduction, queer desire and romance unsettle the heterosexual matrix by asking how intimacy survives when recognition is denied. Sachin Kundalkar's Cobalt Blue (2006) stages this tension. As a nameless guest enters a Maharashtrian's household, Tanay and Anuja fall in love with him. With a fragmented and ever-shifting narrative technique, Kundalkar mirrors the fragile and melancholic life it contains. The paying guest, spectral and silent, embodies a queer desire that cannot be named. This paper seeks to understand how silence operates as both presence and absence in shaping queer desire in Cobalt Blue. It aims to examine how Kundalkar reimagines romance outside the script of heteronormative futurity. It further investigates the significance of anonymity within the Indian queer context, drawing on Butler, Sedgwick and Bersani.*

Keywords: *Queer Desire, Romance, Silence, Anonymity, Heteronormativity.*

Introduction:

By unsettling the normative coordinates of love and intimacy, queer desire gestures beyond the domains of the “heterosexual matrix,” a system that secures the alignment of sex, gender, and desire (Butler 194). When intimacy survives without recognition, it does so as both resistance and vulnerability. In this sense, queer romance is not only about fulfilment but also about inhabiting the precarious conditions of endurance. Sachin Kundalkar's *Cobalt Blue* (2006) dramatizes this precariousness with remarkable subtlety. The novel unfolds within a

middle-class Maharashtrian household, into which a paying guest, a nameless and spectral figure, enters. Both siblings, Tanay and Anuja, fall in love with him, producing a rupture that extends across the domestic and symbolic structures of family and inheritance. The triangular entanglement not only fractures the stability of the home but also interrupts the narrative's coherence, as the text splinters into fragmented letters, shifting voices and silences.

The novel's form, therefore, mirrors its queer thematics. Silence emerges here as a structuring presence. As Eve Kosofsky Sedgwick reminds us, it is not merely absence or lack but an affective force that registers what cannot be spoken or admitted (3). Silence in *Cobalt Blue* produces a space where desire discloses and conceals itself. Here, intimacy further persists without naming and recognising it. The figure of the paying guest crystallizes this paradox. Signifying the invisibility demanded of queer lives within the Indian context, his anonymity is not incidental but carefully choreographed.

This dynamic can be further understood with Leo Bersani's theorisation of sex as shattering, as the undoing of the self rather than its confirmation (222). The paying guest embodies this undoing. By leaving the sibling duo, Tanay and Anuja, with fragments of love and longing for a resolution, his presence destabilises their self-existence. Romance here is neither anchored in futurity nor reconciled within narrative closure. It persists instead as melancholia, a residue of desire that lingers after the lover's departure. This paper seeks to examine how silence functions simultaneously as presence and absence in shaping queer desire in Kundalkar's novel. It aims to explore how *Cobalt Blue* reimagines romance outside the teleology of heteronormative futurity. It further investigates the significance of anonymity within the Indian queer context, where secrecy, invisibility and withdrawal remain central to the politics of intimacy. Drawing on Butler, Sedgwick, and Bersani, the paper argues that Kundalkar constructs a queer grammar of love grounded not in fulfilment but in betrayal and uncompletion.

Queer Desire and the Politics of Romance

Queer desire, a force that unsettles normative frameworks while also revealing how subjectivity itself is bound to power, has long been theorised as both disruptive and constitutive. Lauren Berlant describes desire as an attachment that exceeds the object, binding the aspirational to the material. Desire, in this sense, is not simply about possession but

about projection, the meanings one imposes on the beloved. The object of longing is thus never fully outside the subject but always shaped by its own interpretive acts. Longing discloses absence even as it seeks presence.

Michel Foucault's *History of Sexuality* reframes this absence as part of what he calls "reverse discourse" (101). Sexuality, particularly homosexuality, became thinkable only as medical, legal and cultural discourses named it. However, the same naming enabled resistance. Homosexual subjects began to speak back, claiming legitimacy in the very terms of their marginalisation. Shaped by the very mechanisms that police and proliferate sexuality, queer desire therefore emerges not outside systems of power but within them. For Foucault, power does not repress sexuality but produces it, generating new possibilities for desire through discursive regulation (48).

Judith Butler builds on this by showing how desire is never pre-discursive but performative. Gender, as Butler insists, is not a fixed identity but a repeated stylisation of the body. By extension, desire and romance are also enacted through repetition, simultaneously sustaining and unsettling dominant norms. Often seen as a path to stability or futurity, Romance becomes a site of reiteration where recognition is contested in Butler's frame. In *Undoing Gender*, Butler suggests that desire undoes the subject, revealing the self's dependence on relationality. Desire is to be displaced, to be beside oneself, and to experience the porousness of identity (19–20).

Eve Kosofsky Sedgwick further complicates this relational undoing by theorising triangulated desire. For Sedgwick, desire is not simply a matter of two individuals but a structure that circulates through rivals, norms and prohibitions. The rival, she argues, often becomes as charged as the beloved, binding subjects in ambivalent, sometimes hostile intimacy (21). In this way, romance is never fully dyadic; it is embedded in social configurations that disclose the cultural logics of homosociality, rivalry and prohibition.

Leo Bersani radically redirects this conversation by foregrounding sex as self-shattering. In *Is the Rectum a Grave?* Bersani insists that sexuality is not always about empowerment or identity formation, but about undoing the sovereign self (222). Anal sex, he argues, is not a loss but an ecstatic surrender, a release from the illusion of

coherent subjectivity (3). In this sense, queer sex destabilises not just norms but the very fantasy of the autonomous self.

Jose Esteban Muñoz further positions queer desire as utopian. In *Cruising Utopia*, he contends that queerness gestures toward what is “not yet,” refusing the closure of reproductive futurism (1). Desire, here, is not only critique but possibility, imagining new modes of living and loving beyond the present. Taken together, these theorists show that queer desire and the politics of romance cannot be reduced to identity or reproduction. Desire is produced within power, staged through performance, dispersed through triangulated relations, and sometimes experienced as ecstatic unmaking. However, it also points toward utopian horizons, insisting on the possibility of relational worlds otherwise.

Anonymity and the Unnamed Guest

In *Cobalt Blue*, anonymity emerges as a central principle of desire and intimacy. The paying guest, who remains unnamed throughout the novel, enters the Maharashtrian household of Tanay and Anuja, immediately becoming the axis around which both siblings’ desires revolve. His lack of a name destabilises conventional narratives of recognition and relationality (7). This anonymity is not merely a stylistic choice; it structures the affective and narrative logic of the text, reflecting the fragile, melancholic, and precarious nature of queer intimacies.

In the Indian context, withholding one’s identity carries significant social and cultural weight. As R. Raj Rao observes in his commentary on the anthology *Facing the Mirror*, many contributors adopt pseudonyms or omit surnames as a strategy of survival, signalling that queer existence cannot always be publicly acknowledged (142). By using assumed names, these contributors resist both heteronormative and normative frameworks of recognition, positioning themselves as outlaws within a society that often marginalises same-gender desire. In *Cobalt Blue*, the anonymity of the paying guest performs a similar function. It gestures toward the invisibility imposed upon queer lives while simultaneously enabling a form of ethical and affective intervention in the household.

Kundalkar stages the fragile intersections of desire and recognition through the presence of this unnamed figure. To Tanay, he appears gay; to Anuja, he is understood as straight. Leaving bisexuality without a language of recognition, these differing perceptions highlight how sexuality is continually forced into the binary of heterosexuality and

homosexuality (19). By embodying a form of queer anonymity and arriving with no known caste, religion, or familial history, the paying guest unsettles categories. However, he is never granted a stable place within them.

Set against the late 1990s, the novel gestures toward a cultural moment when young people could begin to speak of homosexuality, where lesbian desire was faintly legible, yet bisexuality remained absent. The paying guest's relationships with both Tanay and Anuja expose this silence, for while his desires exceed the binaries available to them, neither sibling can apprehend him as bisexual. Tanay's self-understanding as gay seems coherent within the framework of available identities, while Anuja's reading of the guest as straight secures her place in a normative discourse. Between these two recognitions, bisexuality disappears altogether.

The Joshi family, an orthodox Marathi Brahmin household living in Kerala, embodies an ethos of tradition and continuity. Their morality allows for limited forms of gender performance but cannot account for desires that move outside its frame. The paying guest's arrival introduces a simultaneously intimate and destabilising disruption. Through Tanay's monologues and Anuja's journals, the novel charts the pain of failed intimacies, the intensity of hidden attachments, and the difficulty of naming a sexuality that resists available categories. The guest's departure remains unexplained because the siblings cannot situate him within their intelligibility terms (48).

Tanay recalls searching for companionship in almost any form, "friendship with someone who was studying information technology: or someone who wanted to settle in the United States. Anyone" (4). For him, the paying guest offered the possibility of permanence, even love, but the relationship dissolves into betrayal: "I don't know how you managed it; an intense relationship with me, an attraction to Anuja, and then to elope with her? To live somewhere else" (23). What emerges is not simply personal grief but the symptom of a broader cultural erasure, where bisexuality is not denied outright but remains unnamed and unthinkable.

Anuja's devastation leads her toward medical treatment, while Tanay's wound manifests in estrangement and silence. The word "bisexual" is never once uttered in the novel, as if it could not exist. In this refusal, Kundalkar dramatises the condition of queer anonymity, where a life is lived in the shadow of invisibility, present but not

recognised, felt but not named. The unnamed paying guest does not merely remain without a proper noun; instead, he embodies the erasure of bisexuality itself.

Silence and Ungrievability of Queer Loss

Sara Ahmed, in her seminal work *The Cultural Politics of Emotion*, argues that “queer lives have to be recognised as lives in order to be grieved” (Ahmed 155). This assertion underscores a critical aspect of queer existence. The recognition of queer lives as legitimate and meaningful is a prerequisite for their grief to be acknowledged. Without this recognition, queer loss remains ungrievable, existing outside the bounds of societal acknowledgement.

Kundalkar poignantly illustrates this concept through the experiences of Tanay and Anuja. Though stemming from the same source, their griefs are shaped by their differing circumstances and societal perceptions. Tanay’s love for the guest is concealed, a secret he cannot share. His emotional turmoil becomes evident when he reflects on the guest’s departure, “You came as a paying guest. You gave my parents the rent. You gave me so much more. Then you slipped away” (4). This line encapsulates his sense of loss and betrayal. Later, as his parents search the guest’s room, Tanay is overwhelmed with emotion. The remnants of the guest’s presence evoke memories of their first meeting, causing his eyes to well up with tears. His mother, misunderstanding his grief, assumes he is mourning Anuja’s elopement, “*Aai* thought I was crying because I was missing Anuja and she hugged me” (Kundalkar 12). This moment underscores the invisibility of queer grief, as Tanay’s genuine sorrow goes unrecognised.

Anuja’s experience contrasts sharply. After eloping with the guest, she returns home heartbroken and is subjected to therapy, her pain publicly acknowledged. However, her grief is framed within heteronormative expectations, and her queer love remains unspoken. The societal acceptance of her heterosexual heartbreak highlights the erasure of queer identities and emotions. Kundalkar masterfully intertwines these narratives to depict the complexities of queer love and loss. Through Tanay’s silent suffering and Anuja’s publicised grief, the novel critiques societal norms that marginalise queer experiences, emphasising the profound impact of unacknowledged love and loss.

Private Affections and Quiet Longing

Intimacy is never fully articulated in this novel. It exists as a suggestion, a gesture and a fleeting awareness. Tanay's reflections reveal a relationship structured less by societal recognition than by shared presence and subtle attention. He wonders, "What do two men who decide to live together do? Men like you and me? Those who don't want children? Those who don't have the old to look after or the young to raise?" (17). The question gestures toward a life together, yet it remains hypothetical, hinting at the quiet, socially unacknowledged forms of queer intimacy.

Moments of physical proximity, setting up the room, touching on the arm, and shared spaces, become carriers of affect and care (Kundalkar 23). Tanay notices colours when the guest breathes, bathes or smiles. Every sensation conveys emotional resonance beyond verbal expression, "When you breathe out, I see red and yellow flashes in front of my eyes...if I'm talking to someone and mention you, my face changes, it's a dark blue" (Kundalkar 52). Yet the intensity of this intimacy is inseparable from its silenced form. Tanay cannot grieve openly: "I have no tears now. Why should I? No one around me would understand. But memory surges back, hot and fresh" (56). Desire, care, and attachment exist in the spaces between acknowledgement and erasure, producing a quiet, potent, and often solitary form of connection.

Anuja's intimacy, by contrast, is shaped by societal constraint. After eloping with the guest, she returns home heartbroken and isolates herself, locking herself in her room. Her grief and longing are never openly expressed, and her attachments remain invisible. Both siblings' experiences show that love and care persist even when unvoiced, producing a silent and private form of intimacy.

Conclusion:

Sachin Kundalkar's *Cobalt Blue*, thus, presents queer desire as fragile, ungrievable and often unrecognised within normative frameworks. Highlighting how bisexuality and non-normative intimacies are rendered invisible, the novel exposes the limitations of binaries and societal recognition through the portrayal of the unnamed paying guest. Tanay and Anuja's experiences of love and loss reveal contrasting modalities of grief. Tanay's queer sorrow remains silent, unacknowledged even by those closest to him, while Anuja's heartbreak, framed by heteronormative society, is public yet still constrained. Intimacy in the novel exists in

subtle gestures, shared spaces and fleeting moments, emphasising the affective force of silence as both presence and absence. Kundalkar's narrative, in dialogue with Ahmed, Butler, Sedgwick, and Bersani, demonstrates that queer love persists despite erasure, producing emotional and ethical depth outside normative recognition.

Reference:

- Berlant, Lauren. *Cruel Optimism*. Duke University Press, 2012.
- Bersani, Leo. "Is the Rectum a Grave?" *October*, vol. 43, 1987, pp. 197–222.
- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge, 1990.
- ---. *Undoing Gender*. Routledge, 2004.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality: Volume 1, An Introduction*. Translated by Robert Hurley, Vintage, 1990.
- Kundalkar, Sachin. *Cobalt Blue*. Translated by Jerry Pinto, Hamish Hamilton, 2013.
- Kundalkar, Sachin. *Cobalt Blue*. Translated by Jerry Pinto, Penguin, 2013.
- Muñoz, José Esteban. *Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity*. New York University Press, 2009.
- Rao, R. Raj. "The Boy Who Loved the Moon: Introduction." *Facing the Mirror: Lesbian Writing from India*, edited by Ashwini Sukthankar, Penguin, 1999, pp. 137–46.
- Sedgwick, Eve Kosofsky. *Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire*. Columbia UP, 1985.
- Sedgwick, Eve Kosofsky. *Epistemology of the Closet*. University of California Press, 1990.

Implications of Kant's Deontology on Business Ethics : A Philosophical Analysis

Priyanka Mukherjee

Research Scholar, Dept. of Philosophy
University of Burdwan, West Bengal

Abstract: Immanuel Kant's (1724-1804) moral doctrine is known as deontology. The influence of deontology is clearly reflected in business ethics. We learn about this mainly through Kant's interpreters. The main rule introduced by Kant is respect for persons. Applying this principle in business, it can be said that an action cannot be called moral where money and people are of equal value. Man has a special quality, which is dignity. Undermining human dignity for the sake of the greater good cannot be a moral act. Any action motivated by good will is therefore an act of duty. Hence, prioritizing human dignity in the business world is considered ethical. In this article, I shall discuss how Immanuel Kant's deontology influences business ethics and the necessity of this doctrine at the present time.

Keywords: Deontology, Business ethics, Good will, Categorical imperative, Utilitarianism, Dignity, Maxim, Hypothetical imperative.

Main Discussion: Kantian ethics is independent of consequences. Kant's ethics can be counted as rigidly deontological. Deontology is the most important branch of ethical theory in normative ethics. The Greek word '*deon*' means duty. Deontology refers to the evaluation of the moral value of an act in terms of duty; the consequence of an action is irrelevant here. According to deontologists, the nature of the right course of action contains the speciality that makes it obligatory for everyone. Here, individualistic opinions are not important. Even the preconditions of ethical actions are overlooked in this ethical perspective. An act that produces the highest good may be evil if the least element of injustice is present.

For Kant, the highest good is good will. To act following the path of good will is to act following the path of duty. Kant's opinion is, only good will is unconditionally good in this world. Intelligence, prudence, courage, determination, and diligence can cause harm if guided by bad will instead of good will. Good will is not produced from our ordinary

desires. It is a special desire that is devoid of practical wisdom and produces independent action. Good will is above all conditions; it is unconditionally good. Freedom of will is necessary before any action. This is the main principle of the rules of conduct and all duties. Not the consequences, rather the sake of doing that action makes the action good. As a case in point, a businessman who is honest to gain fame in society, his act of being honest cannot be counted as moral. In the Kantian perspective, the act is moral if he is honest because being honest is his duty.

Now the question arises, what does duty actually stand for? At this point, Kant differentiates between two kinds of duty or imperatives. Suppose we do something to get one particular thing. Generally, we study to achieve good grades and not for knowledge itself. In this case, our primary need is to achieve good grades; we ought to study. This kind of duty is known as hypothetical imperative. The form of hypothetical imperative is, if we want to do p, do q. Here, q is dependent on our longing for p. The other kind of duties are *required per se*. There is no place for 'if', 'and', or 'but.' According to Kant, these duties are referred to as categorical. They are well known as the fundamental principle of ethics; the categorical imperative. Kant described the categorical imperative mainly in three ways. I shall discuss these in detail later.

For Kant, only human beings can freely choose laws that make them rational and moral. This free will is the basis of human dignity. Kant discusses the necessity of motive while discussing good will. A person who acts by a motive; acts voluntarily. Appropriate behaviour is necessarily dependent on the motive behind that work. Since the intrinsic value of good will is present, good will is unconditionally good and independent of motive. When the issue of good will is associated with the achievement of any goal, it will be considered as a means to achieve that goal. Following the criteria developed by Immanuel Kant, an act is considered to be right regardless of place and time if that act could become a universal rule. In '*Groundwork of the Metaphysic of Morals*', Kant called this principle the 'supreme principle of morality.' Kant's formulation of good will is the categorical imperative.

From the above discussion, it is clear that Kant's ethics is duty-oriented and not dependent on the consequences of an action. Utilitarianism is a consequentialist theory in ethics. Utilitarianism emphasizes on consequences of an action, whether it is just or not.

Though following utilitarianism, it is impossible to judge the rightness of an action in every context. According to utilitarianism, a bad act done by a single individual may not have such an effect on the social interest. However, it is necessary to remember that if a work that is done individually is followed by all members of society, then it can be harmful. So, apart from utilitarianism, it is necessary to look for another criterion of justice. Following deontological ethics, we should act from the right intentions. It gives us the guarantee that we have free will.

From Kant's deontological ethics, it is evident that Kant's rules of deontology are implicitly embedded in business ethics. Though Kant did not explicitly state this relationship. Compliance with ethics in business is considered irrelevant by many philosophers. Such as Aristotle, Karl Marx, etc. They think that any kind of business activity is inherently bad. However, rational philosophers such as Immanuel Kant and John Stuart Mill believe that the business sector becomes corrupt due to a lack of ethical rules. The rules and principles discussed in business ethics serve as guidelines for conducting a business and transacting properly. By complying with these, a person can prove their acceptability in business.

First of all, it is necessary to know how it is possible to judge the ethics of any work done by a business organization. It is easy to understand that these standards of good-bad, should-shouldn't, apply equally to any business organization. Business organizations have certain goals and objectives just like individuals. Therefore, it will be possible to evaluate the ethics of the business organization as well as the behaviour of an individual based on rules. After all, they can freely decide whether they should follow the rules of the institution or not. Therefore, individuals are as much responsible for the corrupt practices of an organization as the organization itself.

For Kant, it is important to believe in dignity and freedom of will. Every human being has individuality and can recognize their unique status compared to other animals. An employee of a business organization has a responsibility to act independently and with dignity while committed to the welfare of individuals. Personal interest is not important in this case.

Kant believes that behind every action there must be a principle. Kant's concept of categorical imperative is mainly concerned with three maxims. Now let's see how the first maxim of categorical imperative can be applied in business. The first maxim mentioned by Kant is, "*Act only*

in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law.”¹ That is, our duty is to behave in such a way that the principle adopted by me can be accepted as a universal law. Universalizability is the main characteristic of moral rules. A subject can be called moral when others would be able to consider the matter in the same way I am considering it.

Kant gives an example to illustrate this point, which is related to business ethics. Suppose a person urgently needs money. In such a case, the person borrows money from someone and promises to return that. But the fact is, he has no intention of returning the money. Can such an act be called moral? If someone's financial condition is very poor, is it fair to make a false promise to him? If this policy is considered universal, it means that any person can take money from another person by giving false promises. If he did not return that money later, there would be no wrongdoing. But such a course of action is logically not acceptable. Here Kant is not talking about the consequence of making false promises would be bad. Rather, his concern is that if the concept of making false promises becomes a universal law, then it is inconsistent. He said in this context:

“And could I say to myself that everyone may make a false promise then he is in a difficulty from which he cannot escape? Immediately I see that I could will the lie but not a universal law to lie. For with such a law there would be no promises at all, inasmuch as it would be futile to make a pretense of my intention in regard to future actions to those who would not believe this pretense or- if they over hastily did so would pay me back in my own coin. Thus my maxim would necessarily destroy itself as soon as it was made a universal law.”²

A businessman can examine this matter following Kantian ethical standards. Nowadays, unethical acts such as theft are committed by various business managers, high-ranking employees, and even customers. The owner of these organizations can judge the matter in this way: the principle on which those actions are consistent with a categorical imperative or not? One can ask oneself questions like, can I consider this action as a universal law without any inconsistency? If I can, then I also suggest that anyone do that action from a completely moral perspective. Otherwise, the action should be impermissible. Again, there are questions like, can theft be accepted as a universal rule? The answer would be no. Arguably, it is not possible to have universal authority over any

commodity. If theft is recognized as a universal law, there will be no such thing as private property. As a result, the issue of ownership will also end in illusion. The categorical imperative is the main feature of morality and pertinent in the business sector.

The second maxim of categorical imperative mentioned by Kant is “*Act that you use humanity, whether in your own person or in the person of any other, always at the same time as an end, never merely as a means.*”³ He says, act following a way that any human being is always used as an end, not merely as a means. Every rational being is an end in itself and intrinsically valuable. A person is not an object who can be used as you wish. Every person has dignity. So, it can never be a moral act to use any person for any purpose without their permission. Let’s see how this maxim of categorical imperative is related to business ethics.

Concerning business ethics second principle states that, to enter into a business contract with transparency, the humanity of individuals should always be viewed as an end. The issue of human dignity related to the ‘respect for persons’ principle is worth remembering in this regard. Acknowledging the issue of dignity, commercial transactions are possible. Though there will be some obligations regarding financial transactions. For example, no one can be coerced during any kind of transaction, and no one can be deceived. Coercion and deception derive from negative freedom. An interpreter of Kant says –

“According to the Formula of Humanity, coercion and deception are the most fundamental forms of wrongdoing to others the roots of all evil. Coercion and deception violate the conditions of possible assent, and all actions which depend for their nature and efficacy on their coercive or deceptive character are ones that others cannot assent to Physical coercion treats someone's person as a tool, lying treats someone's reason as a tool. That is why Kant finds it so horrifying; it is a direct violation of autonomy.”⁴

Simply backing out from coercive or deceptive acts is not enough to oblige towards the respect for person principle. We can also focus on Kant’s view of positive freedom. Positive freedom is used to develop one’s rational and moral capacities. We must increase these capacities while communicating with others.

For example, a company takes the help of advertisements to proclaim some information about the product. They want to make the customer interested in purchasing that product. In this case, the

advertisement may have persuasive components as well as informational components. As a result, the company provides information about the product we need. People are completely used as a medium in this type of deceptive advertising. A company advertises that those who have problems with hair fall can apply this oil, and their hair fall will be stopped within seven days. Though using the oil, it was found that the statement was a complete hoax. Therefore, this work of the said organization can never be called ethical. Legal action can be taken against the organization if such fraud is proven.

We can also spread positive freedom by developing employees' self-respect. The question is, what are the effects of positive freedom in business practices? As we count humanity as an end in itself, it also claims that we take some positive actions while helping others.

The third maxim of categorical imperative is known as the 'formula of autonomy.' It states, "*Act as though you were through your maxims a law-making member of a kingdom of ends.*"⁵ I have to act in such a way that I can consider myself a member of the kingdom of ends. For Kant, the non-existence of emotion is called a law. If obeying the law is not important while doing an action, we may do the action based on our emotions. But moral action is always dependent on judgment. Duty-governed action is moral action. Acting on such an unconditional command becomes a self-imposed rule. That is, people are subject to laws that can be claimed as universal laws. Through morality, the rational being is regarded as a law-making being as well as an end in itself. Moral action is something that everyone is capable of. Man has to act morally because man is competent to perform it.

Business organizations are made up of several individuals. Therefore, the aim of the organization should be to protect the dignity and respect of individuals. The rules and regulations of the business organization will be applied equally to everyone. It is necessary to know whether the members of the business organization are committed to those rules. Efforts must be made to ensure that all employees and customers dependent on the organization get benefits from it. In this way, we can make an institution a real kingdom of ends and ourselves a rule-making entity therein.

Following the Kantian perspective, we can count any business organisation as a moral community. Employees of the organisation are morally connected. The manager of this organisation automatically

respects the humanity present in all persons. With this, employees are refraining from using that organisation as a mere means to achieve their particular goals. There should be some common goals that everyone wants to achieve. Kantian morality also suggests us participation of all workers unitedly within a community. Vast democratization of the organisation is the primary condition that has to be fulfilled. Consent is an important thing when an organisation upholds various rules for its employees. Teamwork should be the main concern with the concept of participative management.

Although Kant's deontology has been influential in business ethics, this theory has some limitations. Presuming that a principle is universal and followed by all may not always work. Again, it becomes difficult to determine in all cases whether a person sees the other person as a mere means. But despite all the limitations, the significance of Kant's ethics in the philosophical context is immense. It has to be acknowledged that if the objective of the business organization is clear, the organization will be able to show itself as a just and humane organization, keeping self-interest aside.

References:

1. Kant, Immanuel, 1998, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, In M. Gregor and J. Timmermann (Eds.), Cambridge University Press, p. 18.
2. Kant, Immanuel, 1990, *Foundations of the Metaphysics of Morals* (1785), Trans. By Lewis White Beck, New York: Macmillan Publishing Company, p. 19.
3. Kant, Immanuel, 1998, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, In M. Gregor and J. Timmermann (Eds.), Cambridge University Press, p. 22.
4. Korsgaard, Christine, 1996, *Creating the Kingdom of Ends*, New York: Cambridge University Press, pp. 140-1.
5. Kant, Immanuel, 1998, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, In M. Gregor and J. Timmermann (Eds.), Cambridge University Press, pp. 23-25.

Bibliography:

- Bowie, Norman E. 1999, *Business Ethics: A Kantian Perspective*, Oxford: Blackwell Publishers.

- Kant, Immanuel, 1998, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, In M. Gregor and J. Timmermann (Eds.), Cambridge University Press.
- Kant, Immanuel, 1990, *Foundations of the Metaphysics of Morals* (1785), Trans. by Lewis White Beck, New York: Macmillan Publishing Company.
- Kant, Immanuel, 1963, *What is enlightenment* (1784), In L. White Beck (ed. and trans.) *On History*. Trans. Indianapolis: The Bobbs Merrill Company.
- Kant, Immanuel, 1797, *The metaphysics of moral; The metaphysical principles of virtue*, In I. Kant Ethical Philosophy 2nd edn, Trans. by James W. Ellington. Indianapolis/Cambridge, MA: Hackett Publishing Company.
- Korsgaard, Christine, 1996, *Creating the Kingdom of Ends*, New York: Cambridge University Press.

Relevance and Significance of Indian Knowledge System in Relation to NEP 2020

Rudra Prasad Saha

Asst. Prof., Dept. of Education

Muralidhar Girls' College

Abstract: *The Indian Knowledge System (IKS) encompasses the vast intellectual, cultural, and philosophical traditions that have evolved over thousands of years in India, covering disciplines such as philosophy, science, mathematics, medicine, linguistics, literature, and art. The National Education Policy (NEP) 2020 emphasises integrating these indigenous knowledge traditions into contemporary education to foster holistic learning, cultural rootedness, and global competence. This research examines the relevance and significance of IKS in the context of NEP 2020, highlighting its role in promoting critical thinking, creativity, sustainable living, and ethical values. Using qualitative and analytical methodologies, the study draws upon ancient texts, modern educational theory, and policy analysis to demonstrate how IKS can strengthen India's education system while preparing students for the challenges of the 21st century. The analysis section provides a detailed exploration of thematic integration, pedagogical benefits, and practical strategies for embedding IKS into curricula.*

Keywords: *Indian Knowledge System, NEP 2020, holistic education, indigenous learning, cultural heritage, value-based education, sustainability, experiential learning, traditional wisdom, educational reform.*

1. Introduction

Education in India has always been a multidimensional process, deeply intertwined with cultural traditions, social values, and philosophical insights. The Indian Knowledge System (IKS) refers to the collective wisdom and knowledge developed in India over millennia, encompassing areas such as Ayurveda, Yoga, Vedic mathematics, astronomy, linguistics, environmental sustainability, and art. Unlike purely utilitarian models of education, IKS emphasises the harmonious development of the body, mind, and spirit.

The National Education Policy (NEP) 2020 marks a paradigm shift in India's education system, advocating for an approach that combines modern scientific advancements with the wisdom of India's civilisational heritage. It explicitly calls for the integration of IKS into curricula at all levels to cultivate respect for India's heritage while fostering innovation and critical inquiry.

This paper explores the philosophical foundations, pedagogical advantages, and contemporary relevance of IKS in alignment with NEP 2020, making the case for its structured incorporation into mainstream education.

2. Objectives of the Study

1. To understand the philosophical and cultural foundations of the Indian Knowledge System.
2. To examine the NEP 2020 provisions related to IKS integration in education.
3. To analyse the pedagogical benefits of embedding IKS in the modern curriculum.
4. To evaluate the challenges and limitations of implementing IKS in contemporary education.
5. To propose strategies for effectively integrating IKS into teaching-learning practices.

3. Review of Literature

3.1 Ancient Foundations of IKS

The roots of IKS are found in ancient texts like the Vedas, Upanishads, Puranas, and epics such as the Ramayana and Mahabharata, which offered integrated approaches to learning encompassing science, ethics, and spirituality (Radhakrishnan, 1996). Ayurveda and Yoga, for instance, combined medical science with lifestyle and ethical conduct, reflecting a holistic worldview.

3.2 IKS and Traditional Education

The Gurukul system embodied IKS principles, emphasising experiential learning, moral development, and community life (Sharma, 2015). Teachers (gurus) transmitted not only subject knowledge but also life skills, values, and critical thinking abilities.

3.3 Modern Perspectives and NEP 2020

NEP 2020 advocates reviving IKS as a part of mainstream education. It recommends documentation, research, and teaching of IKS in schools and higher education institutions (Ministry of Education, 2020).



3.4 Comparative Studies

Comparisons between IKS and other indigenous systems worldwide show that integrating traditional wisdom fosters sustainable development and cultural identity (Sen, 2018).

3.5 Research Gap

While the NEP emphasises IKS, limited empirical studies analyse how it can be effectively integrated into curricula without diluting academic rigour. This research addresses that gap by providing practical and thematic analysis.

4. Methodology

4.1 Research Design

This study uses a qualitative descriptive-analytical design, combining literature review, policy analysis, and thematic interpretation.

4.2 Data Sources

Primary Sources: NEP 2020 document, ancient Sanskrit texts, and historical educational treatises.

Secondary Sources: Peer-reviewed articles, books, and conference papers on IKS and educational reform.

4.3 Analytical Framework

A thematic analysis method was applied, mapping NEP 2020 objectives against core domains of IKS (e.g., Ayurveda with health education, Yoga with physical education, Vedic mathematics with logical reasoning).

4.4 Limitations

The study does not involve primary field data but relies on secondary sources and textual interpretation.

5. Detailed Analysis

The analysis focuses on three major dimensions-philosophical alignment, pedagogical relevance, and practical integration strategies.

The integration of the Indian Knowledge System (IKS) into the framework of the National Education Policy (NEP) 2020 can be analysed along five thematic dimensions: philosophical alignment, cognitive benefits, socio-cultural impact, implementation challenges, and strategic pathways for integration. Each of these aspects contributes to understanding both the opportunities and the complexities involved in realising NEP's vision.

5.1 Philosophical Alignment Between IKS and NEP 2020

The NEP 2020's vision for holistic, multidisciplinary, and value-based education closely mirrors the philosophical underpinnings of IKS. Ancient

Indian education systems-epitomised by the Gurukul tradition-were not designed merely to produce skilled workers, but rather to shape individuals who were intellectually sharp, physically strong, morally upright, and spiritually aware. NEP 2020 resonates with this ethos by emphasising the integration of arts, sciences, ethics, and life skills. The Upanishadic ideal of “Sa Vidya Ya Vimuktaye” (knowledge is that which liberates) aligns with NEP’s goal of freeing learners from rote-based limitations and nurturing critical thinking and self-awareness. This convergence suggests that the NEP is not simply reviving IKS for cultural pride, but as a living, functional model for modern education.

5.2 Cognitive and Academic Benefits of IKS Integration

The cognitive advantages of incorporating IKS into education are profound. Vedic mathematics, for example, can enhance computational efficiency while fostering logical reasoning and problem-solving skills. Similarly, the study of classical Indian languages like Sanskrit sharpens memory, improves linguistic abilities, and facilitates understanding of scientific and philosophical texts in their original form. When students engage with Ayurveda, they develop an integrated understanding of biology, chemistry, and human physiology, alongside preventive healthcare principles. These learning experiences go beyond textbook knowledge, encouraging analytical thinking and interdisciplinary connections. In essence, IKS-based education nurtures the brain’s capacity for both convergent and divergent thinking-skills that are highly valued in 21st-century learning.

5.3 Socio-Cultural Impact and Value-Based Learning

One of the most significant contributions of IKS lies in its potential to reinforce socio-cultural identity and ethical grounding. Ancient Indian literature, epics, and philosophical treatises provide moral frameworks that remain relevant for contemporary challenges. For instance, the Bhagavad Gita’s emphasis on duty (dharma), selfless action (karma yoga), and mental equanimity (samatva) offers timeless guidance for students navigating competitive academic environments. Moreover, environmental ethics embedded in IKS-such as reverence for rivers, forests, and biodiversity-align with global sustainability agendas. By engaging with these traditions, learners develop a sense of rootedness that counters the alienation often associated with globalised education. This is particularly important in a diverse, multicultural society like India, where education must strengthen unity without erasing diversity.

5.4 Health, Well-being, and Emotional Resilience

IKS has always viewed education as a mind-body-spirit integration process. The incorporation of Yoga and meditation practices into school routines, as recommended by NEP 2020, directly supports mental health, emotional regulation, and stress management. Ayurveda's holistic health principles-covering diet, daily routines, and seasonal adjustments-can help instil lifelong habits for physical well-being. Such practices are not mere add-ons but essential foundations for effective learning. Studies have shown that students who practise Yoga and mindfulness demonstrate improved attention span, reduced anxiety, and better academic performance. In this respect, IKS offers a built-in mechanism for developing resilience-something that conventional academic curricula often overlook.

5.5 Implementation Challenges and Potential Risks

While the philosophical and pedagogical case for IKS integration is strong, practical challenges must be acknowledged. A major obstacle is the shortage of educators trained in both traditional knowledge systems and modern pedagogical methods. Without adequate preparation, there is a risk that IKS content will be delivered in a superficial or overly ritualistic manner, undermining its educational value. Another concern is curriculum overload; adding IKS modules without streamlining existing content could overburden students. There is also the need for cultural sensitivity-ensuring that IKS integration does not marginalise minority perspectives or appear as religious indoctrination. These risks require careful policy design, teacher training, and continuous evaluation mechanisms.

5.6 Strategic Pathways for Effective Integration

To overcome these challenges, a phased and well-researched implementation strategy is essential. First, curriculum mapping should be carried out to align IKS topics with existing subject areas-such as linking Ayurveda to biology, Vedic astronomy to physics, and Indian art forms to fine arts education. Second, comprehensive teacher training programmes should be launched to equip educators with both content knowledge and innovative teaching methods. Third, experiential learning should be emphasised-field trips to heritage sites, workshops with traditional artisans, and community-based environmental projects can bring IKS concepts to life. Fourth, technology can be a powerful enabler; digital archives, interactive e-learning platforms, and AI-based

educational tools can make IKS accessible to a global audience. Lastly, research and documentation must be prioritised to continually update and adapt IKS content for contemporary relevance.

5.7 Potential Long-Term Outcomes

If NEP 2020's vision of IKS integration is realised effectively, the long-term benefits could be transformative. Learners will graduate not only with employable skills but also with cultural literacy, ethical sensibility, and a sustainable worldview. This could foster a generation capable of innovative problem-solving rooted in both modern science and traditional wisdom. Moreover, India's global academic reputation could be enhanced by presenting IKS as a valuable knowledge system on par with other global traditions. By positioning IKS as a living, evolving body of knowledge, rather than a static historical relic, education in India could set a precedent for culturally grounded yet globally relevant learning.

6. Conclusion:

The Indian Knowledge System is not merely a repository of ancient wisdom but a dynamic framework for addressing contemporary educational challenges. NEP 2020 offers an unprecedented opportunity to revive and adapt IKS in ways that enrich learning experiences and outcomes. With careful planning, teacher preparation, and resource allocation, IKS can serve as a bridge between tradition and modernity, equipping students with both heritage-based wisdom and 21st-century competencies.

References:

1. Chatterjee, S. (2018). Cultural rootedness in global education policy: The NEP model. *Comparative Education Perspectives*, 9(4), 67–80.
2. Joshi, V. (2017). Vedic mathematics and modern pedagogy. *Mathematics Education Journal*, 12(3), 56–64.
3. Kumar, P. (2019). Ayurveda in school education: Prospects and challenges. *Indian Journal of Education and Development*, 5(1), 23–35.
4. Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India. <https://www.education.gov.in/nep2020>
5. Mukherjee, A. (2020). Ethics in education: Lessons from the Bhagavad Gita. *Journal of Value Education*, 15(1), 33–48.
6. Nair, S. (2021). Integrating IKS into digital education platforms. *Educational Innovations Review*, 18(1), 88–97.

7. Radhakrishnan, S. (1996). Indian philosophy (Vol. 1 & 2). Oxford University Press.
8. Rao, M. (2016). Yoga in the curriculum: A holistic approach to health. *Journal of Physical Education and Wellness*, 10(2), 14–21.
9. Sen, A. (2018). Indigenous knowledge and sustainable development: A comparative analysis. *Journal of Education and Society*, 32(4), 45–59.
10. Sharma, R. (2015). Gurukul system and holistic learning: An Indian model. *International Journal of Education Studies*, 7(2), 102–115.

Tradition in the Perspective of History : East Midnapore

Utkalika Sahoo

Asst. Prof., Dept. of History
Bangabasi Evening College

Abstract: *Midnapore is an ancient historical region. At one time, Medinipur was a major center of Buddhism as well as Hinduism. Ancient Midnapore was developed around Tamluk. Currently, Midnapore is divided into two separate districts. There are various historical places in east midnapore. people of east midnapore played a significant role in freedom movement. Midnapore is famous for its various folk arts. The feudatories of the king of Orissa ruled here. So, we see a tradition and historical connection of Midnapore's own.*

Keywords: *East Midnapore, tamluk, heritage, folk art, historical background, feudal administration.*

Main Discussion: The district of Midnapore, situated in the Indian state of West Bengal, possesses a historical and cultural legacy of considerable significance. Throughout different epochs, the region has witnessed the ascendancy of various ruling dynasties, each contributing to its evolving historical narrative. The erstwhile undivided Midnapore, prior to its bifurcation in 2002, was distinguished by its wealth of historical landmarks and vibrant cultural traditions. In antiquity, the port city of Tamralipta, now identified as Tamluk, served as a crucial maritime gateway to eastern India, facilitating extensive commercial and cultural exchanges. The region is home to a number of Buddhist monuments, among which the Mahavihara at Mughalmari in Dantan stands as a testament to its ancient religious and scholarly heritage.

Despite the expansion of Muslim rule in Bengal during the medieval period, the Hindu rulers and zamindars of Bishnupur successfully defended their dominion over Midnapore. By the 18th century, the district was integrated into a broader geopolitical network linking Burdwan and Chittagong, a period marked by significant socio-political upheavals such as the Chuvar Rebellion. The contemporary landscape of Midnapore remains punctuated with historical sites, while its artisanal traditions continue to thrive. East Midnapore, a subdivision



of the original district, is particularly noted for its ecological diversity and its prominence in tourism and handicrafts. Destinations such as Digha and Mandarmani have enhanced its global recognition, with the confluence of natural beauty, heritage tourism, and religious significance contributing to its cultural and economic prominence on an international scale.

To know about Midnapore, it is necessary to know the first geographical description. The present-day Bengal originates from the siltation of the Ganges and the Brahmaputra. Bengal was home to many different ethnic groups. Three kingdoms were established in India under the name of Angavanga Kalinga. These three cities were the centers of Eastern civilization. The eastern province of Anga and Kalinga was called Banga. According to archaeologists, the entire area of Medinipur in ancient times belonged to the ancient Kalinga kingdom. There were 31 'Dandapathas' of Orissa and those 'Dandapathas' were further divided into 110 'Bishis'. Six of them are part of present-day Midnapore district. These are: 1. Taniya, 2. Jauliti, 3. Narayanpur, 4. Naigaon, 5. Malvita, 6. Vanjbhum-Baripada. Most of the present Kanthi subdivision belonged to the Maljita Danda Patha.¹ There is no name of Tamralipta or Tamluk in the Dandapatha section of the Madalapanji. Because at that time Tamralipta did not belong to Orissa. It was a separate state.² The name of Tamluk is in the 'Mahal' section of Ain-i-Akbari. In the Sanskrit text 'Deshavali Vyavasya' of Jagmohan Pandit it is seen that all the countries west of the original Ganges were called Tamluk countries by the people. Behala Barisal Mandal Ghat etc. belonged to Tamluk country. Mohamohopadhyay Haraprasad Shastri, received a manuscript of Sanskrit in which it was written about Tamluk –

“Mandalaghattadakshine cha haijalasya chahyuttare.

Tamraliptakhyadeshashcha baniyyang cha nibashabhuh..

Dwadasha yajnairjukta rupanadyarah samipatah.

Matsya gabyani yatraiba sampadyate bhrishang nripa..

Kouchadamalake deshang gayanti deshabasinah.

Labananamakarascha yatra tishthati bhurishah..

Pranali dwitrika tatra sada bahati bhumipah.

Malangana manushyanang nibasang basati kil..

Prayah samudrabegashcha tamraliptanadishu cha.

Dibanishing kadachinna bishramyati mahipate..”³

Tamralipta was of special importance during the Buddhist period. Friends tell us that many years before the birth of Christ, the inhabitants of Tamralipta were a nation skilled in great naval warfare. During the reign of the Gupta emperor Chandragupta II, the fame of Tamralipta in eastern India spread to many parts of the world. At this time, Fa-Hien, a passenger on the train, had been in Tamralipt for about two years. He stayed in various Buddhist monasteries of Tamralipta, copied many valuable Buddhist scriptures and took pictures of Buddhist deities to his homeland. It was through this copper plate port that he travelled by sea to the island of Ceylon. Fa-Hien visited a total of 24 ‘Sangharamas’ in the city of Tamralipta. Buddhist monks of both Hinayana and Mahajana sects lived in Tamralipta. A century after Fa-hien left India, two Chinese travellers, Houyi-seng and Song-un, visited the north of India. However, their names were not mentioned in the report. Hiuen Tsang came to India during the reign of King Harshavardhana. He called Tamralipta a rich Buddhist port of high class called tam-mo-liti. There were ten Buddhists and 1000 Buddhists. At one end of this city there was a 200 feet pillar built by king Ashok Dhara and a staircase beside it. Buddhists used to stay here, travellers used to stay here, officers of ships used to stay here. Many rare and precious items were found in copper plates. In addition to the Buddhist monastery, there were 50 Hindu temples.⁴ Fa-Hien came to India in 399, and Hiuen Tsang in 629. Meanwhile, in these 230 years, the news of Tamralipta is almost unknown. There is no trace of the 200 feet high Ashoka Pillar that he had mentioned. Hiuen-Tsang states the extent of the copper-plate kingdom to be 1400 CE. Li is the Chinese word for distance. Most of the present Kathi subdivision and Sutahat, Mahishadal, Nandigram are not among these 1400.⁵ Later, another Chinese traveller, Ai-Sing, came to Tamralipta. He saw 5/6 ‘sangharam’ here.

Tamluk is also famous for the temple of the goddess. Vargabhima Temple is located in this area which is also a Shaktipeeth. However, there is a difference of opinion as to how this temple was built. Some say that this temple was established by Maharajadhiraja Tamradhwaj. Others say that this temple was established by Dhanapati Saudagar.⁶ Goddess Chaturbhuj stands on the chest of Shiva. A statue of a goddess is carved on a black stone. Some say that the name of the goddess ‘Vajrabhima’ belonging to Vajrayana Buddhism was changed to Vargabhima. According to some, the word ‘Varga’ has been added to the image because of the

presence of Lord Shiva there. There is a popular legend about the goddess. It is said that the Afghan king Sulaiman Karrani was the commander of Kalapahar. He was a Muslim. The people of Nadia were Hindus in the first life of this Kalapahar. But after falling in love with the Nawab's beautiful daughter, he converted to Islam and started demolishing Hindu temples. This Kalapahar came to Tamluk during the Odisha campaign. He came to the temple of Vargabhima and stood in front of the idol of the goddess and was stunned by the madness of the destruction of the Kala Pahar Hindu temple. His mind changed. He acknowledged Goddess Jagrata with the touch of his hand.⁷

Abul Fazl mentioned Tamralipta in Ain-i-Akbari in the medieval period. The region had a special reputation for trade. During the period of British rule, the salt industry was produced in Tamralipt in the indigenous tradition. The salt industry started by the local landlords was taken away by the British. Mahishadal is located in the vicinity of Tamluk. Geoghata is situated on the bank of Rupnarayan beside it. Along with Tamluk, several thousand acres of Mahishadal's zamindari lands were taken over by the company for salt production. Tamluk was the main centre of the salt agency in the wider region. At that time salt boats used to come from Rupnarayan Port to Hazar Man. These boats were named 'Tamluk Salt Boats'. The names of the different boats used for different weights of cargo are from Prinsep's book 'The Tamluk's Boat'. In such boats, coal was brought to Tamluk port from Raniganj by river route.⁸

The Tamluk National Government was established on 17 December 1942. On 26 January 1943, a national government under the control of the government was established in Sutahata Nandigram Mahishadal and Tamluk. A power force was created under the management of this government. Satish Chandra Samanta was the head of the national government.⁹ There are differences of opinion in historical circles about the dynasty of Tamluk. However, according to historians Alphinstone Sahib and Welcome Sahib, Tamluk, the progenitor of the Gang dynasty, was the ruler of Midnapore province. He went from this province and established his rule in Orissa. It is estimated that the Gangas ruled Orissa from the 11th century AD to the early 16th century AD. At that time, the Tamralipta kings were the most powerful in the Gangaradhi province. For this reason, it is assumed that Anantavarma Chodaganga was born in one of the Tamralipta dynasties.¹⁰ Later, Ananta Varma was expelled from Swarajya and took refuge in Utkal. Then after various

events he was elected as the king of Utkala. Later, the kingdom of Tamralipta was annexed by Ananga Bhimadeva. So, the history of Tamralipta is linked to the history of Utkala.

Another important area of East Midnapore is Moyna. The history of this temple, which is now part of the Tamluk sub-division, is very ancient. Jauliti Dandapatha was formed with places like Sabog Moina Balisita etc. From the middle of the 16th century, a zamindar dynasty called the 'Dynasty of Maynagadh' was established in Maynagadh. King Govardhanananda Bahubali is the founder of this dynasty. Before that, they lived in Bali. They were conferred the title of Samanta by the king of Utkala. The name of the first feudatory of this dynasty is Kalindiram. Govardhanananda moved from Balisita to Mainagarh. This is where they later settled. From this time, they took the titles of 'Raja' and 'Bahubali.' The history of this dynasty is also associated with Mangalakavya. There is still a popular legend about this ancient royal family located on the banks of the Kansavati River, 16 km west of Tamluk.

"Moynagarh er rajar maan, gajna rajar dhan,
Kuchal ghoroi er poka, de nander taka."¹¹

Legend has it that the capital of Veer Lausen of Dharmmangal was in the Maynagadh area. Lausanne was the son of Cornsen, the commander-in-chief of the Gaudesvara Dharma Pala. However, after Lausanne, the fort was captured by Sridhar Hui. Later Govardhanananda removed this Sridhar Hui and captured the fort. Some parts of the palace still exist. The ancient palace was built with a combination of Odissi art with Buddhist architecture. However, the impression of foreign style is evident in the stop and roof features of the entrance gate. A deep trench was dug around it. This deep trench is called 'Kalidaha' and 'Makardaha'. In Maynagadh along with the temple of ancient Shyamsundar Jiu and the statue of Rangkini of the Buddhist goddess many idols of beautiful rocks are found to be seen. There are two doors on the outside. The Raas festival has been held here for about four hundred and fifty years. The kings of Bahubalendra woke up on the seashore and created the Moina Pargana with 105 villages.¹² Apart from this, Pratapbhan was a pargana under Patashpur. Once upon a time, a king named Pratap Bhanj ruled as a vassal of the king of Utkala. Amar Singh was the last king of the dynasty. The king had sacrificed his life by jumping into a well in Kasba village of Amarshi Pargana in the present time due to fear of destruction of religion. Following their names, the next Pratapbhan and Amarshi

parganas were named. Large ancient ponds and temples like Belda Pratapdighi Tikrapara have been found in that place.¹³ Two other famous Rajbari of East Midnapore are Mahishadal Rajbari and Kajlagarh Rajbari. Janardan Upadhyaya, a high-ranking officer in Akbar's army, founded the royal house of Mahishadal. The next generation of Raja Janardan Upadhyaya ruled here. Rani Janki Devi, the wife of Raja Anadlal Upadhyaya, began to rule the estate. The main temple of Mahishadal is the temple of Madan Gopal Jiu. At present this palace is famous as a tourist place.¹⁴ Kajlagarh is one of the most historic testimonies from the architectural and historical point of view of the royal family. Kajlagarh Rajbari is associated with the history of undivided Midnapore district in the 16th and 17th centuries. The present-day Kajlagarh region was under the sujamudha kingdom. It is said that the people of Ranajhap group got divine dream while hunting here to worship Kali Mata of Kajla. Hence, this place got its name. Later, D. L. Roy joined the government as a civil servant.¹⁵ The dynasties that ruled the East Midnapore district were mainly the feudatories of Utpal Raja. But in obedience to the local people, they sought the welfare of their subjects and maintained good governance.

The coastal area is Khejuri. The post office is about 250 years old. At present, the State Heritage Commission has given heritage recognition to this post office of Khejuri. The history of agriculture is very old. Dutch, Dutch and Portuguese traders have come here many times to do business. The ship reached Hijli near Khejuri in 1514. At that time, the name of the date palm was Kedgiri. From there, the journey to Khejuri port begins. Khejuri port was built by the British in 1756.¹⁶ The work of the post office of Khejuri was in full swing. The post office was staffed by highly paid Englishmen to deal with the passengers and crew of European merchant ships. Under this many postal boats used to exchange letters by traveling in the middle ships. These post-boats were large barracks with twelve rooms grouped next to the barber shop and post-office.¹⁷

East Midnapore is a riverine district. The Rupnarayan, which in the upper portion of its course is called the Dhalkisor and the Dwarakeswar, enters the district a few miles north-east of Ghatal and follows a south easterly course to Tamluk. Here in bands to the east and it finally falls into the Hooghly at Geonkhali opposite Hooghly point... It is influenced by the tide throughout this portion of its course... During

the day months brakish water is found as far as Kolaghat.¹⁸ Hijli was a traditional village in East Midnapore. There are many famous temples and mosques in this area. In 1514, the Portuguese first came and established a trading post along the coast of Orissa. In 1628, during the reign of Jahangir, Rahmat Khan established the Pathan kingdom on the island of Hijli. Taj Khan Masnad of Pathan dynasty made Hijli the capital. He built a beautiful mosque in Hijli. Although the Hijli Island was once lost to the sea, the mosque and shrine of Masnad-e-Ala still exist.¹⁹

The Portuguese were the first to gain prominence during the Mughal period in India's external trade and in establishing India's power. They also came to Hijli. They used to call Hijli 'Anjelim'. They built two churches. Defeated by the Mughals in 1632, the Portuguese, along with 3,000 clergymen, fled to the island of Cabral. But as the epidemic spread there, the Portuguese came and settled in Hijli. The mouth of the Bhagirathi near Hijli was called Rouges' river or Dasyu river. The Maghs and the Portuguese used to practice banditry here. Finally, in 1636, the Mughals expelled the Portuguese from Hijli.²⁰ Mirpur in East Midnapore bears witness to history. The tradition of Portuguese can be seen in this village. By 1742, the Bargis had struck at Mahishadal in Midnapore. King Anandmohan Upadhyaya and Janki Devi got worried to save themselves from the invaders. They asked the Portuguese for help. With the help of 12 strong Portuguese, they were saved from the attack of the invaders. As a gift, the king and queen gave some land of Mirpur to the Portuguese.²¹ They married local Portuguese women and stayed here. Their descendants still live in the area of Mirpur Shuklalpur Betkundu. Although they are Portuguese, they are actually Bengalis. Black-eyed brown-skinned people retain only the surnames Luniz, Decruz, Pereira, etc.²² Foreign culture has come to Midnapore and mixed with its own culture.

East Midnapore is characterized by a rich and multifaceted cultural landscape, shaped by diverse ethnic and religious communities. While the region has a significant Muslim demographic, it simultaneously accommodates a spectrum of cultural traditions that collectively contribute to its unique identity. The artistic and cultural heritage embedded within this district reflects deep-rooted historical trajectories that warrant critical examination. An essential concern arises regarding the extent to which the younger generations are cognizant of the historical processes that have shaped this cultural plurality. A nuanced

understanding of regional history is imperative for fostering a more informed engagement with one's cultural milieu.

The district's cultural heritage is inextricably linked to the broader framework of Lokayat culture, a form of indigenous tradition deeply ingrained in the socio-cultural fabric of the region. This folk life, manifested through oral traditions, ritual practices, artisanal craftsmanship, and performative expressions, constitutes an essential dimension of East Midnapore's identity. Any comprehensive exploration of the district's cultural ethos necessitates an engagement with these vernacular forms of expression. The study of folk culture is not merely an antiquarian endeavor but a vital means of comprehending the lived experiences and epistemologies of the communities that have historically inhabited this space. Without an appreciation of these localized cultural traditions, an authentic understanding of the region's historical and cultural evolution remains incomplete. Consequently, the preservation and scholarly interrogation of East Midnapore's folk culture are indispensable for ensuring that its historical legacy is not only acknowledged but also critically examined in contemporary discourses.

Reference:

1. Basu, Yogesh Chandra. (1328) *Medinipurer Itihas*, vol. 1. Kalika Press, Kolkata, 1328 (bangabda), p. 8
2. Ibid, p. 9
3. Ibid, p. 18
4. Jana, Yudhisthir. (1378) *Brihattara Tamralipter Itihas*. Kolikata Pustakalaya, Kolkata, 1371 (bangabda), p.77
5. Ibid, p. 80
6. Raxit, Trailakyanatha. (1902) *Tamoluk Itihas*. Hare Press, Kolkata, 1902, p.106/107
7. Pal, Rajarshi. "Tamluk Shohor o Devi Bargabhima", *Nibodhata*, 31st year, vol. 3, Sept-Oct, 2017, p. 371.
8. Chattopadhyay, Dipankar. "Otiter Aloy Bandar Nagari Tamralipta", *Poschimbongo tothyo o sonskriti bibhag*, poschimbongo sorkar, Kolkata, 2004, p. 19
9. Ibid. p. 32
10. Basu, Yogesh Chandra. (1328) *Medinipurer Itihas*, vol. 1. Kalika Press, Kolkata, p. 106.

11. Anandabazar Online Portal, 28 April 2019. Accessed on 16 March 2025.
12. Ibid
13. Basu, Yogendranath, Ibid, p. 161
14. <https://www.mahishadalrajbari.co.in>. Accessed on 15.03.2025.
15. Bengali.news18.com, 20th July 2022, visited on 15.03.2025
16. Bengali.news18.com, 22nd Sept 2022, visited on 14.03.2025
17. Karan, Mahendranath, '*Khejuri Bandar*', Kshemananda Kutir, Medinipur, (1334 bangabdo), p. 16
18. O'Mally, L.S.S, MIDNAPORE, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, (1911), p. 6
19. <https://medinikotha.in>, visited on 15.03.2025.
20. Karan, Sri Mahendranath, Hijlir Masnad-i-Ala, Samaj Sebak Sangha, Kolkata, (1958), p. 117
21. <https://www.prohor.in>, visited on 15.03.2025.
22. <https://eisamay.com>, visited on 13.03.2025.

Contemporary Marginal Women Draupadi Murmu at the Top of Respect : Some Words and Some in the Story

Mina Khatun

State Aided College Teacher, Dept. of Political Science
Dwijendralal College

Abstract: *Draupadi Murmu is the first woman President of India, who has reached such a peak of success from a marginalized community. Today is the 79th anniversary of India's independence, yet the marginalized people of this independent India have not yet been able to erase the darkness of their lives and achieve liberation. Especially in the lives of marginalized women. Draupadi Murmu is one such marginalized woman belonging to the Santal community. Where the marginalized people of India are still dying in despair at the helplessness of their fate, where they have been forever oppressed and suppressed by the elite group that stands against their power and have finally given up, lost, and forgotten to speak their minds, Draupadi Murmu has come forward from that community with a fighting mentality and has finally established herself in that atrium of power. Today, she is the head of state, the head of government of independent democratic India. Her struggle was not easy. Her success did not come in a day. How he became an inspiration to the marginalized and backward people is the story I wanted to tell in this research.*

Key Words: *Marginalized Woman President, Oppressed and Suppressed, Women Empowerment, Indigenous Women Leaders, Silently Playing Craftsman, Fighting Mentality.*

Introduction: India is a country, which has a bright side of its noble tradition and culture, as well as a dark side mixed in that tradition. The most troubling aspect of this dark side is the social class structure in the Indian social system. Those who are outside this social structure are the lowerclass marginal or subaltern groups of the society. These lower classes or marginalized people have been so alienated for hundreds of years that their lives have become unbearable. Dr. B. R. Ambedkar and Jyotirao Phule wanted to build a new India that would overcome the bad side of this social structure. Figures like Ambedkar, Jyotirao Phule, where

a person's identity will be determined as a person, in terms of his success, not in terms of caste or religion. It may have taken a lot of time, today we have been able to improve that terrible society a lot, when we see a person from that lower class society holding the status of the first person in India. The society that was born on the soil of independent India sixty five (65) years ago was not very easy either. The great contribution of Phule and Babasaheb Ambedkar is certainly undeniable here. In this story, I want to tell the story of how, as the first female child of independent India and also as a marginal woman, she occupied the highest honorable position in the country of India's governance system, making the impossible possible despite being a woman.

Objectives:

1. Show that it is possible to reach the pinnacle of success from the marginalized level, regardless of where one is born, through education alone;
2. This research-based writing illustrates that not only women's empowerment, but also the empowerment of marginalized women is possible;
3. This discussion also aims to show that not only are women's contributions behind men's success, but men's contributions also lie behind women's success.
4. The purpose of this research is to show that women's empowerment does not just mean becoming equal to men, but also another name for achieving one's own ability to support men.

Methodology:

Descriptive:

Descriptive research method is a method in which a researcher collects information about his research subject, observes and analyzes the collected information to form a subjective idea. In this method, the researcher provides detailed descriptions of a subject but in an unbiased or unbiased manner.

Review of Literature:

1. Rekha Chundel in her study titled Political and Social Empowerment of Tribal woman in India: A Study of Draupadi Murmu's Journey from a Tribal woman to becoming the President of India says that as a woman from the Scheduled Castes and Tribes of India, President Draupadi Murmu will motivate the Scheduled Caste women for education and increase the

literacy rate of their community. She will also make them financially prosperous and aware about their health.

2. Bijoya Lakshmi Mohanto, in her study titled President Draupadi Murmu-A Reflection of Changing Bharat, says that Draupadi Murmu is actually a representative of a social position of people who are one of the oppressed people of British-occupied India. She reminds the history of people in that social position, and what she wants to say here is that in the changing circumstances of present-day India, their society can also come forward and become one of the first in the line.

3. Dipak Kumar Dash in his study titled Unveiling the Role of Indigenous Women Leaders in Odisha's Political Landscape: Challenges, Strategies and Impact says that indigenous women in Odisha's politics are emerging in the country, overcoming various obstacles and problems, and are able to give the message to the society that they too are capable of participating in politics, being aware of their rights, and making a significant contribution to the development of their communities, and the biggest example of this is Draupadi Murmu.

Motivation:

In the research articles on Draupadi Murmu, the fact that Draupadi Murmu, a marginalized woman, rose to the highest position of power in Indian politics and became a model of women's empowerment is not only due to education, but also because of the contribution of a man behind her success, and that man is her own father. The talk of women's empowerment is not just about becoming equal to men, but also about men giving women a place to achieve their potential. Motivated from that, this study seeks to say that.

Early Life of Smt. Murmu:

Odisha, which is famous for Puri sea Beach and Puri Jagannath Temple, Odisha is famous for another reason today, Draupadi Murmu, who is today the fifteenth (15) President of India. This is Birinchi Narayan Tudu, a Santal tribal belonging to the marginalized Dalit caste of Uparbeda, a remote village in Mayurbhanj district of Odisha state. A poor farmer and village panchayat head. He has two sons Bhagat Tudu and Sarni Tudu and a daughter Puti Tudu. His daughter was born on 20th June 1958. In 1963, at the age of 5, Puti Tudu studied at Upper Bera Primary School in their village. Several teachers from Balasore and Cuttack used to come to teach in this school. One of them is Modanmohan Mahato. This teacher disliked the name puti and changed it. The name Draupadi of

Mahabharata was placed in place of the girl's first name and sealed. From that day Puti Tudu's new name became Draupadi Tudu. Although at first she used to write her name Draupadi instead of Draupadi, later it became Darpadi, and now completely Draupadi. The long journey of this Puti Tudu girl from the marginal tribal Santal community from Draupadi Tudu to Draupadi Murmu through the village of Aparveda to Raisina Bhavan in New Delhi on 25th July 2022 was amazing, unbelievable, incredible and unprecedented.

Educational Life of Smt. Draupadi Murmu:

From 1969 to 1973, second class from tribal girls' school in her village. Starting from higher secondary education, they go on to get higher education Go to Bhubaneswar, the capital of Odisha. Studied arts department at Rama Devi Women's College there started. The surprise of the semi-educated and uneducated people of their tribal marginalized communities Graduated from this college. Saotali, Odia, Hindi and English Poverty could not stand in the way of the journey of such a person who was proficient in languages. But this is his Her father's contribution behind the success was undeniable. After graduating, he began his early career in 1979. During this time he was appointed as a Junior Clerk in the Department of Irrigation and Power, Government of Odisha. He left this job in 1983. Later in 1994 she again returned to her professional life as Honorary Assistant Teacher at Sri Aurobindo Integral Education and Research College. In 1997, he left this profession as before. After that we do not see him entering any other profession.

Career Life of Smt. Murmu:

In the year, 1980, A bank employee named Shyamacharan Murmu proposes marriage to her father. At first the father Birinchi Narayan Tudu did not agree, but in the end he gave in to the strong mental insistence of Shyamcharan Murmu and handed over his daughter's jewel in the hands of Shyamacharan Murmu. As a result, Draupadi Tudu became Draupadi Murmu. After this two sons and a daughter came into the life of this couple. Their two sons were Laxman Murmu and Shipun Murmu, and their only daughter was Itashree Murmu. She left her first professional life to take care of her children.

Political Life of Smt. Draupadi Murmu:

He entered the arena of politics in 1997 after leaving his honorary teaching assistantship from 1994 to 1997. He did not stop this path. Joined the Bharatiya Janata Party as an active worker in 1997 and was appointed

councilor of Rairangpur Nagar Panchayat in Odisha in the same year. Elected twice as BJP candidate from Rairangpur Assembly Constituency in Odisha in 2000 and 2004 respectively holding the charge of Ministry of Fisheries and Animal Resource Development. He was awarded the Neelkantha Award in 2007 for carrying out this responsibility effectively.

The Depressing Life of Smt. Draupadi Murmu; Smt. Draupadi Murmu:

The period from 2009 to 2014 was the most difficult period of her life when a coral reef came down and destroyed everything in her life. In 2009, her twenty five (25) years old son Laxman Murmu died mysteriously due to unknown reasons. His death was a shock. The whole family is shocked. Unable to overcome this grief, his younger son Shipun Murmu died in a road accident in 2013 exactly four (4) years after the incident. Last year, he lost his father and two brothers in 2014. Soon after, her life suffered another final blow when her husband died of a heart attack, unable to cope with the bereavement of his son. Then she went into extreme depression. To overcome his depression, he joined the Brahmakumari Spiritual Peace Ashram. She returned to the normal rhythm of life by doing meditation. While giving a testimony, She said in this context,

“I have witnessed many ups and downs in life. I have lost my two sons and my husband. I was completely devastated, but God has given me the strength to continue to serve the people”.

Murmur's return to neo-political life and India's highest honor:

The days of extreme grief in her personal life then surrounded her, while her political life took a turn when she was appointed as the Governor of the state of Jharkhand in 2015. She was the first Governor to be appointed from among marginalized tribal communities to complete her full-time duties. Her term as Governor ends in 2015, in 2021.

Contribution of education in Draupadi Murmu:

On 20 June 2022, she was celebrating her 64th birthday in her home village Aparveda, the very next day, i.e. 21 June, she received a call from Delhi and was told that the NDA government had nominated her for the post of the next President of India. Her rise in political career became brighter when she was elected as the constitutional President of India on 25th July 2022.

Draupadi Murmu's life and her achievements:

Mrs. Pratibha Patil was the first President of the country, and Mrs. Draupadi Murmu was the second woman President of the country.

However, even though she is the second president of the country, she is a record in history. The creator is the first woman president to emerge from a marginalized tribal community. Not only this, she is the first President of India as a person born after independence. She is also the youngest elected president of the country. She was Sixty four (64) years and one (1) month old on the day she was inaugurated as President. Before her, the holder of this record was President Sri Nilam Sanjeeva Reddy. He was sixty four (64) years and eleven (11) months old when he was inaugurated as President.

Here are some words, some anecdotes from Honorable Draupadi Murmu, the fifteenth (15th) President of the country who is sixty seven (67) years old today. Her story today is not limited to her story anymore, her story today is an inspiration to those people, especially to those women who are socially suppressed, backward, on the path of forgetting to fight. Today, Draupadi Murmu is providing mental strength to these people. She led the way, proving once again that education is the only path that brings a man to the threshold of his best position in life. Draupadi Murmu's father, Birinchi Narayan Tudu, deserves a special mention here, because he is the same Indian sixty seven (67) years ago who, despite being a very simple farmer of the Santal community, sent Bhavana's daughter to school. Even today, where the marginalized people are still wandering and dying in the dark alleys, getting lost constantly, his daughter Draupadi Murmu is the biggest example of how far she progressed in her thoughts and actions. It is needless to say that the personality who rose to fame from such a marginalized community. Bhimrao Ramji Ambedkar in his autobiography, said, "Whether one has shoes on one's feet or not, one must always have a book in one's hand". Birinchi Narayan Tudu, knowing that to be the absolute truth, handed over the book to his daughter. True to Ambedkar's words, today Draupadi Murmu is sitting on the highest seat of honor in India. In this presentation, her narrative is presented through some words and some stories.

Conclusion:

Draupadi Murmu, a tribal from a remote region of Odisha, was able to become the President of India for two main reasons: one, her father understood that their community was backward and would remain so as long as they kept themselves away from the field of education. He did not want education for boys only, he also educated his daughter. And as



a result, she is now at the top of respect. If her father had not understood this then, Draupadi Murmu would not have been able to empower herself as a marginalized woman today, and the man who has been silently playing the role of a craftsman behind her success is her father, who is actually a man and the leader of her empowerment and respect.

References:

1. Dash, Dr. Dipak Kumar, June, 2024, Unveiling the role of indigenous women leaders in Odisha's Political landscape: challenges, Strategies and Impact, Innovations Journal, Page-598-619;
2. Chancel, Rekha, June, 2023, Political and social empowerment of tribal woman in India: A study of Draupadi Murmu's journey from a tribal woman to becoming the President of India, International Journal of Political science and Governance, ISSN-2664-603X, Page-22-26;
3. Das, S. & Nayak, R., 2018, Indigenous women's Political leadership in Odisha: An Empirical Study of Impact and challenges, Journal of Political studies, Volume-25, Issues-2, Page-211-228;
4. Mohanty, M., 2017, Historical context of indigenous women's political participation in Odisha, Indian Journal of history, Volume-29, Issues-3, Page-150-168;
5. Patnaik, S., 2018, Gendered Politics: Challenges Faced by indigenous women leaders in Odisha, Indian Journal of Gender studies, Volume-25, Issues-3, Page-437-454;
6. Pradhan, P., 2017, Grassroots organizing and indigenous women leadership in Odisha, Journal of community development studies, Volume-44, Number-3, Page-345-362;
7. Patra, S., 2019, Capacity building for indigenous women leaders in Odisha, Journal of development Studies, Volume-38, Number-2, Page-201-218;
8. Bhera, N., & Mohapatra, P., 2019, Indigenous Women's leadership and political transformation in Odisha: An Interdisciplinary approach, Bhubaneswar: Odisha State University Press;
9. Sahu, M., & Dash, S., 2017, Role of Indigenous women leaders in local Governance: A case study of panchayat raj institutions in Odisha, Journal of rural development, Volume-36, Number-3, Page-301-316;
10. Mishra, S., 2018, Advocacy and networking: indigenous women's strategies in Odisha, Journal of Social movements, Volume-12, Issues-2, Page-333-349.

The Upaniṣads and the Brāhmo Samāja : The Philosophical Foundation of Monotheism (*ekeśvaravāda*)

Uday Karmakar

Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Ranchi University

Abstract: *This paper examines the philosophical foundations of monotheism (ekeśvaravāda) as developed in the Upaniṣadic tradition and reinterpreted by the Brāhmo Samāja. The Upaniṣads articulate a vision of ultimate reality as Brahman—formless, infinite, and non-dual—representing a metaphysical monism that transcends theism in its conventional sense. This conception of divinity is characterized by nirguṇatva (absence of attributes) and is to be realized through inward spiritual experience rather than external worship. By contrast, the Brāhmo Samāj, arising in 19th-century Bengal, reconfigures this non-dual ideal into a rational, ethical theism. While affirming belief in a singular divine principle, the Brāhmo movement emphasizes a morally engaged, personal God compatible with Enlightenment ideals and socio-religious reform. Through a comparative philosophical lens, this study explores the continuities and divergences between these two frameworks, analyzing how abstract metaphysics and ethical theism converge to shape distinct yet interrelated models of Indian monotheism.*

Keywords: *Upaniṣadic Monism, Brāhmo Samāja, Ekeśvaravāda (Monotheism), Nirguṇa and Saṅguṇa Conceptions, Ethical Theism and Non-Dualism, Social Reformation.*

Introduction: In history of Indian Philosophy, monotheism (*ekeśvaravāda*) emerges as a profound and enduring theme, with its earliest philosophical roots embedded in the Upaniṣads. The Upaniṣads—regarded as the pinnacle of Vedantic thought—investigate into the essential unity of the Ātman (Self) and Brahman (Supreme Reality). This non-dualistic spiritual vision later laid the groundwork for the emergence of the Brāhmo Samāja, a modern religious reform movement founded by Raja Rammohan Roy in the nineteenth century. The Brāhmo Samāja announced a new spiritual and social awakening in colonial India, advocating a monotheistic faith grounded in rationality and morality. Its monotheism, however, was

not a mere dogmatic assertion but a philosophical revival of the introspective and transcendental concept of God as expounded in the Upaniṣads.

Amidst the polytheistic rituals and mythological narratives of ancient India, the Upaniṣads carved out a sublime metaphysical vision of a singular, formless, and all-pervasive reality—Brahman-

“Sarvaṁ khalvidam brahma tajjalūniri śānta upāśīta.”¹

Centered on the unity of the Self and the cosmos, this concept of divinity deeply influenced the theological and philosophical orientation of the Brāhmo Samāja. Raja Rammohan Roy, through his reinterpretation of Upaniṣadic ideals, sought to reintroduce the inward monotheistic essence of Indian spirituality into the modern age.

Rejecting idolatry and ritualistic complexity, the Brāhmo Samāja embraced the Upaniṣadic vision of a formless and attribute-less divinity. Thus, the inherent monotheism of the Upaniṣads became the doctrinal cornerstone of the Brahmo faith. This essay explores how the philosophical foundations of monotheism in the Upaniṣads shaped and informed the ideological and spiritual trajectory of the Brāhmo Samāja, ushering in a new horizon of religious and social reform.

The Philosophical Basis of Monotheism (*ekesvaravāda*) in the Upaniṣads:

The Upaniṣads, hailed as the highest stage of Indian metaphysical inquiry, center around the contemplative understanding of Brahman and Ātman. The conception of God in the Upaniṣads is not mythological or ritualistic but philosophical and introspective. Within the broad spectrum of Indian thought, monotheism (*ekesvaravāda*) represents a vital and distinctive current, situated between polytheistic deities and the formless, transcendental vision of divinity.

The core concept of the Upaniṣads is Brahman—omniscient, omnipresent, and pure consciousness. The Brahmānandavallī of Taittiriyaopaniṣad defines Brahman as :

“Satyam jñānam anantam brahma”²

This Brahman is the ultimate reality, beyond form, beyond attributes, and untouched by action, yet the cause of all existence.

The famous mahāvākya from the Chāndogya Upaniṣad asserts the essential identity between the individual self and the Supreme Brahman-

“tat satyam sa ātmā, tat tvam asi”³

It proclaims the monotheistic vision that all existence emerges from a singular essence:

“Sadeva somya! Idamagram asīdekamevadviñyam”⁴

Such assertions reveal the profound monotheistic undercurrent of the Upaniṣadic vision.

In the Bṛhadāraṇyakopaniṣad, Ātman is described as none other than Brahman, culminating in the dictum:

“brahma vā idamagra āsīt tadātmānamevāvet. Aham brahmāsmi”⁵

This radical monism dissolves the distinction between the divine and the individual, positing a singular, non-dual reality that transcends multiplicity.

The Upaniṣadic conception of Īśvara is thus universal and Omnipresent—neither anthropomorphic nor sectarian—

“Ekam sad viprū bahudhā vadanti”⁶

Truth is One, the wise speak of it in many names, though pre-Upanishadic, aligns deeply with the Upaniṣadic spirit and its philosophical monotheism.

The Īśopaniṣad begins with the verse:

“Īśū vūsyam idam sarvaṁ yat kīñca jagatyūṁ jagat”..⁷

Whatever there in this ephemeral world is mutable, all that must be pervaded by the Lord.

This assertion situates Īśvara not as a being apart from creation but as its inner essence, confirming the non-dual, monotheistic paradigm.

The Māṇḍūkyaopaniṣad describes Īśvara as:

“Advaitam śūntam śivam advayam”⁸ — Non-dual, peaceful, auspicious, beyond duality,

This verse upholds a formless, unconditioned concept of divinity. The repeated use of the *neti neti* (not this, not that) formula reveals the apophatic method by which the Upaniṣads describe the indefinable Absolute.

History and Philosophical Orientation of the Brāhmo Samāja:

For centuries, religious practice in India had been entangled in priestly ritualism, idol worship, and caste hierarchies. The tension between scriptural idealism and mythological praxis created spiritual ambiguity. In the early nineteenth century, the influx of Western education, rationalism, and liberal thought catalyzed an intellectual and spiritual awakening. It was in this milieu that the Brāhmo Samāja emerged.

Raja Rammohan Roy (1772–1833), through his translations and interpretations of the Upaniṣads, spearheaded a revival of monotheistic and rational spirituality. To him, true religion lay in the realization of

God and the Self. The Brāhmo Samāja, founded in 1828, was the institutional embodiment of this vision.

After Roy's death, the movement waned temporarily, until revitalized by Debendranath Tagore (1817–1905). In 1843, he established the Tattwabodhinī Sabhā and formally embraced the Brāhmo faith. Tagore deeply infused the Brāhmo Samāja with Upaniṣadic ideals, compiling a new scripture titled Brāhmo Dharma, replete with Upaniṣadic quotations and interpretations.

Keshub Chandra Sen joined the movement in 1857 and later restructured it with a vision that emphasized morality, activism, and universal religion.

The theology of the Brahmo Samaj was grounded in belief in a formless, indescribable, omnipresent God (*īśvara*). This God was not worshipped through ritual but realized through inward devotion and ethical living. The Brāhmo Samāja thus became not only a religious reform movement but also a potent force for social change. Despite its elitist and urban character, the seeds of rationality, morality, and religious liberalism sown by the Brāhmo Samāja remain influential to this day.

The Influence of the Upaniṣads on Brāhmo Philosophy:

The theological and philosophical framework of the Brāhmo was profoundly shaped by Upaniṣadic thought. Rammohan Roy, Debendranath Tagore, and later Brāhmo thinkers derived their doctrines from the Upaniṣadic vision of a formless God, non-duality, and Self-realization. Roy himself translated several Upaniṣads into English and provided rational commentaries, thereby introducing their metaphysics to the Western-educated Indian intelligence.

In the Upaniṣads, God is said to be beyond sensory perception. This abstract vision of divinity found a moral and rational interpretation in the Brāhmo conception of God, who was simultaneously formless and ethically exalted. While the Upaniṣadic Brahman is without qualities, the Brāhmo God—though metaphysically formless—is endowed with moral attributes, making Him a living ideal of ethical consciousness.

The Brāhmo Samāja maintained the Upaniṣadic principle of formless worship, eschewing idol worship and ritual. The Mahāvākyas "*Ayam ātmā brahma*," "*Tat tvam asi*," "*Aham brahmāsmi*"—express the unity of the soul and Brahman, a theme central to Maharshi's teachings. He emphasized the immortality and divine origin of the soul, declaring a synthesis of monotheism with inward spirituality.

By interpreting the Upaniṣads through the lens of modern reason and moral consciousness, the Brāhmo Samāja provided religion with a new direction. This fusion of ancient metaphysics and modern ethics turned Brahmo concept into one of the most significant reformist strands of modern Hindu thought.

A Comparative Perspective on Monotheism

The Upaniṣadic conception of monotheism is fundamentally philosophical and experiential. God is an object of realization, not belief. In contrast, Brāhmo monotheism constructs a moral and religious framework within which God becomes the guide and guardian of ethical living.

In the Upaniṣads, God is *nirguṇa* (without attributes) and beyond action. But in the concept of Brāhmo, God is just, moral, and socially engaged—a subtle convergence of *saguna* and *nirguṇa* perspectives.

Whereas the Upaniṣadic Brahman is the subject of direct spiritual experience, the Brāhmo God is a moral ideal and the lodestar of human conduct. The Upanishadic spirituality is individualistic and contemplative; the Brāhmo orientation is collective and reformist. Thus, monotheism becomes both a path to self-liberation and a foundation for social transformation.

Though the Brāhmo Samāja sought to modernize Upaniṣadic monotheism, it failed to attract mass adherence, primarily due to its conflict with popular mythological culture and its elitist positioning. Nevertheless, it succeeded in translating the spiritual essence of the Upaniṣads into a rational, ethical, and reform-oriented religious movement.

Conclusion:

At its core, Upaniṣadic philosophy affirms the existence of a singular, formless, and conscious reality—Brahman. This monotheism, expressed as the unity of Self and Supreme, resonates throughout the Indian metaphysical tradition. The Brāhmo Samāja, by reinterpreting this vision to meet the exigencies of modernity, transformed it into a faith of ethical monotheism.

Whereas the Upaniṣadic God is silent and ineffable, the Brāhmo God is moral and social. This transformation enriched Indian spirituality with both inner depth and outward humanitarianism. The religious philosophy of the Brāhmo Samāja reflects this dual commitment—to the inward pursuit of the divine and the outward pursuit of justice and simplicity.

In seeking to reform Indian religion through monotheism, rationality, and morality, the Brāhmo Samāja drew its deepest inspiration from the Upaniṣads. Thinkers like Raja Rammohan Roy, Maharshi Debendranath Tagore, and Keshab Chandra Sen reinterpreted these ancient texts in light of modern reason, bringing about a profound transformation in the Indian spiritual consciousness. Thus, the Brāhmo Samāja stands not merely as a religious movement, but as a renaissance in Indian philosophical and religious thought—rooted in the Upaniṣads and flowering into modern reform.

Reference:

1. Chāndogyopaniṣad-3.14.1
2. Taittiriyopaniṣad-2.1.1
3. Chāndogyopaniṣad-6.8.7
4. Chāndogyopaniṣad-6.2.1
5. Brhadāraṇyakopaniṣad-1.4.10
6. Ṛgveda-1.164.46
7. Iśopaniṣad- 1
8. Māṇḍūkyaopaniṣad

Bibliography:

- Gambhirananda Swami. Upaniṣad Samgraha (Sanskrit Text with Bengali Translation). Udbodhani Karyalaya, Ramakrishna Math O Mission, Kolkata.
- Majumder, Ramesh Chandra. Bharter Swadhinata Andolaner Itihas (Part-I), Calcutta: Pharma.K.L. Mukherjee, 1962
- Tagore, Debndranath, Brahmo Dharmo(Part I & II), Tattwabohini Sabha, 1848-1850
- Roy, Raja Rammohan. Iśopaniṣad, Translation & Explanation. Sadharan Brahmo Samaj Prakashana, 2002 (Main Edition 1816)
- Bhattacharya haraprasad. Upaniṣad O Adhunik Chinta, Visva Bharati Granthan Vibhag, Shantiniketan, 1968.
- Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy. Vol. I, Cambridge University Press, 1922.
- Kopf, David. The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton University Press, 1979.
- Radhakrishnan, S. (1953) The Principal Upanishads. Harper Collins Publishers.
- Īśādaṁ Nau Upaniṣad, (Samvat 2080) Gita Press, Gorakhpur, 1421.

Nationalism, Science, and Enterprise : The Role of Acharya Prafulla Chandra Ray in the Development of Indigenous Industry

Sreshtha Nandy

Research Scholar, Dept. of History

Prabhat Kumar College, Contai

Purba Medinipur, West Bengal

Abstract: *Acharya Prafulla Chandra Ray was a visionary in his fight against colonial rule by using science, love of his country and his enterprising skills. His key venture Bengal Chemicals and Pharmaceuticals demonstrated that the local business could still flourish under the stringent British regulations. Ray correlated science for rebuilding the nation by learning, educating, and reforming to see social transformations and work as a group and individually. His concept of science + enterprises = nation building is still observed in his Make in India and Atmanirbhar Bharat programs. The life of Prafulla Chandra Ray is a strong case of how knowledge and business can work hand in hand to bring a long-term social and economic transformation; building Indigenous Industry in post-colonial India.*

Keywords: *Prafulla Chandra Ray, Bengal Chemicals, indigenous industry, science and nationalism, Swadeshi movement, self-reliance.*

Introduction: Bengal experienced civil unrest and economic hardship in the late 1800s and early 1900s. British rule destroyed the Indian-manufactured goods at that time. The busy workshops and trade centres were bound to cease their work. It had a negative impact over the people, who now had to buy imports, but also sparked a new revolt. The Swadeshi movement encouraged Indians to use their own products. A key figure here is Acharya Prafulla Chandra Ray, the chemist who combined science and patriotism. The central argument of this paper is that Acharya Prafulla Chandra Ray's reformulation of Indian nationalism was linked to his vision of employing modern science and indigenous enterprise to counter economic subjugation and foster national advancement. His decision to set up Bengal Chemicals was therefore not just about starting a company. It was a statement, a kind of defiance,

showing that Indians could rely on their own knowledge and resources.

Historical Background

India, long celebrated for its wealth and thriving trade networks, was historically a magnet for global commerce. Roman accounts in the *Periplus of the Erythraean Sea* describe a steady flow of gold into India in exchange for spices, textiles, and precious goods. Bengal, in particular, stood out in the early eighteenth century: its exports of cotton, silk, saltpetre, and opium were nearly three times its imports, with the balance settled in gold. Dutch, French, and British trading posts flourished along its rivers, attesting to its prosperity.

The Battle of Plassey (1757) marked a decisive turning point. The East India Company, through coercive policies, drained enormous wealth, an estimated £38 million between 1757 and 1780 alone, crippling Bengal's economy. Traditional industries were systematically destroyed: weavers were forced into exploitative contracts, Indian textiles were banned from English markets, and shipbuilding was deliberately suppressed under British pressure. By 1800 the imbalance in the economy was evident. Annual exports to India out of England were about 1.7 million, but the imports into England out of India were between £18 million and £30 million. By half a century after the Battle of Plassey, the economy of Bengal was summarized as being “hopelessly crippled” (West Bengal College & University Teachers' Association, 2001).

However, this also brought about new hopes, which were caused by the economic destruction. The colonial curbs affected the initial activities of the industrial enterprises but towards the end of the 19th century, Indian activities started to be discovered. The Swadeshi movement (1905) sought to recast economic struggle into a cultural and political movement, and stressed on local industry, scientific education, and self-help (Paschimabanga, 1999). This is the acrimonious environment into which Acharya Prafulla Chandra Ray would land his vision of science-based national regeneration.

Early Life and Scientific Career of P.C. Ray

Acharya Prafulla Chandra Ray was born in 1861 in Raruli-Katipara, a village in present-day Bangladesh, into a middle-class family that valued both traditional learning and modern education. Sickness characterized his early years, and thus he had time to develop a dominant passion to read. By the influence of the intellectual environment of the Bengal Renaissance, he attained higher education and subsequently received a

doctorate in Chemistry at the University of Edinburgh in 1887 (Sharadiya Gyan O Bigyan, 2022).

Upon returning to India, Ray joined Presidency College in 1889 as an Assistant Professor of Chemistry. The future of original research in India was not encouraging at the time with little laboratory facilities and distrust by colonial scientists. Ray later on in 1895 made an important scientific discovery where he successfully synthesized Mercurous Nitrite [$\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$] a substance which was assumed to be too unstable to exist (Paschimabanga, 1999). This finding led to the publication in the Journal of the Asiatic Society of Bengal which drew the attention of the world and brought Indian chemical research to the world map.

Besides his own work, Ray was the guiding influence of a generation of brilliant scientists that included Satyendra Nath Bose, Meghnad Saha, and Jnanendra Nath Mukherjee who would become the luminaries of Indian science. His professional life went into the newly instituted Science College of the University of Calcutta where he was the first Palit Professor of Chemistry between 1916 and 1936 (Bhadra, 2018). Ray lived frugally and contributed most of his earnings to teaching and research and was a model of a teacher-scholar whose life aim was to foster a culture of self-reliant science in India.

P.C. Ray's Nationalist Vision

Acharya Prafulla Chandra Ray was an innovative chemist, and a powerful nationalist, referred to as a Jatiya Rishi or “nationalist saint” (West Bengal College & University Teachers’ Association, 2001). He felt that science would save the nation. Having received his doctorate at Edinburgh, Ray could have made much of himself in the colonial system, but he devoted his talents to his nation. His most important book, A History of Hindu Chemistry, was not only a work of scholarship but also a national call, to remind Indians of their lost scientific tradition and to restore their self-confidence.

Nationalism was not political but constructive by Ray. He criticized the caste system as a disintegrative agent that did not allow unity and progress and he condemned the colonial education system, which had failed to give educated unemployed, instead of productive and socially responsible citizens. To him economic self-sufficiency meant freedom. This conviction led to the setting up of Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, first Indian-owned pharmaceutical company, which was a Swadeshi indeed (Paschimabanga, 1999).



Besides his personal efforts, Ray espoused the Ahimsa Andolan (nonviolent resistance) and the Khadi Andolan of Mahatma Gandhi, urging the people of India to be simple, self-reliant, and to start cottage industries. He also liked to remind his countrymen that the poverty of India was owing to overdependence on agriculture and no diversification towards industry. In his writings, he warned: “If India is to rise once more in the scale of nations, if her teeming millions are not to drop down dead like so many locusts after a single season’s drought, she must adopt the tactics of the European nations” (Paschimabanga, 1999). Through such exhortations, Ray sought to instill in Indians the urgency of building a balanced economy founded on both modern science and indigenous enterprise.

The Roots of Bengal’s Decline

Acharya Prafulla Chandra Ray opposed the manner in which many people in the Bengali community thought. In his language they want “to catch fish without getting into the water”. He thought this mindset, desiring the fruits without the labour, made Bengalis fall behind in business and in utilising their brains at the service of society. Under British rule, a big number of Bengalis immediately engaged in clerical jobs. These were employment that provided security but killed the independence spirit. One or two of the educated young men were proud to be earning twenty or twenty-five rupees a month as clerks and had not the heart to begin their own trade or industry. Ray perceived that English education in Bengal created men who only could gain employment. It did not make men of science, industry or commerce. Young men were also pressured by family, early marriage and social traditions to take safe employment instead of risky business. Even where few attempted to establish shops, they were not able, as they lacked training, lacked discipline and lacked patience to struggle (Ray, 2022).

The other Indian communities gradually became more and more in trade, by hard work and courage. Instead, Bengalis squandered their smarts in flattery and hairsplitting and their own industries were destroyed as foreign products took over the market. In his case, Ray saw this laziness, dependence and false pride as the source of the economic problems of Bengal (Ray, 2022).

It is an educated man who should be a real businessman, Ray said. He may not be well versed in classic literature or profound philosophy, but he has good common sense and practical thinking. He

can read accounts, considers them math, and knows enough science to comprehend chemistry, physics and engineering. He also has some hands-on knowledge on farming, trade and society. It is said by many that systematic thinking can only be taught at universities. Ray mentioned that good business training may impart the same skill and also wonderful life lessons (Ray, 2022).

Foundation of Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Works

In 1892, Acharya Prafulla Chandra Ray established the Bengal Chemical Works in a modest rented house at 91 Upper Circular Road, Kolkata, with just ₹700 in personal savings (Hazra et al., 2024). At a time when most pharmaceuticals in India were dominated by British imports, Ray's bold ambition was to shatter that monopoly and cultivate indigenous production rooted in Swadeshi ideals (DAS, 2008).

The enterprise initially faced substantial obstacles, limited capital, skepticism from Indian elites unconvinced of its viability, and resistance from entrenched British pharmaceutical firms. Yet Ray, as a scientist-entrepreneur, trained and mentored his workers, pushing them far beyond mere manual labor to appreciate scientific rigor and entrepreneurial ethics (DAS, 2008). Under his leadership, the company expanded its product line, offering medicines, industrial chemicals, and household items (such as antiseptics, hair oils, disinfectants, and naphthalene balls) many tailored to Indian needs and sensibilities (West Bengal College & University Teachers' Association, 2001). This diversified portfolio demonstrated Indians could successfully manage modern industrial production and deliver quality comparable to foreign firms.

By 1901, he had converted it into a limited enterprise named Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd., signaling its formal institutional growth. In 1908, a contemporary industrial review praised the enterprise as “an object lesson to capitalists of this province,” recognizing its resourcefulness and business capacity (Banerjee, 2020). Its influence was great since it was one of the first chemical industries to prosper in India, and it represented not only a source of employment and industrial self-sufficiency but also a powerful symbol of nation-desire, that indigenous enterprise could prosper even within the colonial limits with the support of scientific temper and patriotic faith (Ray, 2022).

Science and Indigenous Enterprise: Philosophy and Practice

Acharya Prafulla Chandra Ray was a rare person who combined science, nationalism, and business. He did not limit himself to only working in

laboratories and factories. Through his book *History of Hindu Chemistry*, he reminded Indians of their scientific past and gave them cultural pride. By starting Bengal Chemicals, he showed how an Indian industry could grow even under strict colonial rules. He realised that science and business could transform society together, which remains relevant to the self-reliance of India. He established Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Works, not to earn money but as a cooperative that showed that Indians could establish modern industry (Ray, 2022).

Ray never saw science as just a decorated fancy laboratory. He regarded science as a social emancipatory power that would liberate a country injured by colonialism and domestic issues. His motto was always committed to “science to society”. He felt that research only helped when it increased the living standards of people, generated employment, and brought self-reliance. College fused research, teaching and enterprise in one smooth model. At Presidency College, he not only taught generations of students the science of chemistry, but also a sense of rationalism and civic duty.

His critique of Bengali society, expressed in writings such as *Bangalir Mastiṣka o Tahar Opobyabohar* (The Mind of Bengalis and Its misusage) (1909) and later essays, revealed his frustration with what he saw as a degree-driven, job-seeking mentality that bred dependence and stagnation. In his 1940 All India Radio address, he lamented how Bengal, once prosperous, had sunk into poverty and unemployment, enslaved by the “addiction” to clerical jobs and landed interests. For him, the cure lay in entrepreneurship, agriculture, and indigenous enterprise. Ray’s enterprise model was explicitly welfare-oriented. He lived austere as Mahatma Gandhi noted that Ray kept only ₹40 of his ₹800 salary and devoted the rest to public causes (Chakraborty, 2020). He ran Bengal Chemicals as a quasi-cooperative social enterprise: it aimed to employ young Indians and reinvest profits in community welfare. In fact, the factory was a “step towards self-reliance” that “helped prevent an economic disaster by providing jobs to the younger generation”

Ray also promoted the cooperative movement as a practical extension of his ideals. In 1921 he became Secretary of the Bengal Co-operative Organisation Society, seeing cooperatives as the most effective means to organise rural credit, support cottage industries, and fight the exploitative dominance of colonial capital. His belief was that collective

ownership and social responsibility could fuse Western science with India's own traditions of community solidarity.

Legacy and Relevance Today

Acharya Prafulla Chandra Ray's legacy endures vividly in the continuing operations of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BCPL), India's oldest pharmaceutical company. Founded in 1901, BCPL has withstood colonial dominance, financial crises, and decades of losses, only to return to profitability in 2016–17 after 63 years (Times Of India, 2016). Its heroic revival and crucial contribution during the COVID-19 pandemic (such as scaling up production of hydroxychloroquine under urgent demand) testify to the power of indigenous enterprise (Express Pharma, 2020). During the same crisis, BCPL was swiftly licensed to produce hydroxychloroquine, ramping up to 10 lakh tablets per day showing its latent industrial capacity rooted in self-reliant infrastructure (Singh, 2020).

As the Father of the Indian Chemical Industry, Ray not only founded the first modern Indian chemist training school but also promoted indigenous production of pharmaceuticals, laying the foundation for national resilience. In contemporary India, initiatives like “Make in India” and Atmanirbhar Bharat mirror Ray's ideology: promoting domestic manufacture, self-reliance, and technological sovereignty. BCPL's longevity proves Ray's equation of “science + enterprise = national regeneration”.

Conclusion:

Ray was an incredible person who had a scientific rigor and bold commercial instinct. He was not just limited to laboratories and factories; he wrote books such as History of Hindu Chemistry that restored the science tradition of India and increased cultural pride. He started Bengal Chemicals as a way of proving that indigenous industries could work even in the colonial era. In many ways, India could still use the kind of perspective he had where science and business went hand in hand; if it really wants to move toward being self-reliant.

References:

- Banerjee, B. (2020). Science, a Metaphor of Nationalism: Acharya Prafulla Chandra Ray and Postcoloniality. *New Literaria*, 1(2), 158–169. <https://doi.org/10.48189/nl.2020.v01i2.008>



- Bhadra, S. (2018, August 2). *Recalling a great visionary*. The Statesman; thestatesman. <https://www.thestatesman.com/opinion/recalling-a-great-visionary-1502668629.html>
- Chakraborty, A. (2020, April 19). *Prafulla Chandra Ray: The “revolutionary in the garb of a scientist.”* The Indian Express. <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/prafulla-chandra-ray-bengal-chemist-pharmacy-6368650/#:~:text=Although%20an%20entrepreneur%2C%20Ray%20led,%E2%80%99%20I%20see%20little>
- DAS, S. (2008, December 6). *Chemistry of nationalism*. Telegraphindia.com; Telegraph India. <https://www.telegraphindia.com/west-bengal/chemistry-of-nationalism/cid/1255607/>
- Express Pharma. (2020, August 25). *Pharma PSU, Bengal Chemicals produces 51,960 pheneol bottles in one day*. Express Pharma. <https://www.expresspharma.in/pharma-psu-bengal-chemicals-produces-51960-pheneol-bottles-in-one-day/>
- Hazra, K., Kumar, D., Dutta, S., Mangal, A.K. and Babu, G. (2024). Life and works of Acharya Prafulla Chandra Ray: A man with ultra luminosity. *Journal of Research in Ayurvedic Sciences*, [online] 8(Suppl 1), pp.S105–S109. doi:https://doi.org/10.4103/jras.jras_300_23
- Ray , P. C. (2022). *বাঙালীর মস্তিষ্ক এবং তাহার অপব্যবহার - আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়* *Prafulla Chandra Roy Archives : Prafulla Chandra Roy : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive*. Internet Archive. https://archive.org/details/20220627_20220627_1711
- Ray, P. C. (1937). *Ātma-charit* [Autobiography]. Calcutta: Chatterjee, Chatterjee & Co. Ltd.
- Sharadiya Gyan O Bigyan. (2022, September 20). Sharadiya Gyan O Bigyan, 75. New Century Publication.
- Singh, S. S. (2020, April 10). *Bengal Chemicals gets COVID-19 drug boost*. The Hindu. <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/bengal-chemicals-gets-covid-19-drug-boost/article31311894.ece/>
- The University Of Edinburgh. (2024, June 24). *Prafulla Chandra Ray / UncoverED / Global*. Global.ed.ac.uk. <https://global.ed.ac.uk/uncovered/1860-1900/prafulla-chandra-ray>
- Times Of India. (2016, October 24). *Bengal Chemicals bounces back after 63 yrs*. The Times of India; Times Of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Bengal-Chemicals-bounces-back-after-63-yrs/articleshow/55039336.cms/>

West Bengal College & University Teachers' Association. (2001). Acharya
Prafulla Chandra: Portrait of a man (Vol. 1). Anil Bhattacharya (Ed.).

West Bengal College & University Teachers' Association. (2007). India
before and after the mutiny.

পশ্চিমবঙ্গ (Paschimabanga). (1999) [Bengali calendar year]. প্রফুল্লচন্দ্র রায়
বিশেষ সংখ্যা [Special issue on Prafulla Chandra Ray].

Adverse Effects of Urbanisation on Environment and A Solution

Paulomi Saha

Asst. Prof., Dept. of Sociology
Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya
Salar, Murshidabad

Abstract: *Urbanisation is a process which forwarded a civilisation from one phase to another. It is the ultimate stage of industrial society. But it has some adverse effects on society as well. These are – 1) High rate of pollution and diseases, 2) High density of population, 3) Increase of waste materials, 4) Unequal distribution of man-land ratio, 5) Problem of slum, 6) Increased rate of crime.*

Now the concept of city life should be changed today. Our urban environment polluted by hazardous waste materials. Frequent use of plastic bags and other materials made of plastic also pollutes our environment. Consumption of energy is another issue of our country. India is the third largest energy consumer in the world. Air and water pollution affect our environment a lot. Population growth in urban area is another problem to be considered. Due to huge population growth, many urban problems increased. Therefore, we should trigger out the problems due to urbanisation and find the solution to get rid of it. In this paper, the researcher intends to focus on the problems due to urbanisation process and to way out a solution that is eco-friendly urbanisation.

Keywords: *Urbanisation, Ecofriendly, City-life, Pollution, Energy-consumption.*

Main Discussion: Urbanization - a process which forwarded a civilization from one phase to another. Urbanization is one of the most important processes of human civilization. According to Oxford dictionary of sociology urbanization refers to city formation. The word urbanization came from the Latin word “urbabus” which means city. The exact meaning of urbanization is to transform a village into a city. The main objectives of urbanization are-

1. Development of the conditions.
2. Population explosion.
3. Scarcity of space.

4. Disadvantage of vehicles.
5. Development of industries.

So, it can be said that urbanization is the ultimate stage of industrial society. The process of urbanization is an ongoing process. The advancement of society and urbanization process goes simultaneously.

In India urbanization process starts from around 2600 B.C., with the advent of Indus valley civilization. The Indian subcontinent shares, with Mesopotamia and Nile valley, a long history of urbanisation. The first phase of urbanisation in the Indus valley is associated with the Harappan civilization dating back to 2350 B.C. The cities of this civilization flourished over a period of more than 600 years up to about 1700 B.C. and this was followed by a prolonged period of over a thousand years in which we have no evidence of urban development. From around 600 B.C., we again come across towns and cities associated with the two majors but closely related, cultural streams of India, namely the Aryan Civilization of the north and the Dravidian civilization of the south. From this period onwards, for about 2500 years, India has had a continuous history of urbanization. Earlier there are only four metropolitan cities in India- Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. Gradually the number of cities increases. Census reports reveal that in the last century (1901-2001), there are about 2000 new urban areas added. In the last decade (2001-2011) more than 2500 new towns emerged. In West Bengal 700 new towns have come up. But urbanization has some adverse effects as well. The effects are as follows-

1. High rate of pollution and diseases.
2. High density of population in cities.
3. Increase of waste materials, garbage, byproducts in cities.
4. Unequal distribution of man-land ratio.
5. Problem of slum.
6. Increased rate of crime.

But we can not stop urbanization due to its adverse effects. The only thing that we can do is to control it. So, naturally an alternative process is necessary. An urban area which do not harm environment is highly desired today. If an urbanization process is possible this transforms rural areas into urban ones, but in a proper way. It can be possible to urbanize a rural area in such a way that industries flourish people engaged as industrial workers, as a result the rate of migration from villages to cities decreases. Population is equally distributed to villages and cities.

Development is the main reason which attracts people from rural areas to urban areas. If it is possible to develop the rural areas then naturally migration will be stopped. In a word eco-friendly urbanization is needed. Eco-friendly means environment friendly. It helps to recycle and preserves energy. It is less harmful for environment. All kinds of pollution will be decrease. People are closer to nature. We can use technology, but it does not harm our environment. The concept of city life should be changed today. Till today we judge the city life in term of consumerism. This very concept makes the people to use different articles including natural resources indiscriminately. The excessive use of such things causes some harms to the civilization. Therefore, the concept of development, modernity, ultra modernity should come under the purview of structural analysis of civilization.

We should control the so-called urbanisation process. So, naturally an alternative process is necessary. In a word eco-friendly urbanisation is needed. Here, we discuss about eco-friendly urbanisation in respect of multiple aspects.

We all know that pollution rate in cities is alarming today. To control the rate of pollution in city, at first, migration from rural area to urban centre should be checked. So, the work opportunity should be increased in sub-urban and rural areas. Development is the main reason which attracts people from rural areas to urban areas. If it is possible to develop or urbanize the rural areas then naturally migration rate will be decreased. As a result, pollution rate will also diminish.

The waste materials from factories and daily sweepings of city-dwellers pollute the river water. Recycle of waste material is very popular today. We can set up a recycling plant in city areas. Recycling is not a new concept. The origin of recycling is found in pre-industrial period. In that time scrap bronze and other metals melted down for perpetual use. Today, mainly due to industrialization hazardous waste material pollute the urban environment. There are several ways may be used to collect the recyclates. A recycling plant is not fruitful all the time. So, the other ways are-

- Drop-off centers- Drop-off centers in different areas of the city may set up which collect the waste.
- Buy-back centre- Here cleaned recycles are purchased. Thus, post-processed materials are ready to sell again.

- Curbside collection- Here the recycles are picked and cleaned by a recycling van.

Besides, we must control the frequent use of plastic bags. The plastic bags less than 40 micron are highly responsible for environment pollution. The Govt. should restrict the use of plastic bags. Supreme Court banned the use of plastic bags in the country. It is noticed that the plastic bags choked the drains and lakes in cities. Not only that the animals (mainly cows and bulls) eat plastics along with other garbage. It choked their stomach, which is very dangerous. It also pollutes the marine life. Unrestricted use of plastic bags should be stopped. Door to door garbage collection system should introduced by all municipalities. It is true that plastic bags are popular because it is easy to carry and handy. But unfortunately, all people are not conscious about the harmfulness of plastics. It is not decomposed within environment. A complete ban on the use of plastic bags is also impossible. So, a solution is plastic bags less than 40 micron thick should be banned. The shopkeepers who use such plastic bags should be punished (like he must fine Rs.2000). Plastic bags producing factories should close. Every year 500 billion plastic bags are used in the whole world. Lastly, we can find an alternative way. Biodegradable bags may be used. Traditional plastic bags are made from polyethylene. Synthetic Fiber bags or reusable fabric bags are good alternatives. If the production of plastic bags is totally stopped by the Govt., then the retailer also forced to use paper bags or jute bags instead of plastics. In West Bengal there are a lot of jute industries besides Hooghly River. But unfortunately, maximum industries are now closed. These are called sick industries. If Govt. revives those industries, then it will also help many youths to be employed in such industries.

Forestation is very much needed today. Plantation of trees in cities is a primary work of municipalities and corporations. Forestation and conservation of trees in cities is necessary. The forest department decided to spread green areas in cities. The wastelands may be used as this. It will certainly improve the condition of cities. Besides the roads or in the middle of two roads tree plantation can be possible. Trees not only decrease pollution rate, but also give shades, decrease heat of summer, increase beautification of cities and also give comfort to our eyes. Forestation in city areas can be possible in several ways. Like -



- Decentralized Peoples' Nurseries: Seedlings are raised through Kishan Nurseries under this programme to cover up the blank degraded areas outside the Forest areas at low cost.
- Strip Plantation: The scheme is meant for the creation of plantations on roadsides, canal banks and sides of the railway lines.
- Management should be intensified.
- Participation of local people in forest management in urban areas.

There is also an idea of sustainable agriculture, which is also very useful. Sustainable agriculture is the use of agricultural management practices that maintain soil quality and reduce the pollution of air and water by agricultural chemicals. Sustainable agriculture is usually considered a middle ground approach between large scale industrial agricultural practice and organic farming.

Consumption of energy is another necessary issue in present days. As a result of energy consumption some problem arises, like global warming. We can solve this problem by energy conservation. Energy consumption rate is increased day by day. India is fourth largest energy consumer in the world. Energy consumption may be divided into four categories. They are-

- Domestic energy consumption.
- Commercial energy consumption.
- Industrial energy consumption.
- Transportation energy consumption.

In urban areas of India especially energy should be saved. Energy conservation is the need of the day. We can save energy by several ways. Such as instead of incandescent bulbs we can use compact fluorescent or LED light bulbs. Because in incandescent bulbs 90% is converted to heat, only 10% electricity is converted into light. On the other hand, LED saves energy a lot and it lasts long period. Use of air conditioner and other high consumption electrical goods should be restricted.

Energy conservation is to reduce energy consumption. We can see in television that celebrities like filmstars advertise for energy conservation. Like- put off the switch when you are not in room. Many people are not aware that men produce energy by using natural resources. The resources are limited. If we waste energy then it will be finished soon. In 2001 Energy Conservation Act is passed.

Now-a-days sustainable energy is also known to us. Sustainable energy is the sustainable provisions of energy that meets the needs of the present and also for future generations without damaging environment. The instances of sustainable energy are hydroelectricity, solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy, biomass, biofuel etc. Today use of sustainable energy is very popular because it saves energy and it has some alternative process to produce energy. We can not depend on natural resources. Like recycling waste material plant, renewable energy is most demanding now.

In urban area another problem is housing problem. Every city faces housing problem. Huge population growth in cities creates such problem. Eco-friendly housing is a popular idea now-a-day. In India in Greater Mumbai, we can find such kind of housings. Brihan Mumbai Municipal Corporation (BMC) introduced it. In urban area now we are familiar with fewer trees, greenery in a city area is rarely seen now. It pollutes our environment. Urbanization is important, but eco-friendly urbanization is more important. Because it is seen that eco-friendly urbanization helps to raise the ground water level. At first in China this Agro-housing idea is fruitful. Another idea is Eco-architecture. It contains of bamboo trees. By bamboo trees houses are made. Bamboo is eco-friendly and renewable. But such type of houses may not be long-lasting. If with bamboo steel, wood and concrete are also used then a perfect long-lasting eco-friendly house can be made.

Some measures which prevent pollution are-

- Housing with the provision of plantation may reduce the level of pollution.
- If the rooftop is used for water preservation, then we can save ground water which is limited in quantity. On the other hand, arsenic pollution may be checked.
- Use of solar electricity plate on rooftop may help us from excessive dependence on conventional energy consumption that also causes air pollution during its generation.
- Use of roof in such purposes can save the dwellers from excessive heat during summer.

In recent years especially in metropolitan cities pollution rate is so much high that many states in India are eager to promote the plan of eco-friendly housing. Such houses are made of bio-glass (which helps to adjust the temperature in winter and summer), bio-luminum frames in

windows, bio-luminum tiles (which is long-lasting and made from salvaged parts of airplanes).

Every metropolitan city is suffered by water crisis. Population density in cities is one of the main reasons. Water in urban areas polluted in so many ways. Such as- discharge of waste materials from industries, municipal sewage, daily sweepings of city dwellers, detergent, toxic materials, so many hazardous waste materials mixes in water. Water pollution in city areas reaches to an alarming situation. The canals in cities are full of wastages. The waste materials hinder the flow of water. As a result, the canals are practically large open sewers. Not only canals the rivers in cities also full of industrial waste, solid waste, sewage, toxic materials etc. Problem of proper sanitation system also affected city a lot. The only way out is consciousness among people. If city-dwellers are aware of water pollution, then the problem may be solved. Recycling plant should be established.

Urbanization in rapid scale happened in every corner of the world. At a time due to urbanization environment is very badly affected. Gradually people are becoming conscious of environmental degradation. In urban areas we face huge rate of air pollution, water pollution, sound pollution, climate change, congestion, disposal of waste materials, automotive pollution etc. So, we can see that there is a close relation between urbanization and environmental degradation. Pollution from vehicles is also common in cities. The emissions from the cars increases air pollution. Vehicle emissions include many air pollutants like hydrocarbons, carbon monoxides, nitrogen oxides etc. Because number of vehicles in cities are increasing day by day. It also creates health problem of city-dwellers.

The solutions of this problem are-

1. Govt. should notice about vehicle emissions test regularly.
2. Use of public transport instead of private vehicles is necessary to excessive air pollution.
3. Regular inspection of industrial emissions.
4. Consciousness of common people.

Rapid population growth in urban areas is another vital problem. Due to huge population growth many urban problems increased. Such as-

1. housing problem in cities
2. energy consumption
3. water crisis

4. waste generation
5. vehicle emissions control
6. pollution

To control the population growth some ways are-

- population growth in cities can be controlled by family planning.
- Promote regional development and help to flourish the growth of cities in semi-urban areas.
- Centre of excellences should be established in suburban and rural areas in order to create the scope of employment and to provide higher education to the local people.

Each urban area is surrounded by a peripheral ring. Migration from rural and semi-urban area to urban area is a universal process. Migration from rural areas to urban areas is by and large, voluntary and spontaneous and is not only confined to the rural poor or the rural unemployment but also among rural rich. Rural urban migration has both negative and positive connotation. It is negative in the sense that the huge influx of migrants into the city puts the city infrastructure under heavy strain and leads to generation of slums and squatter settlements. However, migration of the people to the cities is not a total debt to the city: in fact, the village people bring skills and they often find means of self-employment in the city. Further when the rural rich migrate, capital flows occur from village to city. Data reveals that at the world level net migration from rural to urban areas accounts for less than half of the population growth of cities. Population growth of the cities can be controlled by family planning. Family planning in urban poor, development in rural and semi-urban areas, proper planning by urban development authorities may stop the huge rate of migration from villages. One of the important solutions of this problem is to promote regional development and help to flourish the growth of cities in semi-urban areas.

Environmental problems in modern industrial areas are very common today. Global warming is a problem which is discussed all over the world. Recently the idea of sustainable development has been introduced. Brundtland commission used the term sustainable development. It is that development which lasts. It ensures sustainable and equitable use of resources for meeting the needs of the present and future generations without causing damage to environment. It prevents

further damage to our life support system. It conserves the biological diversity and other resources for long term food security. In 1992, 3rd to 14th June, 179 leaders of state met in Rio De Janeiro, Brazil for the United Nations Conferences on Environment and Development (UNCED). The Earth summit was organized to address urgent problems to environmental protection and socio-economic development.

Indeed, we cannot stop the development of society. So we cannot stop the continuous process of urbanization due to its adverse effects. An urban area which do not harm environment is highly desired today. The concept of city life should be changed. Till today we judge the city in terms of consumerism. This very concept makes the people to use different articles including natural resources indiscriminately. Consumerism is manifested in the chronic purchasing of new goods and services, with little attention to their true need, durability, and environmental consequences of manufacture and disposal. The excessive use of such things causes some harms to the civilization. This very true concept i.e. the concept of market-based economy we should change to save our civilization for both the present and future generations along with govt. responsibility. So, it can be said that we cannot ignore urbanization process. But it should be done in an eco-friendly way. Only then we can save our environment.

References:

1. Ashworth. William, Little. E. Charles. "Encyclopedia of Environmental Studies", Viva Books Private Limited. (1991). Pp- 476.
2. Boyle Godfrey (ed). "Renewable Energy Power for a Sustainable Future", Oxford University Press. (2004).
3. Davis, Kingsley. "Urbanization in India: Past and Future", in Turner, Roy, ed.: India's Urban Future, Oxford University Press, Bombay. (1962).
4. Phadke. V.S, Banerjee-Guha. Swapna(ed). "Urbanisation, Development and Environment", Rawat Publications. (2007).
5. Ramachandran, R. "Urbanization and Urban Systems in India", Oxford India Paperbacks. (1989). pp-22.
6. Rao, M.S.A, (ed). Urban Sociology in India, Orient Longman, New Delhi. (1974).
7. Siddhartha. K, Mukherjee. S, "Cities Urbanisation and Urban System", Klsalaya Publications Pvt. Limited. (2000). Pp-235.

Comparative Analysis of Manik Bandopadhyay's Padma Nadir Majhi and Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea

Samriddhi Sekhar Mondal

Assistant Professor, Dept. of Bengali
Mahishadal Girls' College

Abstract: *This research articulates a comparative study of two great literary texts: Manik Bandopadhyay's Padma Nadir Majhi and Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea. Although both stories portray human beings against dominant marine forces, their thematic concerns differ vastly. Bandopadhyay considers socio-economic marginalisation, communal strife, and environmental determinism in the context of a subaltern Bengali world. Hemingway, however, portrays individual survival, stoic heroism, and existential relevance using a minimalist narrative strategy. Taking ecocritical and narrative theory paradigms, this research investigates how the two stories portray images of dignity, moral agency, and human identity in the context of the natural world.*

Keywords: *Padma Nadir Majhi, The Old Man and the Sea, Comparative Analysis, Human Struggle, Narrative Method.*

Introduction: Released in the mid-20th century, Padma Nadir Majhi (1936) and The Old Man and the Sea (1952) are pathbreaking river- and sea-themed novels, respectively. While Bandopadhyay locates his narrative in colonial Bengal—poverty, social injustice, and environmental vulnerability defining the life of boatmen—Hemingway projects the isolated battle of ageing fisherman Santiago with the Gulf Stream onto a universal plane. Both novels probe how human beings fight against the uncanny but essential powers of nature.

Despite their apparent geographical and cultural differences, these works come together on higher humanistic grounds. They broach themes of survival, failure, dignity, and meaning, though the character of these themes and the philosophies brought to bear upon them is radically different. This comparative reading examines how each author uses water as a metaphor for the hardships of life and as a provocation for an exploration of human resilience, social identity and ethical dignity. Using

ecocritical and narrative modes, this essay maps the structural and philosophical similarities and differences among these books.

1. Human Struggle Against Nature

1.1 Padma Nadir Majhi Collaborative Environmental Advocacy

The main character, Kuber, symbolises river workers whose existence is in the hands of the Padma River. The river nourishes them, but also cruelly destroys them. For Hossain (2018), “when the tidal waves blow during the rainy season... the mighty river grasps and devours the lives of the poor communities.” Floods, erosion, and environmental suffering define the common destiny of Kuber's community, presaging social and moral breakdown.

Bandopadhyay's depiction of nature is realistic. The Padma is not romanticised but felt as a multifaceted thing—both sustaining and destructive. The river is also a metaphor for the colonial economic climate that creates cycles of exploitation and displacement. Kuber's battle is not heroic but thoroughly human, conditioned by environment and circumstance. As with Santiago, Kuber's battle is not with a single opponent but the slow violence of structural poverty, social hierarchy, and environmental danger.

1.2 Santiago's Solo Battle in The Old Man and the Sea

By contrast, Hemingway's Santiago is alone in the middle of the ocean. His battle with the marlin is physical and metaphysical. Santiago's confrontation with nature is made possible by a personal, existential frame of reference. He considers the sea as a worthy opponent, nearly an extension of himself, and the fish as not something of commerce but as a noble adversary:

A man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated.

This is a summary of Hemingway's stoic existentialism. Nature is a proving ground for Santiago, and his moral character is not shaped in triumph but in his survival. Unlike Kuber, Santiago toils in a solitary setting. His agony is metaphysical, not socially conditioned. But the pathos of his ordeal is no less vivid, and his defeat is dignified.

2. Narrative Method and Depth

2.1 Ecocritical Realism in Bandopadhyay

Bandopadhyay's narrative style records ecocritical concerns, in which the natural world is not a backdrop but an active, living force. Kuber and his folk's life is intricately linked with the dynamics of the river. Their suffering is not accidental but results from intricate socio-ecological

interactions. According to Hossain, “the pitiable and miserable condition” of boatmen is a reflection of “their dependence on the natural environment for sustenance.”

Padma Nadir Majhi is nearly ethnographic in its realism. It attests to subaltern vulnerability. Bandopadhyay examines the psychology of poverty, questioning how ecological insecurity deforms moral decision-making. Kuber's decision to work on Moynadip's scheme under a morally questionable patron, for instance, is not an evasion but an entrapment—a demonstration of circumscribed agency.

2.2 Hemingway's Iceberg Theory

Hemingway's iconic Iceberg Theory profoundly affects *The Old Man and the Sea*. His writing is bereft of extraneous embellishment, concentrating on tangible events with an undercurrent of inner emotional and symbolic richness. Santiago's interior monologues, his aspirations for lions, and his stoic relationship with the marlin resonate with deep existential concerns, all without spelling out the obvious.

According to BookAnalysis.com, Hemingway's approach to minimalism “invites readers to excavate meaning,” which renders the narrative profoundly engaging. The ocean serves as an ambiguous entity—immense, indifferent, yet vibrant. By employing nuanced indicators, Hemingway creates a symbolic realm in which each fish, wave, and injury represents deeper concepts—resilience, faith, endurance, and futility.

3. Individual vs. Collective Cultural Perspectives

3.1 Social Organisation and Collective Identity in Padma Nadir Majhi

In Padma Nadir Majhi, personal identity is engulfed by the community. Kuber is no hero. He is one of many, a part of a weak nexus of kinship, community, and occupational relations. Survival among the villagers is not heroic individual action but a matter of community and moral adaptation. Bandopadhyay's novel is political in intent, critiquing colonial and caste systems' erosion of human dignity.

The fictional island of Moynadip represents an idealised vision while also concealing authoritarian rule, suggesting that an ecological paradise can become another site of oppression. The shared vulnerability of the community is addressed by collective measures, imperfect as they are. Kuber's choices represent a mix of haste and a sense of communal destiny.

3.2 The Lone Code Hero in Hemingway

Santiago is the “code hero” of Hemingway's model. With a sense of honour, tenacity, and self-sufficiency, Santiago engages in a battle against enormous odds with unyielding courage alone. His moral compass is internal; the pride he has is in the dignity of struggle, and not in its victory.

There is no community. Although Manolin, the young man, represents intergenerational continuity and affection, Santiago's journey is solitary. His heroism is mythic and solitary. As Reddit's scholarly critique weighs in, “Santiago becomes a symbol of stoic endurance, battling with the sublime and the absurd.”

4. Morality, Dignity, and Redemption

4.1 Shared Survival vs. Stoic Transcendence

Bandopadhyay's morality is ambivalent and communal. The villagers' dilemma-to stay in Moynadip or to be poor-makes compromise inevitable. Salvation is not in moral absolutism but in communal determination. The erotic tension between Kuber and Kapila, for example, turns the expected moral dualities on their head. Human fallibility is not blamed but placed within structural contexts.

Kuber's dignity is a dignity of endurance, a dignity of sustaining moral complexity with implicit determination. In contrast to Santiago, whose nobility is unassailable, Kuber's dignity is compromised, stained, but real. His humanity is that of being bound up with others.

4.2 Moral Triumph Beyond Material Loss

Santiago's triumph is paradoxical. Though he loses the marlin to sharks, he returns with skeletal proof of his conquest. His dignity is preserved because he did not yield. His suffering is transfigured into meaning.

Literary critics usually juxtapose Santiago with classical tragic heroes. His defeat is aesthetic, rather than moral. It is a tragic endorsement of Hemingway's existentialist faith in the value of struggle itself-much as in Camus's “Myth of Sisyphus,” where the act of pushing the boulder is attributed with meaning despite the inevitability of failure.

5. Gender Dynamics and Power Models

5.1 Lack of Females in Hemingway

Hemingway's novella features few female characters. In their absence, the uniformly masculine nature of Santiago's tale is confirmed. The sea is handled in a feminised manner (“la mar”), but it is distant, mysterious, and anonymous. The absence of female human beings suggests a world

where male determination is tested by the indifference of nature and where there is little emotional exchange.

5.2 Women as Socially Contextualised Subjects in Bandopadhyay

In contrast, Padma Nadir Majhi has complex female characters like Kapila and Mala. Patriarchy shapes their desires, fears, and agency, but does not silence them. Kapila's marital infidelity with Kuber is handled with tact rather than judgment. Her choices, like Kuber's, are guided by social and ecological determinism. Bandopadhyay allows women to negotiate both moral complexity and emotional depth.

6. Symbolism of Water

Both pieces use water not just as background but as a metaphor. The Padma River is life-giver and destroyer, a symbol of ecological realism and social upheaval. The sea in Hemingway is the sublime, the eternal, the testing. It is redolent of Biblical imagery and classical mythology.

In Padma Nadir Majhi, the river's unpredictability reflects the uncertainty of colonial Bengal. In Hemingway, the ocean's vastness is representative of the metaphysical unknown. Water functions as a mirror of society in Bandopadhyay and of the soul in Hemingway.

Conclusion:

Padma Nadir Majhi and *The Old Man and the Sea* both present man against nature's unyielding power, exploring ideas of struggle, persistence, and dignity. Bandopadhyay emphasises social and ecological determinants that shape collective fate, while Hemingway celebrates individual determination and moral victory. Both books together present how water-river or sea-serves as equally rich a metaphor for the strife of life, offering different angles for the study of human life anywhere.

In Bandopadhyay's realistic fiction, man's profound dependency on his natural world is disclosed in a richly social and historical context. Hemingway, on the other hand, idealises individualism to almost mythic proportions. But both writers reach the same conclusion: that dignity is not in victory but in survival, not in self-confidence but in perseverance. Both heroes, conditioned by different environments, are bound together by the same principle—a silent, relentless struggle against strong outside elements.

References:

- Bandopadhyay, Manik. Padma Nadir Majhi. 1936.
- Hemingway, Ernest. *The Old Man and the Sea*. 1952.

- Hossain, Md. Amir. "Social Picture and Livelihood of the Boatmen in Manik Bandopadhyay's Padma Nadir Majhi: An Ecocritical Study." International Journal of Social Science Studies, vol. 6, no. 6, 2018, DOI:10.11114/ijsss.v6i6.3287.
- Iceberg theory. Wikipedia.
- How does Ernest Hemingway use the iceberg theory principle in his novel, The Old Man and the Sea? Literopedia, 24 May 2023.
- "The Old Man and the Sea Analysis." BookAnalysis.com.
- "Using this elliptical mode of writing." eNotes.com.
- "Minimalist Narrative Techniques: The Iceberg Theory." ResearchGate, Journal of Literature, Linguistics, and Cultural Studies, 2013.
- Hemingway's Santiago as Code Hero in The Old Man and the Sea. Reddit (University Network).

Nazrul's Krishnanagar : Contemporary Socio-Religious Condition and it's Relation with Poverty

Kushal Biswas

Research Scholar, Department of History
Visva Bharati, Santiniketan, India

Abstract: *Nazrul came to Krishnanagar and stayed here for three years. During this time, he was deeply involved in poverty and as a result of backlash of the conservative society, he had to changed his residence within this short period of time. Being deeply involved in poverty, he wrote two special works here in the context of his real life, one is 'Mrityukhudha' and the other is 'Daridra'. In the light of these works, he has shown the conservative character of the contemporary society along with his religious fanaticism. The fact that the poet has not changed his personality even in his days of utter poverty, has kept himself secular, liberal, and mentally strong which is the main topic of our discussion.*

Keywords: *Krishnanagar, Kazi Nazrul, poverty, society, Religion.*

Discussion: Poet Kazi Nazrul Islam was a prominent poet of Bengali literature, he is also known as the rebel poet of Bengal. Kazi Nazrul Islam stayed in Krishnanagar for three years (1926-28). After coming to Krishnanagar, he first stayed in golapti and from where he was involved in literary activities, politics and all kinds of social working. He was there probably for six to eight months. For the remaining two and a half years, he stayed at Grace Cottage in Chad Sadak village. So His Krishnanagar life is divided into two phases; one is the Golapti phase, the other is the Chand Sarak phase.¹ The life of golapti is the poet's busy life, the life of Chand Sarak is the poet's sad and painful life, suffering, neglect, everything was there. And as a reflection of this poverty life, he wrote a novel called 'Mrityukhudha' and a poem called 'Daridra'. This article tries to emphasise the poet's poverty life and his current social outlook in Krishnanagar. Along with that, contemporary social life, in which religious connections are all the main topics of discussion.

Layek Ali Khan has mentioned that Nazrul started living in Krishnanagar from the beginning of 1926 and at this time he was in financial distress, the 'Daridra' poetry was born from the poverty-stricken mentality of this time.² The poet has become the pain of life of the

contemporary lower class people, in this poem the poet shows not the cover of luxury but the shame of poverty gives people the courage and strength to express themselves in the court of the world. Perhaps it is in the realization of the intense burning of poverty that the poet says when people fall into poverty, they deny their hospitality too. “There is nothing more painful than the arrival of a dear guest on a day of deprivation. One can worship the god with only the heart, but one cannot welcome a guest with only the hands, the shame of only the hands cannot be covered with the whole heart.”³

Most of the people in the society of Krishnanagar were the ordinary agricultural community, along with several Brahmin groups. The Brahmins played a leading role as the administrators of the main society. In the late 1920s, Krishnanagar occupied a prominent place in the freedom movement and political practice⁴, but the contemporary social system and religious content were quite complex, conservative and ungenerous. Nazrul’s change of residence can be seen as a prominent identity and conservative mentality of this complex society. Why the poet left the ‘golapti’ and came to ‘Chand Sadak’ is a very simple question, but the answer is not as simple. So, when we try to find it, naturally we have to face special controversy because there is no end of the debate about his leaving residence among Bengali literature and social activists.

Kazi Nazrul was a very liberal philanthropist and a symbol of the harmony of Hindu-Muslim unity. Sometimes he composed Vaishnava Bhapapanna Kirtan, sometimes his devotion was expressed in the composition of Shakta music also. Sometimes he showed his love for Islam by composing Islamic music, Sometimes he poured devotional offerings at the feet of God, sometimes he became a devil and tried to overthrow God in some place. He did not hesitate to welcome the beautiful or to rebuke him. So in the present day, the poet was also prominently associated with the Vaishnava-prone area of Krishnanagar, but although he was associated liberally, the Hindu society especially the Brahmin society, was quite conservative at that time. ‘Nediarpara’s neighborhood was one of the most conservative Brahmin at that time. There was a literary society, The center of whom and in whose house this society was held was a Hindu child widow-Sarojbasini Gupta.⁵ They were associated with the religious practice and its propagation of the city. Although everything was fine until Nazrul joined the society, but when he joined adverse comments and rumors started in the conservative neighborhood.

Whom this Sarojbasini and others did not look at well at all. In addition, Nazrul believed in Hindu-Muslim syncretism, on the basis of that syncretism, as a Muslim, he performed 'Kalipuja' in his golapti's house. In this case, the contemporary conservative society did not see this work in a positive light, because as a muslim performed of 'kalipuja' is not a right thing for Hinduism so they were very keen to attack the poet in various ways. Ajit Das describes it like "According to some, Nazrul performed Kali Puja in the golapti house. The local Muslims were angry with this. So on the advice of Hemant-Kumar Sarkar, Akbaruddin Saheb took the Kazi to Grace Cottage house".⁶

But the question arises as to why the poet chose the Chand Sadak area even though he left his residence! He could have easily gone to any good Muslim village since he faced opposition from Hindus but not from the Muslims! instead going there, why did he take refuge in a remote, secluded corner of Krishnanagar? The answer to this question can be said that even conservative Hindus and respectable educated Muslims did not look upon Nazrul with favor. Therefore, the poet Nazrul did not go there, even though there were many prominent Muslim villages in Krishnanagar, so he took up residence in the extremely poor and neglected Muslim village of Chand Sadak.⁷

The Chand Sadak area was known as a secluded village in one end of Krishnanagar in contemporary times. This village was full of ordinary hard-working laborers, the extremely poor, Christians and Muslims. Where the very lowest to the lowest of the society lived. The poet himself, being a member of this poor life, was so impressed by the common things that he highlighted them through the novel "Mrityukhudha". The main characters of the novel, their conversations and their pains are all related to the poet's real life. He has just changed their names in the novel. Therefore, the novel is a historical document of the contemporary society. In the description of the daily life of the poor, it is very easy to understand that death due to poverty is a common occurrence in this region because the extent to which the poverty is experienced can make a mother demand the death of her child, whereas death is one of the ways to get rid of poverty. The poet gave that description like. "Her mother then shouted and said, 'God, I can't see anymore, take the child to you. Let him die and live.'"⁸

In the light of the novel, the poet also gave a special introduction to how religion is related to the moral daily life of people. Even though

people are very poor, they are aware of their religion. This is a reflection of the idea that life should go on but caste, religion should not. For example, at the beginning of the novel, a Christian girl touches the pitcher of a Muslim girl while going to get water and that is where the heated argument begins. The two castes may have been the same once. Some have become Muslims and some Christians, and they hate them today because they were once one caste.⁹

Again, while analyzing the situation of poverty of the current society, another thing comes to mind, that one of the ways for the common people to get rid of the burning pain of poverty is conversion. Where poor Muslims are taking initiation into Christianity just to maintain their existence, livings. But in this case, even after conversion, they are not getting real liberation at all. If you understand the character of the novel, you will realise that “Mejo bou”, as a prominent character, converts to Islam to get rid of the conservative views of society and the abject poverty. The poet describes her in this way: “There was a huge commotion on the chandsadak that day. Mejo bou and her children became Christians. She really became a Christian, but she also has a little history. Mejo Bou had been learning a little sewing and writing from the Christian missionary Miss Jones for some time. The missionaries, perhaps, helped poor Muslims and Hindus with their illnesses by giving them medicines and in this way they were able to convert many to their religion. But in the case of Mejo Bou, the bad reputation and contempt of the neighborhood forced to convert her to a new religion.”¹⁰

But the conversions was not as easy as anyone can think because the current social system does not accept religious conversions liberally at all. Muslims, especially “mollas”, had introduced special rules and regulations so that no one could be initiated into the new religion, so when Mejobou went to the church for the first time before being initiated, she remembered “Her mind was only stirred by a strong pain. Her mind seemed to only start to tell her that she was sinning - committing a very great wrong, there is no forgiveness for it, the consequences are very terrible for her for eternity...”¹¹ Moreover, it is surprising to think that the well-informed people of contemporary society do not feel the slightest sense of constraint in taking advantage of the opportunity for the poorest of the poor. Again, when “Mejobou” wanted to return to her own religion, that is, Islam, how did the mullahs of the society take advantage of her.¹²

The poet has shown respect for all religions and the morality of all people. The poet was far above the consciousness of the contemporary era. Therefore, that consciousness should never be minimized. In the novel, he himself is depicted as Ansar and his mind is always disturbed by the description of the poor and dying people. The hunger of people in death or in the form of death has taken a place in his consciousness when he himself realized it – “I have seen the daily events of the misery of those unfortunate people, so the food in my mouth has become so bitter that when I eat a handful of rice mixed with lentils, it gets stuck in my throat and throat. It seems that like those stars in the sky, millions of hungry men and women are looking at my one mouthful of rice!”¹³

India has always been a country of religious diversity, multilingual and many people have lived here together, so Nazrul is a renowned poet of the Bengali culture that was born in this country by combining Muslim and Hindu culture. Immense respect and love for Muslim and Hindu culture is one of the melodies of his poetry. That is why he preferred the praise of white religious scholars. Nazrul was sad because the Muslim community misunderstood him, the old fundamentalists gave him a fatwa calling him an infidel and the time was the year after the poisonous Hindu-Muslim riots of 1926,¹⁴ when he was in Krishnanagar. When he tried his best, the mentality of the conservative society did not change, so it is sad to remember that Nazrul was the first unsuccessful worker among Bengali Muslims. He who wanted the overall progress of the Muslim society of this country, along with the removal of racial differences, ending the deep distance between Hindus and Muslims, and bringing everyone together in the same circle, as a result, the Muslim society did not accept him and the Hindus could not accept him. This is Nazrul's misfortune.

Conclusion:

Thus, from this article I have tried to emphasise that a special picture of the conservative social system and poverty of contemporary Krishnanagar city. The article in question has given a sufficient explanation of how conservative the social system is, when a person has to leave his home. Along with that, the extent of the connection between religion and the poor in society, how religious consciousness is determined there, even in the midst of extreme poverty, how vigilant they are about religion even though people cannot eat two meals a day. In this case, the poet Kazi Nazrul Islam has truly shown a great humanity through his liberal



outlook, which the contemporary society has never understood. But if we do not make that mistake, if we forget the differences of religion, race, and see people as human beings, and try to alleviate the suffering of the poorest people, then perhaps there will be a greater equality of human consciousness in society, without the distinction of high, low, Hindu, Muslim etc. which is very important for the all kind of human being.

Works Cited:

1. Das, Ajit. *Kaji Nazrul Islam: Ek Oggat Parba*. Kolkata: Pustak Bipani, 1959.
2. Khan, Layek Ali. *Nazrul Pratibha*. Kolkata: Nabajatak Prakashan, 1960.
3. Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
4. Nadia Jela Sangramer Itihas Rachana Samiti. *Swadhinata Sangrame Nadia*. Krishnagar: Nadia Jela Sangramer Itihas Rachana Samiti, 1973.
5. Das, Ajit. *Kaji Nazrul Islam: Ek Oggat Parba*. Kolkata: Pustak Bipani, 1959.
6. Das, Ajit. *Kaji Nazrul Islam: Ek Oggat Parba*. Kolkata: Pustak Bipani, 1959.
7. Das, Ajit. *Kaji Nazrul Islam: Ek Oggat Parba*. Kolkata: Pustak Bipani, 1959.
8. Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
9. Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
10. Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
11. Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
12. Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
13. Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
14. Khan, Layek Ali. *Nazrul Pratibha*. Kolkata: Nabajatak Prakashan, 1960.

Bibliography:

- Ahmed, Muzaffar. *Kazi Nazrul Islam Smriti Katha*. 4th ed. Kolkata: National Book Agency Private Ltd., 1975.

- Chattopadhyay, Prantosh. *Kaji Nazrul Islam*. Kolkata: Deb and Co., 1955.
- Choudhury, Kamal. *Nadiar Itihas Pratham Parba*. Kolkata: Dej Publishing, 2015.
- Das, Ajit. *Kaji Nazrul Islam: Ek Oggat Parba*. Kolkata: Pustak Bipani, 1959.
- Dey, Biswanath. *Nazrul Smriti*. Kolkata: Sahityam, 1367 Bengali Year.
- Gupta, Dr. M. Sushil Kumar. *Nazrul Charitmanas*. Kolkata: Bharati Library, 1367 Bengali Year.
- Khan, Layek Ali. *Nazrul Pratibha*. Kolkata: Nabajatak Prakashan, 1960.
- Paschimbanga Bangla Academy. *Kazi Nazrul Islam Rachana Samagra*. Vol. 3. Kolkata: Paschimbanga Bangla Academy, 2002.
- Sarkar, Suwendu De. *Nadiar Kotha*. Kolkata: Pandulipi, 2015.
- Nadia Jela Sangramer Itihas Rachana Samiti. *Swadhinata Sangrame Nadia*. Krishnagar: Nadia Jela Sangramer Itihas Rachana Samiti, 1973.

Strategic Convergence in Asia : India-Japan Relations amidst China's Rise

Surajit Majumdar

Asst. Prof., Dept. of Political Science

Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip

Abstract: *India and Japan share a long history rooted in cultural exchanges, especially through Buddhism. In recent decades, however, their relationship has moved beyond tradition and taken on significant geopolitical importance. With China's increasing assertiveness disrupting the balance of power in Asia, India under Prime Minister Narendra Modi has deepened its strategic cooperation with Japan. Between 2015 and 2021, both countries signed several notable agreements in areas like defense technology, nuclear energy, and infrastructure. These include deals on defense equipment transfers and peaceful use of atomic energy, which have strengthened their security partnership in the Indo-Pacific. Initiatives like the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and high-speed rail projects further highlight Japan's role in India's economic growth. This paper examines how India-Japan relations have evolved under Modi, especially in relation to China's rise, and evaluates their wider impact on Asia's regional balance of power.*

Key-words: *India-Japan strategic cooperation, Modi's foreign policy and Act East approach, China's growing influence in Asia, Indo-Pacific balance of power, defense and technology collaboration, Quad partnership and maritime security, economic and infrastructural connectivity, regional security and China-India rivalry.*

Introduction: The India-Japan relationship has long been shaped by shared cultural and historical bonds, particularly through the influence of Buddhism. Yet in recent decades, this association has acquired a distinctly strategic character. The shifting power equations in Asia largely a result of China's growing assertiveness—have pushed both India and Japan to strengthen their bilateral partnership. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India has sought to expand its engagement with Japan in areas such as defense technology, nuclear cooperation, infrastructure development, and maritime security. Projects like the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and the Mumbai-Ahmedabad High-

Speed Rail stand as visible symbols of this cooperation. At the same time, the two countries' collaboration within the Quad framework reflects their shared vision for a free, open, and inclusive Indo-Pacific. Japan's sustained economic support and India's increasing geopolitical weight have made their convergence crucial for maintaining regional balance. Taken together, the growing synergy between India and Japan underlines a mutual effort to promote stability, connectivity, and a rule-based order in Asia's evolving strategic landscape.

।।One।।

India-Japan Relations: Aim to Maintain the Balance of Regional Power

India-Japan relations are not as significant in Asian politics as China-India relations, although not as important. When India became independent in 1947, Japan was a nuclear-ravaged country. History tells us that since 1945, Japanese generals and political leaders have been labeled as war criminals by the International Court of Justice and sentenced to death. For example, on December 7, 1945, the anniversary of the attack on Pearl Harbor, General Yamashita was sentenced to death. General Tojo, who was the real brain of the Japanese military campaign - whose trial was of great interest to the whole world, when Tojo and his followers were hanged in 1948, Tojo wrote a farewell poem. Vivekananda Mukherjee mentioned that poem in his history of the Second World War:

'It is good bye

Over the mountains I go to-day

To the bosom of Buddh/So happy am I'¹

Such a statement of General Tojo, standing in the face of death during his farewell, undoubtedly marks him as a strong patron of Japanese tradition. Looking back, it can be seen that there was a remarkable cultural exchange between India and Japan through this Buddhist culture. In this regard, it is worth mentioning that the judge in the International Court of Justice was an Indian Dr. Radhabinod Pal. He raised three special questions in his trial. They are respectively:

First, was military, political and economic domination by one nation over another considered a crime in the international community?

Second, were these wars described in the indictment criminal under international law at the time they were fought? If not, can those wars be criminalized by subsequent legislation?



Third, can any person of a state described as an aggressor be criminalized for the performance of official and state duties and responsibilities?

Then Dr. Pal, in his verdict, sided with the Japanese and said that:

‘Like the Kaiser of Germany in the First World War, the Allies in the Pacific War committed heinous crimes against humanity by dropping atomic bombs on Japan in the name of reducing the war quickly and by killing innocent civilians, men, women, children and the elderly, indiscriminately. The victorious side has practically formed all these international courts to achieve its political objectives and has disguised those courts as law and justice. But the victorious side can never give justice to the vanquished. Because, if the courts are rooted in politics, then no matter how much justice is disguised, then justice becomes only a matter of fulfilling the interests of the powerful side.’²

Therefore, it can be said that a relationship between India and Japan was formed at that time according to Dr. Radhabinod Pal. And since that time, Japan, which was still suffering from the wounds of Hiroshima and Nagasaki, was a staunch advocate of disarmament. At that time, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru had strongly advocated for peace. Following the tradition of diplomatic history, he had previously sent an elephant as a gift to the Tokyo Zoo as a symbol of peace and friendship, naming it ‘Indira’. Nehru had provided iron ore so that Japan’s steel industry, which had been devastated by World War II, could recover. Despite the ups and downs of the relationship, Japan has never forgotten this history. That is why Japan stood by India during the severe financial crisis in 1991. Indian Prime Minister Manmohan Singh reminded us of this in his speech to the Japanese Diet during his visit to Japan in December 2006.

The revolutionary transition in Japan-India relations took place in the early 21st century. China created the background for this. As China has become more powerful in Southeast Asia, India and Japan have thought about increasing their mutual understanding. This has the potential to increase the relevance of both countries to China. How important India is to Japan now is understood from the fact that Japan did not publicly praise the India-US nuclear agreement, keeping in mind the feelings of the general Japanese people about nuclear power rather than Japan’s nuclear policy, but Japanese Prime Minister Shinzo Abe has

silently supported the agreement. However, Japan has openly opposed the China-Pakistan agreement and condemned North Korea's nuclear tests. In the case of India, Shinzo Abe's propaganda advisor Kiro Seiji Seko has said that only the international nuclear safeguards should be accepted.

Another notable aspect of India-Japan relations is their economic understanding. Indian Commerce Minister Kamal Nath has already signed a memorandum of understanding with Japanese Commerce Minister Akira Amari to build the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. Indian Prime Minister Manmohan Singh has also talked about increasing economic and trade relations with Japan. In fact, India wants to open its doors to them, to cope with the pressure from China, India is trying to improve trade relations with Japan. If one reason for this is to maintain its weight with China, then the other reason is to maintain the balance of regional relations.

However, when the Congress rule ended in India, when Narendra Modi became the Prime Minister of India. Naturally, such a foundation of foreign policy was created with India's closest and larger neighbors, China and Japan, that it can be said that it has created a political novelty in today's India. Basically, Narendra Modi realized this in his foreign policy, that China's geopolitics and their extremely aggressive attitude, their attempts to enter the borders of India under any pretext and their attempts to annex several regions of India like Arunachal etc.

।।Two।।

Modi 3.0's Foreign Policy: Objectives and its Effectiveness

The foreign policy pursued by Prime Minister Narendra Modi's government has been a remarkable success. This has been possible to a large extent due to the rapid growth registered by the Indian economy during this period. From being one of the 'fragile five' and the 11th largest economy in the world, India is today the fifth largest economy, on track to become the third largest in the next few years. It is the fastest growing major economy in the world with a GDP growth of 8.2% in the last fiscal. Its contribution to global growth has increased significantly and it has emerged as a ray of hope in an otherwise gloomy outlook for the global economy. Its increased GDP has significantly expanded India's capacity to play a more significant and active role in global affairs. In this context, The Sunday Gurdian writes:

‘India’s relations with the United States, West Asia (especially the United Arab Emirates), Japan, Australia, Europe, Southeast Asia and other countries/regions have grown significantly in the last decade...With the reappointment of Dr. S. Jaishankar as the Minister of External Affairs, Prime Minister Modi has clearly declared that India’s strong and principled foreign policy will continue in his third term in office in the next five years...India’s foreign policy will be guided by the maxims of ‘Bharat Pratham’ and ‘Vasudhaiva Kutumbkam’ (the world is one family). This is a subtle assertion that while India will work steadily to promote India’s interests in the political, security, economic, technological and cultural spheres, it will also be equally conscious of its global responsibilities, especially in protecting and promoting the interests and concerns of the Global South. Dr. Jaishankar has clearly stated that India is committed to advancing its role as a ‘world friend’ by maintaining mutually beneficial and cordial relations with the world.’³

This foreign policy concept of India is applicable to present-day India, Japan, and China. This foreign policy concept of India is applicable to the current Indo-Japan and China. However, Prime Minister Modi’s invitation to the leaders of seven neighbouring and Indian Ocean countries to the swearing-in ceremony of his cabinet sent a strong message that India remains committed to its ‘Neighbourhood First’ policy, which he announced at the start of his first term in 2014. This policy has paid huge dividends in the last ten years, despite China’s growing assertiveness and aggression in India’s neighbourhood during this period. Challenges remain but India seems set to maintain and expand relations with most of its neighbours. Leaders of Bangladesh, Bhutan, Nepal and Sri Lanka (also Mauritius) were invited to the swearing-in ceremony in 2014 as well as in 2019.

This has sent a clear message that India, as a much larger and more powerful country, is willing to be generous and open in dealing with its smaller neighbours. Going forward, India will have to keep a close eye on the policies pursued by the Maldives. Despite the friendly attitude displayed so far by Muiju and his government, India has not allowed this to colour their responses and has continued to extend all kinds of financial and economic assistance.

However, a carrot and stick approach may be necessary if Muiju and his establishment do not change course and are aware of India's security concerns and core sensitivities. Prime Minister Modi invited the leaders of Seychelles and Mauritius in view of our growing interest in maintaining peace, security and stability in the Indo-Pacific region, particularly in the Indian Ocean. China's growing presence in the Indian Ocean in particular is indicated by the increasing movement of Chinese ships in the region and its permanent presence in several ports such as Djibouti, Gwadar, Hambantota, Kyaukpyu (Myanmar) and perhaps the Maldives. Mauritius was a regular invitee to all previous events in the coming years due to the presence of a large Indian diaspora in Mauritius and the close historical, civilizational and people-to-people links between the two countries.

Therefore, China's aggression in the Pacific region and the Indian Ocean has made India very aware of the current world relations. And Narendra Modi has gradually come closer to Japan to stop this aggressive mentality of China in the Asian continent. Moreover, India's relations with Japan have been celebrated with considerable trust in culture and defense, trade and several other areas. In that case, several agreements in the field of India-Japan relations during Narendra Modi's tenure have given momentum to their mutual relations. In this context, several agreements organized between India and Japan during Narendra Modi's tenure can be mentioned below:

- Agreement on Transfer of Defence Equipment and Technology (2015)
- Agreement on the Protection of Classified Military Information (2015)
- Social Security Agreement (2016)
- Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy (2017)
- Agreement on Mutual Provision of Supplies and Services between the Self-Defense Forces of Japan and the Armed Forces of India (2021).

Therefore, it can be said that the above agreements are an extraordinary implementation of Narendra Modi's foreign policy under 3.0 - there is no objection to this. Moreover, it cannot be denied that the above agreements and the efforts to implement them have created a new form of relations between India and China. In this context, Manish Jung

Pulami wrote in a research article in a journal about the recent relations between India and China:

‘China and India, or the relationship between the two, are the pivot of global international politics and economy. The relationship between the two countries is and shall be the determinative factor of not only Asian politics but also international politics, along with security dynamics, global governance, and even global prosperity...The China-India relationship portrays patterns of both cooperation and conflicts. The changing political dynamics of both countries and simultaneously the continuities and changes in their foreign policies have determined the circumstances and outcomes of the situation. Moreover, the economic and political aspirations of both Asian giants have fuelled the competition and collaboration between the two. The third parties or countries play an essential role in the relationship between China and India and the future of continental and maritime geopolitics. The USA, Russia, Japan, and Pakistan play significant roles in the China-India bilateral relationship as well as the states in Europe, Africa, Latin America, the Middle East, South-east Asia and, most importantly, South Asia have an essential part.’⁴

||Three||

Implementation of India-Japan Agreements and India-China Relations

To counter China’s aggressive attitude, the Quad Alliance or Quadrilateral Security Ring was formed by these four countries - America, India, Japan and Australia. In that case, a challenge has also arisen in implementing the agreements made with India and Japan. In this context, it is worth noting that if we compare India’s trade with China, it can be seen that in the agreements that India has with Japan, China is much ahead in terms of trade with India compared to Japan. For example, it can be said that in 2017, the bilateral trade between China and India was \$ 84.44 billion. In that case, the amount of India-Japan trade was only \$ 15.71 billion. However, China has an eternal dispute with Japan. In that case, not China, but Japan has gradually tried to stand by India and maintain their opposition to China, in addition to their non-alignment agreement with India. It is worth mentioning that when Prime Minister Narendra Modi visited Japan in 2000, Japan and India committed to a global partnership. As a result, the areas of economic cooperation in which India

and Japan were bound by their mutual relations and cooperation were mentioned in the following formula:

- In India's economic transformation, Japan is regarded as a crucial partner.
- Recently, the relationship between India and Japan has evolved into a stronger alliance with a clear purpose.
- India's large and expanding market and resources, particularly its human resources, are among the many factors contributing to Japan's growing interest in India.
- In the fiscal year 2018-19, Japan and India's bilateral trade totalled 17.63 billion USD.
- The most extensive of all the agreements India has signed with Japan is the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), which entered into effect in August 2011.
- Japanese FDI has primarily gone into India's automotive, electrical equipment, telecommunications, chemical, and pharmaceutical industries. For example, Suzuki.
- Japanese companies founded around 10 Japan-India Institutes of Manufacturing (JIM) in India.
- The central banks of the two nations can now exchange local currencies for up to \$75 billion thanks to a bilateral swap agreement.
- After Singapore and Mauritius, Japan is the third-largest source of FDI (\$28.160 billion between 2000 and June 2018) investment into India.
- It is anticipated that the 320 billion yen investment by 57 Japanese companies in India will create at least 3,000 new jobs.
- Japan has invested \$90 billion in the Delhi-Mumbai Industrial Corridor.
- Collaboration in the High-Speed Railway between Mumbai and Ahmedabad (MAHSR). The ambitious project is being carried out with nearly 90% Japanese financial and technological support.
- The India-Japan Digital Partnership (I-JDP) was established in October 2018 to advance both current areas of cooperation and new initiatives within the context of cooperation in Science & Technology, with a particular emphasis on 'Digital ICT Technologies'.

However, if we look at the relationship that India has with China, it can be seen that the deterioration of India-China relations began in 1998. This problem arose mainly in the context of India's nuclear bomb explosion in May of that year. Regarding the appropriateness of this nuclear bomb explosion, the then Indian Defense Minister George Fernandes said that India had to explode a nuclear bomb to confront China's nuclear weapons arsenal. He considered China as India's number one threat. China widely condemned this nuclear bomb explosion in India on the international stage. During the Kargil War of 1999, China supported Pakistan. However, it also advised Pakistan to withdraw its troops. And at the beginning of the new century, Professor Pranab Kumar Dalal wrote about China-India relations:

'In 2000, Indian President K. R. Narayanan visited China. This led to the re-establishment of diplomatic relations between India and the People's Republic of China. In 2002, China's Zhu Rongji visited India and emphasized economic issues. In 2003, India-China relations improved. In June of that year, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee visited China. China officially recognized India's sovereignty over Sikkim. China and India took steps to resolve the border dispute.'⁵

In 2004, China-India relations improved further. Both countries proposed to open the Nathu La and Jelepale passes in Sikkim. It was said that this would be mutually beneficial for both countries. 2004 was a significant year for China-India bilateral trade. This was the first year that China-India bilateral trade exceeded \$1 trillion. In April 2005, Chinese Premier Wen Jiabao visited Bengaluru. His aim was to increase India-China cooperation in high-tech industries. He said that if China and India cooperated with each other, they could jointly occupy a leading position in the world. He also said that the 21st century is the century of Asian countries in the information technology industry. While in India, he supported India's bid for permanent membership in the United Nations Security Council, but after returning to China, he took a neutral view on the issue. China was granted observer status at the 2005 SAARC summit. Other countries in the region were in favor of granting China permanent membership in SAARC, but India could not agree on this.

An important aspect of the evolution of Sino-Indian relations is that both countries feel the need for energy to expand their industries and to fulfill this, both have invested money in overseas oil fields. In this

regard, there is competition between the two countries as well as joint cooperation.

||Four||

Recent South Asian Power Politics: The Role of China-India And Other Neighbors

As India's importance to its neighbors in South Asia grew, China could not tolerate it. In that case, India had a border dispute with them. But Narendra Modi's 3.0 foreign policy has taken a somewhat active role in stopping China's aggression. In this context, an article in 'Prothom Alo', a newspaper in neighboring Bangladesh, has written:

'On the one hand, the US, Israel and the West are playing a role in South Asian politics as a strategic ally. On the other hand, China is doing politics by forming alliances with Russia in various economic alliances. India was simultaneously protecting both the West and the East. That is why the international community remained silent even though India took several controversial decisions including the repeal of the NRC and Kashmir laws. But India has been shocked by the reckless behavior of China and Nepal. There have been tensions on the border between China and India at various times. But just because Nepal will publish a map of the land occupied by India as its own! Indians will lose their lives at the hands of Nepali guards on the border! Nepal has recently stopped the construction of a dam on the Bihar border. Why only India, no one could have imagined that there could be any pressure from Nepal on the border. India has not faced so much pressure in recent times. On the one hand, the conflict and crisis on the China-Nepal border with its eternal enemy Pakistan is quite uncomfortable for India.'⁶

Such reports in any newspaper of India's neighboring Bangladesh undoubtedly make their anti-India stance clear. But it cannot be denied that whatever the relationship of Bangladesh with the neighboring countries of India and China, Bangladesh, like Pakistan, is playing its role in making China more aggressive towards India. And China is increasing its influence one after another in countries like Nepal and Sri Lanka as a result of its economic aggression. In this regard, China, the only rival of India's power, is maintaining its naval forces in the Pacific and Indian Oceans day after day.

In this regard, India and its neighbours in the Indian subcontinent have a specific foreign policy towards China. The gist of it is that China and India are engaged in a complex rivalry that involves a competition for territory as well as prestige in Asia. India's foreign policy towards China has gone through four phases - from independence to the flight of the Dalai Lama to India in 1959, when Nehru dominated the country's foreign policy making; from 1959 to the Sino-Indian War of 1962, when Nehru also had to succumb to domestic political pressures; from 1962 to Rajiv Gandhi's visit to Beijing in 1988, when systemic factors influenced India's approach; and from 1988 to the present, when a combination of systemic and domestic factors are shaping India's China policy. India is currently pursuing a hedging strategy towards China by expanding relations with countries wary of China's rise, particularly the United States and Japan. However, India would prefer to confront China as an 'independent' great power by rapidly building its own economic and military strength.

However, as China's aggressive policy has intensified, India and Japan have come closer to each other in the politics of the Asian continent. In this context, there is no doubt about Narendra Modi's 3.0 foreign policy. Just as India and Japan have come closer, there is no doubt that Narendra Modi's foreign policy has been very effective in containing China at the international level. In this context, the Economic Times has raised many arguments in favor and against Narendra Modi's 3.0 foreign policy to indicate its relevance and success. Although the issue is controversial, this policy of Narendra Modi has become quite important in the power structure and status of South Asia.

Not only that; India is increasingly integrating with its neighbouring countries and regions. Bilateral partnerships with Australia, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Indonesia, Japan, Kenya, Korea, Mauritius, Oman, Tanzania, Singapore, Sri Lanka, etc. will increase during PM Modi's third term. India can opt for more bilateral strategic partnerships and services-led FTAs such as with the Philippines. India continues to play a larger role in the global arena. While 'Friend of the World', rightly coined by one of the greatest External Affairs Ministers of our time, S Jaishankar, Viksit Bharti aims to deepen global partnerships in the next 25 years, helping to achieve a US\$ 5 trillion economy by the current decade, which will further strengthen the foundation for 2047. In these uncertain times, India's leadership on global issues is welcomed by all stakeholders.

However, specific issues like climate change, reform of multilateral institutions, energy and food security, inflation control, etc. need to be handled carefully. In dealing with the Global South, India has been promoting the interests of developing countries through BRICS or IBSA. This has seen some progress during the two terms of Prime Minister Modi. If India secures entry into the UN Security Council as a permanent member, it will be a great achievement. In this context, Prabir Dey writes about the closeness of India-Japan relations and the success of Modi's foreign policy 3.0 policy:

'The Indian Ministry of External Affairs must collaborate with India's burgeoning private sector while ensuring India's strategic and economic goals. There is potential for more public-private partnerships in the coming days in areas such as physical and digital connectivity, space and undersea exploration, science and technology cooperation, etc. This is an opportunity that Prime Minister Modi should not miss in his third term.'⁷

Conclusion:

In conclusion, the study shows that India-Japan relations have gradually transformed from cultural familiarity to a strategic partnership shaped by present-day geopolitical realities. The rise of China has clearly encouraged both countries to expand cooperation in defense, technology, connectivity, and maritime security. Under Modi's foreign policy, this partnership has gained stronger direction through initiatives such as the Quad and major infrastructure and digital projects. Ultimately, the relationship reflects a shared effort to maintain regional balance and support a stable, rules-based Indo-Pacific order.

References:

1. Mukherjee, Vivekananda. (2012). *History of World War II*, Part II, Nabpatra Publications, p. 599.
2. Pal, Radha Binod. (1953). *International Military Tribunal for the Far East-Justice*, Sanyal & Co. Calcutta, p. 700.
3. Sajjanhar, Ashok. (June 30, 2024). *India's foreign policy in Modi 3.0*, Sunday Gurdian, p. 25.
4. Pulami, Manish Jung. (14 Nov 2022). *China-India contemporary relations: Geopolitical challenges to the small states in South Asia*, Stosunki Międzynarodowe – International Relations (SM-IR), p. 15.

5. Dalal, Pranab Kumar. (2020). *International Relations: Theory and the Contemporary World*, Kolkata Book Syndicate Private Limited, p. 222.
6. Mallick, Maruf. (23 June 2020). *Why India is in the grip of China's aggressive policies*, Prothom Alo, p. 12.
7. Dey, Prabir. (Jun 08, 2024). *India's foreign policy priorities under Modi 3.0*, The Economic Times, p. 5.

Bengal Famine of 1943 : Starvation, Food Problem, and the Provincial Politics

Partha Pramanik

Research Scholar, Dept. of History
University of Calcutta

Abstract: *The Great Bengal Famine of 1943, also known as Panchsher Manwantar, was one of the great disasters that killed millions of people during the time of the Second World War. This article deals with the role of provincial politics in addressing the famine of 1943. This man-made havoc was closely associated with political developments at the provincial level. Hunger and destitution became an important element of political actions during the hour of crisis. Conflicts of political interests over the urgent needs of the hungry destitute were quite evident during the time of famine. This study tries to locate such political activities that acted as an obstruction to the famine work and turned the famine into a political crisis where political strategies and the blame game overshadowed the cry of the starving millions.*

Keywords: *Politics, Famine, Hunger, Food, Rationing, Blackmarket.*

Main Discussion: Pre-colonial India was not unaware of famines and food problems. Several incidents of famine took place both during the ancient and medieval periods. After the establishment of British rule in India, the English made several changes to the existing system of economic, socio-political, and cultural life of the country. Such changes to the existing system of the pre-colonial framework brought new traits to the famine condition. Colonial famines became more in the nature of 'Boom famine'ⁱ rather than 'Slump famine', where the role of humans in creating famine conditions became more important compared to the pre-colonial famines, in which natural disasters played the most pivotal role. The Bengal Famine of 1943 was one of such 'Boom famine', which was considered as one of the most devastating famines of British India. The famine took place during the time of the Second World War. The outbreak of famine and epidemic that followed claimed the lives of 3.5 million peopleⁱⁱ in Bengal. Millions of emaciated people started to migrate from their respective villages to cities and towns just for the expectation of a fistful

of rice. Starvation and destitution turned them into mere skeletons of skin and bone, and they started to die on the streets of Calcutta and other towns due to extreme hunger.

There were several reasons behind the occurrence of this catastrophic incident. The primary ground was prepared by the outbreak of cyclone and flood in the southern districts of Bengal, which included the districts of Midnapore and 24 Parganas. According to the report of the Famine Inquiry Commission under Sir John Woodhead, the cyclone swept away the lives of almost 14,500 people and 190,000 cattle.ⁱⁱⁱ Although the actual reasons were deeply rooted in the politics and policies made in favor of the different interest groups of British India. Apart from British oppressive policies, the conflicts amongst the regional political parties also played a pivotal role in the Bengal Famine of 1943, which is the main area of discussion of this article.

The tensions developed between the Governor, Sir John Herbert, and the Progressive Coalition Ministry led by Fazlul Huq were the beginning of such confrontations at the local level. The League Ministry under the Muslim League also engaged in direct conflicts with the opposition parties, including Krishak Praja Party, Hindu Mahasabha, and Congress. The Communist Party of India and the Forward Bloc also participated in this tussle of political interests over the famine crisis. The series of political conflicts also caused undue delay in implementing famine relief and rehabilitation. During the time of famine, an efficient food distribution system was expected to ameliorate the effects. The situation demanded a well-maintained coordination between the provinces and the centre. But the political complexities within the province during the time of war and famine on various issues aggravated the destitution of famine victims. The declaration of necessary ordinance, implementation of anti-famine schemes, and necessary measures to control issues like inflation and high prices of essential commodities got delayed. By taking advantage of such political bickering, the blackmarketeers started to take control over the trade of rice, cloth, kerosene, sugar, salt, etc, resulting in extreme scarcity of these articles. As Bhowani Sen claimed, during the time of famine, the Congress, the League, and the Mahasabha were engaged in a fratricidal bickering.^{iv}

The League Ministry was not even ready to reveal the extent of food scarcity in front of the world at large. On the 8th May 1943, Mr. H. S. Suhrawardy, the Food Minister, stated, “There was a sufficiency of food

grains for the people of Bengal.” Historian Cormac O. Grada argued that, by receiving encouragement from the authority of Delhi and London, in May 1943, H. S. Suhrawardy even dared to ask the newspaper editors to preach the ‘doctrine of sufficiency’. He also claimed that some of the media houses campaigned against the hoarders, actually ‘buttressed by an official determination to prove ‘statistically’ that Bengal contained enough food’.^v From the very beginning, the League ministry tried to prove that there was enough food in Bengal, but because of the hoarders and profiteers, the process of distribution of food was hampered. On the other side, the then Chief Minister of Bengal, Sir Nazimuddin, said in Delhi on the 15th October, 1943, “At the moment we took office, the cupboard was literally bare.”^{vi} On 14th November 1943, Mr. M. A. Jinnah said that the conflagration had already started before the League Ministers got in.^{vii} According to Mr. Suhrawardy, his statement was to avoid panic in the public mind. But because of his comments, a wrong impression of Bengal’s plight was generated throughout India, as stated by Sardar Baldeb Singh, the then Food and Development Minister, Punjab. According to him, such a late declaration of famine delayed the arrival of charity and deprived Bengal from getting assistance from the Government of India and from the rest of the world. Sardar Baldeb Singh said that it should be no surprise if the people began to harbor grave doubts about the manner in which the situation was still being handled there by the provincial authorities.^{viii} For achieving their own minor political interests, the League Ministry sacrificed the interests of their distressed fellow brothers of Bengal and failed to comprehend the devastating situation properly.

On the other hand, Sekhar Bandopadhyay showed how the *Namasudras* of eastern Bengal suffered during the time of famine and how their leader continued to offer their full support to the European and Muslim League and defended the government in the Assembly, which grossly neglected their duties during the time of famine. He mentioned that Mukanda Behari Mullick stated in the Bengal Assembly on 14 July 1943 that “there was no need to worry about the recent hikes in the prices of food stuff” and supported the illegal appointment of M. M. Isphani as the sole procuring agent of food grains of the government.^{ix} Even in 1943, the Communists tried to highlight the food crisis by mobilizing the peasants; most of the scheduled caste leaders deliberately chose to neglect these activities of the CPI.^x All the local political parties

and the imperial government itself were much more interested in a blame game rather than addressing the crisis.

The political parties had different ideas over the issue of rationing. While the Congress and the Communists wanted the authorities to implement rationing widely, the Hindu Mahasabha opposed the step. Senior officials alleged that the Hindu traders opposed the rationing system in 1943.^{xi} Nirmal Chandra Chatterjee, leader of the Hindu Mahasabha, took up the cause of Hindu traders and denounced the rationing system. He charged the Bengal Government for reducing the percentage of private retail shops from 55 per cent to only 22 per cent.^{xii} Shyama Prasad Mookerjee also supported this view and argued that rationing had deprived the people of food.^{xiii} Also, in many cases, the official distribution of food aid for the 'non-priority' section of the people got hampered due to the political and communal squabbles regarding the selection of government-controlled ration shops, which ultimately hampered the whole process of relief.^{xiv} Richard Tottenham, Secretary of the Government of India, stated that political leaders failed to unite the people during this hour of crisis and became puppets in the hands of their own section of hoarders, and began a fratricidal war to bring each other down.^{xv} P. C. Joshi, in his article, talked about the 'Animal Theory of Revolution'. Chiding some Congress leaders, he observed that, "Our opponents saw in the food crisis another opportunity for the 'revolution' of their imagination".^{xvi} Jai Prakash Narain, in his second letter to 'Fighters for Freedom', referred to charity and said, "But charity is not enough. It will not solve the problem.....Let the hungry create a situation in which normal British administration becomes impossible. Let us tell them, not only tell but help them to do it to seize food where they can get it." In another instance, Ram Monohar Lohia, another Congress socialist, in his pamphlet, 'Rebels Must advance', wrote that there was no hoarding and profiteering, and the demand for price control and rationing was an anti-national demand. They had a strong perception that revolution would come through Indian hunger. A meeting was held in Calcutta University in June 1943, attended by all major political parties, over the issue of implementing rationing and forming relief committees to meet the emergency situation. In any case, the provincial government implemented rationing in Calcutta in November 1943. However, none of the mainstream political parties wanted to work with other political parties on humanitarian grounds for the sake of dying people. Political

parties were much more interested in getting mileage by utilizing the anger of the emaciated and ill-fated hungry people of the village interiors. There were many instances where Congress workers obstructed relief activities organized by the Communists and spread rumors against them. The Congress workers did not participate in the relief work with full vigor. Manikuntala Sen observed in her autobiography that “We hardly saw any Congress workers around, which did not worry us as ordinary people came forward.”^{xvii} Even the women's wing of Congress, known as the all-India Women's Congress, had not come forward for the rescue of the destitute with its full strength. If they had shown their interest in a joint effort, the relief work would have been much stronger and more effective.^{xviii} On the other hand, the Hindu Mahasabha in their small hospital at Pichaboni in Contai, tried to keep its mortality rate down by turning away those patients who were in critical condition. A picture of Dr. Shyama Prasad Mookerjee was placed in every room of the hospital. According to T. G. Narayan, this was nothing but blatant political campaigning and propaganda.^{xix} Even the political parties did not hesitate to take the help of the hoarders to achieve their political goals. While the Muslim League was supported by the Muslim hoarders, the Huq Ministry and its ally, the Hindu Mahasabha, were supported by the Hindu hoarders.^{xx} In ‘My Political Thesis’, P. C. Joshi described the acute political factionalism in Bengal as a struggle between the majority and minority hoarders to have supreme control over the Ministry for their own selfish and sectional interests. He also argued that Bengal is starving because of its political leaders, who were not interested in getting food for the people by uniting themselves.^{xxi} In several cases, government aid, which was set aside for a general distribution amongst the poorest, was misused by the political parties, and priority was given to the most vocal section of the middle class and the wealthy agriculturalists for gaining political advantages.^{xxii}

The rural people of Bengal, mainly the agricultural labourers and sharecroppers, were severely affected by the strikes of famine but failed to access necessary support from the political parties, who were more interested in politics of hunger rather than using the strength of political unity against the imperial government to prevent hunger and destitution.

References:

- i. Dreze Jean & Amartya Sen, *Hunger and Public Action*, Delhi: Oxford University Press, 1993.
- ii. Amartya Sen, A. K. *Famine Mortality: A Study of The Bengal Famine of 1943* in E. J. Hobsbawm et. al., (ed) 'Peasants in History', Essays in Honour of Daniel Thorner, Oxford University Press, Delhi: 1980, pp. 194-220.
- iii. The Famine Enquiry Commission Report, 1945, p.66
- iv. Bhowani Sen, *Rural Bengal in Ruins*, Bombay: People's Publishing House, p.6.
- v. Cormac O. Grada, *Famine A Short History*, New Jersey: Princeton University Press, 2009, p. 166.
- vi. Haridas Mazumder, *The Shadow of Famine*, Calcutta: Lalmohan Chatterjee, March 1944, p. 7.
- vii. *Ibid.*, p. 8.
- viii. *Ibid.*, p. 9.
- ix. Sekhar Bandhopadhyay, *Caste, Protest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal, 1872- 1947*, Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 201.
- x. *Ibid.*, p. 234.
- xi. Srimanjari, *Through War and Famine in Bengal, 1939-45*, New Delhi: Orient BlackSwan, 2009, p.183.
- xii. *The Statesman*, 10 February 1944, p. 2.
- xiii. Srimanjari, *op.cit.*, p.185.
- xiv. Sanjoy Bhattacharya, *Propaganda and Information in Eastern India 1939-45: A Necessary Weapon of War*. U.K: Curzon Press, 2001, p. 204.
- xv. R. Batabyal, *Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali 1943-1947*. New Delhi: New Sage Publication, 2005, p. 135.
- xvi. P. C. Joshi, *Communist Reply to Congress Working Committee's Charges*, Bombay: People's Publishing House, 1945, p. 272.
- xvii. Manikuntala Sen, *In Search of Freedom*. Calcutta: Stree, January 2001, p. 71.
- xviii. *Ibid.*, p.73.
- xix. T.G. Narayan, *Famine Over Bengal*, Calcutta: The Book Company Ltd., 1944, pp. 172-73.
- xx. Rakesh Batabyal, *op.cit.*, p. 135.
- xxi. *Ibid.*
- xxii. Sanjoy Bhattacharya, *op.cit.*, p. 204.

A Study on Tribal Development Policies and Their Impact on Indigenous Communities in India

Debdas Mondal

Librarian, S.R. Fatepuria College
West Bengal, India

Abstract: *India's indigenous communities, commonly referred to as Scheduled Tribes, represent a significant portion of the country's cultural and demographic diversity. Despite constitutional protections and numerous welfare schemes, these communities continue to face systemic marginalization, socio-economic exclusion, and cultural erosion. This study critically examines the evolution and impact of tribal development policies in India, analysing their objectives, implementation frameworks, and real-world implications. It also explores the contradictions between state-led modernization and indigenous autonomy, highlighting successes, gaps, and the way forward for inclusive and sustainable development.*

Keywords: *Tribal Development, Scheduled Tribes, Indigenous Communities, Public Policy, Displacement, PESA Act, Forest Rights Act, India.*

1. Introduction

India is home to more than 700 tribal communities, accounting for over 8.6% of the total population (Census 2011). These communities are spread across diverse ecological zones, from the forests of Central India to the hills of the Northeast and the coastal plains of South India. Traditionally self-sustaining, tribal societies have been guided by distinct social, cultural, and economic systems that emphasize harmony with nature, collective living, and oral knowledge transmission. Post-independence, the Indian state recognized the historical disadvantages faced by tribal communities and adopted a welfare-centric approach to their development. However, despite targeted programs and constitutional safeguards, many tribal regions remain underdeveloped and impoverished. This paper analyses the policy framework governing tribal development in India and assesses the outcomes of such interventions from a socio-economic and cultural perspective.

2. Literature Review

Research on tribal development in India spans multiple disciplines, including anthropology, sociology, public policy, and economics. Scholars have extensively debated the effectiveness of tribal welfare policies, the consequences of state-led modernization, and the resilience of indigenous identities amidst socio-political transformation. This review synthesizes major academic perspectives and policy analyses to contextualize the study. Classic works by anthropologists such as **Verrier Elwin** and **G.S. Ghurye** set the tone for early discourse on tribal integration. **Elwin (1959)** advocated for the preservation of tribal cultures and minimal state interference, promoting a “national park” approach to tribal life. In contrast, **Ghurye (1963)** emphasized assimilation, viewing tribes as “backward Hindus” who should merge into mainstream society. These conflicting paradigms continue to influence policy debates. The introduction of the **Tribal Sub-Plan (TSP)** and later the **PESA Act (1996)** have been widely analysed for their design and implementation. Studies by **Xaxa (2005)** and **Rath (2006)** argue that despite these frameworks, tribal development remains hindered by bureaucratic inefficiency and lack of tribal participation. **B.K. Roy Burman** highlighted how centralization of power often contradicted the spirit of decentralized governance under PESA. A growing body of literature has critiqued the outcomes of the **FRA**. **Sundar et al. (2008)** argue that while FRA is a corrective legal measure, its poor implementation and high rate of rejections have failed to meet its emancipatory potential. **Bose (2013)** and **Kumar (2017)** further document the resistance from forest departments and systemic exclusion in claim processing. Displacement due to infrastructure projects and mining has been a critical area of concern. **Walter Fernandes (2008)** estimates that over 60 million people have been displaced since independence, with tribals constituting 40% of the displaced despite being only 8.6% of the population. These studies point to structural violence and the commodification of tribal land without adequate rehabilitation. Research by **Nambissan (2010)** and **Mohanty (2009)** highlights the gaps in educational outreach in tribal areas. While schemes like EMRS have improved access, curriculum content often lacks cultural sensitivity. Loss of mother tongue and oral traditions is a recurring concern, with scholars emphasizing the need for bilingual education and inclusion of indigenous knowledge systems. Recent scholarship emphasizes participatory development as a solution to the

top-down policy approach. Studies such as **Chaudhuri & Chaudhuri (2014)** document successful models in states like Maharashtra and Odisha where community-led implementation of FRA and PESA has enhanced local governance and cultural revitalization. These success stories underscore the importance of context-sensitive and inclusive development practices.

3. Historical Context and Evolution of Tribal Development Policies

The relationship between the Indian state and its tribal communities has undergone a significant transformation over the centuries. During the colonial era, the British administration viewed tribal regions primarily through the lenses of resource extraction and political control. The colonial state enacted a series of forest laws and land revenue systems that undermined the traditional lifestyles of tribal people. These legal interventions systematically restricted access to forests—once a primary source of livelihood and cultural identity for tribal groups—leading to dispossession, economic marginalization, and social disintegration. The tribal resistance movements during the colonial period, such as the Santhal Rebellion (1855–56) and the Birsa Munda Uprising (1899–1900), were direct responses to this colonial exploitation and cultural alienation. Post-independence, India adopted a more inclusive constitutional framework that acknowledged the distinct socio-cultural identity of tribal communities and committed the state to their upliftment. The Constitution of India introduced several safeguards:

- **Fifth Schedule (Article 244):** This provision governs the administration and control of tribal areas in mainland India. It empowers the Governor to intervene in state legislation that may adversely affect tribal interests and establishes Tribes Advisory Councils to ensure tribal voices in governance.
- **Sixth Schedule:** It extends to tribal areas in the northeastern states (e.g., Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram), allowing for the creation of Autonomous District Councils with legislative, executive, and judicial powers. This was a recognition of the need for decentralized governance mechanisms to protect the distinct socio-political structures of these regions.
- **Article 46:** As part of the Directive Principles of State Policy, this article mandates the state to promote the educational and economic interests of Scheduled Tribes (STs), and protect them from social injustice and all forms of exploitation.

A watershed moment in tribal policy came with the Fifth Five-Year Plan (1974–79) when the Planning Commission introduced the Tribal Sub-Plan (TSP) strategy. It marked a shift from a generalized approach to development toward targeted policy intervention in tribal areas. The objective was to bridge the development gap between tribal and non-tribal populations by earmarking specific financial resources for tribal welfare. Over the subsequent decades, the policy landscape evolved to encompass a broad spectrum of interventions-ranging from education and health to employment, forest rights, and local governance-culminating in landmark legislations such as the Forest Rights Act (FRA) and Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA).

4. Major Tribal Development Policies and Legislations

4.1 Tribal Sub-Plan (TSP) Strategy

The TSP was conceptualized to direct a proportionate share of the central and state budgets to tribal-majority regions. It mandated that public expenditure in tribal areas should match or exceed the percentage of the tribal population in a given state. Despite its conceptual strength, the execution of TSP has often been diluted due to several systemic issues:

- The absence of a dedicated budget line item made tracking and accountability difficult.
- Projects meant for general development were often misclassified as tribal-focused.
- Community participation, a vital component for sustainability, was largely absent in planning and implementation.

As a result, TSP often became a top-down, bureaucratic exercise rather than a transformative developmental initiative.

4.2 Forest Rights Act (FRA), 2006

The FRA was a landmark legislative effort to reverse the historical injustices suffered by forest-dwelling Scheduled Tribes (FDSTs) and other traditional forest dwellers (OTFDs). The Act recognizes:

- Individual rights over forest land for habitation and cultivation.
- Community rights over forest produce, grazing areas, water bodies, and traditional worship places.
- Rights of management and conservation, empowering Gram Sabhas to protect biodiversity and preserve customary practices.

Although groundbreaking in principle, the implementation has lagged. Key challenges include:

- Excessive bureaucracy and stringent documentation requirements.
- High rejection rates (up to 50–60% in some states) of claims without proper redressal mechanisms.
- Resistance from forest departments that fear loss of control over land and resources.

4.3 Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)

PESA was enacted to extend the principles of democratic decentralization to the Scheduled Areas. It sought to:

- Empower Gram Sabhas with decision-making authority over natural resource management, local dispute resolution, and approval of development projects.
- Recognize customary tribal laws and practices in governance.

Despite its potential to redefine grassroots democracy, PESA has faced roadblocks such as:

- Weak political will and incomplete legal integration into state laws.
- Administrative interference and reluctance to devolve real power to Gram Sabhas.
- Inadequate capacity building for tribal communities to exercise their rights effectively.

4.4 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005

MGNREGA guaranteed 100 days of wage employment per year to rural households, with tribal areas witnessing considerable benefits. It helped:

- Alleviate poverty and reduce seasonal migration.
- Promote financial inclusion through direct benefit transfers.

However, implementation flaws such as delayed wage payments, fake job cards, and underemployment have undermined its full potential in tribal belts.

4.5 Education and Skill Development Programs

Several schemes were introduced to address the educational backwardness of tribal children:

- Eklavya Model Residential Schools (EMRS): Residential schools that aim to provide quality education in remote tribal areas.
- Van Bandhu Kalyan Yojana (VKY): A holistic development program focusing on education, skill development, and health.

While these schemes have improved access to schooling, challenges remain in terms of:

- High dropout rates.
- Shortage of trained teachers and frequent absenteeism.
- Lack of culturally relevant curricula and neglect of tribal languages.

5. Impact on Indigenous Communities

5.1 Socio-Economic Outcomes

Government policies have contributed to improvements in literacy, infant mortality, and access to drinking water and sanitation. However, disparities persist:

- As per NFHS-5 (2019–21), tribal populations show disproportionately higher rates of malnutrition, maternal mortality, and educational dropout compared to the general population.
- Economic inequality and social exclusion remain widespread due to structural disadvantages.

5.2 Land and Resource Rights

The failure to enforce FRA provisions has resulted in continued land alienation:

- Mega development projects-mining, hydroelectric dams, and industrial corridors-have led to forced evictions and dispossession of tribal lands.
- The clash between forest conservation policies and tribal rights has criminalized traditional forest use, intensifying mistrust between communities and authorities.

5.3 Cultural and Linguistic Erosion

Mainstream development often fails to respect tribal epistemologies, rituals, and language systems:

- Most school curricula exclude tribal histories, folklore, and languages.
- Media representation of tribal culture is often limited to exoticization or stereotyping.
- Modernization, without safeguards, accelerates loss of identity and cultural disintegration.

5.4 Political Empowerment and Participation While constitutional reservations have ensured tribal presence in legislative bodies and local governance structures, real empowerment is constrained:

- Gram Sabhas often lack financial autonomy and institutional support.
- Administrative machinery frequently bypasses traditional tribal institutions, reducing their role to token representation.

6. Gaps and Challenges in Policy Implementation

Despite progressive policies, the tribal development agenda faces significant roadblocks:

- Top-down Planning: Policies are rarely designed in consultation with tribal communities, resulting in solutions that fail to resonate with ground realities.
- Bureaucratic Hurdles: Corruption, red tape, and excessive documentation requirements discourage tribal beneficiaries from accessing entitlements.
- Fragmented Governance: The overlapping authority of departments dealing with forests, tribal affairs, revenue, and rural development leads to policy inconsistency and poor coordination.
- Lack of Data and Evaluation: There is a chronic shortage of disaggregated and updated data on tribal populations, which hampers effective planning, resource allocation, and impact assessment.

7. Case Studies and Best Practices

7.1. Menda-Lekha, Maharashtra

This village became a beacon of community-led forest governance by successfully implementing community forest rights under FRA. It demonstrated that empowering Gram Sabhas and recognizing traditional knowledge can lead to sustainable natural resource management.

7.2. Dongria Kondh, Odisha

The resistance by the Dongria Kondh tribe against the proposed bauxite mining in Niyamgiri Hills was a landmark victory for tribal rights. Backed by the Supreme Court judgment and robust community mobilization, it reinforced the constitutional mandate of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

7.3. Eklavya Model Residential Schools (EMRS)

Despite infrastructural and administrative challenges, some EMRS in Gujarat and Jharkhand have produced first-generation graduates and helped improve educational attainment among marginalized tribal groups.

These examples underline that context-sensitive, community-led, and rights-based approaches are more likely to succeed in tribal development than imposed, one-size-fits-all solutions.

8. Way Forward: Towards Inclusive and Participatory Tribal Development

To make tribal development transformative and just, India needs to reframe its approach along the following lines:

- Strengthen FRA and PESA: Ensure full and transparent implementation through grievance redressal, regular audits, and community capacity building.
- Revitalize Indigenous Languages and Cultures: Promote bilingual education, local curriculum development, and community media to preserve tribal identities.
- Incorporate Tribal Indicators: Develop tribal-centric development metrics that go beyond GDP and include well-being, cultural integrity, and environmental harmony.
- Institutionalize FPIC: Mandate free, prior, and informed consent for any industrial, infrastructure, or conservation project affecting tribal communities.
- Leverage Traditional Ecological Knowledge: Recognize and integrate tribal knowledge systems into policies on biodiversity, climate adaptation, and sustainable agriculture.

9. Conclusion

Tribal development in India represents both a challenge and an opportunity. While legal and policy frameworks such as FRA, PESA, and TSP are progressive in spirit, their weak implementation has perpetuated a cycle of marginalization, landlessness, and cultural erosion. The gap between policy intentions and on-ground realities reflects systemic inertia, administrative apathy, and lack of community ownership. To bridge this gap, a paradigm shift is necessary—from viewing tribal communities as beneficiaries of welfare to recognizing them as equal stakeholders in governance and development. This means respecting their land rights, embracing their knowledge systems, and enabling genuine political and economic empowerment. Only through such inclusive and participatory models can India fulfil the constitutional promise of justice, equality, and dignity for its indigenous citizens.

References:

1. Baviskar, A. (2005). *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley*. Oxford University Press.
2. Government of India. (1996). *Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act*. Ministry of Rural Development.
3. Government of India. (2006). *The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006*. Ministry of Tribal Affairs.
4. Ministry of Tribal Affairs. (2021). *Annual Report 2020-21*. Government of India. <https://tribal.nic.in>
5. National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-21. *International Institute for Population Sciences*. <https://main.mohfw.gov.in>
6. Planning Commission. (2006). *Report of the Working Group on Empowerment of Scheduled Tribes for the Eleventh Five Year Plan (2007-2012)*. Government of India.
7. Rao, M. (2019). Tribal Development in India: Problems and Prospects. *Economic and Political Weekly*, 54(36), 45-51.
8. Shah, G. (2010). *Social Movements in India: A Review of Literature*. SAGE Publications.
9. Xaxa, V. (2001). Protective Discrimination: Why Scheduled Tribes Lag Behind Scheduled Castes. *Economic and Political Weekly*, 36(29), 2765-2772.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in



Published By: Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Phn: 8250595647

Email: ebongprantik@gmail.com

Website: www.ebongprantik.in